Pearl S. Buck-র The Patriot-র অনুবাদ।

পোর্ট্রেট



॥ পার্ল বাক ॥

অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু

॥ [illegible] ॥
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীপঞ্চমী ১৩৬২

প্রকাশক ঃ
সুনীল দাশগুপ্ত
নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট ঃ
মণীন্দ্র মিত্র

মুদ্রাকর ঃ
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা-১৩

পাকিস্তান প্রাপ্তিস্থান ঃ
বইঘর
চট্টগ্রাম

চার টাকা আট আনা

পেঁচ্‌মট

চীন সাধারণতন্ত্র পনেরো বছরে পা দিয়েছে। পশ্চিমী হিসেবে ১৯২৬ সালের কথা। সাংহাইয়ে থাকেন দুই পুত্রের পিতা ধনপতি ব্যাংকার শ্রীযুক্ত উ। বহু পুরুষের বিত্তশালী উ পরিবার—এবং এই শহরের জীবনেও নানা দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠা প্রায় তিন পুরুষের। বর্তমানে শ্রীযুক্ত উর হাতেও সে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ আছে। কারণ গ্রেট্ চায়না ব্যাংকের কর্ণধার তিনি। মস্ত বড় ব্যাংক। মধ্য আর দক্ষিণ চীন জুড়ে তার শাখা প্রশাখা। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক দেখবার জন্য অতি অল্প বয়সেই জাপান আর ইওরোপ ভ্রমণ করেন এবং ফিরে এসেই এই ব্যাংক স্থাপন করেন। কালে নয়া শাসন ব্যবস্থার আমলে ব্যাংক ফেঁপে উঠল।

শ্রীউর বাবা জেনারেল উর ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক নেই। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় অন্যান্য সামরিকদের মত সভরসায় ব্যাংকের দিকেই তাকান।

সামরিক হলেও কখনও যুদ্ধে যাননি জেনারেল উ।

মাঞ্চু রাজত্বের শেষ সময় তখন। বছর আঠারোর তাগড়া জোয়ান ছেলে উ। সুদর্শন চেহারা। ওকে বিদেশে পাঠাবার আদেশ এল সেবার সামরিক শিক্ষার জন্য। শুনে বাবা মা আঁৎকে উঠলেন। মা কেঁদে কেটে অন্নজল ছাড়লেন এবং শেষ অবধি নাতির মুখ না দেখা পর্যন্ত ছেলের যাওয়া রদ করে বিশেষ হুকুম নামা জারী করিয়ে ছাড়লেন। একটি কাঁদুনে খোকা অর্থাৎ অধুনা ব্যাংকার শ্রী উকে কোলে পেয়ে তবে ছেলেকে ছাড়লেন।

একই সঙ্গে আরো কয়েকজন যুবককে পাঠিয়েছিলেন সম্রাট। লোকে ভাবল নিদানের ডাকে টনক নড়েছে মাঞ্চু রাজার। অন্তিম কালে তাই ঘুণ-ধরা, ফোঁপরা সেনাবাহিনী সংস্কারের খেয়াল হয়েছে। কিন্তু সংস্কার-টংস্কার হয়নি—কেন, সে খবর দুনিয়া জানে। সম্রাট ছিলেন দুর্বল। প্রবল প্রতাপান্বিতা রাণী-মাতার চক্রান্তে দুর্বল পুত্রের সমস্ত সংস্কারমূলক কর্ম-সূচি বানচাল হ'ল। ফলে দুবছর যেতে না যেতেই সুদূর বার্লিনে অর্থাভাবে

বিপন্ন হলেন উ। জানতে পেরে টাকা পাঠিয়ে বাবা ছেলেকে ফিরিয়ে আনলেন। চোখ খুলল তরুণ জেনারেল উর। উপলব্ধি করলেন—রাজা নয় রাষ্ট্রের আসল চাবিকাঠি ব্যাংকের হাতে। এবং তখনি দু'বছরের শিশুপুত্রের ভাগ্য নির্ণয় হয়ে গেল। বড় হয়ে সে ব্যাংকার হবে।

হ'লও তাই। সাংহাই-এর মাটিতে পা রাখতে না রাখতে শ্রীযুক্ত উ চোখ বুজলেন। বৈধব্য সইতে না পেরে মাও সতীর মত পতির পথ ধরলেন নিজের হাতের সোনার আংটি ও বিষাক্ত পাথর গিলে। অতএব কচি বয়সেই সমস্ত উ পরিবারের কর্ণধার হলেন জেনারেল উ। বাপের এক মাত্র ছেলে—অতএব পিতার বিপুল সম্পত্তি এবং সুদূর হুনান প্রদেশে অবস্থিত পিতৃপুরুষের জমি-জমা, ঘর-বাড়ী যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়ে বসলেন।

অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় টাকা রেখেছিলেন বৃদ্ধ উ। ব্যাংকের ওপর এতটুকু বিশ্বাস ছিল না তাঁর। ভাবতেন ওগুলো স্রেফ মানুষের কাছ থেকে টাকা লুটবার বিদেশী কায়দা। কাজেই বিপুল নগদ টাকা দিয়ে রুপোর জুতো তৈরী করিয়ে বাক্স বন্দী করে রেখে ছিলেন নিজের ঘরে। প্রথম কাজই জেনারেল উ করলেন সেই সব রুপোর জুতো নিয়ে রাখলেন বিভিন্ন ব্যাংকে। তারপর এক বিরাট ইমারৎ ফাঁদলেন সাংহাইয়ের ফরাসী পাড়ায়। অর্থাৎ তদানীন্তন ফ্যাশনেবল পাড়ায়। এক তরুণ ফরাসী স্থপতিকে রাখলেন মাইনে করে। বাড়ী করে, আসবার পত্রে বাড়ী সাজিয়ে দিলে সে। একেবারে খাস পারীর বিশুদ্ধ ঢংএর বাড়ী—চীনের ছিটে ফোঁটাও রইল না। সপরিবারে এখানে উঠে এলেন জেনারেল। সারাদিন চলে শ্রীমতীর ঘ্যান্-ঘ্যানানী—মোটা গালচে পাতা—অর্থাৎ কুটোটি পড়তে পারবে না মেজেতে। এমনি ধরনের হাজারো অসুবিধা বিদেশী কায়দার। শ্রীযুক্ত আঙুল দিয়ে দেখান বিদেশে হাজার হাজার গৃহিণীরা এসব অসুবিধা সয়েই তো ঘর করছেন। অতএব—।

পরম শান্তিতে চল্লিশটা বছর কেটে গেল। বড় ছেলে মানুষ হ'ল, ব্যাংকার হ'ল। অন্য ছেলেরা যে যার পথে গেল। সন্তানের লিষ্টিতে মেয়েরা ধরা নেই। তবু পিতৃ-কর্তব্যের ত্রুটি হয়নি। মেয়েদের সব ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। এবং তারপর তাদের কথা ভাবার আর দরকার হয়নি। তারপর যথাসময়ে সাংহাই-এর একটি সুশিক্ষিতা মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনলেন। দুটি নাতি হ'ল একে একে আই-কো আর আই-ওয়ান।

নাতিদের পেয়ে মহা খুশী বৃদ্ধ জেনারেল। চিরটা কাল শান্তিতেই কাটিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। যুদ্ধে যাননি কখনও, ছোটখাটো লড়াইও দেখেননি। তবু তিনি জেনারেল—যেহেতু কোন সুদূর অতীতে একদা সম্রাট কর্তৃক তিনি জার্মানীর সামরিক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং যেহেতু অতবড় সম্পত্তির মালিক উ। নিজেদের দেশের সৈন্য বাহিনী পরিদর্শন করবার জন্য যে সব উচ্চপদস্থ ইংরেজ, মার্কিনী বা ফরাসী সামরিক কর্মচারীরা মাঝে মাঝে সাংহাইতে আসতেন, তাদের মত করে কতগুলি উর্দি তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন নিজের দর্জি দিয়ে। যে কোন উর্দিতে চমৎকার মানাতো ভদ্রলোককে। কিন্তু সব মিলিয়ে মিলিয়ে খানিক রাশ্যান কসাকদের ঢং-এ নিজের খেয়াল মত বিচিত্র একটা পোষাক করিয়ে নিয়েছিলেন—ওটাই পরতেন সর্বদা।

উর্দি ছিল ও'র বাইরের পোষাক। বাড়ীতে পরতেন জমকালো জরীর কাজ করা খুব নরম সিল্ক বা সার্টিনের তৈরী সাবেকী ধরনের আলখাল্লা, আর মখমলের জুতো। উর্দিগুলো গুছিয়ে আলমারীতে রাখা থাকতো—প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তনের সময় একজন খানসামা নিয়মিতভাবে ওগুলো নুতন করে ঝেড়ে ঝুড়ে আর পদকগুলোকে পালিশ করে ঝক্ঝকে করে রাখত। পদকের কতগুলো ও'র নিজের কেনা, আর কতগুলি প্রত্যাশীদের দেওয়া উপহার।

সুখে স্বচ্ছন্দেই বড় হয় আই-কো, আর আই-ওয়ান। কোন ঝঞ্ঝাট নাই। একটু যা অসুবিধা, দু'ভাই দুরকম। আই-কো বড় ছেলে। ভারী ঘ্যান্ঘ্যানে স্বভাব। বাড়ীর আদরে ও বিগড়ে গেল। সে-আদর ওর পক্ষে মারাত্মক হ'ল, সেই আদরেই একেবারে অন্য মানুষ হ'ল আই-ওয়ান। মা-বাবা, ঠাকুর্দা ঠাকুরমা, মায় ঝি চাকর অবধি ওকে ভালোবাসে। ওকে নিয়ে কোন ঝামেলা সইতে হয়নি কোনদিন।

শুধু হঠাৎ একদিন গ্রেপ্তার হয়ে সে জেলে গেল। বয়স তখন সবে আঠার বছর। এ নিয়েও বাড়ীর কাউকে কোন ঝামেলা পোয়াতে হয়নি, কেননা কিছু জানতেই পারেনি কেউ। মাত্র একটা রাতই জেল হাজতে ছিল। ভোরবেলা অমনি ছাড়া পেয়ে গেল। যে মুহূর্তে জানতে পারলেন জেলার কার ছেলে আই-ওয়ান, সেই মুহূর্তেই ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে প্রায় কেঁদে পড়লেন ওর সামনেঃ

'বাবু, মালিক, জানতে পারিনি আপনি কে। ঘাট মাপ হয়।' নোংরা হাজত ঘরের এক কোণে খান তিনেক ইঁট পেতে বসে ছিল আই-ওয়ান। 'কেন এসেই বলেন নি বাবু, আপনি শ্রীযুক্ত উর ছেলে—আর জেনারেল উ আপনার ঠাকুর্দা! তাহলে তো—!'

বুক ফুলিয়ে উত্তর দেয় আই-ওয়ানঃ 'অপরাধ হয়ে থাকলে জেলে যাবো বইকি।'

আসামীদের মধ্যে একমাত্র ওরই সিল্কের পোষাক পরা। নীচের দিকটায় ময়লা লেগে গেছে, লুটিয়ে থাকায়। একজন আসামী মুখ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, তা মহারাজ অত ভালো জামাটা একটু গুটিয়ে চললেই হয়।' সস্তা নীল কাপড়ের তৈরী সরকারী ইস্কুলের উর্দি-পরা ছেলেটি—চোয়াড়ে ধরনের চেহারা। আই-ওয়ান পড়ে মিশনারীদের পরিচালিত বড়লোকের ছেলেদের ইস্কুলে—সেখানে উর্দি পরতে হয় না।

আই-ওয়ান জবাব দিয়েছিলঃ চলি না, এর চেয়ে আরো ভালো পোষাক আছে বলে।'

ঠিক এই মুহূর্তেই এসে পড়ল জেলার। কানে গেল আই-ওয়ানের কথা-গুলি। আরো ভয়ে মুখ কালো হয়ে গেল।

মিনতি করতে লাগল লোকটা, 'আমার উপর রাগ করবেন না খোকাবাবু। চাকুরীটি যাবে, আপনার বাবা রাগ করলে। গরীব মানুষ আমি। চলুন, বেরিয়ে আসুন আপনি, গাড়ী ডেকে একেবারে আপনার বাবার কাছে পেঁাছে দিয়ে আসি। বাড়ী গিয়ে আমার হয়ে একটু বলবেন বাবু কর্তাকে। গরীবের চাকুরীটা যাতে না যায়।'

হয়তো এবারও আগের মতই বুক ফুলিয়ে প্রত্যাখ্যান করত আই-ওয়ান।

কিন্তু মাত্র আঠারো বছর বয়েস, তারপর একদিকে ক্ষুধা, ক্লান্তি আর একদিকে ওই নোংরা ঘর। তা ছাড়া ওই নানা জাতের নানা বয়সের বিশ্রী নোংরা মানুষ-গুলোর মধ্যে এক ঘরে ওর কি রকম গা ঘিন ঘিন করছিল। ওই ছাত্রটি যা একটু ভদ্র দেখতে। সুতরাং বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠে মাথা উঁচু করে গট্‌গটিয়ে বেরিয়ে এল।

ভীত সন্ত্রস্ত জেলার গেটটি বন্ধ করছে এমন সময় থমকে দাঁড়াল ও।

'দাঁড়ান,' হুকুমের স্বরে বলে, 'ওই ছাত্রটিও আসবে।'

'তা তো পারি না,' জেলার বলে, 'ও যে বিপ্লবী।'

'আমিও তো তাই।', জোর গলায় বলে আই-ওয়ান।

সত্যি তাই, বিপ্লবী দলের বলেই ও ধরা পড়েছে ইস্কুল থেকে। সৈন্যরা ইস্কুল ঘেরাও করে প্রত্যেকটি ছাত্রকে খানাতল্লাসী করেছে। আই-ওয়ান একাই ঘুরে ঘুরে একটা বই পড়ছিল। কার্ল মার্কস বলে এক জার্মানের লেখা বই-খানা, ছাত্র মহলে অত্যন্ত প্রিয়। লুকুচুরি ভালোবাসে না আই-ওয়ান, যা ভাল বুঝবে তা করবেই। অতএব সে খানাতল্লাসীর ভয়েও বই লুকুল না ও।

'কি পড়ছ ওটা?'

'কার্ল মার্কস্।' অবজ্ঞাভরা জবাব। ভেবেছিল সৈন্যরা জানেনা কিছু। কিন্তু অবাক কান্ড, সেই মুহূর্তেই হাতে হাতকড়ি এবং টানতে টানতে জেলের ঘরে। সারা রাত ও রাগে গর্জাল। অন্য বন্দীরা ধম্‌কে দিল ক'বার, তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে।

জেলার জোরের সাথেই বলেঃ 'বিখ্যাত ব্যাংকার উর ছেলে বিপ্লবী হ'তে পারে না।'

রাগে মাটিতে পা আছড়ায় আই-ওয়ান।

'দাঁড়ান না, মজা দেখাচ্ছি, আপনার চাকরী থাকে কি করে দেখি।'

বেচারা জেলারের মুখ একেবারে ছাই। প্রায় কেঁদে ফেলে বলেঃ

'কিন্তু কি কৈফিয়ত দেব?'

'বলবেন, আমার হুকুম। আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব রইল।'

ইতিমধ্যে সেই ছাত্রটি এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। চৌক বলিষ্ঠ নিশ্চল মুখ; কিন্তু চোখে দীপ্তি আর তীক্ষ্ম সন্ধানী দৃষ্টি।

'হায় ভগবান!' আর্তনাদ করে জেলার।

হ্যাঁচ্‌কা টানে ওর হাত থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে গেট খোলে আই-ওয়ান। হায় হায় করে ওঠে জেলার, মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে।

নিজের দেহ আর পা দিয়ে দরজাটা ফাঁক করে ধরল আই-ওয়ান। ছেলেটি বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়াল। আই-ওয়ান বললঃ

'বলে দেবেন, আপনি কিছু জানেন না।' তারপর আবার গেট বন্ধ করে জেলারের হাতে চাবি দিয়ে হন্‌হন্‌ করে দু'জনে বেরিয়ে এল। গেটের লোহার গরাদের কাছে কাছে ভিড় করে এল বন্দীদের নোংরা ভীরু মুখগুলি।

জেলার গাড়ী ডেকে দিল। তাতে চড়ে বসল দু'জনে। শেষবার মিনতি করে বেচারাঃ 'দেখবেন বাবু একটু, আমি গরীব। চাকুরিটা যদি—'

'যদি যায় তবে জানাবেন আমায়।' সংক্ষিপ্ত কাটা একটা জবাব দিয়ে গাড়োয়ানকে বাড়ীর নম্বর দেয়।

নম্বর শুনে ছাত্রটি বলেঃ 'ওখানে তো যেতে পারব না।'

'কেন?' আই-ওয়ান শুধোয়।

'আমি যে সত্যি বিপ্লবী।' একটা রহস্যজনক হাসি হেসে বলে ও।

'সত্যি? আমি যে সত্যিকারের একজন বিপ্লবীর খোঁজ করছি কবে থেকে।'

হাল্কা ভাবে ছাত্রটি বলেঃ 'মেলা আছে বিশ্ববিদ্যালয়'।

তারপর হঠাৎ গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে গেল ও। এবং আই-ওয়ান ওকে ধরে ফেলার আগেই ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। যেতে যেতে বলে গেলঃ 'আমার নাম লিউ-এন্-লান। ধন্যবাদ, ছাড়িয়ে এনেছ বলে।'

বাড়ী ফিরে দেখে, ও যে রাতে ছিল না সে খবরই রাখেনা কেউ। চিত্ত-বিনোদনের জন্য সাধারণতঃ ও থিয়েটার দেখতেই যায়। বিশেষ করে ভালো-বাসে পুরানোকালের বীরদের কাহিনী নিয়ে নাটক যেমন অনেক সময় ডাকাতের গল্পে থাকে—মহানুভব ডাকাতরা ধনীদের কাছে লুট করে গরীবদের সাহায্য করে এমনি ধারা। সপ্তাহে প্রায় দিন দুই যায়ই। যেদিন যায় প্রায় ভোর রাত্তিরে ফেরে—নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়ীতে ঢোকে।

এবাড়ীতে সবাই দেরিতে শোয়। প্রতিটি দিন ও একা প্রাতরাশ খেয়ে ইস্কুলে যায়। চাকররা ছাড়া কেউ ওঠে না তখনও। আজও ও সবার অলক্ষ্যেই ওপরে গেল। ঘর বিছানা যেমনি ছিল তেমনিই আছে। প্রথমেই গিয়ে বিছানাটা এলোমেলো করে দিয়ে রাতে যে শোয়নি তার প্রমাণ ঘুচিয়ে দিল। তারপর জামা কাপড় ছেড়ে নেয়ে তৈরী হতে না হতেই দরজায় টোকা পড়ল। পিওনী, ওর মায়ের ক্রীতদাসী এসেছে চা নিয়ে।

আই-ওয়ানকে একেবারে তৈরী দেখে লজ্জা পায় পিওনী। তাড়াতাড়ি বলেঃ 'ছিঃ কত দেরি হয়ে গেল। উঠতেই দেরি হয়ে গেছে আজ।'

'তা আর কি হয়েছে। ওই সাহেবদের ইস্কুলে আর তো যাচ্ছিনে।'

'সেকি?' চায়ের ট্রেটা রেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে পিওনী।

'এবার থেকে সাধারণ ইস্কুলে পড়ব।' জানিয়ে দেয় আই-ওয়ান।

'ওরে বাবাঃ, সেখানে যে রামা শ্যামা সবাই যায়!'

'সেজন্যই তো আমারও জায়গা হবে।'

'তোমার বাবা আর ঠাকুর্দা দিচ্ছে যেতে।'

'খাওয়াই ছেড়ে দেব তাহলে।' জোর গলায় বলে আই-ওয়ান।

'তার মানে তো,' দুষ্টুমী উছলে যায় পিওনীর চোখে। 'আঁচল ঢাকা দিয়ে খাবার নিয়ে আসতে হবে আবার, তাই না? বাবুর অভ্যেস তো আছেই। কিছু দরকার হলেই, বাস্ খাবোনা, আর লুকিয়ে খাবার জোটাই আমি। ছিঃ ছিঃ আই-ওয়ান। ও সব শয়তানী বুদ্ধি আই-কোরই মাথায় খেলে, জানি।'

হেসে ওঠে দু'জনে।

জাতীয় বিদ্যালয়ে যাবার রাস্তা অমনি করেই করতে হ'ল। আই-ওয়ান খাওয়া ছাড়ল। অমনি ওর মা ছুটল বাবার কাছে; ঠাকুরমা ছুটল ঠাকুরদার কাছে। চারটি দিনও গেল না। তার আগেই ওর অঙ্গে উঠল লিউ এন্ লানের মত নীল উর্দি। শুধু মায়ের ইচ্ছায় কাপড়টা হ'ল ভালো বিলিতী কাপড়, আর জামাটা তৈরী হ'ল ওর ঠাকুরদার খাস দর্জীর হাতে। এটুকু সন্ধিতে

ওর আপত্তি হ'ল না। কারণ ওর ওপরে বাড়ীর লোকের অধিকারও জাহির থাকা চাই। শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পরখ করে সবাই বললে—বেশ মানিয়েছে।

ঠাকুমা বললেন—'আয় দেখি, গালটা টিপে দি!'

কি আর করবে—এখানেও সন্ধি করতে হয়।

দু' বছর পরের কথা।

স্কুলে স্কুলে বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটি। যোগ দিল আই-ওয়ানও। পরিবারের কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি এ পথে যাবে ও। সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী দুই ধারায় ওর জীবন চলে এখন। একদিকে ধনীগৃহে ধনীর দুলালের সনাতন জীবন। আর একদিকে ওই আবেগোচ্ছল তরুণদলের একজন হয়ে ওর স্বপ্ন দেখা—এই নূতন প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করে, নবতর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। এই প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধেই ওদের বিদ্রোহ। ঠিক এর আগের পর্বে এমনি করেই বিদ্রোহ হয়েছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার জীবন বলেও—কোথাও সংঘর্ষ নেই। স্কুলের বন্ধুরা কেউ ওর মস্তবড় বাড়ীটা দেখেওনি। এই সেদিন শুধু পেংলিউ দেখে ফেলল। ইস্কুল ছুটির পর বাড়ীর কাছেই একটা মিষ্টির দোকানে সেদিন ঢুকেছিল আই-ওয়ান। বেরুতেই দেখা পেংলিউর সাথে। বিপ্লবী দলেরই একজন ছেলে। নেহাৎ সাদাসিধে মানুষ, অথচ ওকে একেবারে পছন্দ করে না আই-ওয়ান। শহরেরই একজন ছোট দোকানদারের ছেলে ও—গায়ে পায়ে ছোট্ট এতটুকু মানুষ, কুৎকুতে চোখ, ঝুলে-পড়া ঠোঁটের ফাঁকে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোয় সর্বদা। এগুলোব ওপর বেচারার হাত নেই; কিন্তু তবু কেউ ওকে দেখতে পারে না।

'কোথায় যাচ্ছ, আই-ওয়ান?' পেংলিউ ডেকে বলে।

'বাড়ী।' বলে ফেলেই মনে হ'ল, মিথ্যে কথা বললেই হ'ত। এই তো সাথ নিলো মানুষটা। নিক। বাড়ীর গেট পর্যন্ত, বাস। ভেতরে যেতে মোটেই বলবে না। কারণ ওকে বড়-বড় ঐশ্বর্য দেখাতে চায়না আই-ওয়ান। দেখে ভাববে তো—বাইরে খুব বিপ্লব ফলানো, ওদিকে তো দেখছি দিব্যি রাজার হালে থাকা হয়। বুঝবে না তো কিছু। এদিকে মানুষটা এলই বা কি করে! বাড়ীতো ওর সেই কতদূরে চীনে-পাড়ায়। কোন মতলব নেই তো পেছনে? বাড়ীর দরজায় এসে বিদায় দেয় পেংলিউকে।

'কাল দেখা হবে,' বলে পেংলিউ।

'ভীরু কোথাকার! ত্রিসীমানায় কেউ নেই, তাও বাবুর মুখ দিয়ে 'কম্‌রেড্' কথাটা বেরুবে না।' মনে মনে গর্জায় ও।

কিন্তু পেংলিউ গেল না। জিজ্ঞাসা করে।

'এই বুঝি তোমার বাড়ী? এখানেই থাকো?'

বাড়ীটার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায় ও।

'কি করব না থেকে।' জবাব দেয় আই-ওয়ান, 'ঠাকুর্দার তৈরী বাড়ী, সবাই আছে এখানে এক সাথে। কাজেই আমারও থাকতে হয়।'

'বেশ বাড়ীটি। বিলিতী ধরনের।' বলে পেং লিউ।

কথায় অকিঞ্চনের সুর। ভালো লাগে না আই-ওয়ানের।

'আসি তাহলে।' জোর গলায় হাঁকে ও।

'আমিও চলি।' পেং লিউও বলে।

জোর কদমে মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে আই-ওয়ান।

আজ ওদের দলের সভা ছিল। তাই ফিরতে দেরি হয়েছে। ক্ষিদেও পেয়েছিল সেজন্যই গিয়ে ঢুকেছিল খাবার দোকানে। ওর আওয়াজ পেয়ে ঠাকুমা হাঁক দেন :

'এলিরে আই-ওয়ান? আয় এখানে। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

ঠাকুরমার ঘরে ছিল পিওনী। ছুটে এসে ওর হাত থেকে বইপত্র নিয়ে ঠোঁটের একটা বিমিষ্ট-ভঙ্গি করে বলে : 'রেগে টং হ'য়ে আছে গিন্নী।'

, ভ্রূ কোঁচকায় আই-ওয়ান।

'যাচ্ছি ঠাক্‌মা।' জবাব দেয় আই-ওয়ান। 'আই-কো এসেছে পিওনী?'

মাথা নাড়ে পিওনী। আই-ওয়ান ঠাকুরমার কাছে চলে যায়।

ছ'বছর বয়েসে প্রথম ইস্কুল গেছে আই-ওয়ান। সেই থেকে চলছে ইস্কুল থেকে এসেই ঠাকুরমাকে দেখা দিয়ে তবে অন্য কথা। ভারী বিশ্রী লাগে ওর। যত দিন যায় ততই রাগ হয়। একি! প্রত্যেকটি দিন এক বুড়ী ওর জন্য বসে থাকবে, আর ওকে গিয়ে তার দরবারে হাজিরা দিতেই হবে। যখনই ভাবে—মনটা খারাপ হয়ে যায়। ওদের আড্ডার সভায় যখনই পারিবারিক বন্ধনের কথা ওঠে, আই-ওয়ান উঠে জোর গলায় বলে : পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে না পারলে, কোন কাজই সম্ভব হবে না আমাদের দ্বারা।' নিজের পরিবার, বিশেষ করে ঠাকুরমার কথা কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে সর্বক্ষণ।

অপ্রসন্ন সুরে বলে : 'এই যে এসেছি ঠাক্‌মা।'

মস্ত বড় পালং-এর ধার ঘেঁষে বসে আছে বৃদ্ধা—কাছেই বাতি আর চণ্ডুর নল তৈরী। নাতি সন্দর্শন হলেই নলে পড়বে টান। আই-ওয়ানের স্বরের অপ্রসন্নতা ধরা পড়ে না বৃদ্ধার কাছে।

'আয় আয় কাছে আয়।' সামনে সরে বসে বৃদ্ধা, এদিকে আয়, একটু দেখি তোকে।'

আসতেই হয় কাছে যদিও ভারী খারাপ লাগে। লম্বা লম্বা নখ-ওয়ালা অস্থি চর্ম-সার দুটো থাবা এসে ওর হাত ধরে।

'হাত ভেজা কেনরে?' চীৎকার করে ওঠে বৃদ্ধা।

'বড় গরম বাইরে।'

'ছুটতে ছুটতে এসেছিল,' তিরস্কার করে ঠাকুরমা, 'কতবার তোকে অমন করে হুটোহুটি করতে বারণ করেছি। মানুষ ক্ষয়ে যায় না অত হুটোপাটিতে!'

'তাড়াতাড়ি হাঁটতে আমার ভালো লাগে।' বলে আই-ওয়ান।

'তোমার ভালো লাগলেই তো চলবে না। বংশের কথা মনে রাখতে হবে। আমার নাতি তুমি সে খেয়াল রেখো।'

না, কখনও না। যা কিছু ওর মূল্য সে এই বৃদ্ধার পৌত্র বলে? ওর বংশধর বলে! মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

বিরস মুখে বলে, 'বারে! একটুও যেন ইচ্ছেমত চলব না।'

তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ওর কব্জী চেপে ধরে বৃদ্ধা হঠাৎ। চীৎকার করে ওঠে : 'একটু মানে? সব সময়ই তো নিজের খুশিমত চলছিস। শুধু

নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা গ্রাহ্যির মধ্যেই নেই তোদের। কি হ'ল সব একালে! আই-কেও ঠিক তেমনি। সারা দিন একটি বারও এধার মাড়ায় না।'

হঠাৎ যেন কেমন ভয় করে, কি জানি যদি চটে গিয়ে থাকে নাতি! এক হাতে ওকে ধরে রেখে আর এক হাতে খেজুরের মোরব্বার টিনটা এনে একটা খেজুর তুলে দিলেন নাতির হাতে।

আই-ওয়ানের ইচ্ছে হয় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু লোভনীয় খাদ্যটি দেখেই পেটের আগুন চনচনিয়ে ওঠে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কেন জানি, সব সময়েই ওর পেটে ক্ষিদে। অতএব ভ্রূ কোঁচকাতে কোঁচকাতে খেজুরটা নিয়ে মুখে ফেলে।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে!' হাসে ঠাকুরমা। আস্তিনের ভেতর দিয়ে আই-ওয়ানের হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'জানিস্, তোকে ছাড়া আর কাউকে ছোঁয়াইনে এই বস্তু। ভারী বলকারক। খুব রক্ত হয়। কাউকে দিইনে। খালি—' পিওনীকে শুনিয়ে একটু জোর গলায় বলেঃ 'আমি ঘুমুলে ওই হত-ভাগী চুরি করে সব মেরে দেয়।'

পিওনীর শান্ত রুপোলী স্বর খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে রিন্‌রিনিয়ে ওঠে; 'আমি গিন্নিমা? ও মা সে কি গো! কক্‌খনও না।'

'কক্‌খনও না! চুরি ক'রে বলে শেষ করে দিলে। মুখপুড়ীর কি দরদ আছে গো! সেই সাত বছরের ছুঁড়িকে কড়ি দিয়ে কিনে আজ এই এগার বচ্ছর পালছি। নেমকের মান কি আর রাখে ও ছুঁড়ি!'

জবাব দেয় না আই-ওয়ান। পিওনীর হয়ে কথা কইতে গিয়ে শেষে ঠাকুরমার সন্দেহে পড়ো। একবার ভুল ক'রে শিক্ষা হয়েছে, আর না।

হাত টেনে নিয়ে বলেঃ 'ও ঠাক্‌মা, এত এত ইংরাজীর কাজ রয়েছে যে কালকের জন্য!'

'ও! তাই নাকি? আচ্ছা। কিন্তু বেশী রাত জাগিসনে যেন।'

'যাই ঠাক্‌মা।'

'যাই নয়, শুতে যাবার আগে আসবি আর একবার।'

'তখন কি আর হুঁশ থাকবে তোমার! চণ্ডু টেনে তো বুঁদ হয়ে থাকবে।' রূঢ়ভাবে বলে আই-ওয়ান।

'না রে, না। বল কখন আসবি—ঠিক জেগে থাকব। দেখিস।'

'সে সব পারব টারব না। পড়া শেষ হ'লে, তবে তো!'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বৃদ্ধা। চণ্ডুর হুঁকোর দিকে চোখ পড়ে। চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলেঃ 'তা বটে, তা বটে।' তারপর ডাকে—

'পিওনী।'

নিঃশব্দে আসে পিওনী রেশমী জুতো পায়ে। বৃদ্ধাকে শুইয়ে দিয়ে হুঁকো ধরায়। আই-ওয়ান তখনও দাঁড়িয়ে।

'বইগুলো টেবিলের ওপরেই রেখেছি।' পিওনী বলে ওকে।

বৃদ্ধার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে এরই মধ্যে। ফিস্‌ফিস্ করে বলে আই-ওয়ানঃ 'জাহান্নামে দিচ্ছিস্ বুড়ীকে, লজ্জা করে না তোর!'

কালো ডাগর চোখ দুটো দিয়ে বড় বড় করে চায় পিওনী।

'হুকুমের চাকর।' আই-ওয়ান ভ্রূ কুঁচকে মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়। পেছন ফিরে দেখে আর একবার—ছোট্ট রুপোর চামচ দিয়ে কি একটা এঁটেল বস্তু

মেশাচ্ছে পিওনী। কিন্তু চোখ ছিল না ওদিকে। কখন তাকাবে আই-ওয়ান সেই অপেক্ষাই করছিল দুষ্টু মেয়ে। এখন চোখে চোখ পড়তেই লাল টুক্-টুকে জিভটা বের ক'রে ভেংচে দিলে। ধড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল আই-ওয়ান।

কিন্তু দরজা বন্ধ ক'রেই বা নিস্তার কোথায়। আফিমের মিঠে মিঠে ঝিম্ ধরানো গন্ধ সর্বত্র। ওপরে গিয়ে নিজের ঘরের জানালাগুলো সব খুলে দিলে—কিন্তু তবু গন্ধ। হাওয়া নেই—গোটা বাড়ীটার বায়ুমণ্ডলে জড়িয়ে আছে সেই মৃদু অথচ তীক্ষ্ম গন্ধ। সারা জীবন শুঁকে আসছে ওই গন্ধ আর সারা জীবন ধরে এসেছে ঘৃণা করে। সাবেকী চীনে ধরনের বাড়ী হ'লে আঙিনার দেয়ালে তবু আটকাত খানিকটা। কিন্তু প্রতি তলায় এই বিরাট বিরাট হল আর সিঁড়ির স্তর বেয়ে বিষাক্ত গ্যাসের মত সর্বত্র ছড়িয়ে যায় আফিমের ওই আদিম গন্ধ। চুপি-চুপি-আসা, শক্তি-হারা ওই সৌগন্ধে যেন মৃত্যুর পূতি। সারা বাড়ীটা বিষাক্ত হ'য়ে আছে। সিল্কের প্রাচীর সজ্জায়, চেয়ার কৌচে রাখা লাল তাকিয়া গুলোয়—কোথায় নেই। রাত্তিরে সিল্কের লেপটা টেনে শুতে যায়—তাতেও। সারাক্ষণ কেবলি যেন গন্ধ পাচ্ছে।

সেই জন্যেই মনে মনে ভাবে আই-ওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে এন-লানের ছোট্ট কুঠুরীখানার মত নেড়া ঘরই ভালো। পিওনীকে দিয়ে দরজা জানালার দামাস্কের ভারী ভারী পরদা গুলি খুলিয়ে ফেললে। ওর জন্মের বহু আগে প্রত্যেকটি দরজা জানলায় ওই পরদা ঝুলেছিল ফরাসী সজ্জাবিদের হাতে। এখনও তেমনি ভাবেই সর্বত্র কায়েম আছে ওর ঘরের জানালা দুটো ছাড়া। পর্দাশূন্য জানালাগুলো হাঁ হাঁ করে। আলো এসে প'ড়ে যেন ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে। পিওনী মুখ বাঁকায়—ম্যাগোঃ! কি বিচ্ছিরী! কড়া আলোকে মোলায়েম করার জন্য প্রাণপাত করে মেয়ে। আজও এসে আই-ওয়ান দেখল তার নিদর্শন—জানালায় নীল ফুলদানীতে গোলাপী করবীর এক গুচ্ছ। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভাবল আই-ওয়ান, 'কি হবে ফুল দিয়ে? ফেলে দেব ছুঁড়ে।'

কিন্তু ওই ভাবা পর্যন্ত। ব্যথা পাবে পিওনী। কি করে আঘাত দেবে ও মেয়েকে? এ বাড়ীতে কথা কইবার মত এই তো একটা প্রাণী। কিন্তু বলবে কি ওকে সব কথা? ওযে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে এবং শিগ্গিরই হয়তো সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে হবে—বলবে সব? মন ঠিক করতে পারে না ও। ছেড়ে যেতে হবে? এই বাড়ী, এই জীবন? মনে হলে গর্বে বুক ফুলে ওঠে, আবার ব্যথাও বাজে। কিন্তু উপায় কোথায় এ ছাড়া? ধনতন্ত্র-বাদের সৃষ্টি, পুরানো ঝরঝরে মৃতকল্প এই সমাজ-ব্যবস্থা থেকে দেশকে বাঁচাবার কোথায় উপায় আর?

আই-কোও মরে গেছে, তরুণ হলেও ঠিক ঠাকুরমারই মত মরে গেছে ও। যে নিজের সুখ ছাড়া আর কিছু জানে না সে মৃত ছাড়া আর কি? কিন্তু তবু বাবার পাশেই ও স্থান করে নিয়েছে অতি সহজে। অতবড় ব্যাংকের সভাপতির ছেলের এ প্রাপ্য সম্মান। আই-কো কি করে না করে কিছুই জানে না আই-ওয়ান। শুধু এটুকু জানে পারতপক্ষে আই-কোর পদাংক ও অনুসরণ করবে না।

বাড়ীতেও ওই বিশ্রী ঘন নীল রংএর ইস্কুলের পোষাক পরে থাকলে রাগ

করেন ওর বাবা আর ঠাকুর্দা। তাই ওটা ছেড়ে ধোঁয়াটে সবুজ রং-এর হালকা সিল্কের আলখাল্লাটা পরে নিল। পাকানো সুতোর বোতামগুলো আঁটতে আঁটতে ভাবতে লাগল—আর ক'দিন। এসব তো ছাড়তেই হবে। তখন শুধু ওই ইউনিফর্ম ছাড়া আর কিছু পরবে না। এই ঝোলানো ল্যোটানো পোষাক পরে কি বিপ্লবীর চলে? পাহাড় চড়তে হবে, মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হবে গাঁয়ে মাঠে ঘাটে; রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে লোককে বোঝাতে হবে বিপ্লবের কথা। এসব কি আর সিল্কের জোব্বা-জাব্বা পরে করা চলে? শুধু ভোলই নয়, নামও পাল্টে ফেলতে হবে। নইলে সাংহাইয়ের ধনী ব্যাংকারের ছেলেকে বিশ্বাস করবে কে?

দরজার কাছে ছোট্ট একটু কাশি শোনা যায়। সাথে সাথেই পিওনীর ছোট্ট মাথাটা দেখা যায় দরজার ফাঁকে:

'ঠাকুর্দা জিজ্ঞাসা করলেন, এত দেরী কেন? আর বাবা ডাকছেন এক্ষুণি।' ঘোষণা শুনিয়ে দেয় পিওনী।

'যাচ্ছি, বলগে।' সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় আই-ওয়ান।

ঘরের মধ্যে চলে আসে পিওনী। সোজা চলে যায় জানালার কাছে, স্বর বদলে যায় ওর। বলে:

'করবী ফুলটা দেখেছ?'

'হুঁ।'

চামড়ার জুতো খুলে মখমলের চটি পরে আই-ওয়ান। ইস্কুলের জুতোর খটখটানি শুনলে ঠাকুর্দার হাতে রক্ষা থাকবে না। ফিরে এসে জুতো বদলে নিয়ে তবে রেহাই।

'সূর্যের আলো পড়ে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে না ফুলগুলো?' শুধায় পিওনী।

তাকায় আই-ওয়ান চোখ তুলে। নতুন করে দেখল আজ এ মেয়েকে। এ যেন সেই কড়ি দিয়ে কেনা দাসী নয়, ওর খেলার সাথী, কলহের সাথী সেই পিওনী নয়। ফুলের পাশে বড় সুন্দর লাগল ওকে। বলতে ইচ্ছে করে —তুমি সুন্দর! তুমি সুন্দর! কিন্তু ওযে পিওনী, শুধু পিওনী, আর কিছু নয়!

'কে জানে, বাবা! কে দেখতে গেছে তোর ফুল।' আর দ্বিতীয় কথা না বলে বেরিয়ে গেল আই-ওয়ান। কিসের কৌতূহল ওর? পিওনী কেমন দেখতে হয়েছে এখন, এত ওর কিসের গরজ? মনে পড়ে সেই যখন ছোট্ট ছিল পিওনী। হলদে রং-এর মুখটা—একরত্তি মানুষ। যেন বাড়ই ছিল না। কই এখন তো সে হলদে রং নেই ওর।' অবশ্যি লম্বা হয়নি। কিন্তু হলদে ভাবটা গেছে।

হল পেরিয়ে ওর ঘরের ঠিক উল্টো দিকেই ভারী কাঠের দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে একটু কাশল ও।

'এস।' ডাকলেন ঠাকুর্দা।

ভেতরে আসে আই-ওয়ান।

ঠাকুমার মত অত খারাপ লাগে না ঠাকুর্দাকে। তবে ভয় করে। অনেক জিনিস জানেন ঠাকুর্দা, যদিও বয়েসের দরুনে ভুলে গেছেন অনেক কিছু।

কিন্তু ও'র চাইতে যে আর কেউ বেশী জানতে পারে কিছুতেই মানবেন না। কেউ যদি বলে বিদেশীরা এরকম করে, তক্ষুণি তিনি প্রমাণ করে দেবেন, সত্যিই তাই; অথবা তার বিপরীত। কেউ যদি বিদেশের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে অমনি বলে দেবেন, 'হ্যাঁ ভাই দেশগুলো সবই তো ঘুরে দেখলাম। প্রত্যেক জায়গা প্রত্যেকটা থেকে আলাদা। আর সবগুলো আমাদের থেকে একেবারে আলাদা। ওই হ'ল আসল কথা।'

আরো জোর করো তো অদ্ভুত সব গল্প ফেঁদে বসবেন। পঞ্চাশ বছর আগে রেলগাড়ীগুলো নাকি ছিল ড্রাগনের মত। বুঝলে তো! হাঁ হ'য়ে শুনছে সব। বলে চললেন, 'ভেবে দেখ দিকিন মাঠ ভেঙে গর্জাতে গর্জাতে চলেছে ড্রাগনটা আর নাক দিয়ে ভসভসিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে!' পঞ্চাশ বছর আগে এসব শুনলে তাক লেগে যেত লোকের।

এখন তো আর সে যুগ নেই। মেলাই ট্রেণ। সাংহাইয়ের প্রত্যেকটি মানুষ রেলগাড়ী দেখেছে। কি আর বলবে বুড়ো। চুপ করে থেকে মান বাঁচাতে হয়।

'বস, কি পড়লে আজ শুনি।' বলেন ঠাকুর্দা।

চেয়ারের ধারে বসে বলতে আরম্ভ করে আই-ওয়ান। 'আজ পড়েছে, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরীজী, অঙ্ক।'

'সমর-বিজ্ঞান পড়নি?' তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর্দা।

'বিজ্ঞান তো কাল।'

'বিজ্ঞানের কথা বলছি না, সমর-বিজ্ঞানের কথা বলছি। আসল জিনিস। যখন জার্মাণীতে ছিলাম—দেখেছি ওদের সৈন্য চালনা। সেই জন্যই তো গত গ্রীষ্মের সময় জার্মাণ মাষ্টার রেখেছিলাম তোর জন্য।'

তাকিয়ে থাকে আই-ওয়ান বৃদ্ধের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে। পঞ্চাশ বছর আগের জার্মাণী? তার সাথে এখন ওর সম্পর্ক কি? পিঙ্গল বর্ণের রোগা হাতটা বুলিয়ে চলেছেন দাড়িতে বৃদ্ধ। আই-ওয়ান বসে আছে ওদিকে চেয়ে। কি যেন ভাবছে; হয়তো ভাবছে না। আচ্ছা, আজ রাতে পিওনী যখন ওর বিছানা করতে আসবে—তখন যদি বলে দেয় সব কথা! তাহলে কাঁদতে বসবে পিওনী। না বলে দরকার নেই কাউকে। যেদিন বিপ্লব আরম্ভ হবে, আর ফিরবে না ব্যস্। আজের সভায় বলছিল এন লান যে আগামী বসন্তেই—

'আচ্ছা যাও।' কোমল স্বরে বলে ঠাকুর্দা 'ভালো করে কথা শুনে চলো, অনেক কিছু ভেবে রেখেছি তোমার জন্য, ভাই।'

আই-ওয়ান উঠে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে পেছন ফেরে। দরজার কাছে গিয়ে আর একবার নমস্কার ক'রে চলে যায়। পারতপক্ষে এ ঘরে এসে কথা বলে না ও। পালাতে পারলে বাঁচে। যত পুরানো বই আর আসবাব-পত্রে ঘরটা ঠাসা। কেমন ছ্যাঁৎলা-পড়া গুমসান গন্ধ, ঠিক বুড়ো মানুষের গায়ের মত। জানালা প্রায় খোলাই হয় না। দিনে খুললে বলবেন জানালা বন্ধ রাখলে ঘর ঠাণ্ডা থাকে, আর রাতে খুললে বলবেন ঠাণ্ডা লাগে।

'সারা বাড়ীটাই গন্ধ', ভাবে আই-ওয়ান। পিওনীরও একটা গন্ধ আছে। চামেলী সেণ্ট মাখে ও। বড় কড়া গন্ধ। বহুবার বলেছে ও, কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয় পিওনী। বরঞ্চ বলে, 'আমার নয়, দোষ তোমার। অত কেন লম্বা নাক!

দুনিয়ার লোকের যেটা ভালো লাগছে, তোমার ঠিক উল্টো।' মিঠে স্বরে মিঠিয়ে মিঠিয়ে বড় কাটা কাটা কথা বলে মেয়েটা।

এখনও বাবা মার কাছে হাজিরা বাকী। তারপর ছুটি। আর এক ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা মারে আই-ওয়ান। অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঢুকে পড়ে। মস্ত মস্ত দুটো ঘর এক সঙ্গে। সব থেকে চেনা ঠাঁই আই-ওয়ানের। এ ঘরেই ও হাঁটতে শিখেছিল প্রথম—পুরু চীনে-গালিচায় ঢাকা কাঠের এই মসৃণ মেজের ওপর। ফুলদানীটি থেকে আরম্ভ করে কারুকার্য করা মেহগনী কাঠের আলমারী, হাতীর দাঁতের বল আর হাতীটা অবধি প্রতিটি জিনিস ওর অতি পরিচিত। আলমারীটা ও ছুঁতেও পেত না। কিন্তু বল আর হাতী দিয়ে ও খেলত। খুব ভালোবাসতো ও বলটা।

জানালার ধারে বসে মা কাপড়ে ফুল তুলছেন। বাবা কালো কাঠের মস্ত-বড় ডেস্কটার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন, ঘরের আরেক প্রান্তে। আফিসের বিদেশী পোষাক ছাড়া হয়নি এখনও।

'তোর ঠাকুর্দার আর ঠাকুমার কাছে হয়ে এসেছিস নাকি?' বাবা বলেন, 'এই এলাম আমি। যাই জামা কাপড় ছেড়ে আসি।' কিন্তু ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আবার বলেনঃ 'তোর দাদা ফিরেছে?'

'না, বাবা।' জবাব দেয় আই-ওয়ান।

শ্রীমতী উ সেলাই থেকে মুখ তুলে হাত বাড়িয়ে দেন ছেলের দিকে। মুখে সংশয়ের ছায়া। ইংরাজীতে বললেনঃ 'আয় এদিকে'।

বেশ ভালো ইংরাজী বলেন শ্রীমতী উ। এবং এজন্য তাঁর গর্ব আছে। বাপের বাড়ীতে বহুদিন ইংরেজ গভর্নেস-এর কাছে তালিম পেয়েছেন।

'তোকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছেরে, আই-ওয়ান।' বলে মা।

'সত্যি বড় ক্লান্ত লাগছে, মা।' ইংরাজীতেই জবাব দেয় আই-ওয়ান। ইংরেজীই ও বেশী পছন্দ করে। কারণ চীনে কায়দার লম্বা চওড়া জাঁকাল ভদ্রতার বুলি ওর অসহ্য। ওসব বালাই ইংরেজীতে নেই। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ইংরেজীতে 'মহামহিমান্বিত...অমুক, আমি অমুক..... ... অধমাধম...বলে কথা বলবে না।

কোন কোন ব্যাপারে ওর মা ভয়ানক গোঁড়া। পাকা সাহেবী বুলির সাথে অত গোঁড়ামী মানায় না। যখন ছোট ছিল আই-ওয়ান, বহু দিন পর্যন্ত চেইন দিয়ে রূপোর একটা তালা ওর গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য ওই শেকল তালায় ছেলের প্রাণ কুলুপ-আঁটা থাকবে। চুপি চুপি টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করত আই-ওয়ান। কিন্তু সেকরা দিয়ে পোক্ত করে লাগানো ছিল শিকলীটা।

'এত দেরী যে আজ!' মা বলে।

'সভা ছিল ইস্কুলের পর।'

'কিসের সভারে?' চীনে ভাষায় প্রশ্ন করে বাবা।

'রাজনৈতিক।' ইংরেজীতে জবাব দেয় আই-ওয়ান।

'দেখিস আবার ফ্যাসাদ বাঁধাসনে যেন।' এবার বাবাও ইংরেজীতে বলেন। ভৃত্যবর্গের কান এড়াতে হ'লে শ্রী উ ইংরেজীর সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন।



বলেন বেশ, কিন্তু উচ্চারণ তেমন ভালো নয়। কতগুলি অক্ষর নিয়ে বড় গোল বাঁধে।

আবার বলেন, 'এইটুকু তো সব মানুষ তোরা। একটা শাসন ব্যবস্থা বদলান সহজ কথা? তোদের ছাত্রদের কর্ম নয়। উল্টে কর্তারা তোদের ঘাড়ের ওপর থেকে মাথাগুলো নামিয়ে ফেলবে পট্ পট্ করে।'

'আই-ওয়ান!' আকুল কণ্ঠে বলেন মা, 'আমায় কথা দে বাবা।'

স্ত্রীর কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বলে যান শ্রী উঃ 'বালখিল্যদের পাগলামো শুনতে বয়ে গেছে সরকারের। তাছাড়া, দেশ শাসন কি মুখের কথা? কি বুঝিস্ তোরা তার?' কণ্ঠে সহজ অন্তরঙ্গতার সুর। 'গাল দিচ্ছিস্ তোরা, হৈ হাঙ্গামা মেলাই করছিস। কিন্তু কি বুঝিস তোরা বলতো! অর্থনীতি, ব্যাংক, বিদেশী ঋণ, কত ব্যাপার সব আছে।'

'বিদেশী ঋণ? কেন?' যেন ফেটে পড়ে আই-ওয়ান।

উত্তর চীনের প্রকাণ্ড একটা লোহার খনি বন্ধক রেখে জাপান থেকে দশ লক্ষ ডলার ঋণ লগ্নী করা হয়েছে সম্প্রতি। এতদিন তা নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা হয়নি ওদের। কিন্তু আজকের সভায়ই এ ব্যাপারটা উঠেছে। আলোচনার আরম্ভেই গম্ভীর ভাবে এন লান উঠে এই বিদেশী ঋণের প্রতিবাদে হুট করে একেবারে জান কবুল করে বসল।

বলল: 'শোন বন্ধুগণ! এই বিদেশী ঋণ অমনি অমনি দেওয়া হচ্ছে না আমাদের। কোনোদিনই হয়নি। বিশেষ লাভজনক সুবিধা আদায় করে তবে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্ররা প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকারের কাছে। কিন্তু কর্ণপাত করেননি তাঁরা। অতএব তোমরা আমাকে অনুমতি দাও বন্ধুগণ—অর্থমন্ত্রীকে সরিয়ে দেব দুনিয়া থেকে। জামার আস্তিনে পিস্তল লুকিয়ে নিয়ে যাব। নূতন রক্ষিতাকে নিয়ে যখন দুপুরে খেতে যাবে—বাস্—।'

নির্বাক, নিস্তব্ধ সভা। শ্রোতারা অবাক হয়ে চেয়ে থেকেছে বক্তার দিকে। শাদা শাদা দাঁতগুলো কড়মড় করে ভয়ংকর মুখভঙ্গী করে গর্জে ওঠে আই-ওয়ানঃ 'দশটি হাজার ডলার দিয়ে কিনেছে ওই মেয়েমানুষটাকে। রোজ রোজ নতুন নতুন মেয়েমানুষ অর্থমন্ত্রীরা নইলে আর কে কিনবে!'

বহু ছেলে এগিয়ে এল—'কার আগে প্রাণ, কে করিবে দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি।' আই-ওয়ানদের কেন্দ্রে এই প্রথম। অন্যান্য এলাকায় বহু গুপ্ত-ঘাতকের দল তৈরী হয়েছে। সামাল সামাল রব উঠেছে বড়লোক আর উচ্চ-পদস্থদের মহলে। দেহরক্ষীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। বিশেষ করে জাপানের একুশ দফা দাবীর পর বৈদেশিক দপ্তরে একজন ছাত্র গিয়ে যেদিন হানা দিল তারপর থেকে আরো সাবধান হয়েছে সকলে।

সভায় উত্তেজিত আলোচনার পর স্থির হয়—এন্-লান্ নয়। তাকে খোয়ান চলবে না—দুরূহ সংকটের দিন সামনে।

যাই হোক, জান সত্যি সত্যি দেবার প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, এন্ লানের জান কবুল করাতেই ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল।

শ্রী উ বলতে লাগলেনঃ 'কেন নেওয়া হয় বিদেশী ঋণ? পুনর্গঠনের কাজে প্রত্যেক দেশেরই নিতে হয়।'

শ্রীযুক্ত উ-র বন্ধুদের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক আছেন। জাপানীই

বেশী। চীন-জাপান মৈত্রীতে বিশ্বাসী চীনাদের অন্যতম শ্রী উ। জাতিসংঘে জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রী যেদিন 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য,' এই আওয়াজ তুললেন, তারপর থেকেই শ্রী উর মুখে তার প্রতিধ্বনি। সুযোগ পেলেই বলেন ঃ

'তোরা বুঝতে পারবিনে', অত্যন্ত স্নেহের সুরে বলে চলেন শ্রী উ, 'আদর্শবাদের যুগে জন্মেছিস কিনা! তোর বয়সে আমিও অনেক স্বপ্ন দেখেছি। আদর্শের পেছনে ছুটেছি। অবশ্যি একা আমি নই—প্রায় সারা যুব সম্প্রদায়। বুঝি, অমনি একটা আদর্শের পেছনে ছুটছিস তোরাও।'

মা বলে ঃ 'আই-কো তো অমন নয়!'

'আই-ওয়ান অনেকটা আমার স্বভাব পেয়েছে।' বেশ জোর দিয়ে বলেন শ্রী উ। চুপ করে বসে থাকে আই-ওয়ান। বাবা মার কথায় বড় একটা জবাব দেয় না। কৌশল হিসেবেই এ পথ গ্রহণ করেছে ও। বিরোধিতার অবকাশ থাকে না। অতএব সন্তান ধর্ম বজায় থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে খোলা থাকে স্বমতে চলার পথ।

মা আবার সূচ সুতো তুলে নেন, এবং বাবা কলম। আই-ওয়ান মনে মনে ভাবে—বলুন বাবা যা খুশি! কিন্তু এমনি করে কথা বলেন এক এক সময় যে ছোট একটুখানি কথাও গভীর দাগ কেটে যায় মনের মধ্যে। নিজেকে তখন মনে হয় ছোট্ট শিশু। কি যে বলেন বাবা! সেদিন, আর এখন! এক দুর্বল সম্রাটের আদর্শের পেছনে ছুটেছেন ও'রা। আর এখনকার বিপ্লবী দল। কার সঙ্গে কার তুলনা!

'যাই, বাবা!' আই-ওয়ান উঠতে চায়।

'দাঁড়া।' বাবা বলেন।

বসে থাকে আই-ওয়ান। বিদ্রোহে সারা শরীর মন জ্বলে ওঠে।

মনে মনে গর্জায়—কিছু কাজ নেই। আমায় যে বসিয়ে রাখতে পারেন ঐ ক্ষমতাটুকুই দেখাতে চান। তাই মিছামিছি বসিয়ে রেখেছেন। যেতে চাইলাম আর বললেন যাও, তাতে তো আর ক্ষমতা দেখানো হয় না! ওর ঠোঁট কুঁচকে ওঠে। দেখা যাবে যখন চলে যাবে সব ছেড়ে—

এবার চীনে ভাষায় জিজ্ঞাসা করেন বাবা ঃ 'কি করবে কিছু ভেবেছ নাকি?'

আই-ওয়ান চোখ তোলে। কলম রেখে দিয়েছেন বাবা।

'কিছুদিন থেকেই ভাবছি, এবার তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক করে ফেলা দরকার। তোমার মায়েরও কি সব প্ল্যান আছে।'

মা বলেন ঃ 'বয়েস কুড়ি হ'ল তোমার। বড় হয়েছ এখন।'

আই-ওয়ান যেন লাল হ'য়ে ওঠে। লক্ষ্য করেন ওর বাবা। কোমলভাবে বলেন ঃ

'ঘাবড়ে যেও না। জোর করব না কিছুতে। তোমায়ও না, তোমার দাদাকেও না। দেখছ তো, এখনও তোমাদের বিয়ের ঠিক করিনি। একবার কথা হয়েছিল বহুদিন আগে, কিন্তু শেষটায় ঠিক করলাম তোমরাই দেখে শুনে বিয়ে করবে।'

'ধন্যবাদ, বাবা।' আই বলে গুনগুনিয়ে।

সত্যি তাই। বিয়ের ব্যাপার বাবা ওদের হাতেই ছেড়ে রেখেছেন। যদিও

নিজের স্বাধীনতা ও স্বতঃসিদ্ধ বলেই জানে, তবু, বাবা মার ওপর আজ এই প্রথম ও কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অধিকাংশেরই বাবা মার ইচ্ছামত বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। বিবাহ বিষয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যও প্রচুর সংগ্রাম করতে হবে ওদের। বিশেষ করে মেয়েরা এ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহশীল। বহু সভাসমিতিতে বিবাহ-বিষয়ে স্বাধীনতার দাবী তুলেছে ওরা।

অনেক সময় ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মেয়েদের এই সংকল্প নিয়ে আলোচনা করেছে। ঠিকই বলেছে মেয়েরা। কিন্তু আবার প্রশ্নও এসেছে মেয়েরা যদি বিয়ে করতেই না চায় কি হবে তাহলে। ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে। ছেলেরা এগিয়ে গিয়ে বলবে—আমায় বিয়ে কর। মেয়েরা বলবে—করবো না। বড় লজ্জার!

একদিন এন-লান হেসে বলল আই-ওয়ানকেঃ 'ভয় নাই হে। সেই মেয়েটিকে মনে আছে? বিয়ের স্বাধীনতা নিয়ে যে খুব জোর গলায় বক্তৃতা দিলে!'

আছে। মনে আছে। ভারী সুন্দর তেজী মেয়েটি। ফুকিয়েনের দক্ষিণ প্রদেশে বাড়ী। এন্-লান তার পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে আই-ওয়ানের হাতে দেয়। আবেগ-ভরা প্রেমপত্র। নীচে সেই মেয়েটির নাম সই করা। অবাক হয়ে যায় আই-ওয়ান। হিংসাও হয় একটু। 'বিয়ে করবে নাকি!" জিজ্ঞাসা করে। এন্-লান মাথা নাড়ে। 'কখন কি হবে ঠিক নেই। আজ আছি, কাল নেই। এই তো বিপ্লবীর জীবন। এর মধ্যে বিয়ে! তা ছাড়া ও বিয়ে করার কথা তো বলেনি!'

সত্যিই তাই। মেয়েটি লিখেছে, আমাকে অনুমতি দিলেই চলে আসব তোমার কাছে। আমরা স্বাধীন এখন।

চিঠিটা ফিরিয়ে দেয় আই-ওয়ান।

'তা ছাড়া বৌ আছে যে আমার! বাবা মা বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তো বাড়ী যাই না।'

'বৌ!' চীৎকার করে উঠেছিল আই-ওয়ান। আশ্চর্য ছেলে! এই তো সেদিন জেল থেকে বের করে নিয়ে এল ওকে। রোজই কিছু না কিছু নূতন শুনিয়ে হক্‌চকিয়ে দিচ্ছে মানুষটা!

বলে যাচ্ছেন বাবাঃ 'কোন লাইনে কি পড়বে না পড়বে ঠিক তো করে ফেলতে হয় এখন। আমার ইচ্ছে, বুঝতেই পার তুমিও ব্যাংকেই বসো। তোমার দাদাকেও তাই দিয়েছি।'

আই-ওয়ান নিরুত্তর। ব্যাংকে ও যাচ্ছে না। বিদেশী ঋণের সাহায্য ও করতে পারবে না। দলের সবাই যে ঘৃণা করবে ওকে। সে ও ঘৃণা সইতে পারবে না। বিদ্রোহীদের কালো খাতায় ওর বাবার নামও আছে। হিংসা হয় এন্-লানের ওপর। কৃষকের ছেলে সে এবং তার জন্য বুক ফুলিয়ে চলে। প্রায়ই বলে, 'আমার বাবা নেহাৎ সাধারণ মানুষ। মা লেখা পড়া জানেন না।' বড়লোকের ওপর ভারী খাপ্পা ও। আই-ওয়ানও তো ঘৃণা করে পুঁজি-পতিদের। কিন্তু যতই বিদ্রোহ আর বিরোধিতা থাক বাবার বিরুদ্ধে, তাঁকে ও না ভালোবেসে থাকতে পারে না! কিছুতেই বুঝবে না এ কথা এন্-লান।

সোজা বলবে, 'আমি যদি তোমার জায়গায় হ'তাম, ঠিক বলে দিতাম, তুমি পুঁজীপতি, দেশের শত্রু, অতএব আমার বাবা নও।'

'আমি তাড়াহুড়োও করব না, জোরও করব না,' তেমনি সস্নেহে বলেন বাবা, 'তুই তো আমার ছেলে। ভেবে কিছু ঠিক করে নিয়ে বলিস আমাকে।'

বাবা সমাপ্তিসূচক মাথা নাড়ে। আই-ওয়ান ওঠে। মনের সমস্ত বিরক্তি গ্লানি ধুয়ে গেছে। এমনি হয় বরাবর। বাবার সমস্ত কর্তৃত্ব এমনি স্নেহে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়।

'ধন্যবাদ, বাবা।' স্তিমিত স্বরে বলে আই-ওয়ান।

'কোথায় যাচ্ছিস?' মা শুধান।

'আমার ঘরে, পড়তে হবে।'

ছেলে বাড়ীতেই থাকবে। খুশি হয়ে মাথা নাড়েন মা। দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায় আই-ওয়ান। খানিক পরে দেখা হবে নীচে খাবার ঘরে। মস্ত বড় টেবিলটায় বসে খাবে ওরা চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়। রোজ খায়। নেহাৎ সাধারণ খাদ্য। কিন্তু এন-লানের পক্ষে রীতিমত ভোজ।

এতক্ষণে ছুটি। খানিকটা সময় তবু নিজের বলে পাওয়া যাবে। তাড়াতাড়ি চলে যায় নিজের ঘরে। হয়ত পুরু ঢাকনার তলায় চা-এর কেৎলীটা গরম আছে এখনও। টেবিলের ওপর একটা কৌট ভরে কি যেন রেখে গেছে পিওনী। খাবার আগের এই ঘণ্টাখানেক সময় ওর বড় ভালো লাগে। একলা থাকে এ সময়টা। পড়বে বলে বটে, কিন্তু খাবার আগে কক্‌খনও পড়ে না। পড়ার অজুহাতে টেবিল থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসে। এক এক দিন পড়ে। কিন্তু বেশীর ভাগই সোজা থিয়েটারে চলে যায় খাবার পরে।

আজ কাজ করতেই হবে। মস্ত একটা ইংরাজী রচনা লিখতে হবে। মনের গোপনে আকাঙ্ক্ষা এন-লানকে লেখায় হারাবে। কিন্তু কোনদিন পারবে না। অদ্ভুত লেখার ক্ষমতা এন-লানের। যত চেষ্টাই করুক ও, ওদের শিক্ষয়িত্রী সেই প্রৌঢ়া ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে প্রশংসা পায় এন-লানই। আজ আরো বেশী চেষ্টা করবে ও। শুধু শিক্ষয়িত্রীর প্রশংসাই ওর কাম্য নয়। ও চায় এন-লান ওকে দাম দিক। ও চায় দক্ষিণ মুখের দৃষ্টি। অতএব আলস্য ছেড়ে খাতা টেনে নিয়ে টেবিলে বসে পড়ে। যথাসাধ্য ভালো করে কাজ করবে ও, এবং এখন থেকেই আরম্ভ করবে।

বড় ঘুম পাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে প্রায় দুপুর রাত। সবে মাত্র ইংরাজী রচনা শেষ হয়েছে। আর একবার পড়ে। ভালোই তো হয়েছে মনে হয়। তবু মিস্‌ মাইৎল্যাণ্ডের কাছ থেকে লাল কালি বিচিত্রিত হয়ে ফিরে আসবে খাতাখানা। নানা অভাবিত জায়গায় আঘাত পড়বে তাঁর কলমের। সে যাই হোক—মোটের ওপর মন্দ হয়নি। খুশিমনে আর একবার পড়তে আরম্ভ করে। এমন সময় বিছানার কাছে একটা কোমল খস্‌খসানীর শব্দ পাওয়া যায়। চোখ তোলে না আই-ওয়ান। কিন্তু বোঝে পিওনী এসেছে বিছানা করতে। গরম চাও নিয়ে এসেছে। তারপর, অনুভব করে ও, ওর পাশে এসে দাঁড়াল পিওনী, হাত রাখল ওর কাঁধের ওপর, আর চুলের ওপর রাখল

ওর গাল। আজ নূতন নয় এ। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—বিকেলে করবী ফুলের কাছে দাঁড়ান ওর ছবি। সরে যায় আই-ওয়ান ওকে ধমকাতে ধমকাতেঃ

'উঃ, কি বোট্‌কা গন্ধ। কতকাল চলবে আর শুনি?'

'চিরকাল, চিরকাল। আমার ভালো লাগে, আমি মাখব। এখন রাখো তো পড়া! ঢের হয়েছে। শুতে যাও চট্‌পট্‌।'

'কত বলে কাজ বাকী আছে। তুই কি জানিস তার!'

'এখনও শেষ হয়নি? তোমার মাথায় তাহলে গোবর।' কোমল সুগন্ধি হাত দুখানা বুলিয়ে দেয় পিওনী আই-ওয়ানের গালে। আবার বলে, 'না গো না, অমনি বলেছি। আমি জানি তুমি আমার বুদ্ধির ঢেঁকী।'

একবার—দুবার—নেচে ওঠে হৃৎপিণ্ডটা। মনটা কেমন করতে থাকে। আশৈশব খেলার সাথী ওরা। জানে আই-ওয়ান, পিওনীও জানে, ও ক্রীত-দাসী। কিন্তু সবাই ওকে ভালোবাসে, তাছাড়া আই-ওয়ানের বোন কটি মারা যাওয়ায় ওর অধিকারের সীমা বিস্তৃত হয়েছে। পরস্পর ভাই-বোনের মতই বড় হয়েছে ওরা। পিওনী যে একেবারে দাসখত লেখা, তা ওয়ান মনেও করে না কখনও। পিওনীও কথা তোলে না। কিন্তু গত কমাস থেকে অন্য একটা কি যেন সুর বাজছে আই-ওয়ানের মনের তারে। ভালোও লাগে আবার রাগও হয়। বেশ লাগে মেয়েটা যখন হাত দুটো ওর কাঁধে রাখে, চুলের ওপর ওর গালখানি থাকে এলিয়ে। এক-এক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও আই-ওয়ানের হাত দুখানি জড়িয়ে যায় ওর অঙ্গে। এর আগে কখনও এমন করেনি। অনেক সময় ভেবেছে, এবং নিজের মনে লজ্জা পেয়েছে। বিপ্লবী দলে যোগ না দিলে হয়ত এত সংযম থাকত না ওর।

তা ছাড়া আই-কোর মত হতে চায় না ও। সমস্ত ক্ষণ মেয়েটার পেছনে লেগেই আছে সে—গাল টিপবে, হাত ধরবে, কখনও বা জড়িয়ে ধরবে। সরে পালিয়ে যায় পিওনী। একবার আঁচড়ে দিয়েছিল। লম্বা লম্বা চারটে আঁচড় গালে—কদিন বেরুতেই পারল না আই-কো। বাড়ীতেও এ নিয়ে হাঙ্গামার একশেষ। আই-ওয়ানের মা চুপি চুপি পিওনীকে ধমকে দিলেন, আর বাবা আই-কোকে। আই-ওয়ানের ঘরে এসে পিওনীর সেকি কান্না সেদিন। কেবলি বলেঃ 'তোমার দাদাকে দুচক্ষে দেখতে পারি না—চিরটা কাল আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলে।'

আর এখন ওরই রক্তে দোলা লাগে পিওনীর স্পর্শে। ভারী লজ্জিত হয়। সরে যায় ও।

'এখন বড় হয়ে গেছ কিনা, তাই আর আমায় ভালো লাগে না।' গুণ-গুনিয়ে বলে পিওনী।

'কে বলেছে রে? আলবৎ ভালো লাগে। ঠিক আগের মত!'

'বড় একা লাগে আমার।' স্তিমিত স্বরে বলে পিওনী।

খাতা বই টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলে বলে আই-ওয়ানঃ

'ভাগ শিগ্‌গির। আমার শোবার সময় কক্‌খনও এখানে থাকবিনে।'

ভয় হয়, আঘাত পায়নি তো পিওনী? কিন্তু না, হাসছে ও খিলখিল করে। পেছন ফিরে দেখে—কোথায় আঘাত আর কোথায় কি। চোখ দুটোতে দুষ্টুমী ঝিলিক দিচ্ছে আর স্বরে স্ফূর্তির লহর। বলে পিওনীঃ

'হুঃ! বড় হয়েছ কিনা, তাই আর দরকার নেই পিওনীকে। তাই না খোকাবাবু! বুলো খোকা আমাল!'

তেড়ে যায় আই-ওয়ান। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় ওকে দরজার দিকে। হাত ছাড়ে না দুষ্টু মেয়ে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পারবে কেন পিওনী। ঠেলে বের করে দেয় ওকে আই-ওয়ান। শেষ পর্যন্ত ওর নরম হাতটা আঠার মত সেঁটে ছিল ওর হাতে। দরজায় চাবী লাগিয়ে কান পেতে ও দাঁড়িয়ে থাকে। নাঃ, কোনও শব্দ নেই। দরজা খুলে দেখতে যায়। না থাক, যা দুষ্টু ও মেয়ে! নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে লুকিয়ে। ধুপধাপ করে হেঁটে বিছানার কাছে গিয়ে কাপড় ছাড়ে আই-ওয়ান। এবং তারপর ধড়াম্ করে জানালাটা খুলে দেয়। পিওনী থাকলে ঠিক শুনতে পাবে। মেয়েটা আছে না গেছে একটু দেখার জন্য ভেতরটা ওর আকুলি বিকুলি করে। যদি থেকে থাকে, তাহলে দরজা খুললেই হুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। নাঃ, বড় ভয় করে মেয়েটাকে ও! আই-ওয়ান যে দেশমাতৃকার পায়ে উৎসর্গ করেছে নিজেকে। তা ছাড়া আই-কোর মত হবে না ও কোনদিন।

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে মশারী ফেলে আই-ওয়ান, আবার আফিমের গন্ধ। ওর সারা সত্তায় ঘৃণা কিলবিলিয়ে ওঠে। সেই ঘৃণায় ও ভুলে যায় পিওনীকে।

ইংরেজী ক্লাস-ঘরে দলের সভা বসেছে। একেবারে একটেরে ঘরখানা এবং সব চেয়ে নিরাপদ। বাড়ীটা দোতলা এবং একটিমাত্র সিঁড়ি। তারই ঠিক উল্টো দিকে ঘরটা। পেং-লিউ সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে—এমন ভঙ্গিতে যেন কারো জন্য অপেক্ষা করছে। টিকটিকির কাজে ও ওস্তাদ। ওর কুৎকুতে চোখ দুটো সব কিছু দেখে। এবং দরকার হলে এমনি স্বাভাবিক ভাবে বোকা-বোকা মুখ করবে যে তুমি বোকা বনবে। কাউকে আসতে দেখলেই ও জোর গলায় সম্ভাষণ হাঁকবে, ঠিক ও-ঘরে গিয়ে পেঁছুবে আওয়াজ। এবং নিমেষে পেছনের দুটো দরজা দিয়ে শ্রীমানরা অন্যান্য ক্লাস-ঘরে ছড়িয়ে পড়বেন একজন দুজন বা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। তারপর বই খাতা মুখে নিয়ে মনোযোগী ছাত্রের মত পড়তে বসে যাবেন। যাই হোক এ পর্যন্ত এসব কিছুর দরকার হয়নি। বছর দুই ধরে নির্বিঘ্নে চলেছে সভা-সমিতি। এবং ওরা এখন 'জাতীয় দেশপ্রেমিক ও ভ্রাতৃসংঘে'র অংশ। সরকার ঢালা হুকুম দিয়ে রেখে-ছেন, কম্যুনিস্টদের গুলি করে মারবার। সেই থেকে ওরা আর কম্যুনিস্ট নয়, দেশপ্রেমিক।

এন্-লান্ বত্রিশ দন্ত বিকশিত করে তার চাষাড়ে হাসি হেসে বলেছিল ঃ

'দেশ-প্রেমিকদের মারতে পারলে তো? হোক না বিপ্লব, দেখে নেব। সব ফারাক হো যায় গা। তখন আমরাই ওদের কোতল করব।'

এ-ঘরের সবাইকে চেনে আই-ওয়ান, কিন্তু জানে না। জানে শুধু এন্-লান্‌কে। তেইশ জন সভ্য—তার মধ্যে নয় জন মেয়ে। সবার নাম অবশ্য জানে ও। কিন্তু পেং-লিউ আর এন্-লান্ ছাড়া বাড়ীর অবস্থা কারো জানে না। এই জানাজানিটুকুও হয়েছে যে থেকে ওরা এখানে সভা করছে সেই থেকে। আই-ওয়ান যখন প্রথম আসে—তখন দুটি মেয়ে নিয়ে মোটে এগার জন সভ্য ছিল। বাকীরা যে কোত্থেকে এল কিছুই জানে না। নূতন কেউ এলে—

নিয়ম হচ্ছে প্রথম সে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের নামটি বলবে এবং তারপর ওকে জানে এমন একজন উঠে ও যে গুপ্তচর নয় তা বলবে হলফ করে।

আই-ওয়ান নিজে এসেছে এন্-লানের মারফৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পরেই এন্-লান্‌কে খুঁজে নিতে ওর দেরী হল না। তার কাছ থেকে শুনেল 'ভ্রাতৃত্বের' কথা। এবং তারই দায়িত্বে সভ্যও হয়ে গেল। পরে জিজ্ঞাসা করেছিল এক-দিন এন্-লানকেঃ 'তুমি তো এক আমার বাবার নাম ছাড়া কোনও পরিচয়ই জানতে না—তাহলে কি করে— ?'

'জানতাম না মানে! আমার জন্য যা করেছিলে তুমি তা তো জানতাম!'

'কার ছেলে আমি তাতে কিছু যায় আসে না তোমাদের ?'

'কার ছেলে তা নিয়ে কি করব? তোমার মত ছেলেদের আমাদের দলে পাওয়া দরকার, এইটুকুই জানি।'

এই তেইশ জনের মধ্যে ওর আগের চেনা কেউ নেই; এবং ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিল যে এরা ওর আগের স্কুলের সহপাঠিদের মত নয়। তারা ছিল সব বড় লোকের ছেলে। তবু মনে হল আই-ওয়ানের, এরাই আপন। ও এদেরই একজন। সাংহাই-এর বিখ্যাত ব্যাংকারের ছেলে ও—লজ্জায় মরে যায়। জামা একটু-আধটু ছিঁড়ে গেলে বা বোতাম খসে গেলে ও মেরামত করে না। তবু যদি একটু গরীবানার ছাপ পড়ে। উত্তর মরুভূমির কড়া রোদ হাওয়া আর ধুলোর দৌলতে এন্-লানের কালো চুল হয়েছে কটা; যত্নের অভাবে থাকে রুক্ষ, উস্ক-খুস্ক। তারই মত হবার সাধনায় আই-ওয়ান নিজের কালো কোমল চুলগুলিকে সযত্নে এলো-মেলো করে রাখে।

আই-ওয়ানের মনে হয় সমস্ত জগতে একমাত্র এখানেই প্রাণ আছে—আছে সুস্থ, পিপাসিত জীবনের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি। বাড়ীতে সবাই যে যার নিজের নিয়ে আছে। নিজে আর নিজের পরিবার বাস্। তার বাইরেও যে মানুষের জগৎ আছে—এবং মানুষগুলো যে সেখানে কি হালে আছে কেউ তাকায় না সেদিকে। আই-ওয়ান্‌ও তো অমনি ছিল। কার্ল মার্কসের বইখানা পড়ার পরই চোখ খুলেছে ওর। কার্ল মার্কস পড়ার জন্য ওকে জেলে যেতে হয়েছিল। আফসোস নেই—নইলে এন্-লান্‌কে কোথায় পেত!

পরিচয় আর একটু ঘনিষ্ঠ হবার পর একদিন জিজ্ঞাসা করে এন-্লান্‌কেঃ 'তুমি জেলে গিয়েছিলে কেন বলতো ?'

ভারী অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে আই-ওয়ান্—এন্-লান্ কথা বলে খুব ধীরে ধীরে—হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে কথা খুঁজে খুঁজে। তার চাইতে লেখে অনেক সহজে। যখনই ভালো করে কিছু বলতে চায়—ও লিখে পড়ে। আজও বললে—'লিখে দেব। নিজের ঘরে বসে পড়ো এবং পড়া হলে পুড়িয়ে ফেলো।'

এন্-লান লিখেছেঃ

আই-ওয়ান্,

যেদিন তুমি এলে জেলে—আমার তিয়াত্তর দিন কারাবাস হয়ে গেছে। তিয়াত্তর দিন তো নয় যেন দশটা বছর—ওই সেল্ এই। ছোট একটা গরাদে দেওয়া জানালা। অতি কষ্টে জেলের পাঁচিলের ওপর দিয়ে তিনকোণা ছোট এক ফালি আকাশ দেখা যায়। আর কিছু না। কতটুকু ফালি জানো—মা যে কালো

রুমালখানা মাথায় বাঁধতেন ঠিক সেরকম। মরুভূমির হাওয়া আর বালুতে জটা বেঁধে যেত মার চুলে। তাই রুমালখানা বেঁধে মাথা ঢেকে রাখতেন। আগেই বলেছি তোমায় আমার বাড়ী একেবারে উত্তর সীমান্তে। গোবী মরুভূমির শুকনো হাওয়া গ্রামখানাকে যেন সর্বক্ষণ চাবকায়। তার সাথে অহোরাত্র পিঙ্গল রং-এর বালুর ঝড়। বুড়োরা বলত একদিন গোটা গ্রামটাই বালুর তলায় চাপা পড়ে যাবে। মানুষগুলো মরে গরমে বালুর নিচে সুঁটকী হয়ে থাকবে।

দিনের পর দিন জানালার গরাদে মুখটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতুম। ওই ফালি আকাশটুকুনির দিকে চেয়ে চেয়ে সব আশা আমার শুকিয়ে উঠত। তুমি আসবার কদিন আগে এমনি হল মনের অবস্থা—আর বুঝি গাঁয়ে ফিরতে পারবো না—আমার জন্মভূমির শুদ্ধ শুচি বালুর শয্যায় শুয়ে আমার শেষের নিশ্বাস পড়বে না—। গুলিতে ঝরঝরে দেহটা লুটিয়ে পড়বে এখানে এই ফাটকের আঙিনায়। তারপর ওরা ছুঁড়ে ফেলে দেবে দেহটা আধা-বিদেশী এই দাক্ষিণী শহরের কোমল ঐশ্বর্যময়ী মাটির ওপর। গাঁয়ে বসে জানবে না কেউ—কি হল আমার, কেনই বা আর ফিরলুম না।

আমাদের গ্রাম বড় দূরে। নূতন বছরেও বাড়ী যেতে পারতুম না। যেতুম সেই এক গরমের সময়। অনেক দূর হাঁটতে হতো। ট্রেণের ভাড়া জোটাব কোত্থেকে? এমন কি কুলিদের গাড়ীর (বসবার জায়গা নেই তার মধ্যে) ভাড়াও জোটাতে পারতুম না। তখনও বিয়ে হয়নি আমার—(পরে একটি মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন আমায়—আর কোনও দিন দেখব না সে-মেয়েকে) বাড়ী যেতুম —চাইতুম যেতে—অনেক কিছু যে বলার আছে আমার সবাইকে। ছাব্বিশ ঘর লোকের বাস ছিল—প্রত্যেকটি পরিবার, প্রতিটি মানুষ আমার অতি আপনার। ওদের জন্যই তো আমার পড়া সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষ—যে যা পেরেছে দিয়েছে। যারা টাকা-পয়সা দিতে পারেনি—তাদের মেয়েরা নিজে হাতে জুতো, মোজা, জামা এই সব তৈরী করে দিয়েছে।

প্রাণ ধরে কোনওদিন বলতে পারিনি ওদের যে ওগুলো কমাস পরে আর পরিনি, পরতে পারিনি। ছেলেরা ঠাট্টা করত। অবশ্যি ছেলেদের ঠাট্টায় তেমন যেত আসত না কিছু। ওরাও হাসত আমিও হাসতুম। বুঝতুম একে তো সুতী তার ওপর বেমানান বেমাপ ঢিলে-ঢালা পোষাক, আর বিশ্রী জুতোয় কিম্ভূত কিমাকার দেখাত আমায়। সত্যি জামাগুলো বড় ঢলঢলে ছিল। যাঁরা বানিয়ে দিয়েছিলেন ভেবেছিলেন, বড় সহরে আসছি—ভালো খেয়ে পরে দুদিনে ফুলে উঠব। তাই ভবিষ্যতের মাপসই করেই বানিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেদের ঠাট্টা সইতে পারলুম না, অমর্যাদা করলুম স্নেহের।

ঘরে বোনা মোটা কাপড়ে টেঁকসই করে তৈরী জামাগুলো একটা পুরানো কাপড়ের দোকানে বেচে দিলুম। দাম মন্দ পেলুম না। সেই টাকায় ইস্কুলের পোষাক কিনে নিলুম। জেলে যখন যাই ওই পোষাকই পরা ছিল।

কেমন করে জেলে এলুম জিজ্ঞাসা করেছ। অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। ইংরেজীর ক্লাস। সৈন্যেরা এসে হানা দিলে এমনি সময়। হাঁক দিলে আমার নাম ধরে। একজন ইংরেজ কবির কবিতা পড়া হচ্ছিল। ভালো করে বুঝতে পারিনি, কিন্তু আবছা আবছা যেটুকু বুঝেছি, বড় ভালো লেগেছিল।

বছর-তিনেক প্রায় ইংরাজী পড়ছি। বাড়ী গেলে গাঁয়ের লোক ঘিরে বসতো

এসে সন্ধ্যে বেলা। একটু ইংরেজী বল না ভাই শুনি। বলে অস্থির করে তুলত। দু-চারটে কথা শুনিয়ে দিতুম। চুপ করে শুনত, তারপর আমি থামলেই হেসে গড়িয়ে পড়ত। হাসতে হাসতে চোখের জল বেরিয়ে আসত ওদের। বলত কি জান! যেন মোরগের লড়াই। তারপর মানে বুঝিয়ে দাও। অবাক হয়ে যেত আমার বিদ্যের বহর দেখে।

আমার কাকা লিউ-ই ছিলেন গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন। মাথা নেড়ে পাইপ টানতে টানতে বলতেন—'ছোঁড়াটাকে ইস্কুলে পড়তে পাঠিয়ে ভালোই হয়েছে। গাঁয়ের আর তো কেউ ইস্কুলে টিস্কুলে যায়নি। এখন আর আগের দিনকাল নাই। ও আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করবে। যা ইংরেজী শিখেছে—বড় সরকারী চাকুরী ওর বাঁধা। তাহলে আর কি—সুদ শুদ্ধ আমাদের সব ফিরে আসবে।'

সায় দিতেই হত। চারিদিকে তাকিয়ে দেখতুম—বলি-সংকুল আঁধার মুখগুলোর মধ্যে কি সরল নিষ্কলুষ চোখগুলি—পরম আগ্রহে চেয়ে থাকত আমার দিকে। ভালোবাসায় বুক আমার ভরে উঠত। ওদের পায়ের কাছে ছোট ছোট ছেলেরা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকত চুপ করে। ওদের কাছে আমি একটা কেউ-কেটা। ভাবত আমি পাশ করে বেরুব—মস্ত বড় সরকারী চাকুরী করব—তখন ওদের জন্য মাষ্টার রেখে দেব, ইস্কুল করব—সব্বাই যাবে ইস্কুলে...

হ্যাঁ, কি বলছিলাম—! ইংরেজীর ক্লাস হচ্ছিল। পড়াছিলাম 'I wandered lonely as a cloud...' বুঝতে পারিনি তেমন, তবু ভালো লেগেছিল। মিস্ মাইংল্যান্ড বলছিলেন ধীরে ধীরে—'প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি ওয়াডর্স্-ওয়ার্থের লেখা কবিতা এটা।'

দরজায় ধাক্কা। চমকে চাইলুম সবাই। পল্‌কা দরজা, এক ঘায়ে খুলে গেল। দেখেছ তো, কেমন সামান্য হাওয়ায়ই খুলে যায়। তা বন্দুকের বাঁটের ঘা সইবে কি করে। দরজায় প্রায় জন কুড়ি সৈন্য দাঁড়িয়ে। একজন চীৎকার করে উঠল: 'লিউ এন্-লান্ কোথায়?'

নাম শুনে দাঁড়ালুম উঠে।

'তোমার নাম লিউ এন্-লান্?' হাঁকল সার্জেণ্ট।

অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। তবু না ঘাবড়ে শান্তভাবে বললাম: 'হ্যাঁ'

'গ্রেপ্তার তুমি।' গর্জে উঠল লোকটা, 'চল সঙ্গে।'

আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। কোনও মতে তুৎলে তুৎলে বললুম: 'কেন? কেন আমায়—?' সত্যি ভেবেই পাচ্ছিলুম না গ্রেপ্তারের কারণ। মাষ্টারমশায় ও শিক্ষয়িত্রীরা এবং দুচারজন বন্ধু-বান্ধব ছাড়া যে আমার নাম আর কেউ জানত তাই জানতুম না। আবার বললুম, 'আমার মনে হচ্ছে, ভুল হয়েছে।'

'না, ভুল হয়নি,' আবার গর্জে ওঠে সার্জেন্ট: 'শেনসি জেলার লিউ গাঁয়ের লিউ এন্-লান্ তো তুমি!'

'হ্যাঁ আমিই। কিন্তু ধরছেন কেন?'

লাল হয়ে উঠল সার্জেন্টের মুখ চোখ। 'কি এত বড় কথা? আমার সাথে তর্ক?' চ্যাঁচাতে লাগল প্রাণপণে। তারপর ছুটে এসে আমার জামার

কলার ধরে ঝাঁকাতে লাগল। ভয় হল—কলারটা বুঝি ছিঁড়েই যাবে—আর-একটা নূতন জামা কিনতে হবে। ক্রমাগত চীৎকার করতে লাগল লোকটা। ইচ্ছা হল দিই গোটা কয়েক লাগিয়ে। কিন্তু অতগুলো বন্দুক উঁচানো রয়েছে আমার দিকে। সাহস হল না।

মিস্ মাইৎল্যান্ড ভীষণ চটে গেলেন। সেই শান্ত চেহারা; সিঁথি করে আঁচড়ান পাকা চুলে ঘেরা ছোট্ট সেই স্থির ধীর মুখ। কোনদিন কেউ এতটুকু রাগতে দেখেনি মহিলাকে। কিন্তু আজ একেবারে খেপে উঠলেন। ছুটে গিয়ে সার্জেন্টের হাত ধরে সে কি ঝাঁকানি। কঠোর স্বরে বললেনঃ

'আমার ক্লাস। এতবড় স্পর্দ্ধা আপনার? ছাড়ুন, ছাড়ুন শিগ্গির। শুনতে পাচ্ছেন?'

ইংরেজীতে বললেন মিস্ মাইৎল্যান্ড। কিছুই বুঝতে পারলে না সার্জেন্টটা। ক্ষ্যাপা ইঁদুরের দিকে হুলো বেড়াল যেমন করে তাকায় ঠিক তেমনি করে তাকাতে লাগল লোকটা মিস্ মাইৎল্যান্ডের দিকে।

আমাকেই জিজ্ঞাসা করলঃ 'মেম সাহেব কি বলছে?'

আমি অনুবাদ করে দিলুম।

সার্জেন্ট বলেঃ 'বলে দাও, তুমি গ্রেপ্তার হয়েছ।'

ইংরেজীতে বলে দিলুম মিস্ মাইৎল্যান্ডকে।

'কেন?' দাবীর সুরে জিজ্ঞাসা করেন শ্রীমতী।

'জানি না।' আমি বললাম।

'মানে?' চীৎকার করে ওঠেন তিনি, 'ওই জানোয়ারটাকে জিজ্ঞাসা কর কেন। আর শুনছ, ভালো করে বুঝিয়ে দাও ওকে যে আমি ওকে জানোয়ার বলেছি!'

ও কথা কি বলতে পারতুম! খালি বললুম, 'মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করছেন, আমায় ধরলেন কেন।'

'কেন ধরলাম তাতে ওর কি?' বলে সার্জেন্ট।

মিস্ মাইৎল্যান্ডকে শুধু বললুমঃ 'সাহেব বলছেন ওঁর কারণ বলার হুকুম নেই।'

'ধুত্তোর নিকুচি করেছে তোর হুকুমের। বলে দাও ওকে—এখানে ক্লাসের মধ্যে এসব চলবে না। এমন করে ছাত্রদের ধর-পাকড় বন্ধ করতে হবে। আমি ব্রিটিস কনস্যুলার কাছে বলে দেব।' বললেন মিস্ মাইৎল্যান্ড।

আমি ইতস্তত করি।

'যা বলেছি বল ওকে।' হুকুম হয় আমার শিক্ষয়িত্রীর।

বললুম কি আর করব।

অগ্নিদৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকায় সার্জেন্ট। মিস্ মাইৎল্যান্ডের চোখ থেকেও আগুন ঝরে পড়ে। সার্জেন্ট মুখ ফিরিয়ে নেয় ভারিক্কী চালে। বলেঃ 'ওপরের হুকুম।'

'কেন?' আবার জিজ্ঞাসা করি আমি।

আমি জানতে চাই 'ব্যাপার কি?' চীৎকার করেন মিস্ মাইৎল্যান্ড।

কিন্তু আর কিছু বলার আগেই, সার্জেন্টের হুকুম শোনা যায়,

'ফরওয়ার্ড মার্চ।' সৈন্যেরা এসে আমায় ধরে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে

যায়—কেউ কোন সাহায্য করার আগেই। কিই-বা আর করা যেত। ছাত্ররা পাথরের মত বসে রইল। খালি মিস্ মাইংল্যান্ড চীৎকার করতে লাগলেন।

তারপর ওই জেল। একটা সেল্-এ তালা বন্ধ করে রেখে দিলে আমায়। মন্দ নয় সেল্টা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—হয়তো আমার আগে কেউ আসেনি ওখানে আর। সেদিন যা দেখেছিলে—সে তো তখন শুয়ে শুয়ে কত কয়েদী এসেছে গেছে। তাইতে অমন নোংরা হয়ে ছিল। মোটের ওপর সেল্টা ভালোই—আমাদের গাঁয়ের মানুষ যে রকম ঘুপ্‌সী ঘাপ্‌সী মেটে ঘরে থাকে তার চাইতে অনেক ভাল। প্রথম প্রথম ইস্কুল পড়তে এসে অমন একখানা ঘর আমি ভাড়া দিয়ে থাকতে পারিনি। তারপরে তো হস্টেলে জায়গা পেলুম। সেল্-এর মধ্যে একটা কাঠের চৌকী, একটা নীল সুতী লেপ, কিন্তু বেশ পরিষ্কার, এক-দিকে কয়েকখানা ইঁট সাজিয়ে একটা বসবার জায়গা আর ছিল আমার ছোট জানালাটি। আমাদের বাড়ীতে—যেখানে শৈশব কেটেছে আমার—ঘরে একটাও জানালা ছিল না। কিন্তু দরজার পরেই ছিল উঠন—শস্য মাড়াই হত সেখানে। আকাশ ছিল অবারিত। ছোট্ট বেলায় দুয়ারে বসে আমি দেখতুম উঠনে ঢালা শস্য মা আর বাবা মাড়াই করে বাছাই করে দুরন্ত হাওয়ায় তার ঝড়তি পড়তি উড়িয়ে দিয়ে ঝাড়াই করে ঘরে তুলতেন। তখন যে খাওয়া খেতুম, তার চেয়ে জেলের খাওয়া অনেক ভালো।

শুধু অনেক ভালো নয়, রীতিমত ভালো। যেদিন গেলুম তার পরের দিন দুপুরে পেলুম ভাত, নোনা মাছ, রুটি। বেশ তৃপ্তি করে খেলুম। যে-জেলে এমন ভালো খাওয়ায়, সেখানে আমি ন্যায় বিচার পাব না ভাবতেই পারলুম না। তা ছাড়া বিশ্বাস ছিল আমাদের নতুন সরকার ন্যায়পরায়ণ। নিশ্চয়ই বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পাব। প্রতিদিন ভোরে উঠে ভাবতুম আজ নিশ্চয়ই ডাক আসবে। কি বলব না বলব বহুদিন আগেই মনে মনে মক্স করে রেখেছিলুম। কাঠের বিছানায় রাত্তিরে শুয়ে, আর দিনের বেলায় টুকরো আকাশটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঐ মুসাবিদাই চলত। একটি একটি করে শব্দ বাছাই করে জবানবন্দী তৈরী করেছিলুম। শুনবে? শোন তবেঃ

'ধর্মাবতারগণ, আমি মিনতি করছি, অনুগ্রহ করে বলুন আমার কি অপরাধ। আমি কোন বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত নই।'—তখনও, সত্যি ছিলুম না আই-ওয়ান্। কম্যুনিষ্ট হয়েছি তার পরে। হ্যাঁ, তারপর 'আমি মন প্রাণ দিয়ে পড়াশোনা করি, স্কুল ছেড়ে কোথাও যাই না। আমার জীবনে শুধু একটি আকাংক্ষা আছে—ভালো করে পাশ করব; এবং তারপরে একটা ভালো কাজ করব ঋণগুলো যাতে শোধ হয়। ঋণশোধ হয়ে গেলে—আমাদের গ্রামে একটা ইস্কুল করতে চাই। ভারী গরীব আমার গাঁয়ের মানুষ। শুকনো হাওয়ায় ফসল তেমন হয় না। কোনো মতে অনাহার ঠেকিয়ে রাখা চলে। মাঝে মাঝে তাও হয় না। দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। তার ওপর অতিরিক্ত হারের খাজনা—যুদ্ধের, আফিঙের, আরও কত কি। আফিম অবশ্য সরকারই কেনেন। কিন্তু আগেই আমাদের এত বেশী ট্যাক্স দিতে হয় যে মুনাফা সামান্যই থাকে—অন্য ফসলের চাইতে অবশ্য কিছু বেশী থাকে। ঐটুকু বেশী দেওয়া হয় যাতে ওর লোভে আমরা ফসলের বদলে আফিং ফলাই। এই সব নানা কারণে

আমাদের গাঁয়ের লোক বড় গরীব। ইস্কুল করার পয়সা কোথায় তাদের? আমি এখন লেখা পড়া শিখছি। বড় শিখবার আকাংক্ষা আমার সেই ছোট-বেলা থেকে। তাই আমাকে পড়তে পাঠাবার জন্য অভাবের সংসার থেকেই কেড়ে খিমচে তুলে নিয়ে আমার অর্থ জুটিয়েছে ওই গরীব বেচারারা। তাই না এই সুন্দর শহরে এই ইস্কুলে পড়তে পাচ্ছি। খুব সুখেই আছি এখানে। এখন বলুন ধর্মবতাররা, আমার অপরাধ কি?'

এ ছাড়াও আরো অনেক কিছু বলব ভেবেছিলুম। রোজ মনে মনে মক্স করতে করতে প্রায় মুখস্ত হয়ে গেল। কল্পনার চোখে দেখতুম কত সময়—আমি দাঁড়িয়ে আছি আদালতে বিচারকদের সামনে—গম্ভীর, বুদ্ধিদীপ্ত, উদার চেহারা সবার। নিশ্চয় ওঁরা নিজেদের ভুল দেখতে পাবেন। আমি ছাড়া পেয়ে যাব। তারপর গরমের ছুটিতে বাড়ী গিয়ে বুক ফুলিয়ে সবাইকে বলব—কেমন করে ভুল করে আমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল—জেলের কি চমৎকার ঘর, কি সুন্দর লেপখানা, দিনে দুবার কি ভালো ভালো খাবার খেতাম সব বলব। গাঁয়ে দুবারের বেশী কেউ খায় না। তাও আবার শীতের দিনে কাজ কম থাকে, তখন একবেলার বেশী জোটে না। কিছু অসুবিধা ছিল না সেল্-এ, তবু ঘুমুতে পারতুম না। কি জানি কখন আদালতের ডাক আসবে। জিভের ডগায় নির্সাপিস করত আমার এত যত্নের মক্স-করা জবানবন্দী।

কিন্তু দিনের পর দিন গেল—ডাক আর এল না। যে রক্ষী আমার খাবার এনে দিত সে ছাড়া আর কোন মানুষেব মুখ দেখতে পেতুম না। একদিন তাকেই জিজ্ঞাসা করলুমঃ

'আমার বিচার হবে না?'

'ওসব জানি-টানিনে, বাপু, এই রইল তোমার ভাত।' বলে চলে গেল।

অস্থির হয়ে উঠলুম। বুঝি পাগল হয়ে যাব। রোজ মিনতি করি রক্ষীকেঃ 'একটু খোঁজ নাও, ভাই। হাত জোড় করছি।'

সে শুধু মাথা নেড়ে বলেঃ 'কয়েদীদের সাথে আমার কথা বলা মানা।'

স্কুলের খরচের টাকাটা আমি ট্যাঁকে বাখতুম। নূতন কয়েদীদেব স্নান করিয়ে জেলের পোষাক পরিয়ে তবে সেল্-এ পাঠাবাব নিয়ম—কিন্তু আমি রেহাই পেয়ে গিয়েছিলুম। কারণ গোসল-খানার হেপাজতী যে লোকটাব হাতে ছিল সে নাকি তার ভাই-এর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল সেদিন। তাই সোজাই সেল্-এ গিয়ে উঠলুম, এবং তারপর ওদের আর মনে ছিল না কিছু। কাজেই টাকাটা কাছেই ছিল। একদিন তার অর্ধেকটা সেই রক্ষীব হাতে তুলে দিলুম।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল লোকটার। কিন্তু হাত পেতে টাকাটা সে নিলে। পর দিন এসে খবব দিলে—বিচাব হবে না। আমি বাজনৈতিক বন্দী—রাজ-নৈতিক বন্দীদের অপরাধ স্বতঃসিদ্ধ। তার প্রমাণ অনাবশ্যক।

'কিন্তু সেই অপরাধটাই যে কি তাই তো জানলুম না।' চীৎকার করে উঠলুম আমি।

'তাতো জিজ্ঞাসা করিনি।' রক্ষী বলল।

কোমর থেকে বাকী টাকাটা বের করে আবার তার হাতে তুলে দিলুম।

কাতর মিনতি করে বল্লুম: 'আর নেই ভাই! এই সব। দয়া করে একটু জেনে দাও আমার বিরুদ্ধে কি চার্জ।'

ও চলে গেলে বিছানায় বসে ভাবতে লাগলুম টাকা ফুরিয়ে গেছে না বললেই হত। যদি ও কিছু না করে? ঘেমে সারা শরীর আমার ভিজে যেতে লাগল।

কিন্তু লোকটা ভালো। পরের দিন এসে বলল—আর একজন রক্ষীকে ও জিজ্ঞাসা করেছিল। তার ভাই জেলের কেরাণী। আমি নাকি কোন্ বিদেশী কাগজে আমাদের দেশের কথা কি লিখেছিলুম, দেশটা বড় গরীব, সর্বদাই দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে, ট্যাক্স খুব বেশী, এবং দেশের কৃষকদের আফিম সরকারই কেনে এবং এমনি আরো সব। বিদেশীরা পড়েছে এবং খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ নাকি করেছে। বিদেশীদের কাছে সরকারের মাথা হেঁট হয়েছে। ওই হল আমার অপরাধ।

কি সাংঘাতিক! বলে উঠলুম 'কিন্তু না, তাতো বলিনি।'

'ওদের নথিপত্রে তো তাই আছে।' বলে চলে গেল রক্ষী।

সারা রাত দুচোখের পাতা এক হল না। কত প্রশংসা করেছিলেন লেখাটার মিস্ মাইৎল্যান্ড। তাঁরই দেওয়া রচনা। বলেছিলেন—এত ভাল হয়েছে লেখাটা—ইংরেজরা যদি পড়তে পেত দেখত তারা চীনের যুবকরা তাদের দেশকে কতখানি ভালোবাসে। 'কি বল এন্-লান্, একটা পত্রিকায় এটা পাঠিয়ে দি পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য।'

মিস্ মাইৎল্যান্ডের কথা শুনে আনন্দে আমার রক্ত ঢেউ দিয়ে বইতে লাগল। তারপর তিনি ওটা শুদ্ধ করে দিলেন।। ক'সপ্তাহ ধরে বসে নকল করলাম। এবং একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলুম একটা ইংরেজী কাগজের সম্পাদকের কাছে। পুরস্কার পেলুম—লেখাটা ছাপা হল—সম্পাদকের মন্তব্যসহ। তিনি লিখলেন এমন আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ ও সুচিন্তিত বিশ্লেষণ সচরাচর পাওয়া যায় না। দেখে গর্বে ও আনন্দে আমি এতখানি হয়ে উঠলুম।

একটু থামে আই-ওয়ান। মনে পড়ে রচনাটার কথা। ওদের ইস্কুল থেকেও সবাই ওই প্রতিযোগিতার জন্য লিখেছিল। এবং লিউ এন্-লান্—মনে পড়ছে ঐ নামে কোথাকার একটি ছেলের লেখাই সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু অখ্যাত বালকের নাম,—দুদিন পরে সকলে ভুলে গেল। আই-ওয়ান্ও ভুলে গিয়েছিল।

আবার পড়তে আরম্ভ করে।

এরই জন্য আমার জেল। দিনের পর দিন চলে যায় অনন্ত রাত্রি প্রভাতের মালা গেঁথে। রাত কালো আর প্রভাত আলো এ ছাড়া আর কোনও তফাৎ ছিল না রাত্রি-প্রভাতের। আমার দিন রাত্রির হিসাবও হারিয়ে গেল। কত-দিন যে জেলে আছি সে খেয়ালও আর রইল না। বন্ধু-বান্ধব ছিল না আমার। কে আর দেখা করতে আসবে। মিস্ মাইৎল্যান্ড চেষ্টা করেছিলেন, তাকে বলে দিলে আমায় দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি জানলেন ভালোই আছি আমি—পরে এসব শুনেছি ও'র কাছ থেকে। পকেট খালি কাজেই রক্ষীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করার উপায় ছিল না।

তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরাদে মুখ দিয়ে কখনও বসে কখনও বা দাঁড়িয়ে

আকাশের টুকরোটুকুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু ভাবতুম কি লিখেছিলুম প্রবন্ধটায়...উচ্ছ্বল উচ্ছ্বল এক বাসন্তী দিনে বসে লিখেছিলুম প্রবন্ধটা— ভারী সুন্দর দিনটা ছিল। উষ্ণ হাওয়া মদিরা হয়ে উঠেছিল। বাজার ছেয়ে গিয়েছিল ফুলে। রাস্তায় ঘাটে ছড়িয়ে ছিল খুসি; মোটর গাড়ীগুলো যেন উড়ছিল হাওয়ার বেগে। রিক্সাগুলো চলছিল সুকৌশলে পথ বাঁচিয়ে। প্রশস্ত রাস্তার বুকে বিদ্যুৎগতি মোটরগাড়ীর কি যে অদ্ভুত সৌন্দর্য! কতবার দাঁড়িয়ে পড়ে দেখলুম মুগ্ধ চোখে। বিকেল বেলা স্কুলের পর চলে গেলুম শহরের বাইরে—মাইল মাইল জুড়ে শহরতলীর শ্যামলা রূপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম—এক বিচিত্র মহা-অনুভূতিতে হৃদয় আমার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল—কি যে সে অনুভূতি, নিজেই জানিনে—বুঝি প্রেমের ব্যথা—কিন্তু কোনও সে নারীর ভালোবাসা নয়। কোনও মেয়েকে তো জানতুম না। জানতুম শুধু একজনকে—সে আমার স্বদেশ—আমার মাটি—প্রেম উদ্বেল হয়ে উঠল—ব্যাপ্ত হয়ে গেল আমার সম্মুখের আকাশে বাতাসে, জলে মাটিতে, উত্তর প্রান্তে আমার গ্রামখানিতে যেখানে মাটির বুকে আমার ঘর বাঁধা আছে; ছড়িয়ে গেল এই নূতন তৈরী নূতন যুগের শহরে—প্রসারিত হল আরো দূরে সেই দক্ষিণ সমুদ্রে, আজও যাকে আমি চোখে দেখিনি। আমার সেই বৃহৎ প্রেম ধীরে ধীরে পরিশ্রুত, ঘনীভূত হয়ে রূপ নিতে লাগল শব্দে। ইচ্ছা হল—সব লিখে ফেলি—আমার মাটি মার যত কথা আমার মনে আছে একটি একটি করে সব লিখি। বিরাট এক বর্ণাঢ্য কুজ্ঝটিকার মধ্য থেকে উজ্জ্বল জলবিন্দুর মত ফুটে ফুটে উঠতে লাগল একটি একটি কথা। ছুটে ফিরে এলুম আমার ঘরে। লিখতে বসলুম। একটি একটি করে কথা দিয়ে সাজালুম আমার সেই বৃহৎ প্রেমকে।

বড় সহজ কাজ নয়। ঠিক ভাবে ফুটিয়ে তুলতে গলদঘর্ম হয়ে উঠলুম। রাত্তির হল। পড়ে রইল খাওয়া, বিছানার পাশে মোমবাতিটি জেবলে চলল আমার লেখা। সারা শহরময় অন্ধকারের বুক থেকে বিজলী আলো, নিয়ন্ আলোর ফোয়ারা উঠছে। আমার দরিদ্র ঘরে শুধু জ্বলছে মোমের বাতি। নাই থাক, নাই থাকল আমার ঘরে বিজলী বাতি। আমার দেশেতো আছে। সেই যে আমার গৌরব, আমার গর্ব। আজ লিখছি তাই—নইলে তো এতক্ষণ বেরিয়ে পড়তুম রাস্তায়। প্রাণ ভরে, চোখ ভরে দেখতুম আলোর দেয়ালী। দেখে দেখে আশ মেটেনি আমার কোন কালে।

লিখলুম সে কথাও—ইলেকট্রিক আলোর কথা। গোটা শহরটার কথা—সমুদ্রের মধ্যে থেকে জন্ম-নেয়া, এই নূতন, সুদৃঢ় শহর। লিখলুম মোটর গাড়ীর কথা, মোটর ট্রাকএর কথা—আগে মোট বইত মানুষ, এখন বয় ওই ট্রাক। ইস্কুল, বাজার, বিদেশ থেকে আসা সুরসাল ফল, ফুল, গ্রীন্ হাউস, মেয়েদের কেশকুণ্ডনের দোকান, রাজ প্রাসাদের চাইতেও সুন্দর হাল আমলের অট্টালিকাগুলি—কিছুই বাদ দিলুম না। সেদিনের সন্ধ্যায় দেখা দূর-বিসারী শহরতলীর মাঠ, আকাশও রইল। তারপর কলম রাখলুম।

কিন্তু পড়ে দেখলুম এত আমার গোটা দেশ নয়। এর মধ্যে কোথায় আমার গ্রাম, আমার বাবা মা, কোথায় উত্তরের সেই শুষ্ক কঠোর ক্ষেত, মাঠ, কোথায় মরু-প্রান্তরের উন্মাদ বায়ু, দুবছরের আগের সেই করাল দুর্ভিক্ষ। মাটির

অন্ধকার ঘুপসী কুটিরগুলোর ছবি আঁকা হয়নি এখনও; হয়নি সামান্য ছিটে-ফোঁটা লাভের লোভে খাদ্য-শস্যের চাষ না করে আমাদের আফিমের চাষ করার কাহিনী লেখা। তারপর কর—রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি যে কর—তাও লিখলুম। সমস্ত দিক চিন্তা করে দেখলুম যে কর আদায় হচ্ছে তার মোটেই সম্ব্যয় হচ্ছে না। চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল বাবা, মা এবং গাঁয়ের আর সকলের মুখগুলি। ইচ্ছা হয় কি জান? অমন করে মরুভূমির হাওয়ায় মার খেয়ে মুখগুলি নাই বা হত রুক্ষ! অপর্যাপ্ত খাদ্য খেয়ে খেয়ে নাই বা ওরা অমন অস্থিসার হত! পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্য শিকড় খুঁড়তে আর জ্বালানী সংগ্রহ করতে গিয়ে রুক্ষ ঢেলা মাটি খিমচিয়ে খিমচিয়ে হাতগুলো ওদের ছড়ে ছড়ে শতধা হয়ে গেছে। নাই বা হত অমন।......তাই......তাই ওসব কথাও না লিখে পারলুম না।

আর বড় আকাংক্ষা আমার যে সান্-ইয়াৎ-সেনের প্রতিষ্ঠিত আমাদের এই গৌরবমণ্ডিত সরকার কোনও রকমে একটু ব্যবস্থা করে দিন যাতে আমার গ্রামখানি এই নূতন যুগের সুখ সুবিধাগুলির সামান্য একটু অংশও পায়। যেমন ধর—একটু ট্যাক্স কমান, কিছু রাস্তা তৈরী—শহরের মত বড় বড় মোটরের রাস্তার কথা বলছিনে—এই অতি সাধারণ কাঁচা মেটে রাস্তা—কোন রকমে গাধাটা, বা ঠেলাগাড়ীটা যেতে পারে। অথবা ধর দরকার হ'লে চাষীর আফিং-এর চাষ না করার স্বাধীনতা; আর তার সাথে আফিং-এর ওপর থেকে সরকারী ট্যাক্স কমান এই ধরনের আর কি......।

জেলে বসে ভাবতে ভাবতে বুঝলুম আমার ওপর সরকারী রোষের কারণ কোথায়। কেন তাঁরা আমায় দেশদ্রোহী বলেছেন। আগে তো মনে হয়নি এসব কথা। যা মনে এসেছে লিখে গেছি। প্রথমে লিখেছিলুম নিজের ভাষায়। নিজেরই খুব ভালো লাগল। পরে ইংরাজীতে অনুবাদ করে ফেললুম। এইখানেই অপরাধ। ইংরেজীতে লিখেছি। বিদেশীরা জানবে—ট্যাক্স, আফিম, দুর্ভিক্ষ আর গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার কথা। তাইতেই ও'রা খেপে গেলেন। শুধু যদি চীনা ভাষায় রেখে দিতুম তাহলে হয়ত এতটা গড়াত না। সেই বাসন্তী সন্ধ্যার যে এই পরিণাম হবে তা তো সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

কিন্তু দিনের পর দিন অমনি গেল, তাও কেমন বিশ্বাস করতে পারলুম না যে আমি ন্যায় বিচার পাব না। রাতের বেলা কি ভয়ানক একা লাগত—কি সাংঘাতিক ভয় করত। কিন্তু ভোর বেলা আমার আকাশটুকু যখন আলোয় ভরে উঠত—অন্য মানুষ হয়ে যেতুম আমি। ভাবতুম—এই নতুন কালে এ অসম্ভব। হয়তো ওরা আমার কথা ভুলে গেছে। ন্যায় বিচার হবে না, তা কি হয়! আসবে, আমার সময় আসবে। আধুনিক আইন যে একেবারে নূতন করে তৈরী হয়েছে! আমাদের ইতিহাস ক্লাসে আইনের কাঠামোটা পড়েছিলুম আমি।

কিন্তু কিছুই হল না। তারপর একদিন সেলগুলো সব ভর্তি হতে লাগল। নিশ্চয়ই খুব কড়া হাতে বিপ্লবী শিকার চলছিল। কারণ প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওয়ার্ড ভর্তি হত। আর সকালে খালি হয়ে যেত। কি সাংঘাতিক সেই রাত-গুলো গেছে, কি বলব! ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকত মানুষগুলো। সারারাত

গাল দিত। শেষ রাত্তিরে চীৎকার করে বিলাপ করে করে কাঁদতে বসত। প্রথম প্রথম বোঝাতুম। এই বোঝাতে গিয়েই আসলে আমি বিপ্লবী হলুম, আই-ওয়ান্। কি সব কাহিনী এক-এক জনের। অপরাধ কি? না, মিলে দোকানে শ্রমিকদের দুটো পয়সা বেশী পেতে, কেউ হয়তো কাউকে সাহায্য করেছে; কেউ হয়তো পতিতালয়ে বিক্রী করে দেওয়া কোন মেয়েকে পালাবার পথ করে দিয়েছে; কেউ দেশকে উন্নততর করার জন্য আমাদেরই মত দেশপ্রেমিকদের দলে যোগ দিয়েছে এই তো। সবারই অল্প বয়স। অনেকে তোমার আমার চাইতেও ছোট। প্রতিদিন চেয়ে চেয়ে দেখতুম হত্যা করবার জন্য সার বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে ওই কচি, কাঁচা প্রাণগুলোকে। খুনীদের ওপর তীব্র ঘৃণায় আমার সারা অস্তিত্ব বিকল হয়ে উঠত। তখনই পণ করলুম—পালাতে যদি পারি এ-হত্যার প্রতিশোধ একদিন নেব। তুমি যখন এসেছ—তখন আমি পুরো বিপ্লবী। বোঝান টোঝান ছেড়ে দিলুম তারপর। চুপ করে থাকতুম নূতন কেউ এলে। ওয়ার্ডটা নোংরা হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে এত লোকের আনা-গোনায়। হোক। চোখ থেকে ঘুম চলে গেল। আমার রাত্রি হয়ে উঠল শুধু প্রভাতের প্রতীক্ষা। শেষ রাতে খুট করে তালাটা খুলে যেত, আর বৃত্তাকার একটা আলোর চোঙ যেন অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছুটে আসত। সাথে সাথে একটা কর্কশ কণ্ঠ একটি একটি করে নাম পড়ে যেত—আমি ছাড়া সকলের। প্রতিদিন নিশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করতুম—এই বুঝি আমার নামটাও—। ঘামে সর্বশরীর নেয়ে উঠত। আমার নাম আর ডাকা হল না কোনদিন। ভুলে গেছে ওরা আমায়।

আলোর চোঙটা হতভাগাদের মুখের ওপর নেমে আসত এক এক করে। সৈন্যরা হাতে হাতে একসঙ্গে করে হাতকড়ি পরিয়ে দিত। কেঁদে উঠত ওরা। তারপর সরু বারান্দা বেয়ে সারবন্দী করে নিয়ে যেত ওদের। পড়ে থাকতুম শুধু আমি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম ওদের যাওয়া। জানতুম কোথায় যাচ্ছে। কল্পনার চোখে দেখতুম হয়তো যেতে যেতে একটু খোলা হাওয়ার স্পর্শ লাগছে ওদের চোখে-মুখে। কত দিন, কত কাল হয়ে গেল, আমি পাইনি ও বস্তু। তখনও আঁধার কাটেনি। কতগুলো হাত—অন্ধকারে হাতগুলো দেখতে পাচ্ছে না ওরা, একটা কঠিন দেয়ালের গায়ে ঠেলে দিল সমস্ত লোককে। তারপর একটা চীৎকার, কিসের খানিক শব্দ, চোখের সামনে একটা আলোর ঝলক্। বাস্—ডেলা পাকিয়ে পড়ে গেল সব মাটির ওপর।

আমার মাথার মধ্যে কেবলি গুনগুনিয়ে ফিরত একটা ইংরেজী লাইন
—'I wandered lonely as a cloud..'

ইচ্ছা হত চীৎকার করে বলি ওদের কিছু। কিন্তু কি হল ওদের কেউ জানে না। বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গেলুম আমি। ওই দুর্ভাগাদের সাথে, প্রতিদিন আমিও মরতুম। তারপর তুমি এলে। তোমার সাথে ফিরে এলুম আমি বিস্মৃতির তল থেকে।/

রাত গভীর হয়েছে। কতবার যে চিঠিটা পড়ল আই-ওয়ান্। পোড়াতে পারল না। এযে মহৈশ্বর্য! ভাঁজ করে কতগুলো পুরানো বই-এর নীচে দেরাজে রেখে দিল চিঠিটা। এ বইগুলো কোনদিন পড়ে না ও। ওই কাগজ-গুলোর মধ্যে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে এন্-লান্। প্রতিদানে কি দেবে ও!

সারা রাত জেগে ভাবল—যোগ্য কি আছে দেবার—ওর ধমনী-প্রবাহিত শোণিত ছাড়া। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে ওই শোণিতের শপথে। তাই হবে যোগ্য দান।

পরের দিন এন্-লানের সাথে দেখা হলে চিঠির বিষয়ে একটা কথাও তুলল না আই-ওয়ান্। লজ্জা পেয়েছে যেন এন্-লান্। কাছে গিয়ে শুধু বলল আই-ওয়ান্ঃ 'তুমি আমার রক্ত-ভাই হবে?'

লজ্জার মেঘ কেটে গেল এন্-লানের। বলল: 'হব।'

দুজনে এন্-লানের ঘরে গেল। পুরানো প্রথা অনুসারে পরস্পরের বাহু থেকে রক্ত বের করে এক সাথে মিশিয়ে, হাতে হাত রেখে নিল রক্তের শপথ। এর পরে কোনদিন আর এ-বিষয়ে কথা হয়নি ওদের—কিন্তু রক্তের পণ ওদের রক্তে মিশে রইল।

প্রতিদিন স্কুলের পরে খালি ক্লাস ঘরে মিটিং হয়—ওরা দুজন থাকে। অন্যরাও আসে। সেদিনের মিটিং-এ এন্-লান্ দাঁড়িয়ে বলল—'শহরের উত্তর দিকের সিল্ক-মিলের এলাকাটাকে সংগঠনের ভার পড়েছে আমাদের উপর। এই মিলগুলির সমস্ত দায়িত্ব আমাদের।'

সমস্ত মন দিয়ে শুনছে আই-ওয়ান্। তালিকা থেকে একটা একটা করে মিলগুলোর নাম পড়ে যায় এন্-লান্। জীবনে এই সব এলাকায় কখনও ও যায়নি। অথচ হাজার হাজার পুরুষ, নারী, শিশু কাজ করে এই সব মিলে।

এন্-লান্ বলে: 'তোমাকে সব থেকে দূরের মিলটার—তাতুয়ান মিল—ভার নিতে হবে। রিক্স ভাড়া করে যেতে পারবে তুমি। হেঁটে যেতে হবে না। যাদের হেঁটে যেতে হবে তারা কাছেরগুলো নাও।'

বলে যায় এন্-লান্, কলে কারখানায়ও বিপ্লবকে পোঁছে দিতে হবে, যাতে শ্রমিকরা বুঝে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারে সে-দিনের জন্য যে-দিন এই সরকারকে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা হবে নূতন শাসন-ব্যবস্থার—জনগণের নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থা। এন্-লান্ বলেছে, এই হচ্ছে সত্যিকারের পথ। এন্-লানের চিঠির কথা ভাবে—আর সেই গ্রামগুলোর কথা। ভালোই হয় করভার যদি লাঘব হয়; আফিং-চাষের বাধ্য-বাধ্যকতা থেকে যদি মুক্তি পায় কৃষকরা। আর ওই যা বলল এন্-লান্, মিলের শ্রমিকদের অবস্থা যদি এত দুরবস্থা, তবে তাদেরও উন্নততর জীবন-যাত্রার জন্য সাহায্য করা দরকার। এরকম কাজ হাতে পেয়ে খুব খুশী আই-ওয়ান্। খুশী হয়ে ও অন্যদের মত নিঃশব্দে কাজের ভার গ্রহণ করে। দেশের বহু শহরে তরুণ-তরুণীরা এসব কাজের ভার নিচ্ছে আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে—সকলের আশা-আকাংক্ষার সেই দিনটি. ....

পেং-লিউ ছুটে এল হাঁপাতে হাঁপাতে—কে যেন আসছে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

'পালাও', এন্-লান্ বলে।

যেন নিমেষে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল সবাইকে। কিন্তু যেতে যেতে লক্ষ্য করে আই-ওয়ান্, পেংলিউ পালাল না। ঘরেই দাঁড়িয়ে কার যেন অপেক্ষা করতে লাগল। এবং কিছুক্ষণ পরে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে এসে বলল: 'কেউ নয়, দরজা মেরামত করতে মিস্ত্রী এসেছিল।' আবার চলল মিটিং।

পেংলিউর কথা ভুলে গেল আই-ওয়ান্‌ সহজেই। ওকে সবাই ভুলে যায়—চেহারায় ধরণে ধারণে এত সাধারণ—এত ছোট, এত বৈশিষ্ট্য হীন, আপাত দৃষ্টিতে এত নিরীহ মানুষটা যে ওর কথা কারো মনে থাকে না। পাহারা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ ওকে দেওয়ার কথাও মনে হয়না করো। একটুও পছন্দ করেনা ওকে আই-ওয়ান্‌।

নূতন জীবন আরম্ভ হয় আই-ওয়ানের।

একদিন আই-কো জিজ্ঞাসা করেঃ 'কি নিয়ে এত ব্যস্ত-বাগীশ শুনি? কোন শয়তানীর তালে আছ বুঝতে পারছি।'

গত কয়েক সপ্তাহ ফিরতে ওর দেরী হয়েছে। প্রায়ই আই-কোর পরে ফিরেছে। আজ দরজায়ই দেখা। নিজস্ব দামী রিক্সাটা থেকে নামতে নামতে বলে ভাইকে আই-কো, 'কুলি মজুরের মত হেঁটে আসা হচ্ছে কোত্থেকে?' অন্য বন্ধুদের মত ইস্কুলের ছুটির পর সেই পোষাকে হেঁটেই মিল এলাকায় চলে যায় আই-ওয়ান্‌ এবং যেতে গর্ব বোধ করে।

উত্তর দেয় না আই-ওয়ান্‌। দুজনে পাশা পাশি সিঁড়ি দিয়ে ওঠে। বাব্‌ড়ী চুল আই-কোর মাথায়—সুগন্ধি তেলে অতি চিকন করে পালিশ করা। তারি তীব্র সৌরভ আই-ওয়ানের নাকে এসে লাগে। ৎসে-লি হাল আমলে যুবক সমাজের অত্যন্ত জন-প্রিয় কবি। তাঁরই অনুকরণে আই-কো এবং তার বন্ধুদের মাথায় বাব্‌ড়ী চুল। এক কালে ৎসে-লির সংগে কিছু পরিচয় ঘটেছিল আই-কোর। আজও কথায় কথায়—ৎসে-লি এবং আমি অমুক করলাম—আজ আমি ৎসে-লিকে অমুক কথা বলেছি...বলে হকচকিয়ে দেয় মানুষকে। ৎসে-লির মতন কবিতা বেরুলেই পড়বার জন্য পাগল হয়ে ছোটে মানুষ। আই-ওয়ান্‌ও পড়েছে, কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায়নি।

আই-কো ধমকায়ঃ 'তা ছাড়া একলা তোমার যেখানে সেখানে যাওয়াও উচিত নয়। যদি ভুলিয়ে নিয়ে যায় কেউ। আশ্চর্য নেই কিছু। জানো কত টাকা লাগবে ছাড়িয়ে আনতে?'

মিথ্যে নয়। ঘটছেও চারধারে নানা রকম ঘটনা। গোলমালের সময় এখন। ওর বাবা দুজন জোয়ান দেখে রুশ দেহরক্ষী রেখেছেন—যেখানে যান তারা সংগে থাকে পিস্তলে হাত দিয়ে। আই-কোর রিক্সা-ওয়ালাও আগে সৈন্য ছিল। তারও জামার মধ্যে পিস্তল লুকান থাকে।

আই-ওয়ান্‌ বলেঃ 'যত গরীব দেখায় ততই তো ভাল।'

'চিনতে যেন বাকী থাকবে ব্যাটাদের।' বলে আই-কো।

ভেতরে আসে ওরা। একটা পর্দার পেছনে থেকে পিওনীর মাথাটা উঁকি দিয়ে সরে যায়। ঠাকুমার ভাঙা গলা খন্‌খনিয়ে ওঠেঃ

'আই-কো! আই-ওয়ান্‌!'

'ৎসে-লির ওখানে নেমন্তন্ন আছে। কে যাবে বুড়ীর কাছে এখন! গেলেই দেরি হবে।' আই-কো বলে।

'গুরুজন না? বুড়ী বুড়ী কর, লজ্জা করে না?' আই-ওয়ান্‌ বলে চাপা স্বরে।

আই-ওয়ান্‌ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঠাকুরমার ঘরে গিয়ে ঢোকে। আই-কোর ছ্যাবলামো ভালো লাগেনা ওর। ওর সামনে থেকে যেতে পারলে ও বাঁচে।

একটু পরেই বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে ভাবে ঃ 'ৎসে-লি, ৎসে-লি! কেবল ৎসে-লি। দেশের এই দুর্দিনে ছেলের দল, ছুটছে ৎসে-লির পেছনে। কি অধিকার আছে তাদের? তরুণ কবির ওপর ঘৃণা হয় ওর। বলবে এন্-লান্কে এই লোকটার নামও প্রাণদণ্ডের তালিকায় তুলে রাখতে।

এই তালিকা ওদের দলের এক অস্ত্র বিশেষ। ওরা বোঝেনা এখনও, এক ধার থেকে ওই তালিকায় নাম তোলা মানে পাইকারী হত্যার ব্যবস্থা করা। তবু নাম তোলে—খানিকটা সান্ত্বনা। বিরোধীপক্ষের ওপর প্রতিশোধের ইচ্ছার আংশিক চরিতার্থতা। শিক্ষক হোক, ছাত্র হোক রাজ-কর্মচারী হোক —কারো ওপরে চট্‌লেই ওরা মারণ-তালিকায় নাম তোলে। হয়ত কোনও বিদেশী শক্তির সাথে সরকারের সন্ধি হল, ব্যাপারটা ওদের পছন্দ হলনা। অমনি সংশ্লিষ্ট রাজকর্মচারীর নাম খাতায় উঠে গেল। কেউ হয়ত জন-সাধারণের তহবিল তছরূপ করেছে—নাম উঠল। সেদিন পেং-লিউ এল, তার তরুণ বিজ্ঞান-শিক্ষক মিঃ রানাল্ডের নাম তুলতে হবে খাতায়। ভদ্রলোক ইংরেজ। ওকে পছন্দ করেন না তিনি এবং অপছন্দটা চেপে চলেননা। সেদিন গাল দিয়েছিলেন—বর্বর হিন্দুদের মত ভীরু শেয়াল বলে।

মানে বোঝেনি ও তখন। বাড়ীতে গিয়ে অভিধান দেখে রেগে টং। তাই ছুটে এল এন্-লানের কাছে। এন্-লান্ বললে ঃ 'বিদেশীদের নাম কি হবে হে? সব বিদেশীরা তো অমনিই কোতল হবে।'

কিন্তু কবে যে সে দিনটি আসবে কে জানে? হেমন্তের শেষের দিকে সকলেরই ধারণা হল আর দেরি নেই। কানাকানি চলে হ্যাংকোতে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সরকার ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে এবং শিগ্গিরই হয়তো চ্যাং-কাই-শেক ইয়াংসে নদী দিয়ে এসে পড়বে। দলের মধ্যে আলোচনা হয় আশায় আনন্দে —বাড়ীতে ওর বাবা করেন ঘৃণায় আর তাচ্ছিল্যে। এন্-লান্ বলে, শুধু কথায় হবে না। কোমর বেঁধে কাজে লাগা চাই। গুপ্ত দলের মধ্যে প্রস্তুতির সাড়া পড়ে যায় সারা শহরে।

'কাজে লাগা মানে, জনগণকে প্রস্তুত করা', বলে এন্-লান্, 'শুধু দেহে নয়, মনেও।' আমরা যারা জনগণের ভাষা জানি, তারা ওদের মন তৈরী করবে। আর আই-ওয়ান্, তুমি সামরিক কুচকাওয়াজ শিখেছ। সুতরাং তুমি তা তুয়ান মিল্-এ একটা সশস্ত্র বাহিনী গঠন করবে।'

অবাক হয়ে গেল আই-ওয়ান্। এন্-লান্ ওর পরিচয় না হয় জানে, কিন্তু কি করে জানল ঠাকুর্দা ওকে জার্মান শিক্ষক রেখে তিনটি বছর সামরিক শিক্ষা দিয়েছেন? প্রথমটায় কথাই কইতে পারলনা ও। তারপর চীৎকার করে বলে উঠল ঃ 'করব।'

তখন আর কিছু বলেনি, কিন্তু পরে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল এন্-লানকে কথাটা। এন্-লান্ মুখ ভরে হেসে বলল ঃ 'স্কুলের ড্রিল ক্লাসে দেখিনি! তোমার মত অমন হংস-কদম কারো হয়না।' বলেই চলে গেল।

আরম্ভ হল আই-ওয়ানের কাজ মিলের পাণ্ডুর, কংকালবৎ মানুষগুলোকে নিয়ে। দুমাস হল, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে মিলে যায় ও। কাজ বড় কঠিন। মিলের ভেতরে যাবার হুকুম নেই। বাষ্পে ভিজিয়ে রাখা পচা

গুটি পোকার গন্ধ আসে ভেতরের বড় বড় ইমারতগুলো থেকে। মিলের বাইরে ছোট ছোট খড়ের কুঁড়েতে থাকে শ্রমিকরা। ওখানেই গিয়ে অপেক্ষা করে আই-ওয়ান্।

প্রথম কেমন যেন লাগত। এরা মানুষ! ন্যুব্জদেহ ওই কংকালের দল! অনর্গল কাশি, জ্যোতিহীন চোখ, ফোলা ফোলা লাল কাঁচা মাংসের মত হাতগুলো! স্ত্রীলোক আর ছোট ছোট মেয়েদের হাতের অবস্থা আরো খারাপ। তীব্র ব্যথায় মরছে সারাক্ষণ। হাতগুলো আল্গা করে তুলে ধরে থাকে। প্রথম দিন চীৎকার করে উঠেছিল আই-ওয়ান্, ওকি? তোমাদের হাতে হলো কি?'

উত্তর দিল ছোট্ট একটি মেয়ে। বছর বারোও হবে না বয়েস।

মৃদু স্বরে বললঃ 'গরম জলে হয়েছে।' ভারী মিষ্টি গলা।

'গরম জল?' জিজ্ঞাসা করে ও।

এক বৃদ্ধা বলে উঠলঃ 'গুটিগুলোকে খুব গরম জলে ফেলতে হয়গো বাবু। ভেতরকার পোকা গুলান মরে যায় আর সুতো নরম হয়। গরম জল থেকে হাত দে তুলে সুতোর খেই বার করতে হয় আস্তে আস্তে। বিদেশী যন্তর দিয়ে জলটাকে তাঁতিয়ে রাখে কিনা, তাইতে অমন হয় হাত।'

নির্বাক হয়ে যায় আই-ওয়ান্। সদ্য ফোলা মাংসগুলো চোখের সামনে দেখে ওর মাথা ঘুরে ওঠে। প্রথম দিন কিছুই করতে পারলনা; অমনি ফিরে গেল। বাড়ী ঢুকতে ঢুকতে মনে হয়—আফিংএর গন্ধই শুধু নয়। আরো দুর্গন্ধ আছে বাড়ীতে। সিল্কের গন্ধ। উঃ, কি বিশ্রী ওই সিল্ক মিলের গন্ধ। সিল্কের মধ্যেও যেন লেগে আছে।

রাতে পিওনীকে বলেঃ 'নিয়ে আয় দেখি তোর সেই সুগন্ধি টুগন্ধি কি আছে?'

নিজের সুগন্ধি হাত দুখানা ওর গালে চোখে বুলিয়ে দেয় পিওনী।

'আঃ।' আরামের নিশ্বাস ফেলে আই-ওয়ান্।

আবার হাত নিয়ে আই-ওয়ানের ঠোঁটের ওপর রাখে পিওনী। স্থির হয়ে থাকে ও। ভারী মিষ্টি গন্ধ। বড় ভালো লাগে।

'ঠিক ফুলের মত রে তোর হাত দুখানা।' বলে।

আই-ওয়ান্ ভালোবাসেনা পিওনীকে। এতদিনে এ-কথাটা বুঝেছে ও। বাসতে পারবেও না কোনদিন। কিন্তু বড় মিঠে ওর কচি হাতদুখানা, বড় কোমল। এই সৌরভ, এই মাধুরী—মুহূর্তের জন্য ওর মনে হয়—বরদান হয়ে নেমে আসে প্রত্যেক তরুণের জীবনে। ওর জীবনেও আসবে—হয়তো পিওনী নয় অন্য কারো হাতে। ইচ্ছে হয় হাতখানা টেনে নেয় আপন হাতে। কিন্তু না, থাক। ওর জীবনে নারীর স্থান নেই। ওখানে জনতার জন্য সিংহাসন পাতা।

কিন্তু বলবে কি করে পিওনীকে এ কথা?

কোমলভাবে ওর কাঁধে দেহ এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিওনী। আপত্তি করেনা আই-ওয়ান্। বইয়ের দিকে তাকিয়ে বসে আছে ও ডেস্কের সামনে। পিওনীর হৃদ্পিণ্ডের ওঠা পড়ার স্পর্শ লাগছে ওর কাঁধে। মুহূর্তের জন্য মুছে যায় পিওনী, মুছে যায় সব কিছু। সব ছাপিয়ে আজ বিকেলের দেখা

সেই নূতন মানুষগুলো ভিড় করে থাকে ওর মনের দিগ-দিগন্ত ভরে। নারীর হাতের চেয়ে, পিওনীর হাতের চেয়েও ওরা যে বাস্তব!

পিওনী বলেঃ 'শুতে যাবে না?'

সেই ওকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল আই-ওয়ান্, তারপর থেকে ও সকাল সকাল ওর চা নিয়ে আসে। বেশীক্ষণ থাকে না।

আদরের সুরে বলে আবারঃ 'এত খাটলে চলে? এত খাটবার দরকারই বা কি তোমার! গরীবের ছেলে তো তুমি নও!'

'ঘুম যে আসে না রে!' বলে আই-ওয়ান্। মনে মনে বলে—কি বুঝবি তুই, বড়লোকের ছেলে বলেই তো ঘুম আসে না।' ভাবে এই মুহূর্তটা যদি আজের রাত না হয়ে আগামী কাল হত—তাহলে এখন ঘরে থাকতে হত না—ওই দুর্ভাগাদের কাছে আবার চলে যেতো; যদি কিছু করতে পারত ওদের জন্য!

'ভাগ', বলে পিওনীকে, 'কাজ করব এখন।'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলে যায় পিওনী। অন্য দিনের মত আজ আর খুনসুড়ি করে না। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় একটু। আই-ওয়ান্ ফিরে তাকায় না দেখে চলে যায়। আই-ওয়ান্ ওঠে বই ফেলে, জানালায় গিয়ে অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানকার প্রতিটি অণু পরমাণু ওর জানা। বাবা ঠকুর্দা বহু টাকা ঢেলেছেন এর পেছনে।' বড় বড় পাথর এসেছে পিকিং-এর উত্তর প্রান্ত থেকে; নানকিং-এর অন্তর্বর্তী 'নীল চীনে মাটির প্যাগোডা' পাহাড় থেকে রং বেরং-এর বিচিত্র আকারের নুড়ি এনে তৈরী হয়েছে আঁকা বাঁকা পথটা। ঝরণা আছে, পুল আছে। হ্রদ, গ্রীষ্মাবাস, নৌক—সব আছে। আকাশ-চুম্বী পাঁচিল উঠেছে চারধারে। বাইরের কিছু দেখা যায় না ওর জানালা থেকেও। গেট নেই; ছোট একটা খিড়কীর দরজা আছে মাত্র মালীর জন্য। সারাক্ষণ ওটা তালাবন্ধ থাকে। চাবি থাকে মালীর কাছে।

'এই পাঁচিল ঘেরা বাগানে বন্দী হয়ে কাটালাম এতদিন!' ভাবে আই-ওয়ান্।

স্তব্ধ তমিস্র রজনীর দিকে তাকিয়ে সংকল্প করে—আর নিজের চিন্তা নয়। শুধু ওই মানুষগুলো—মিলের ওই মানুষগুলোর কথাই জানতে হবে এখন থেকে। ওরাই হবে ওর জীবনের সাধনা।

বেশী দিন লাগল না। মিল-শ্রমিকদের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে কিছু আর জানতে বাকী রইল না ওর। চীন মহাদেশের নানা জায়গা হতে ওরা এসেছে সাংহাইয়ে। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, আর গৃহযুদ্ধের ফলে মাটি হতে উন্মূলিত হয়ে ছিটকে এসে পড়েছে এই শহরে। এখানে কোন মতে তবু 'দুটি অন্ন খুঁটি' প্রাণের ধুকপুকানিটুকুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে ওরা; যখন তখন সৈন্যদের অত্যাচারও নেই। মাথা গুঁজে রাখার মত একটু কুড়ে জুটেছে। এইটুকুই তফাৎ আগের অধ্যায় থেকে।

আই-ওয়ানের জীবনের প্রধান সাধনাই হল এখন এদের সেবা করা। ইস্কুলের পড়া করে, ঠিক যেটুকু না করলে নয়; অর্থাৎ বকুনিটুকু শুধু বাঁচান।

বাড়ীতেও করণীয় যা কিছু চট্ পট্ সেরে বেরিয়ে যায়, যাতে ধরা না পড়ে। মিলের শ্রমিকরা ছাড়া আর সব যেন মিথ্যা মায়া।

কিন্তু কি করবে? করবার বিশেষ কিছু নাই। এটুকু যখন বুঝতে পারল, ওরা যেন ওর আরো আপন হয়ে উঠল। হেমন্ত-শেষের স্যাঁৎস্যাঁতে বৃষ্টির মধ্যে গিয়েও ওদের সাথে দরমা-ঘেরা কুড়ের মধ্যে বসে থাকে। ওরা একবার পরস্পরের দিকে চায়, আর একবার ওর দিকে চায়। মাথা নেড়ে বলে একজনঃ 'বাপুহে, বুঝতে পাচ্ছি, দয়ার মানুষ তুমি। যা বলছ, তোমার খাঁটি কলজের কথা। কিন্তু করবে কি। আমাদের কপাল খণ্ডানোর সাধ্যি কারো নেই। এ ছাড়া দুমুঠো নুন ভাত জোটাবার আর কোন রাস্তাও নাই। এখানেই মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। কেই বা আমাদের চায়? কেউ না। দুনিয়ায় কেউ নাই। আমরা মলাম বাঁচলাম, কার মাথা ব্যথা বলো!'

'কেউ না করে, তোমাদের নিজেদেরই করতে হবে!' আই-ওয়ান্ বলে।

'আমরা? আমরা কি করব, বাবু? কি ক্ষেমতা আছে আমাদের?'

একটু একটু করে ও বোঝায় মানুষগুলোকে, অক্ষম নয় ওরা, ওরা শক্তিধর।

'অন্ততঃ আশা তো করবে হিম্মৎ করে। আশা না রাখলে চলবে কেন? আশা না রাখলে যে আজও খোয়া গেল, কালও খোয়া গেল হে।' আই-ওয়ান্ বলে।

অনেক কষ্টে, অনেক দিনে যেন সাহস হয় মানুষগুলোর; একরত্তি একটু আশা করবার মত হেতুও খুঁজে পায়। অনেক চেষ্টার পর কুড়ের বাইরে একটা জন-বিরল স্থানে বের করে আনে ওদের আই-ওয়ান্। তারপর আরম্ভ হয় সামরিক কুচকাওয়াজ। ভারী ভারী পাগুলো ঠিক মত পড়ে না। লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকে সবাই। আই-ওয়ান্ জোর করে, তিরস্কার করে।

'এই মাথা তোল সব', হুকুম দেয় ও, 'লড়তে হবে যে তোমাদের। নিজে-দের জন্যই লড়তে হবে।'

সমস্ত কার্যপদ্ধতি এর মধ্যে ও বুঝিয়ে দিয়েছে ওদেব—বিপ্লবী সৈন্য-বাহিনী নদীপথে আসবে, সাধারণ ধর্মঘট ঘোষিত হবে মিলে, কারখানায়—সর্বত্র সেই ধর্মঘটেরই প্রস্তুতি হচ্ছে। তাই প্রত্যেক জায়গায়ই শ্রমিকদের সামরিক সংগঠন চাই। তারা ভেতর থেকে সংগ্রাম করবে, আর সেনা-বাহিনী আঘাত হানবে বাইরে থেকে। শোনে ওরা আর সংশয়ে দোলে।

একজন বলেঃ 'সাপের মুখ থেকে গিয়ে বাঘের মুখে পড়ব, এই আর কি।'

অবশেষে একদিন আই-ওয়ান্ গর্জে ওঠেঃ 'আমার কথায় যাদের বিশ্বাস আছে, তারাই শুধু থেকে ড্রিল শেখো।'

চোখের নিমেষে, বয়স্করা ফিরে গেল তাদের কুড়েয় তাদের অতি-পরিচিত অতি দুঃখের মধ্যে। সতের জন যুবক রইল শুধু। এদের নিয়েই দল গঠন করে আই-ওয়ান্। কিন্তু সংশয় যায় না ওদেরও। একদিন প্রত্যেকের হাতে বন্দুক তুলে দিল আই-ওয়ান্। কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এখন। একটা দোকানের মালিককে ঘুষ দিয়ে দলের জন্য কত-

গুলো বন্দুকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক সঙ্গে আসবে না। প্রস্থে প্রস্থে দশটা দশটা করে আসবে। আই-ওয়ান আঠারোটা বন্দুক নিল। একটা তার নিজের জন্য, বাকী সতেরটা ছেলেদের জন্য। রাত্তির বেলা নিজে এল। ঘরের কোণে, জামার তলায়, শোবার বিচালীর গাদার তলায়, এমনি করে লুকিয়ে রাখল এক একটা বন্দুক এক এক জায়গায়। এক একজন করে বন্দুক ছুঁড়তে শেখাল—শহর থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলত—ওরা শিকার করতে এসেছে।

হাতের হাতিয়ার ওদের বুকের বল জুগিয়েছে।

বাগানের পথে আই-ওয়ান্ রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আসা যাওয়া করে। মালী ঘুষ নিয়ে হেসে আরেকটা চাবি দিয়ে বলে, 'তুমিও দেখছি আই-কোর মতই, বাবু!'

হাসে আই-ওয়ান। ভাবুক মালী, তাই ভাবুক, আই-কোর মত ও-ও অভিসারে যাচ্ছে। অভিসারই বটে।

সারা হেমন্ত এবং শীত অন্ধের মত যে যার দল নিয়ে নির্দিষ্ট কাজ করে যায়। ওর দলে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে এন্-লান জানে। শহরে এমনি আরো দল আছে, এবং সেখানেও সকলেই যার যার নির্দিষ্ট কাজ করছে। এর বেশী আর কিছু জানে না আই-ওয়ান্। কেউ কোথাও নিশ্চয়ই আছে যে সব জানে। কিন্তু কে সে, কোথায়—সে খবর কারো জানা নেই। আই-ওয়ানের অনুভূতি বলে কোথাও আছে বিরাট এক গুপ্ত-সংগঠন—তারই অংশ ও; এক বিরাট দেহের, একটি প্রত্যঙ্গ যেন। সে দেহের শিরায় শিরায় বইছে জীবন শোণিত। তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে ওদেরও বক্ষে; আর তারই দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সর্ব-ক্রিয়া। এর বেশী আর কিছু নেই। আগেকার অধ্যায়ে যা কিছু বাস্তব ছিল আই-ওয়ানের জীবনে, সব তুচ্ছ হয়ে গেছে এখন। পরিবারের কথা কদাচিত ভাবে—জানে, এই গৃহ ওর ছাড়তেই হবে একদিন। এবং একদিন আসবে যখন মৃত্যুর পরোয়ানা এদের সামনে এসে দাঁড়াবে সেদিন স্তব্ধ হয়ে ওকে শুধু দেখতে হবে। কিন্তু দুর্বল হয়না আই-ওয়ান্। ওর বক্ষের মধ্যে এক গোপন মহাজীবনের অনুরণন! সব মানুষের সর্ব-দুঃখহারিণী এক মহা-শক্তির অংশ ও, এই গভীর অনুভূতিতেই ওর শক্তি। ভাবে ও, হলেনই বা বাবা, কেন তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করব আমি। আজ হাতে পেলে এন্-লানদের তো তিনি ছাড়বেননা, ছাড়বেন না তাঁর নিজের পুত্রকেও।

তুচ্ছ হয়ে যায় রক্তের বন্ধন। গভীরতর বন্ধনের আয়োজন আজ। দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে মানুষ—সনাতন পথকে আঁকড়ে ধরে আছে যারা—আর যারা নূতন পথের অভিযাত্রী। রক্তের বন্ধন এ বিভাগকে ঠেকাতে পারেনি, চলবে না এর ওপর কোন আপসের সেতু-বন্ধন। আই-ওয়ানের মনে এই বিভেদ স্পষ্টতর, তীব্রতর হয়ে ওঠে দিনে দিনে। কখনও শীতের নিস্তব্ধ রাত্রিতে, নিঃসঙ্গ শয্যার একান্তে শুয়ে শুয়ে মনে হয় বিপুল সমুদ্র যেন ধীরে ধীরে অনিবার্য গতিতে আপনাকে বিস্তার করে দিচ্ছে বিভক্ত মানুষের

মাঝখানে। জলের উপরিভাগ স্থির শান্ত; কিন্তু তার গভীরতম গভীরে গুহা-গহ্বর-সংকুল তলদেশ। সেখানে ফাটল ধরেছে। গভীর ফাটল—। ওই ফাটল বেড়ে বেড়ে দুই বিভক্ত মানুষের মধ্যেকার সাগরকে অনতিক্রম্য করে তুলবে। জাতিতে জাতিতে বিভেদ নয়। মিঃ রানাল্ড আর মিস্ মাইংল্যান্ড এক দিকে হয়ে শ্বেতজাতির পক্ষে দাঁড়াবেন না। মিঃ রানাল্ড, তাঁর পিতৃ-পিতামহ থাকবে এক দিকে আর মিস্ মাইংল্যান্ড থাকবেন বিপরীত দিকে। আই-কো থাকবে বাবার সঙ্গে, যেহেতু ওই আশ্রয়কেই সে বেশী নিরাপদ মনে করবে। মা ঠাকুরমাও তাই থাকবেন। আর পিওনীর মত মানুষ—ক্ষুদ্র জীব ওরা, চরম মুহূর্তে এলে কোন পক্ষে যাবে বলা যায় না। ওই বিরাট গহ্বরের দুই প্রান্তে পূর্ব-পশ্চিম সব এক হয়ে যাবে।

আই-ওয়ান্ থাকবে এন্-লানের পাশে—আর ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে ওদের দলের আর অন্য দলের জানা অজানা যত মানুষ। আরো থাকবে দীন, দরিদ্র, চাষী, মজুর, বিভিন্ন ব্যবসায়ের কর্মচারীরা, থাকবে দুনিয়ার যুব-শক্তি—থাকবে তরুণ আর তরুণীরা—তাদের ভাষা হয়তো জানেনা আই-ওয়ানরা —কিন্তু জানে হৃদয়ের ঐক্য আর লক্ষ্যের ঐক্য। এই বিশাল বিপুল ভ্রাতৃত্বের সম্ভাবনা ছেড়ে ও কেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সঙ্গে বাঁধা পড়ে থাকবে। ওদের সাথে রক্তের সম্পর্ক ওর নেহাৎ দৈবে। পুরনো কাল মিলিয়ে যায়। ধ্যানে পরিশুদ্ধ হয়ে কোষ-মুক্ত তরবারীর মত দীপ্যমান হয়ে প্রতি নূতন দিনের সম্মুখীন হয় আই-ওয়ান্। এবং নিজেকে ঢেলে দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে ওর দলের তরুণদের।

সারা শীত ধরে তীব্র হিমেল হাওয়া আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কাজ এগিয়ে চলে আই-ওয়ানের। দলে এখন সাঁইত্রিশ জন ছেলে। প্রত্যেকের নাম ও জানে; মিলের চারদিকে মাছের গায়ের আইশের মত ঘিঞ্জি কুড়ের রাশের মধ্যে প্রত্যেকের ঘরখানি আলাদা করে চিনে নিতে পারে ও। প্রথম প্রথম সবাইকে একরকম লাগত—ফ্যাকাশে চেহারা, এক রকম মাংস-লেশ-হীন বীভৎসতা; কোটর-প্রবিষ্ট চোখ ঘিরে একই রকম বলয়িত কালো, একই রকম সকরুণ শুষ্কতা ওদের ওষ্ঠ-জোড়ায়। জীবনের ইতিবৃত্তও হুবহু এক। বিভিন্ন জায়গায় ওদের জন্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোভী এবং অত্যাচারী শাসকের চাপানো গুরু করভার—সর্বত্র দুর্ভাগ্যের মার খেয়ে এক-জাতীয়তা লাভ করেছে ওরা। একজন যদি বলে 'বাবার আমি সব চেয়ে ছোট ছেলে, দুই একরেরও কম জমি ছিল তাঁর, আমার খাওয়া আসবে কোত্থেকে বল; আমি জন্মলাম বলে তো আর সকলে উপোস কত্তে পারে না', ধরে নিতে পারো এই ইতিহাস ওদের প্রতি ঘরে। নদীর ঢলে গা ভাসিয়েছিল ওরা। হয়তো সাগরে গিয়ে পড়ত। কিন্তু মোহানায় সাংহাই জাল ছড়িয়ে আছে। আটকে গেল। আর কোথা যাবে? ঠেকল এসে এই মিলে।

আই-ওয়ান্ প্রথম যখন শুনল মানুষগুলো খাটে উদয়াস্ত—শীতের দিনেও; গ্রীষ্ম ছাড়া সূর্যের মুখ দেখতে পায় না, এবং এত খেটে যা মাইনে পায়—রাগে কাঁপতে থাকে ও। 'এ ব্যবস্থা বদলাবই আমরা—গর্জে ওঠে ও।

একজন বলে বসে, 'বাবা, কতলোক এটুকুর জন্যই হেদিয়ে মরছে, তা

আমাদের আর বেশী কেন দিতে যাবে? এ বাপু তুমি ন্যায্য কথা বলছ না!'

এই স্বল্পে তুষ্টি—এর বিরুদ্ধেও ওকে সংগ্রাম করতে হয় কম না। ওদের ভাষা অভদ্র অমার্জিত, অক্ষর জ্ঞান নেই কারো, অভ্যাস জানোয়ারেরই মত লজ্জা-সংকোচহীন—নৈসর্গিক প্রয়োজন হলে যেখানে থাকে সেখানেই ব'সে পড়ে অবলীলায়। কিন্তু বড় লোকের সামনে ওরা এতটুকু হয়ে যেন মাটির সাথে মিশে যায়—ভয়ে নয়, ভীরুতায়; ওরা জেনে রেখেছে দেবতাই ওদের এদের অসমান করে গড়েছেন। এই বিনয় বনাম বিনতি ভাঙ্গতে আই-ওয়ানের পরিশ্রমের অন্ত নাই।

ও ওদের জোর গলায় বলেঃ 'কে বললে ছোট; আরও দশজন মানুষ যেমন তোমরাও তেমন। মানুষের পূর্ণ অধিকার তোমাদের আছে।'

এমনি উদার তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে ওরা, এমনি শীতল ঔদাস্যে জবাব দেয় যে রাগে দাঁত কড়মড় করে আই-ওয়ান্।

তবু ভালো না বেসে থাকতে পারে না। পরম নিষ্ঠায় ওরা শিখতে চেষ্টা করে। দু'তিনজন করে পালা করে আসে ওর কাছে। কাজের সময় থেকে সময় চুরি করতে হয়। সেই সময়টা অন্যেরা পুষিয়ে দেয়। প্রাণপণ ওদের চেষ্টা। সারা শীত ধরে চেষ্টা করার ফলে এক সাথে পা ফেলে চলাটা কোন রকমে আয়ত্ব হয়েছে। এবং বন্দুকও ছুঁড়তে পারে ভালোই। অভ্যাসের জন্য নিজের টাকা দিয়ে আই-ওয়ান্ গুলি কিনে এনেছে। পাকা গোলন্দাজ হয়ে উঠছে, গর্বে বুক ফুলে ওঠে ওদের। সামরিক পোষাক পরার জন্য শিশুর মত অস্থির হয়ে ওঠে সব। আই-ওয়ানের জামায় হাত বুলিয়ে বলেঃ 'এমনি গরম কাপড়ের উর্দি পাব তো আমরা?'

'পাবে! পাবে! বলছি তো, গরম কাপড়ের জামা পরতে পাবে, পেট ভরে ইচ্ছে মত খেতে পাবে।'

শীতের রাত। চাঁদ উঠেছে সেদিন। ওকে ঘিরে বসেছে সবাই। মোটা ওভারকোট পরা ওর। লজ্জায় ও মরে যেতে লাগল। কেন পরে এল কোটটা! কোথায় এদের সাথে বসে এদেরই মত শীতে জর্জর হবে, না ও এল প্রচুর আচ্ছাদনে দেহ ঢেকে, উষ্ণতায়, আরামে; সুখাদ্যে পেট ভরে—অমন খাদ্য হয় তো চোখেই দেখেনি ওরা। অথচ ওই ওর প্রতিদিনের সাধারণ আহার। উষ্ণ অশ্রুতে ওর চোখ ভরে আসে। ওর কথা শুনে মাঝে মাঝে লোকগুলির চোখে একটুখানি আশার ঝিলিক দেখা যায়। ওর বুক ভেঙ্গে যায় দেখে। হিমেল হাওয়ায় ওদের দেহে জড়ান ন্যাকড়াগুলো ফর্ ফর্ করে ওড়ে; দেখে ওর নিজের হাড় অবধি যেন কন্ কন্ করে ওঠে। ভাবে —বাড়ীখানা যদি বাবার না হয়ে আমার হত—আমি তার সমস্ত দুয়ার খুলে দিতুম এদের জন্য। তারপর ভাবে তাতেই বা কি হত! কোথায় জায়গা হত সবার! লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগাদের দাঁড়াবারও তো জায়গা হত না! যত ধনী আছে সকলের বাড়ীর দুয়ার উন্মুক্ত করে দিলেও না। দুনিয়া-জোড়া ওই সর্বহারার দল!

একজন শুধায়ঃ 'কবে হবে গো!' চেনে আই-ওয়ান্ লোকটাকে। অল্প বয়েস, কাশির রোগ, বাঁচবে না আর বেশীদিন। যত তাড়াতাড়িই হোক, ও দেখে যেতে পারবে না।

'এই শিপ্পিরই', আই-ওয়ান্ বলে, 'হয় তো এই বসন্তেই।'

তবু বাঁচবে না ওই দুর্ভাগা, বাঁচবে না ওর মত আর যারা আছে। বাঁচবে যেদিন একেবারে নূতন করে তৈরী হবে সমাজ—ধনীর সমাজ নয়, দরিদ্রের সমাজ,—যেখানে আইন দরিদ্রের, গৃহ দরিদ্রের, যত পরিকল্পনা, সৃষ্টি হবে ওদেরই ঘিরে—যাতে আর ধনী থাকবে না, প্রবল থাকবে না আর থাকবে না দরিদ্রের ওপর তাদের শোষণ।'

আই-ওয়ান্ বলেঃ 'আর বেশী বাইরে থেকো না, বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড় সব।'

একটা ছায়া যেন কথা কয়ে ওঠেঃ 'তুমি যখন কথা বল, আমাদের আর শীত, ক্ষিদে কিচ্ছু থাকে না গো!'

আর সহ্য করতে পারে না আই-ওয়ান্, ওর বুক ভেঙ্গে যায়। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে উঠে পড়ে।

রাত গভীর হয়েছে—তবু পা সরে না ওর; এই নগ্ন দারিদ্র্যের মধ্য থেকে স্বগৃহের অতি-প্রাচুর্য আর অপচয়ের মধ্যে তখনি গিয়ে উঠতে পারল না। জন-বিরল রাস্তা ধরে তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে ও স্কুলের দিকে চলল। এন্-লানের সাথে গিয়ে কথা বলবে খানিক ক্ষণ।

একাই ছিল এন্-লান্ তার কুঠুরীতে। স্কুলের পড়া পড়ছিল না। ঘন ঘন লেখা কি কতগুলি কাগজ পড়ছিল যেন। আই-ওয়ান্ ঘরে ঢুকতে বই এর নীচে কাগজ গুলো চাপা দিল।

'এস হে, মুখখানা অমন কেন?'

এন-লানকে কেউ কখনও বিমর্ষ দেখেনি। ওর কৃষ্ণ চোখের তারায় হাসি আর খুশি ঝলমল্ করে সর্বদা। বিশেষ করে আজ কাল এতটুকু কিছু পেলেই হল। যেন ভেতরে কোন্ খুশির বান ডেকেছে ওর, দুকুল ভেঙ্গে উপচে পড়চে তাই।

একটু থেমে আই-ওয়ান্ বলেঃ 'আমি এলাম—,' দল সংক্রান্ত কোন কথা এখন আর ওরা জোরে কয় না। ছোট লোহার খাটটার ধারে ঘেঁষে বসে একটা চিরকুটে লিখলঃ 'কতদিন লাগবে আর বলতে পার?'

'আগামী বছরের আগে নয়।' লিখে জবাব দেয় এন্-লান্, তারপর চিরকুটটা পুড়িয়ে ফুঁ দিয়ে ছাই উড়িয়ে ফেলে।

আই-ওয়ান্ বলেঃ 'বেশ জ্যোৎস্না আছে আজ। চল না একটু ঘুরে আসি।' এন্-লানের কি পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর দৃঢ়তা। একটুও যদি ও পেত তার। কোন কিছুতেই চঞ্চল হয় না ও মানুষ। স্থির হয়ে থাকে কি এক বিশ্বাসে। সম্মতি সূচক মাথা নেড়ে উঠে পড়ে এন্-লান্। কোটটা পরে, উত্তর দেশের চাষীদের মত খরগোশের লোমের একটা টুপী পরে নেয়। তারপর বই-এ চাপা কাগজগুলো বের করে, পুড়িয়ে আগের মত ছাই ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় আই-ওয়ানের সাথে।

একটা নিস্তব্ধ সরু গলি দিয়ে খানিক গিয়ে একটা পাঁচিলের ধারে বসে হাওয়া বাঁচিয়ে, যাতে হাওয়ায় ওদের কথা উড়ে না যায় কোথাও।

সোজাসুজি আরম্ভ করে আই-ওয়ান্ঃ 'কি করে বোঝাই বলতো লোকগুলোকে যে সত্যি তুচ্ছ নয় ওরা! আমি চিরজীবন যাদের মধ্যে থেকেছি

তারা ঠিক এর উল্টো। তারা জেনে রেখেছে দুনিয়ার সব কিছুর ওপর অধিকার তাদের জন্মস্বত্বে।' একটু থামে আই-ওয়ান্, আই-কোর কথা মনে হয়। কানা কড়ির যোগ্যতা নেই আই-কোর। যোগ্যতার মধ্যে খাওয়া আর বিলাসিতা। অথচ সব চেয়ে ভালো সব তার চাই। বলে চলে আই-ওয়ান্, 'আর এই বেচারিরা জানে এই হীন অবস্থা ওদের অদৃষ্টের লেখন। কি করে বিশ্বাস করাই বলতো যে ওদেরও বাঁচবার অধিকার আছে। এত চেষ্টা করছি একটু ঘৃণা করুক ওরা বড়লোকদের, কিন্তু কিছুতেই পারছি না। বলে কি জান? কপাল, বাবু কপাল। কপালেই কেউ বড়লোক কেউ গরীব। কপাল কে খন্ডাবে বলুন!'

এই বুঝি হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে এন্-লান্। কিন্তু হাসলো না। চাঁদের আলোয় দেখা যায় ওর মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। স্বর গম্ভীর,

'একেবারে গোড়া ধরে টান দিয়েছ। আমাদের আসল সমস্যা বড়লোকদের নিয়ে নয়। তাদের মেরে ফেলে, ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নাও বাস্ খতম। কিন্তু মুস্কিল হলো, যারা জন্ম-হাভাতে তারা আশা করবে কোথেকে! আশা করবার মত একটু বনেদ তো চাই। খাবার বল, দুটো পয়সা বল, যাই হোক একটু কিছু হাতের মুঠোয় পাবে নিজের বলে, তবে তো বিশ্বাস হবে!' একটু থেমে আবার বলে এন্-লান্ঃ 'তুমি আদর্শবাদী, আই-ওয়ান্। তোমার দুর্বলতা ওখানেই। জেনে রেখো বড়লোকের চাইতে গরীবেরা কোন অংশেই ভালো নয়।'

তাকায় আই-ওয়ান্ ওর দিকে। কি বলে এন্-লান্?

'তাহলে ওদের জন্য খেটে মরছ কেন?' জিজ্ঞাসা করে।

'খাটছি এই আশায় যে কোনদিন যা পায়নি বেচারিরা একদিন তা পাবে।' এন্-লান্ বলে চাপা স্বরে।

এবারে হেসে ওঠে ও।

'তুমি কি ভাবো, তোমার বাবার বাড়ীটা যদি ওদের কারো হাতে ছেড়ে দাও, এতটুকু ভাগও ভাই-বেরাদার কাউকে দেবে? না, দেবে না।' উস্কু খুস্কু চুলগুলি ঝাঁকানি দিয়ে সরিয়ে দেয় এন্-লান্। আবার বলে, 'তোমার বাবার চাইতেও অধম ওরা, দেখবে। কারণ তোমার বাবাকে জানোয়ারের জীবন যাপন করতে হয়নি কোনদিন। আই-ওয়ান্, প্রস্তুত থেকো।'

'কিসের জন্য?'

'যেদিন সর্বহারারা সব কিছু হাতে পাবে সে দিনের জন্য।'

'কেন?'

'সেদিন ওরা বুনো জন্তুরও অধম হয়ে উঠবে।' এন্-লান্ বলে, 'ধরো এসে বললাম, আজ থেকে শহর তোমাদের। সেদিন ওরা যে শুধু বড়লোকদেরই মারবে তা নয়, নিজেরাও মরবে খুনোখুনী করে। যাও বা পাবে তাও কাড়াকাড়ি করে সব নষ্ট করে ফেলবে। চুপ চাপ করে থেকো তখন। ফিরেও চেয়ো না ওদের দিকে—কদিনের মধ্যেই দেখবে সব ঠান্ডা'।

'তারপর?'

'খেওখেয়ি শেষ হলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকবে শূন্য হাতে।

তারপর আমাদের পালা। তখন গিয়ে শক্ত হাতে রাস্ টানবো। নিয়ম শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য করব।'

'বাধ্য?' আই-ওয়ান্ জিজ্ঞাসা করে, 'আমি তো ভেবেছিলাম, সবাই স্বাধীন হবে তখন।'

'স্বাধীন?' পরুষ কণ্ঠে জবাব দেয় এন্-লান্, 'ওটা স্বাধীনতা নয়। উচ্ছৃঙ্খলতা। স্বাধীন কেউ নয়। তুমিও না, আমিও নই। একটা পদ্ধতির মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়। ওদেরও তাই হবে। শুধু একজন আছে—'

'কে?' আই-ওয়ান্ জিজ্ঞাসা করে। এতদূর ওদের কথা-বার্তা এগোয়নি কখনও।

'সে', এন্-লান্ জবাব দেয়, 'এক মহামানব।'

'কে?' আবার আই-ওয়ান্ শুধায়।

আই-ওয়ানের দিকে একটু ঝুঁকে বসে এন্-লান্। ওর উষ্ণ নিশ্বাস এসে লাগে আই-ওয়ানের গালে।

'চ্যাং-কাই-শেক্।' বলে এন্-লান্।

বিপ্লবী সেনাবাহিনীর নেতার নাম।

'যেদিন এই শহরে আসবেন তিনি', দ্রুত নিশ্বাস পড়ে এন্-লানের, 'সেই দিনই হবে দিন। সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী। দিন কুড়ির মধ্যে সাধারণ ধর্মঘট ঘোষিত হবে। এ কয়দিনের মধ্যে শ্রমিকরা সভা সমিতি করে সব সংগঠন ঠিক করে নিতে পারবে। ওরা আঘাত হানবে ভেতর থেকে আর চ্যাং-কাই-শেক বাইরে থেকে। ওই যে কাগজটা তখন পুড়িয়ে ফেললাম, তারই মধ্যে লেখা ছিল সব—গোপন হুকুমনামা। অমাদেব এতদিনেব সব পরিশ্রমের অবসান হবে এবার—নূতন দেশ হবে আমাদের দেশ!'

বাইরেব হিম ও ভেতরের উত্তেজনায় কাঁপছে ওরা। চাঁদ দিগন্তে ঢলে পড়েছে। পাঁচিলের ছায়া পড়েছে গলিতে। সেই ছায়া-ঘন আঁধারে বসে আছে ওরা দুজন। কিন্তু অন্ধকারের দিকে ওদের লক্ষ্য নাই—আগামী দিনের আলোয় ভরে আছে ওদের দুই চোখ। যে দিন এত দিনের যত অন্যায় ভস্ম হয়ে যাবে। আই-ওয়ান্ দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে—সাচ্চা মানুষের বিজয়ী সৈনিক দল—ওই ওরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চ্যাং-কাই-শেকের একটা ছবি দেখেছিল আই-ওয়ান্। বিপ্লবীদের উর্দি পরা। দেখতে যেন অনেকটা এন্-লানের মত লেগেছিল। এন্-লানের মতই উদার প্রদীপ্ত দুই চোখ, সেই রকমই বলিষ্ঠ কৃষকের চেহারা। আজ ওর আদর্শ-পাগল মন ওই মানুষটিকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায়। বলিষ্ঠ, বীর্য-বান্ ওই তরুণ মানুষটি সারা যুব-শক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে. নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ওর। হাসি না অশ্রুতে বুঝতে পারে না ভালো করে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

'যা বললে, ভালোই করেছ বলে। আরও বেশী করে খাটব। ঠিক প্রস্তুত থাকব, দেখো।' আই-ওয়ান্ বলে।

উত্তর দেয় না এন্-লান্। হাত ধরাধরি করে নিঃশব্দে ফেরার পথ ধরে দুজনে।

'কি নরম তোমার হাত খানা! কখনও মেহনতের কাজ করনি, না?' এন্-লান্ জিজ্ঞাসা করে। বিচিত্র কণ্ঠস্বর!

লজ্জা পায় আই-ওয়ান্। এন-লানের কঠিন হাতখানার মধ্য থেকে নিজের হাত টেনে নিয়ে বলেঃ 'না, কিন্তু শক্তি রাখি যথেষ্ট।'

স্কুলের গেট থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফেরে আই-ওয়ান্। কি ভারী বুক নিয়ে এন্-লানের কাছে গিয়েছিল ও—এখন সম্পূর্ণ হাল্কা হয়ে গেছে। আশ্চর্য ক্ষমতা এন্-লানের। নিজেকে বর্তমানের মধ্যে হারিয়ে ফেলে আই-ওয়ান্। কিন্তু এন্-লান্ অন্য ধাঁচের। এন্-লানের কাছে মুহূর্ত শুধু মুহূর্তই—সত্য শুধু ভবিষ্যৎ। বর্তমানের দুয়ার খুলে ও দেখিয়ে দেয় ভাবীকালের পথ। সেই পথকেই রচনা করছে ওরা সবাই হাত মিলিয়ে। শীতে কুঁকড়ে-যাওয়া ওই মানুষগুলোর জন্য ওর শুধু মায়া হয় এখন, ব্যথা লাগে না।

আহা বেচারীরা, যাই হোক, পাবে তো স্বাধীনতা!—হলই বা শুধু মুহূর্তের! আর কিছু না হোক অন্ততঃ দু'হাত ভরে লুটতে পারবে যা মন চায় তাই।

বাগান পেরিয়ে ওপরে যায়। ভাবতে চেষ্টা করে গরীবেরা এসে ভরে ফেলেছে বাড়ী, পর্দা ছিঁড়ে গালিচা ছিঁড়ে, চারদিক ভেঙে চুরে তচ্‌নচ্ করে ফেলেছে। কেমন লাগবে? রাগ হবে কি আই-ওয়ানের?

না, কখনও হবে না। দৃপ্ত স্বরে নিজের মনকে শোনায় ও, কেন হবে? কোনদিন তো এসব জিনিসে আকর্ষণ ছিল না!

কার যেন কান্নার শব্দ। কান পাতে ও। আই-কোর। ছোট শিশুর মত কাঁদছে। অবাক হয়ে যায় ও। সেই মুহূর্তে নিঃশব্দে পিওনী এসে নীচু স্বরে বলেঃ 'কখন থেকে বসে আছি তোমার জন্য। কি যেন করেছে আই-কো, খুব খারাপ কাজ। এক্ষুণি ঠাকুরদার ঘরে যাও। ডেকেছেন।'

ঘর তো নয় যেন খাঁচা। চারদিক বন্ধ, ভ্যাপ্‌সা গরম। ঠাকুরমা ছাড়া সবাই আছেন। মা নিঃশব্দে কাঁদছেন—মুখখানা ফোলা, গাল দুটো থির থির করে কাঁপছে। ঠাকুরদা তাঁর মস্ত বড় চেয়ারটায় সোজা হয়ে বসে আছেন। হাতে সিগারেট। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আই-কো হাতে ভর দিয়ে। কি যেন জোরে জোরে বলছিলেন বাবা। ও আসতেই থেমে গেলেন সবাই তাকাল ওর দিকে—আই-কো নড়ল না। আই-ওয়ানকে দেখেই বাবা আবার আরম্ভ করেনঃ

'এই যে—অবশেষে তুমিও? মাঝরাত্তির উৎরে গেছে বহুক্ষণ। জানিনে কেন বড় ছেলের চাইতে ছোট ছেলের ওপর আমার বেশী আশা ছিল। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

আই-ওয়ান্ উত্তর দেয়ঃ 'ক্লাশের একজন ছেলের কাছে।' আই-কো রুমাল নিয়ে ঘন ঘন চোখের জল মুছছে আর নাক ঝাড়ছে। সমস্ত জিনিসটা ভারী কুৎসিত মনে হয় ওর। দাদার জন্য মায়া হয়—অত বড় ছেলে অত দুর্বল! ছেলে মানুষের মত ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদছে! অপদার্থ করে ফেলেছে

মানুষটাকে। সম্পূর্ণ আই-কোর দোষ নয়। ওকে একটু সামলে নেওয়ার অবকাশ দেবার জন্য বাবাকে বলে আই-ওয়ান্ঃ

'এমন সুন্দর জ্যোৎস্না, দুজনে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।'

'বাস্! আর কিছু না?' চীৎকার করেন বাবা। 'কি বোঝাতে চাও আমায়?'

'খানিক ক্ষণ গল্প সল্প করেই তো ফিরে এলুম, সেও তার জায়গায় গেল।' শান্ত ভাবে জবাব দেয় আই-ওয়ান্।

মা তাঁর অভ্যস্ত ধরণে হঠাৎ বলেনঃ 'ও কি মিথ্যে বলছে? ও অমন ছেলে নয়।'

'হ্যাঁ, সোনার টুক্রো ছেলে সব।' মুখ ভেঁচিয়ে ওঠেন শ্রী উ স্ত্রীর স্বর নকল করে। 'দুমাস আগেই বুঝতে পারছিলাম ব্যাংকে হাত পড়ছে। তুমি বললে, তোমার আই-কো, বড় ভাল ছেলে, মাছ ভাজাখানা উল্টে খেতে জানে না! এখন দেখ! সোনার ছেলে কেমন চুন কালি দিলে মুখে।'

শ্রীমতী কাঁদতে আরম্ভ করেন, আই-কো লজ্জায় মাথা নীচু করে।

ঠাকুবদা আদেশ করেনঃ 'বসো, আই-কো।'

চোখ না তুলে টেবিলের ধারে বসে আই-কো।

'কি করেছ জান?' ঠকুরদা বলেন, 'বোধহয় সে ধাবণা নাই তোমার।'

অস্পষ্ট স্বরে ধরা গলায় বলে আই-কোঃ 'এমন আর কি হয়েছে!'

'খবরদার—' ধমকে ওঠেন বাবা।

বৃদ্ধ কঠিন সুরে বলেন ছেলেকেঃ 'তুমি চুপ কর, যা বলার আমি বলছি। আই-কো, বহু টাকা ভেঙেছ তুমি; ওটাকা পবের টাকা জানো!'

একটু চুপ করে থেকে তেমনি কাঁদ কাঁদ সুরে বলে আই-কোঃ 'বারে, আমার বাবারই তো ব্যাংক। বাবাই তো সভাপতি।'

আই-ওয়ান্ লক্ষ্য করে নিঃশব্দে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন বাবা।

'কিন্তু টাকা কাদের জান?' ঠাকুরদা আবার বলে, 'অন্যের টাকা। এক আধ জনের নয়, বহুলোকের টাকা। সরকারী টাকাও আছে। তোমার বাবাকে বিশ্বাস করে সবাই। তার ছেলেকেও তারা বিশ্বাস করেছিল।'

ঠাকুরদার কঠোর কণ্ঠ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই ঘরে।

সে কি? দাদার এই কাজ? ভবে আই-ওয়ান্।

আবার ফেটে পড়েন বৃদ্ধঃ 'কেন করেছ বল, তোমার তো টাকার অভাব নেই!'

আই-কোর চোখে আগুন জ্বলে ওঠে ঠাকুরদার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু জবাব দেয় না কিছু।

এবার বাবা চীৎকার করে ওঠেনঃ 'শিগ্গির বল, কেন করেছিস। সবাই জানতে চায়—, আই-ওয়ান্ও চায়—চেয়ে পাসনি এমন কখনও হয়েছে? যখন যা দরকার চাওয়া মাত্রই তো পেয়েছিস্।'

'তোমাকে বলতে চাইনি।' জোর করে উত্তরটা বের হয় আই-কোর মুখ থেকে।

থম্ থম্ করে ঘর। সবার দৃষ্টি ওর দিকে। ও একবাব এর দিকে, আর একবার ওর দিকে চায়।

বলতে আরম্ভ করে আই-কোঃ '—আ—আমি......' থামে, আবার বলে, 'অমন করে সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে কেন?......সব......তো একবারে—নিইনি—। একটা কিছু ব্যাপারের জন্যও নিইনি। ৎসেলি একদিন বললে —কি— একটা করবে—বেশী কিছু না—কি জানি—সামান্য। ওর হাতে টাকা ছিল না। আমায় বললে, আই-কো, তোমার পকেটে তো সর্বদা টাকা ঝন্-ঝন্ করে। সবাই বলতে লাগল। সত্যি নেই বলতে আমার ভারী লজ্জা করল—' কেঁদে ফেলে প্রায় এবার। পালিশ-করা চুলগুলি মুখের ওপর এসে পড়ছে। বাবার দিকে ফিরে আবার বলতে আরম্ভ করেঃ 'তুমি বলছ —কেন—তোমার কাছে চাইনি! কি করে চাইব! তুমি—যে—বকবে! সর্বক্ষণ তো বক। বরাবর কেবলি বক তুমি। চাইলেই তো চ্যাঁচাতে— ফের! ফের! তাই চাইনি। নিজেই নিয়েছি।'

মা উঁচু গলায় বলেন বাবাকেঃ 'মিথ্যে নয়। চব্বিশ ঘণ্টা তো বেচারাকে গাল মন্দের ওপরেই আছ।'

'হুঁ, নইলে তো গোল্লায় যেত। এ বাড়ীতে মানুষ থাকে! যত মেয়েমানুষের কাণ্ড—তোমরাই তো ওকে ফাঁকি দিতে, মিথ্যে কথা কইতে, আমার সামনে ভিজে বেড়ালটি সেজে থাকতে শিখিয়েছ! মাথাটি ওর চিবিয়ে তোমরাই খেয়েছ। তোমাদের জন্য দেশটা শুদ্ধ গোল্লায় যাচ্ছে। আমি জানিনে ভেবেছ! আমিও বড়লোক বাপের ছেলে—মেয়ে মানুষ আর দাসীতে গিস্ গিস্ করত বাড়ী, তার মধ্যে থেকেছি আমিও, বুঝলে!'

আই-ওয়ান একেবারে নির্বাক। ওর জীবনের রসের উৎস এখানে নয়, অন্যত্র। এ গৃহ পরিবেশ ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার সাথে ধূলিসাৎ হবে না ও। বাবার কথায় অবাক হয়ে ভাবে ও—কেনই বা নষ্ট হলেন না বাবা, কেনই বা চরিত্র হারাল আই-কো! ও নিজে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে কতগুলো বই-এর দৌলতে; তারপর দেখা হল এন্-ক্লান্-এর সাথে, গুপ্ত দল, আর মিল শ্রমিকদের সাথে। এদেরই জন্য ও বেঁচে গেছে। আসল কথা বিপ্লবই বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে। বাবাও হয়তো এমনি কোন শক্তির টানে বেঁচে গেছেন।

বাবা বলেন—বেদনার্ত স্বরে, 'কি করি তোকে নিয়ে, বলতো আই-কো? এমন অপদার্থ ছেলে দিয়ে হবে কি?'

ঠাকুরদা বলেনঃ 'যাই হোক, তোমার ছেলে তো, আমারও নাতি। টাকাটা পুরিয়ে দিতে হবে। তারপর ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—বিদেশের কোনও স্কুলে থেকে লেখাপড়া শিখবে। এখানকার এই সব কুসংগের হাত থেকেও বাঁচবে।'

আই-কো কথা বলে না, বাবা কি বলেন সেই প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকে।

মা তাঁর সহজ কোমল ভঙ্গিতে বলেনঃ 'সেই ভালো। সেখানে কেউ ওকে চিনবেও না। কত ছেলেই তো পড়াশোনা করতে যাচ্ছে আজকাল বিদেশে।'

'কেবল চাপা দেওয়া! আর চাপা দেওয়া!' তিক্ততায় বিষিয়ে ওঠে শ্রীউর স্বর, 'চেপে-চুপে রাখ, যাতে কেউ জানতে না পারে! চিরকাল ওই করে এলে! এমনি করলে ভালো মন্দের তফাৎ কোনও কালে শিখবে ও?'

আই-কো ফিস্‌ফিসিয়ে বলেঃ 'আর কোনদিন এমন কাজ করবনা! যথেষ্ট

শিক্ষা হয়েছে আমার! কোনদিন তোমাদের কথার অবাধ্য হব না!'

'যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে,' আদেশ দেন শ্রী উ আই-কোকে, অনুচ্চ হিম শীতল কণ্ঠ, 'জিনিষপত্র গুছিয়ে নাওগে। জার্মানীতে মিলিটারী স্কুলে ভর্তি করে দিচ্ছি তোমায়। দেখা যাক তারা কিছু করতে পারে কিনা। টাকা হাতে পাবে না, খরচ করে ফেলবে, টিকিট নিজে হাতে কিনে দেব আমি।'

বৃদ্ধ সায় দেনঃ 'সেই ভালো। যদি শেখে জার্মানীতেই শিখবে কিছু।

একটি কথাও না বলে বেরিয়ে যায় আই-কো। এখান থেকে শোনা যায়, হল পেরিয়ে গেল ও—তারপর ওর ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে আবার খুলে গেল।

এ ঘরে সব নিস্তব্ধ। দেশলাই জ্বালিয়ে ঠাকুরদা চুরট ধরিয়ে টানতে থাকেন। খানিকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলেনঃ

'শোব এবার।'

ছেলে বলেঃ 'চলুন আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।'

'না, একাই যেতে পারব।'

বৃদ্ধ চলে যান। শ্রীযুক্ত উ বলেন স্ত্রীকেঃ 'যাবে নাকি?'

'যাবে নাকি' মানেই, 'যেতে হবে,' জানেন শ্রীমতী। চোখ মুছতে মুছতে উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আই-ওয়ান্ আর তার বাবা। বাবা বলেনঃ 'বসো।'

বসে ও। চোখের দিকে তাকিয়ে বাবা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসেনঃ 'তোমার দাদার জায়গায় বসবে?'

প্যাগোডার আকারে একটা কাগজ-চাপা নিয়ে অস্থিরভাবে লোফালুফি করছেন বাবা। মসৃণ অথচ দৃঢ় হাত দুখানি। হাতের মাংস পিওনীর গালের মত নরম, কিন্তু বলিষ্ঠ হাত!

আজ যেন বাবাকে বড় কাছে মনে হয়। এত কাছে তো কোনদিন মনে হয়নি বাবাকে! আই-কোকে নিয়ে আশা-ভঙ্গের যে-বেদনা ওই বুকে বেজেছে অন্তর দিয়ে তার গভীরতা অনুভব করে আই-ওয়ান। বাবার আজ সান্ত্বনার বড় প্রয়োজন। যদি সব বলতে পারতো বাবাকে! ভয় করে। চিরকাল সেই এক মানুষ। যা পছন্দ করবেন না, শত ভাল হলেও তা বুঝবেন না, বুঝতে চেষ্টাও করবেন না। অতএব থাক। কিন্তু বাবার কথা সরাসরি ফেলতেও পারে না। তাই বলেঃ

'এ বছরের পড়াটা শেষ হোক না বাবা! তারপর।'

মনে মনে ভাবে, ততদিনে দুনিয়া বদলে যাবে।

'বেশ তাই হবে! তুমিও চলে যাও তাহলে। আজকাল ছেলে যে কেন চায় লোকে জানি না! সেকালে ছেলে ছিল মানুষের বুড়ো বয়সের অবলম্বন, তাই ছেলে চাইতো। কিন্তু আজকালের ছেলেদের কাছে কিছুর প্রত্যাশা নাই!'

আই-ওয়ানের দিকে না তাকিয়েই উঠে চলে যান তিনি। আই-ওয়ানও নিজের ঘরে চলে যায়। এতদিন বাবাকে মনে হতো বড় অহংকারী; অথচ বড় পরিতৃপ্ত মানুষ, কিন্তু যা চাইবেন তা হাতের মুঠোয় পেয়ে তবে ছাড়বেন। অথচ আজ দেখ—কোথায় গর্ব আর কোথায় তৃপ্তি? যা চান তাই বা কোথায়

পান? কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায় আই-ওয়ানের। যথেষ্ট থাকলেও তৃপ্তি হয় না মানুষের! মিলের ওই লোকগুলি কি চায়? শুধু দুমুঠো অন্ন আর মাথার ওপর একটু আশ্রয়—একটু নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়। ঐটুকু পেলেই ওরা কত সুখী। কিন্তু বহু লোকের তো এ সবই আছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে—তবু তারা সুখী নয়। বিপ্লব এদের জন্য কোন আশীর্বাদ আনবে? ভাবতে ভাবতে ঘরে এসে ঢোকে। পিওনী ওরই প্রতীক্ষায় বসে আছে টেবিলের কাছে। ওর দীঘল ছাঁদের সুন্দর মুখখানা বড় গম্ভীর।

কানে কানে শুধায়ঃ 'কি হয়েছে বল না? আই-কো কাউকে খুন করেছে?'

'না, তা নয়।' বলে আই-ওয়ান।

'তা হলে? আমি জানি খুব খারাপ কাজ। কি কাঁদছিলেন ঠাকুরমা। বলছিলেন তোমার বাবা নাকি মারতে মারতে আজ ওকে মেরেই ফেলবেন।'

শ্লেষের স্বরে বলে আই-ওয়ান্ ' কক্খনও না। তবে ওকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

উল্লসিত হয়ে ওঠে পিওনীঃ 'বাইরে? শিগ্গিরই?'

মাথা নাড়ে আই-ওয়ান।

'তা হলে নিশ্চয় খুন করেছে কাউকে, বলছি আমি।' উত্তেজিত স্বরে বলে পিওনী।

'না, না, বলছি তো না,' বলে আই-ওয়ান্, 'টাকা ভেঙেছেন।'

'ব্যাংক থেকে?' চীৎকার করে ওঠে পিওনী।

'হ্যাঁ। কিন্তু ও বেচারার ওপর অত রাগ কেন তোর, বলতো!' আই-ওয়ান শুধায়।

'বলতে পারব না তোমায়, বলতে চাইও না', পিওনী বলে। 'বুঝতে পারবে না তুমি, কি সাংঘাতিক। একে তো দাসী, তারপর আই-কো হেন সোমত্ত ছেলে—ইস্কুল যাবে না, কোথাও যাবে না, কেবল বাড়ীর মধ্যে ঘুরঘুর করবে—সেই বাড়ীতে আমাদের মত মানুষের থাকা যে কি ব্যাপার, কি বোঝাব তোমায় আমি!'

মুখ ঘুরিয়ে নেয় পিওনী।

'কিন্তু তোকে তো দাসী বলে কেউ ভাবে না রে!' আই-ওয়ান বলে।

'তুমি জানো না।' আবেগভরে বলে পিওনী, 'আমার সম্বন্ধে কিচ্ছু জান না তুমি।'

দুই হাতে মুখ গুঁজে প্রবল বেগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে পিওনী। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় আই-ওয়ান। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে শুধু দেখে। শান্ত করতে চেষ্টা করে ওকেঃ

'কাঁদিস্‌নি, পিওনী, লক্ষ্মী সোনা, কাঁদিস্‌নি।'

কিন্তু ওর কান্না থামে না। 'দাসী না তো কি', কাঁদতে কাঁদতে বলেঃ 'সারাক্ষণ একটা বুড়ীর হুকুম-বরদারী করো। মাঝ রাত্তিরে উঠে পোড়া কাঠের মত ঠ্যাং টেপো, চণ্ডু সেজে দাও! কি বিচ্ছিরি গন্ধ, মাগো!'

'তোরও ভালো লাগে না ও গন্ধ?' আই-ওয়ান শুধায়।

'মোটেই না,' কেঁদেই চলে পিওনী, 'গা গোলায়, আমি ছুটে পালিয়ে আসি।

কিন্তু পালাবার পথ কি আর আছে? আবার যাও, আর চণ্ডু ঘোঁট যতই তোমার গা গোলাক।—তার ওপরে তোমার মা—'

'কেন?' এ গৃহের জীবন-যাত্রার এক অজ্ঞাত অধ্যায় আজ অনাবৃত হয়ে যায় আই-ওয়ানের চোখের সামনে।

কান্না থেমে যায় পিওনীর। বলেঃ 'কেন আর কি? আই-কো! ওর চাপা স্বর ক্রোধে ফেটে পড়েঃ 'কি বলেন জান? বলেন, তুই দাসী, তোর অত কি? আই-কো যা বলে শুনতে হবে তোর!'

'মা? মা বলেছে?' ফ্যাল্ ফ্যাল করে তাকায় আই-ওয়ান্ পিওনীর দিকে। ওর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন শিথিল, ভারী হয়ে আসে।

সম্মতি-সূচক মাথা নাড়ে পিওনী।

'কিন্তু তুই, তুইতো রাজী হোসনি?' দাবীর সুরে বলে আই-ওয়ান।

'না', মাথা নেড়ে জানায় পিওনী।

'কতদিন ভেবেছি, আফিং খেয়ে মরি,' বলে চলে ও, 'বেঁচে কি হবে, বলতে পার, আই-ওয়ান? তোমাদের ঝি চাকরদের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে সুখী হতে পারছিনে যে! তার চেয়ে আর একটু বেশী কিছুর শিক্ষা পেয়েছি—অথচ আবার এত বেশী নয় যে এর থেকে মুক্ত হতে পারি। তোমার সাথে সাথে আমায় লেখা পড়া শিখিয়েছেন; তোমার মার কাছে আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু কৃতজ্ঞতা শুকিয়ে গেছে আমার। নরকের পোকা হয়েই যদি কাটাতে হবে তবে কেন আমায় লেখা পড়া শেখালেন। কেন বোকা মুখ্যু করে রেখে দিলেন না। তাহলে তো ভাবতেও শিখতুম না—চাকর বাকর কাউকে নিয়ে যা হোক করে দিব্যি চলে যেত। মানুষকে ভালো জিনিষের স্বাদ দেবে অথচ জিনিষগুলো দেবে না, এর চাইতে নির্মমতা আর নাই।'

কি বলবে? কথা খুঁজে পায় না আই-ওয়ান্। বহুদিন পিওনী এখানে আছে। কিছু তো জানতে পারেনি ও! ওতো ভেবেছিল, সকলের আদরে যত্নে বেশ সুখেই আছে পিওনী। কাজকর্ম যেটুকু করে সে দানের মর্যাদা হিসেবে। কিন্তু আজ এ যে এক বড় উদ্ঘাটন। বুঝতে পারে পিওনীর অন্তর। পিওনী ভালো খায়, সিল্ক সার্টিন পরে, কিন্তু তবু এ গৃহ ওর বন্দীশালা। মানুষের স্বাধীনতা কোথায় ওর! ওরও মুক্তির চাবীকাঠি বিপ্লবে।

এক মুহূর্তে মনঃস্থির করে নেয়, সব বলবে পিওনীকে।

'পিওনী—' আরম্ভ করে। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়।

পিওনী তাকায় ওর দিকে।

'কিছু বলতে চাই তোকে।' বলে আই-ওয়ান।

'বলো!, কি বলবে!'

'পিওনী, বিপ্লবের কথা শুনেছিস কখনও?'

'শুনেছি বৈকি! ও ভাল কাজ নয়, বাপু। তোমার বাবা তো হামেশাই চটামটি করেন। বিপ্লবীরা নাকি ডাকাত।'

'কক্খনও না।' উত্তেজিত হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্।

'তুমি কি করে জানলে?' জিজ্ঞাসা করে পিওনী।

আর এদিক ওদিক নয়। সোজা বলে দেবে এবার আই-ওয়ান।

'আমিও যে একজন বিপ্লবী রে।'

নিশ্চল পাথরের মত শুধু পরস্পরের দিকে তাকায় ওরা।

'আই-ওয়ান্!' চাপা স্বরে ডাকে পিওনী।

মাথা হেলায় আই-ওয়ান।

'তোমার বাবা যদি জানতে পারেন, কি ভাববেন জানো? 'আই-কোর. চাইতেও গোল্লায় গেছ তুমি।'

চম্‌কে ওঠে ও। 'ঠিক বলেছিস।'

'খবরদার, ওঁকে যেন বলতে যেওনা কখনও!' বলে পিওনী, 'কেন বললে আমায়! তোমার জীবন মরণ যে আমার হাতে তুলে দিলে। তোমাকে যে মেরে ফেলবে ওরা, আই-ওয়ান্! কেন গেলে এ পথে?'

প্রথম থেকে সব ইতিবৃত্ত বলে যায় পিওনীকে। সেই প্রথম বইয়ে পড়েছিল নূতন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছে মানুষ—সেই থেকে এন্-লানের সাথে দেখা, ওদের দলের কথা, মিলের কথা—একে একে সব বলে যায়। এমন প্রাণ খুলে, প্রাণ ঢেলে দিয়ে কারো সাথে কথা বলেনি আই-ওয়ান্, এন্-লানের সাথেও না। এ মেয়ের কাছে ওর কোন লজ্জা নেই। পিওনীকে নয়, নিজেকেই যেন বলছে ও। নিশ্চল প্রতিমার মত স্তব্ধ হয়ে বসে শোনে পিওনী। আগামী দিনের স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্ন ঘিরে অন্তরের আশা বিশ্বাস মূর্ত হয়ে ওঠে আই-ওয়ানের কথায়।

'কবে হবে?' মাঝখানে বলে ওঠে পিওনী।

'শিগ্গিরই—' চাপা স্বরে বলে আই-ওয়ান্, 'চ্যাং-কাই-শেক এলেই।'

খানিকক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে পিওনী ঃ

'বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করি না!—পিওনী! আমি বলছি, এক বিন্দু মিথ্যে নয়।' ব্যগ্র কণ্ঠে বলে আই-ওয়ান।

বিদ্রূপের স্বরে জবাব দেয় ও ঃ 'সত্যি বলে তুমি ভাবছ। তুমি আর কত জানবে, এক রত্তি তো ছেলে। অমনি মানষের জন্য বেগার খাটতে বয়ে গেছে লোকের। বিশ্বাস করি না আমি। তোমরা বিপ্লবীরা যেন আর দশজনের থেকে আলাদা!'

বোঝাবার চেষ্টা করে আই-ওয়ান্ ঃ 'জানিস্‌নে তুই ওদের। শুধু তো এ বাড়ীর মানুষদেরই দেখেছিস্, ভাবছিস্ দুনিয়া সুদ্ধুই অমনি। এরা ধনিক কিনা, তাই অমন স্বার্থপর!'

'ধনিক ফনিক কি বলছ, বাবা জানিনে', ঠোঁট ফুলিয়ে বলে পিওনী, 'পয়সা থাকলেই বরং লোকে ক্ষেমা ঘেন্না করে দু চার পয়সা ভিক্ষে সিক্ষে দেয়। এই তো জানি, বাপু। গরীবেরা দিলদরিয়া হবে, এমন কথা তো সাতজন্মে শুনিনি। ওরা তো দেখি কেবল নিজের পেট ভরতেই ব্যস্ত।

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্ ঃ 'আরে বুঝছিস না তুই—গরীব বড়লোক কিছুই থাকবে না যে রে!'

'মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, কি সব যা তা বক্‌ছ।' পিওনী বলে।

রাগে আই-ওয়ানের ইচ্ছে হয়, পিওনীর গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়।

'ঝকমারী করেছি তোকে বলে। ভাবছিলাম, দুদিন পরে গোলামী থেকে খালাস হয়ে যেতে পারবি শুনলে তোর ভালো লাগবে, তাই না বললাম! চ্যাং-কাই-শেক এলে গোলামী টোলামী কারো থাকবে না। দেখিস্।'

'ওঃ সেই লোকটা!' হেসে ওঠে পিওনী, 'সেও তো মানুষই, না আর কিছু?' হঠাৎ মুখটা ওর কালো হয়ে যায়ঃ 'আচ্ছা, মুক্তি যদি পাইই, কোথায় যাব বলতো? এ বাড়ী ছাড়া আর তো কিছু জানিনে! কোথায় কে আমায় ঠাঁই দেবে? থাক বাবা, দাসী হবার কপাল নিয়েই জন্মেছি, তাই থাকব।'

সেই নৈরাশ্য! মিলশ্রমিকদের ঘুণ-ধরা বুকের মধ্যে বাসা-বাঁধা যে নৈরাশ্য দেখেছিল আই-ওয়ান, এই সাটিন-শোভিত মেয়ের রক্ত-বরণ ঠোঁটের ফাঁকেও ঝরে পড়ছে সেই নৈরাশ্য। জেড্ আর সোনার আংটি ওর আঙুলে আঙুলে। সুকুমার, অলংকৃত হাতখানা দিয়ে টেবিলের ওপরকার জিনিষ-পত্র নিয়ে খেলা করছে ও। ভাবছে আই-ওয়ান, ও নিজে আর ওর মত যারা আছে, তাদের ছাড়া সবাই কি অমনি আশাহীন? পিওনীর হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন একটা বিষাদে ওর চিত্ত বিধুর হয়ে ওঠে। দরিদ্রের অন্ন আর বস্ত্রের সংস্থান—ওই কি বিপ্লবের শেষ কথা? বিপ্লব কি শুধু ঐটুকু? না না তা নয়, শেষ কথা নয়, আরও আছে, আরও বহু আছে। ঐ তো পিওনী শুধাল মুক্তি পেলে কোথায় যাবে ও—কোথায় ওর আশ্রয় মিলবে। কি জবাব দেবে আই-ওয়ান্? জানে না তো!

একটু ইতস্তত করে প্রকাশ্যে বলেঃ 'আমার মনে হয়, যেমন করে হোক, সকলের জন্য খাবার সংস্থান করা হবেই। কারণ বিপ্লবের পরেও মানুষ অনাহারে থাকবে, তা হতেই পারে না। অবশ্য তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

উত্তর দেয়না পিওনী। কিন্তু এর পরের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না আই-ওয়ান্। হঠাৎ যেন আপন ভুলে ভারী খুশী হয়ে ওঠে পিওনী। উচ্ছলতায়, কোমলতায়, ব্যগ্রতায় ভরে বলেঃ 'এন্-লানের কথা বল না আমায়! —কেমন দেখতে? বেশ ভালো?'

প্রশ্ন শুনে বিরক্তিতে আই-ওয়ানের মন বিগড়ে যায়। এন্-লানের সম্বন্ধে ও কথা ভাবতে পারে কেউ? অপমান! মস্ত বড় অপমান এন্-লানের! মেয়েরা সত্যি পেটে কথা রাখতে পারে না। বিপ্লবের যোগ্য নয় ও। ঠিক কথাই বলেছে ও—দাসী হয়ে থাকার জন্যই ওর জন্ম। না হলে খালি মানুষের চেহারার কথাই মনে আসে!'

'জানি না', কাটা জবাব দিয়ে ঝট্ করে উঠে পড়ে ও, 'ঘুম পাচ্ছে, এখন শোব। রাত হয় তো ভোর হয়ে এল।'

মুখে হাতের উল্টো দিক আড়াল দিয়ে পেলব একটি হাই তুলে পিওনীও ওঠে। আই-ওয়ানের কোন কথার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়নি ওর—অথচ এটুকু বুঝতে বাকী নেই যে, আই-ওয়ানের জীবন মরণ আজ থেকে ওর হাতে।

আই-ওয়ানের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর মুখে হাতখানা বুলিয়ে দিয়ে বলেঃ 'তুমি যা বল কিছু ভুলি না। সব কুলুপ-আঁটা থাকে কলজের মধ্যে। একলা যখন থাকি তখন খুলে নিয়ে দেখি, ভাবি। এইটুকুই আমার সব। আই-

ওয়ান্‌—ধরা পড়ো না যেন লক্ষ্মীটি!' দুই হাত শক্ত হয়ে যুক্ত হয়ে ওঠে পিওনীর।

'না রে না। ভয় করিসনে! তা ছাড়া কদিনেরই বা ব্যাপার!'

'ছাই বিপ্লব!' ফুঁপিয়ে ওঠে পিওনী। ওসব বিশ্বাস টিশ্বাস করিনে আমি। বড় ভয় করছে। কেন বলতে গেলে আমায়? না—না—ভালোই করেছ বলে। একটা জিনিষ যেন বুঝতে পারছি।'

'কি বুঝতে পারছিস?' শুধায় আই-ওয়ান্‌।

মুখের ভাব বদলে গেছে। স্থির হয়ে আছে পিওনী।

'তোমায় বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি কেন তোমার হৃদয় স্পর্শ করা যায় না। মন্দিরের তরুণ পুরুতদের মত তুমি। আমায় যখন বলছিলে তোমার কথা—আমি তোমার মুখ দেখেছি যে! সব বুঝতে পেরেছি ওই মুখ দেখে।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে পিওনী আই-ওয়ানের দিকে চেয়ে। ওর ওষ্ঠের প্রান্তে অতি ক্ষীণ একটুখানি হাসি থরো থরো কাঁপছে।

'চলি', বলে দরজা বন্ধ করে চলে যায় ও।

হাঁ করে রইল আই-ওয়ান্‌। কি যে বলে গেল মেয়েটা কিছুই বুঝতে পারে না। পর মুহূর্তেই ভুলেও যায়। কি আর এমন বলবে! পিওনীর মত মেয়ে এমন কি বলতে পারে মনে রাখার মত।

তখন খেয়াল করেনি আই-ওয়ান্‌ পিওনী যে ওকে তরুণ পুরোহিতের মত বলেছে। তাহলে চটে যেত। সমস্ত ধর্মস্থানকে পুরোহিতদের কবলমুক্ত করাই ওদের প্রধান কাজ। মানুষকে এতকাল ঠকিয়ে এসেছে পুরোহিতের দল। আই-ওয়ানও প্রাণ পণ চেষ্টা করে ঐ প্রভাব হতে নিজের দলস্থদের মুক্ত করতে। যখনই কোন কারণে কেউ ভগবানের দোহাই দেয়—ও ধমকে দেয়। বলে ভগবান টগবান নেই—কার দোহাই দিচ্ছ?

প্রথমদিন ওর মুখে এ কথা শুনে কেউ জবাব দেয়নি। কিন্তু আর একদিন আকাশের দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞাসা করে ফেলল একজনঃ

'বলছ তো বাপু, স্বর্গ নেই। ওটা তাহলে কি?'

নূতন বছরের ছুটি ছিল সেদিন। নিজের খরচে আই-ওয়ান্‌ একটু চা আর নতুন বছরের কেকের আয়োজন করেছিল শহরতলীর এক চা-খানায়। খেয়ে দেয়ে সব এসে বসল খোলা মাঠে। তখনই উঠল প্রশ্নটা। আই-ওয়ান্‌ জবাব দেয়ঃ 'ওটা মেঘ।'

'তার ওপরে?'

'কিছু নেই।'

শুনে চুপ করে ভাবে ওরা। লোকটি আবার বলে খানিক পরে।

'তহলে এতদিন পুরুৎরা সব মিথ্যে কথা বলেছে আমাদের?'

'নিশ্চয়ই।' আই-ওয়ান্‌ বলে।

সবাইকে নিরুত্তর দেখে আবার বলে ও, 'আচ্ছা, অত তো পুজো আচ্চা কর, ধন্না দাও দেবতার ঠাঁইয়ে, কি পেয়েছ বলতো।'

চুপ করে ভাবে ওরা।

টেরা চোখ এক যুবক বলে, 'কথা বটে। ফি বার নতুন বছরের দিনে

মাথা কপাল তো আর কম কুটি না। কত বলেছি, দাও ঠাকুর একবার ছাপ্পর ফুড়ে। তা দেখ না কেমন বড় মানুষ হয়েছি সব।'

আর একজন বলে বিষণ্ণ সুরে, 'কপাল হে কপাল। ও লেখন খণ্ডাবে কে বল। অদেষ্টে নেই, তা ঠাকুর দেবতার দোষ কি।'

টেরা চোখ খেঁকিয়ে ওঠে, 'মার ঝাঁটা অমন দেবতার মুখে। বাস্ ধম্মো টম্মো আর নয়। ঢের হয়েছে। লাগো সব কোমর কষে; তেনারা যেমন বল্‌ছেন, বিপ্লবের দৌলতে যদি দুঃখ ঘোচে, দুটো পয়সাটা আসটা ঘরে আসে তো ও সব পুজো-খেকোদের তোয়াক্কা রাখে কে?'

সবাই হেসে ওঠে। আজ সুখাদ্য পেটে পড়েছে, মন ওদের খুশি। দেখেছে আই-ওয়ান্, দু-মুঠো অন্ন—শুধু ওদের ক্ষুধারই অন্ন নয় সে, বুকেরও বল। বহুবার খাইয়েছে তাদের ও—পেট ভরা ওই ভালো মন্দ বস্তুর ছিটে ফোঁটা অভাগাদের কাছে বয়ে এনেছে বিপ্লবের অঙ্গীকার—যতই ও খাইয়েছে ততই বিপ্লবে ওরা আস্থাবান হয়েছে; প্রতিবার সেই আস্থা স্ফীত হয়েছে, গভীরতর হয়েছে।

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে ওরা, 'ঠিকই বলছে হে বাবু। নইলে নিজের ট্যাঁক ফুঁকে আমাদের খাওয়াবার গরজটা কিসের! বড় ভালো লোক।'

এদের মাঝে থেকে, এদের সাথে কথা বলে আই-ওয়ানেরও বিশ্বাস বাড়ে, বুকে বল বাড়ে। রাস্তায় ভিখারীকে পয়সা দিতে দিতে আশায় বুক ভরে যায়। আর একদিন! তারপর তো ভিখারীই থাকবে না আর!

ধীরে ধীরে শীত চলে গেল।

কি একটা গোলমালে সেদিন রাতে হঠাৎ জেগে ওঠে আই-ওয়ান্। বাগানের বাতিগুলো সব জ্বলছে। বাবার চীৎকার শোনা যাচ্ছে, 'বাঁধ ব্যাটাকে। পুলিশে দেব। এল ব'লে পুলিশ।'

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। জামা পরে নীচে ছোটে। মাঝ-পথে মায়ের সাথে দেখা। হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলেন, বাগানে একটা চোর ধরা পড়েছে।

বাগানের হিমেল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন ওর বাবা আর ভৃত্যের দল। সামনে কঙ্কালের মত একটা মানুষ। এক ফালি ন্যাকড়া পরনে, দৃষ্টিতে কতদিনকার জমানো ক্ষুধা—পেটে দানা পড়েনি যেন কতদিন। ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

কি করে বাগানে ঢুকল লোকটা কে জানে। মাটিতে কপাল ঠুকে ঠুকে কেঁদে কেঁদে মিনতি করছে। ওর লম্বা চুলগুলো মুঠি করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে মালী। বাহাদুরী করছে বুক ফুলিয়েঃ 'চালের টালিতে খর্ খর্ একটা আওয়াজ হল প্রথম। তারপর ধুপ্ করে কি একটা যেন ভুঁয়ে পড়ল। বউকে ডেকে বললাম—কি বটেরে? এ তো হাওয়া নয়। তখন—'

আর্তনাদ করে ওঠে লোকটা, 'না বাবু না, চুরি করতে আসিনি। দুদিন কিছু খাইনি। পেটের জ্বালায় আঁস্তাকুড় ঘাঁটতে এসেছিলাম। এঁটো কাঁটা যদি কিছু পাই। ঘরে ঢুকতাম না, বাবু। বিশ্বাস করুন। আমার জান বাঁচান...আপনারা আমার মা বাপ...

আই-ওয়ান্ বলতে যায়ঃ 'সত্যি কথাই বলছে, বাবা, লোকটা। দেখছ

ক্ষিদেয়......।' কিন্তু লোকটার চোখে চোখ পড়ে যায়। কি এক হিংস্রতা আর বিদ্বেষের আগুন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে ওর দৃষ্টিতে। স্তম্ভিত হয়ে গেল ও। এ কিসের আগুন? পুলিশ এসে পড়ল; বেঁধে নিয়ে চলল অপরাধীকে। বিরস মুখে চলে গেল লোকটা। কিন্তু ওর ভঙ্গিতে কেমন একটা অভ্যস্ততা। এ যেন নূতন কিছু নয় ওর কাছে।

বাড়ীর সবাই উঠেছে। চলছে জট্‌লা, আর উত্তেজিত আলোচনা।

আই-ওয়ান্ নিজের ঘরে চলে গেল। ভেবে কূল পায় না. অনাহারী ওই মানুষটার চোখে ও কিসের আগুন। আরও যেন কোথায় দেখেছে এ আগুন। হুঁ, আই-কোর চোখে—যে দিন ও চলে গেল। ঠিক জাহাজে উঠবার সময়। তুলে দিতে গিয়েছিল ও আর বাবা। পাছে নেমে পালিয়ে যায় আই-কো, সেই ভয়ে বাবা শেষ পর্যন্ত ওর সাথে ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজকের এই ধরা-পড়া চোরটার মতই মনে হচ্ছিল আই-কোকে। বিদ্বেষে, বিদ্রোহে অমনি বহ্নিমান হয়েছিল তারও দুই চোখ। ভাবতে ভাবতে সব যেন গুলিয়ে যায় আই-ওয়ানের। আচ্ছা কতটা দেবে বিপ্লব মানুষকে? প্রত্যেকটি মানুষের খাওয়া পরার ব্যবস্থা না হয় হল; না হয় প্রতি ঘরে ঘরে প্রাচুর্য ছাপিয়ে উঠল। কিন্তু তাতেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? যদি না—। সংশয়ে চিত্ত দোলে। ধমক দেয় দোলায়িত চিত্তকে। না, সংশয় রাখবে না ও। বিশ্বাসে ও অটল থাকবে, অচঞ্চল থাকবে। মানুষ—মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে—উন্নততর জীবনে ধন্য হবে। ওই হবে আশীর্বাদ। একটি মানুষও এই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে না। বরাভয় নিয়ে আসছেন চ্যাং-কাই-শেক। রাত কালো, প্রভাত আলো। কালো রাত কেটে পূবে দিগন্তে ওই ভোরের আলো নামল। চ্যাং-কাই-শেকের হাতে আলোর মশাল।

আর কথা হয়নি পিওনীর সাথে। সে রাতের পর থেকে আপনাকে কোন আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছে মেয়ে। আই-ওয়ান্ ঘরে থাকলে সে আর ঘরে আসে না। কিন্তু প্রতিটি কাজ যথা-নিয়মে হয়ে যায়। বিছানার ওপর লেপটি বিছানো থাকে সযত্নে; কেৎলীতে থাকে ধোঁয়ান গরম চা; জানালায় অথবা টেবিলের ওপর ফুলদানীতে থাকে তাজা ফুল। ও বাড়ী ফেরার আগে সব তৈরী হয়ে থাকে। একদিন সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল; একটু ঝুঁকে এল পিওনী চামেলীর সুবাস ছড়িয়ে। যেতে যেতে বলে গেল সংক্ষিপ্ত ছোট্ট একটু আবছা হাসি হেসেঃ 'এখনও স্বপ্ন দেখছ? কবে জাগবে?'

রাগ করে না আই-ওয়ান্। নাইবা বিশ্বাস করল ও, কিন্তু আগামী দিনের প্রসাদে অংশ পিওনীরও থাকবে। নিঃসংশয় এখন আই-ওয়ান্—পিওনীর হাতে ওর জীবন নির্ভয়। বিশ্বাসঘাতকতা কখনও করবে না ও মেয়ে।

সময় এগিয়ে এল প্রায়। দ্বিতীয় মাসের আধা আধি চলে গেছে। মিল মালিকরা এখনও জানে না, যে দুই সপ্তাহ পরে সাধারণ ধর্মঘট। নিজেরাও জানে না শেষ পর্যন্ত এ ধর্মঘট কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। শহরে গুপ্ত দলের সভ্য সংখ্যা যে কত তারও সঠিক হিসাব কারো জানা নেই। দলের সভায় সেদিন সবাই দাঁড়িয়ে হিসেব দিল সাংকেতিক ভাষায়। দেয়ালের কান থাকলে সে কান শুধু শুনবেই বুঝবে না কিছু।

ধর্মঘটের দুদিন আগে শেষ বৈঠক হল দলের। বলে দিয়েছিল এন্-লান্,

আর সভা হবে না। হওয়া নিরাপদও নয়, প্রয়োজনও নেই। প্রতি দিন প্রতি ঘণ্টার কার্য-সূচী জানা আছে। নেহাৎ যদি ওর সাথে কারো কোন কথার প্রয়োজন থাকে, চিরকুটে একটা সূর্য এ'কে ওর হাতে দেবে, তারপর ও স্থান, তারিখ এবং সময় নির্দিষ্ট ক'রে দেবে। এ ছাড়া সমস্ত দেখা শোনা, যোগা-যোগ বন্ধ; কেউ যেন কাউকে চেনেই না। প্রত্যেকে নিজের নিজের জায়গায়, নির্দিষ্ট কর্তব্যে অচঞ্চল থাকবে। শেষের দিন সব এক হয়ে যাবে—নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে। তার আগ পর্যন্ত সবাই একক।

পরের দিনই ইংরাজীর ক্লাসে এন্-লান্ খাতার পাতায় সূর্য আর তার নীচে সময় লিখে ধরল আই-ওয়ানের সামনে।

এন্-লানের ঘরে এলে আই-ওয়ানকে বলল ওঃ 'দেখ, তোমার জন্যই আমার বিশেষ ভয়। তাই সাবধান করে দেবার জন্য ডেকেছি। খবরদার বাড়ীর কাউকে ঘুণাক্ষরে কিছু বলো না যেন। শেষের দিকেই বিপদ বেশী। আর তোমার বাবার ক্ষমতা জান তো? গোপনীয়তার ওপর আমাদের সকলের বাঁচন মরণ নির্ভর।'

'আমি?' ব্যাগ্রভাবে বলে আই-ওয়ান্, 'আমি তো—'

হ্যাঁ, বড় সরল মন তোমার। মন্ত্রগুপ্তির কৌশল শেখনি। কখন যে বেরিয়ে যাবে জানতেই পারবে না তুমি।'

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে ও এন্-লানের চোখের দিকে। মুখ হাঁ হয়ে যায়। ও যে পিওনীকে বলে দিয়েছে।

এন্-লান্ বলেঃ 'তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি—অপকর্মটা হয়ে গেছে। বাইরে চল কথা আছে।'

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ওরা এটা ওটা কেনে, এটা ওটা দেখে, কোন বালখিল্যের দলকে একটু ঠাট্টা তামাসা করে—আর যখনি দেখে আশে পাশে কেউ নেই, সেই ফাঁকে একটু কথা বলে নেয়। পিওনীর সম্বন্ধে এবং কি বলেছে আই-ওয়ান্ তাকে কথায় কথায় ধীরে ধীরে সব বের করে নেয় এন্-লান্।

এত রাগ এন্-লানের ও কোনদিন দেখেনি।

'একে তো মেয়ে মানুষ, তার ওপরে একটা দাসী!' বাঘের মত ধক্ ধক্ করে ওর চোখ জ্বলে। 'এত বড় মূর্খ কেউ কোথাও দেখেছে তোমার মত!'

ব্যগ্রভাবে বলে আই-ওয়ানঃ 'বিশ্বাস কর সেরকম মেয়ে নয় পিওনী। তুমি জান না। ও ঠিক আমার বোনের মত।' তারপর ইতস্ততঃ করে বলেঃ 'আর—আর—আমাকে—ভালোবাসে ও।'

'প্রথমতঃ ও তোমার বোন নয়। তারপর ভালোবাসে বলছ। সে তো আরো সাংঘাতিক। ভালোবাসল অথচ ভালোবাসা পেল না এ ক্ষমা করবে কি করে ও?'

আবার প্রতিবাদ করে আই-ওয়ান্ঃ 'ও রকম মেয়ে নয় পিওনী।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে এন্-লান্ঃ 'যা হবার তা হয়ে গেছে।' খানিকক্ষণ পরে আবার বলেঃ 'নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনে আমি। তোমাদের সকলের দায়িত্ব আমার ওপর। মেয়েটির সাথে একটু দেখা করিয়ে দিতে পার!—দেখেও নিতাম কেমন মেয়ে আর একটু ভয় টয় দেখিয়ে দিতাম, যাতে কিছু ফাঁস না করে।'

'কি জানি!' থতমত খেয়ে যায় আই-ওয়ান্, বলে, 'হয়ত আসবে না, লজ্জা পাবে।'

'দাসী হয়ে—?' তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে এন্-লানের চোখে।

'দাসী বলো না। আমরা কখনও ওকে সেভাবে দেখিনি।' বলে আই-ওয়ান্।

'ওকে বলো', এন্-লান্ আবার বলে, 'শুধু তোমার জীবনের প্রশ্ন নয়। আমাদের সকলের জীবন মরণের প্রশ্ন।'

ব্যাপকভাবে ধর পাকড় চলেছে। ধৃতদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় না। ওদের নিয়ে যায় এবং আর ঘরে ফেরে না কেউ—ঐ পর্যন্ত। ইস্কুল, কলেজ, ঘর বাড়ী ছেঁকে দলে দলে ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। মাঝপথ থেকে সৈন্য দল ছুটে এসে ওদের ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয়। তারপর তাদের আর কোন হদিস নিকেশ থাকে না।

আই-ওয়ান্ বলেঃ আমি বলব ওকে।

পরের দিন পিওনী ওর ধারে কাছেই এল না। ভৃত্য দিয়ে ডেকে পাঠালে আই-ওয়ান্। বলে পাঠাল পিওনী, ঠাকুরমার ঘরে কাজ আছে।

পরের দিন। সাধারণ ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছে। প্রাতরাশের সময় খবরের কাগজ হাতে বাবা ঢুকলেন ঘরে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে গর্জাতে গর্জাতে পড়তে লাগলেন সংবাদ।

'য়্যাঁ! সিল্কের মিল সব বন্ধ?'

আই-ওয়ান্ খাবার কাঠি নামিয়ে রাখে।

'তাতুয়ান মিলে তিন শ' শ্রমিক কাজে যোগদান করেনি, লিংই মিলে চার শ' পঁচিশ, সুং-রেন্ এ—' রাগে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দেন শ্রীযুক্ত উ। বলেনঃ

'প্রত্যেকটি মিলে আমার টাকা আছে যে! সরকার কি করে বরদাস্ত করছে এ সব? সব ছাত্রদের কাজ। ওরাই খেপিয়েছে সবাইকে।'

ঠাকুর্দা বলেঃ 'অতগুলো তো নিকেশ হল—তাতে হয়নি দেখছি।'

মা জিজ্ঞাসা করেনঃ 'অচ্ছা কম্যুনিজম্ শব্দটার মানে কি? আগে তো শুনিনি কোনদিন। ওটা কি কোন ধর্মের নাম?'

এক বাটি গরম ডিমের ঝোল নিয়ে আসছিল পিওনী। কথাটা কানে গেল ওর। শুনে চমকে উঠল। খানিকটা ঝোল ছলকে পড়ে গেল।

ঠাকুরমা ধমকে উঠলেনঃ 'বড় হচ্ছেন আর ধিঙ্গি হচ্ছেন। কোনদিকে যদি এতটুকু খেয়াল থাকে!'

আই-ওয়ান্ ওর সন্ত্রস্ত, অর্থপূর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। এন্-লান্ এর বার্তা ওকে পৌঁছে দিতে হবে। গোপনে কথা বলার সুযোগ খুঁজতে লাগল আই-ওয়ান্। খাওয়া অসমাপ্ত রেখেই বাবা টেবিল থেকে উঠে গেলেন।

'এক্ষুণি আফিসে যেতে হবে। কে জানে, হয়ত এতক্ষণে ভূতের নৃত্য চলছে ওখানে', বলেন বাবাঃ 'তা হোক বা না হোক সরকারকে এবার একটু বুঝিয়ে দেব। শিক্ষা-বিভাগে নূতন যে ঋণটা দেবার কথা ছিল, আর দিচ্ছিনে; ওনারা ছাত্রদের সামলাতে পারবেন না আর আমরা টাকা দিয়ে মরব!'

পিওনী চায়ের কেট্লী হাতে নিয়ে পাশে এসে জিজ্ঞাসা করে শ্রীযুক্ত উ কে, 'আর একটু চা দোব ?'

ওর কথার জবাব না দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলেই চলেন উ,—'আসুক না একবার চ্যাং-কাই-শেক !'

আই-ওয়ান্ চম্‌কে তাকায়। পিওনী ঘুরে ঘুরে সকলের পেয়ালায় চা ঢালে।

'তার মানে ?' আই-ওয়ান্ জিজ্ঞাসা করে,

কঠোর হাসি হেসে চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে উঠে পড়েন শ্রী উ চেয়ার ঠেলে।

গভীর শ্রদ্ধায় ভাবে আই-ওয়ান্ঃ 'বললেই হল! কি করবে চ্যাং-কাই-শেককে। হুঃ ব্যাংকারদের তোয়াক্কা রাখে না সে!' পিওনীর কথা আবার মনে পড়ে যায়। ভুলে গিয়েছিল এতক্ষণ। কিন্তু পিওনী নেই সামনে। সারাবাড়ী খুঁজেও পিওনীকে পাওয়া গেল না। অবশেষে রান্নাঘরে ওর গলা শোনা যায়। উঁকি মেরে দেখে আই-ওয়ান্ ফিরিওলা মাছ নিয়ে এসেছে তারই ওপর ঝুঁকে আছে ও।

'পিওনী!'

মাথা তুলে তাকায় পিওনী।

'আমার ইস্কুলের টুপীটা পাচ্ছিনে, দিয়ে যা।' তবু যদি একটু আসে মেয়ে, তাহলে সংবাদটা দিয়ে দেবে।

আবার মাছের ওপর ঝুঁকে পড়ে পিওনী বলেঃ 'আলমারীতেই আছে দেখগে, তৃতীয় আলনাটায়।'

কি করে আর আই-ওয়ান্। নিরুপায় হয়ে স্কুলে চলে যায়। ক্লাসে এন্-লানের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় খবরটা।

ধর্মঘট চলবে একুশ দিন। শেষের দিনই আসল দিন। বাইরে থেকে সব ঠিক সে রকমই আছে। সবাই ধীর স্থির শান্তভাবে চলাফেরা করছে। কিন্তু ধর্মঘট সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। দোকান-পসার, কারখানা সংবাদ পত্রের অফিস কোথাও বাকী নেই। শ্রমিকদের ভারী ফুর্তি। টাকা তাদের আসছে। জীবনে এই প্রথম ছুটি পেয়েছে ওরা, দিনের বেলা হৈ হৈ করে সব এখনে যারা ওখানে যায়, চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে। জন্তু জানোয়ারের খেলা দেখে অবাক হয়। এতদিন শুধু নামই শুনেছিল। বিদেশী বয়েস্কোপ দেখে এবার। রাত্তির বেলা চায়ের দোকানে আর জুয়ার আড্ডায় কাটে। আই-ওয়ান্ ওর দলটাকে কিছুতেই এক সঙ্গে করতে পারে না। উত্তেজনায়, আশঙ্কায় রাতে ওর ভালো ঘুম হয় না, কিন্তু প্রাণপাত করে এত দিন শেখাল যাদের তারা ইস্কুল-থেকে-ছুটি-পাওয়া বাচ্চা পোড়োদের মত উল্লাসে মেতে উঠেছে। সারা দিন পূর্ণ অবসর। রাতেও পাওয়া যায় না কাউকে— দুজন তিনজন করে আসে। অন্যদের কথা জিজ্ঞাসা করলে হেসে শহরের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দেয়।

একজন বলেঃ 'সব দেখে নিচ্ছি, এসব দেখার ভাগ্যি তো আর কোন-কালে হয়নি।'

আরেকজন বলেঃ 'আমি আর বাবা কিছু চাইনে, এমনি যদি থাকতে পারি তোফা! আজ কি দেখেছি, জানিস্! তিনটে বাঁদর, বুঝলি, মানুষের সাজ পরেছে। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে আমার!'

আই-ওয়ানের কথা শোনবার অবকাশ নেই কারো। হাজার চেষ্টা করেও একটা কথা শোনাতে পারে না, আই-ওয়ান্। অনন্যোপায় হয়ে বাড়ী ফিরে যায়। আশঙ্কায় মন উদ্বেল হয়ে ওঠে—কি জানি আসল দিনে, সমবেত সংগ্রামের দিনেও যদি এদের খুঁজে না পাওয়া যায়। বড় অসহায় বোধ করে ও। সংকেতের সাহায্যে এন্-লানের সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করে সেদিন। ছেলেরা সব ক্লাশে, স্কুলের সবুজ লনে এসে বসে দুজনে। আই-ওয়ান্ বলেঃ 'আমার দলের ছেলেদের কি হয়েছে জানি না; ধর্মঘট আরম্ভ হবার পর থেকে ভারী ছেলেমানুষী করছে সব। বিপ্লবের কথা ওরা যেন ভুলেই গেছে।'

আনুপূর্বিক সব শুনে এন্-লান্ বলেঃ 'কি বলেছিলাম আর এক দিন মনে আছে? এখনও আদর্শবাদী রয়ে গেলে? কিছুই জানো না তুমি। সারা জীবন যারা হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খেটে এল, দুদিন ছুটি পেয়েছে। তুমি কি ভাবছ একটু আমোদ ফুর্তি করবে না? ছেড়ে দাও না এখন। আসল দিনের কথা ভাবছ? শৃংখলা? কিচ্ছু রাখতে পারবে না। আচম্কা তুফান উঠবে—। তচ্নচ্ হয়ে যাবে সব। সে যে কত বড় তুফান, কি তার চেহারা হবে, ক্ষয় ক্ষতিই বা কি হবে—কেউ ভাবতে পারে না। পরে—অনেক পরে—ঝড় থেমে গেলে, তখন ধীরে ধীরে সব থিতুবে।' একটু থেমে আবার বলে ও স্বর আরো নীচু করে, 'সেই মেয়েটির কি হল? এই সাংঘাতিক সময়, একটি কথায় কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

আই-ওয়ান্ বলেঃ 'কথা বলার সুযোগই—'

'করে নাও—শিগ্গির সুযোগ করে নাও—আমাদের সকলকে বিপদে ফেলছ তুমি—সে খেয়াল আছে?' এন্-লানের কণ্ঠে হুকুমের স্বর।

চলে যায় এন্-লান্। আবার সেই কর্মহীন শূন্যতা। শুধু দিন গোনা, আর পথ চেয়ে থাকা। নববসন্তে বাতাস চঞ্চল—নিশ্চল প্রতীক্ষা আরো পীড়া-দায়ক। বাড়ী ফিরে আসে ও। ঠাকুরমা ডাকেন—তাঁর কাছে গিয়ে রোজ-কার মতই সম্ভাষণ করে,

'কি ঠাক্মা?'

প্রতিদিনের সেই ক্ষীণ জরা-কম্পিত স্বরঃ

'কোথায় ছিলি?'

সব সেই। কিছু বদলায়নি, অথচ সব যেন স্বপ্ন। এ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছে আই-ওয়ান্।

'স্কুলে।' জবাব দেয় ও।

ঠাকুরমার কানে পৌঁছয় না সে কথা। একটু কেশে আরম্ভ করেন নিজের অভাব অভিযোগের কথাঃ

'হাড়ে হাড়ে ব্যথারে ভাই। মরে গেলাম। বেড়েই যাচ্ছে, হাঁটতে পারি না

এখন আর। তা কি কারো গ্রাহ্যি আছে? ফেলে রেখে দিয়েছে এখানে—বুড়ী মরল আর বাঁচল, কার মাথা ব্যথা? নাতি পুত্তুর থেকেও এই তো লাভ!'

আই-ওয়ান ভাবে, এন্-লান্ হলে বলত: 'বেশ করি। গ্রাহ্যি করি না তো, বেশ করি।'

কিন্তু কঠিন হতে পারে না আই-ওয়ান্ এন্-লানের মত। অত্যন্ত কোমলভাবে বলে: 'কে বললে ঠাক্মা, তোমার জন্য আমরা ভাবি না।'

নাতির মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধা। তারপরে হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। বলে:

'তোর হাতখানা দে তো রে, সোনামণি!'

ভারী বিশ্রী লাগে, তবু হাত বাড়িয়ে দেয় ও। জরা-জীর্ণ থাবা দুটো দিয়ে সাগ্রহে ওর হাত ধরে বৃদ্ধা। বলে:

'আঃ; কি সুন্দর কচি হাতরে।'

স্পর্শে গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে আই-ওয়ানের। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও হাত সরিয়ে নিতে পারে না। ওর অতি-দ্রুত কল্পনায় বার্ধক্যের ছবি পড়ে—ধীরে ধীরে উত্তাপ হারায়, শক্তি হারায় দেহ। তাই সে তারুণ্যের উষ্ণতাকে আশ্রয় করতে চায় অমন ব্যাকুল হয়ে।

বিড়্ বিড়্ করে বলে ঠাকুরমা, 'আমি মরলেই বাঁচিস তোরা—না? না, তুই নস্।'

কিন্তু আই-ওয়ান্ জানে ঠাকুরমা মরলে ওর পৃথিবী ওল্টাবে না। প্রাচীনরা মরেই তো নবীনদের জায়গা করে দেবে। এই তো বিধান। এ বিধান না হলে তো পৃথিবী অচল হত। তবু বাইরে বলে: 'ছিঃ, ওকি কথা বলছ, ঠাক্মা?'

পড়া আছে বলে বেরিয়ে যায় আই-ওয়ান্। এই ঘরের দুর্গন্ধে ও থাকতে পারে না বেশীক্ষণ। চারদিকে কুলুপ আঁটা—আর বাইরে মদির বসন্ত রুদ্ধ দ্বারে মাথা কোটে।

বেরুতেই পিওনীর সাথে দেখা। ঠাকুরমার জন্য এক বাটি সুপ নিয়ে এ ঘরেই আসছিল। মনে পড়ে যায় এন্-লানের কথা।

'তোর সাথে কথা আছে পিওনী, ঘরে আসিস।'

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে চলে যায় পিওনী।

আই-ওয়ান্ বলে, 'আমি জানি, তুই যাবি না।'

বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে জবাব দেয় পিওনী, 'তাই বলেছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই তো বলেছি!'

বিদেশী আরাম চেয়ারটায় এলিয়ে আছে আই-ওয়ান্। এ বাড়ীর সবই বিদেশী, শুধু বিছানাগুলি ছাড়া। নরম তুলতুলে স্প্রিংএর বিছানায় ঘুমুতে পারেন না ঠাকুর্দা, তাঁর শক্ত কাঠের পাটাতন আর কাঠের বালিশ চাই। তাই বিছানাগুলি দেশী রাখতে হয়েছে।

পিওনী বলে, 'আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুবে না। সে ভয় নেই তোমাদের। তবু ভাবছি দেখাটা করেই আসি।'

ফ্যাল ফ্যাল করে পিওনীর দিকে তাকিয়ে থাকে আই-ওয়ান্। পিওনীর কুণ্ঠিত ওষ্ঠের কোণে আর চোখের তারায় দুষ্টুমী ঝিল্‌মিল্ করে।

'কেন?' আই-ওয়ান্ শুধায়?

ঝাড়ন দিয়ে বই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে পিওনীঃ

'বিপ্লব বিপ্লব বলছ, নিজের চোখে দেখেই নি না একটু। আর তাছাড়া মুখও বদলাবে। সারা জীবন এই বাড়ীটার মধ্যে; এক ঘেয়ে—আর ভালো লাগে না।

কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায় আই-ওয়ানের। এ পরিবারের মেয়ে পিওনী। ঘরের মেয়েরা তো অচেনা পুরুষের সামনে বেরয় না। রেওয়াজ নাই। রেওয়াজ? রেওয়াজই না ভাঙতে চাইছে বিপ্লবীরা!

'আচ্ছা, কালই বলব গিয়ে এন্-লান্‌কে যে আমারই ভুল হয়েছিল। দেখা করার সময় ও জায়গা ঠিক করে দেবে'খন।' গুম হয়ে বসে আই-ওয়ান্।

'এখানেই নিয়ে এসনা। তোমার বন্ধু, তোমার বাড়ীতে আসবে না কেন? আমি চা খাবার এনে দেব—আমার ওই তো কাজ।' বলে পিওনী।

চুপ করে ভাবে আই-ওয়ান্—এখানে! স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের কাউকে এখানে আনার কথা কখনও ভাবেনি। পেং-লিউ গেট পর্যন্ত এসেছিল। তাকেও ভাগিয়ে দিয়েছিল ও। সেদিন থেকে সে ওর ওপর চটে আছে। কেমন যেন একটা ইতরতা আছে পেং-লিউর মধ্যে। কেউ ওকে দেখতে পারে না। এন্-লান্ কখনও কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেয় না ওকে। আচ্ছা, এন্-লান্ তো দরিদ্রের ছেলে। ওই বা এরকম কেন? আর পেং-লিউই বা ওরকম কেন। তা আই-কোও তো বড় লোকের ছেলে—ওই বা অমন কেন? আই-কো বম্বে পেঁৗছে একটা চিঠি দিয়েছে—সমুদ্র নাকি ওর ভারী খারাপ লাগে। আর যেতে চায় না, বম্বেতেই থেকে যেতে চায়। কিন্তু বাবা নিষেধ করে তার করে দিয়েছেন। যেতেই হবে জার্মানীতে—টাকা চলে গেছে সেখানে। যে খানে টাকা গেছে, সেইখানে ওকেও যেতে হয় অগত্যা। পেং-লেউর কথা মনে হলেই ওর আই-কোর কথা মনে পড়ে যায়—কোন্ একটা জায়গায় যেন দুজনের মিল আছে।

ওর চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে দিয়ে পিওনী বলেঃ

'কতবার জিজ্ঞাসা করলাম, কিছুতেই বললে না এন্-লান্ কেমন দেখতে।'

'জানি না।' সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় আই-ওয়ান। ভাবে, কেন যে ওকে সব বলতে গেলাম!

'বয়ে গেছে না বললে তো! নিজের চোখেই দেখব।' পিওনী বলে।

চাপা সুরে গুন্‌গুন্ করে গান করে পিওনী! এন্-লান্ ভাবে, বিপ্লব টিপ্লবের ধার ধারে না এরা। ঝক্‌মারী করেছে, ওকে সব কথা বলে!

পরের দিন, এক সঙ্গে নোট লেখার সুযোগে পিওনীর কথা বলে এন্-লান্‌কে। এন্-লান্ লিখেই চলে যেন শুনছে না কিছু। তার পর বলেঃ

'বুদ্ধি আছে মেয়ের। ভালোই তো—বড়লোকের বাড়ী দেখিনি কখনও। এর পর আর সুযোগ হবে না, বড়লোক তো আর থাকবে না বিপ্লবের পরে!

আর, তোমার সঙ্গে পড়ি, তোমার বাড়ী যাব। কেউ ধরতেই পারবে না কিছু। আচ্ছা, ঠিক চারটেয় গেটে দেখা হবে। আমার লেখা হয়ে গেছে, চলি।'

সারাদিন ভারী অস্বস্তিতে কেটেছে আই-ওয়ানের। এন্-লানকে নিয়ে এসেও অস্বস্তি কাটেনি। উজ্জ্বল কালো চোখদুটি দিয়ে নীরবে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে এন্-লান্। পাটভাঙ্গা একটা স্কুলের পোষাক পরা; পরিপাটি করে চুল আঁচড়ান, পকেটে নীল রুমাল। একটু খেপে গেছে পোষাকটা, বুকের বোতাম লাগেনি, তলাকার নীল কামিজ দেখা যাচ্ছে। কামিজটাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় এন্-লান্ লাল গালিচটা দেখে।

'এর ওপর পা দেব না কি হে?' জিজ্ঞাসা করে।

হাসে আই-ওয়ান্। 'উচিত নয় দেওয়া। কিন্তু দিতে পার।' বলে। বড় ভয় করে, এসব দেখে কি জানি কি ভাবে এন্-লান্।

এন্-লান্ যেতে যেতে বলেঃ 'আমার নেই তাই। থাকলে গায়ে দিয়ে শুতুম, এমন করে পায়ে মাড়াতে পাত্তুম না।'

সকাল বেলাই পিওনীকে বলে রেখেছিল আই-ওয়ান্—ঠাকুরমা যেন আবার ওকে ডাকাডাকি না করে বিকেলবেলা। ঠিক ব্যবস্থা করে রেখেছে পিওনী। অঘোরে ঘুমুচ্ছেন বৃদ্ধা চণ্ডুর নেশায়।

প্রসন্ন মুখে বলে এন্-লান্, 'আরে! তোমার বাড়ীতেও আফিংএর গন্ধ! আমাদের বাড়ীতেও ছিল খুব।'

অবাক হয়ে আই-ওয়ান্ জিজ্ঞাসা করেঃ 'সে কি? গাঁয়েও লোকে আফিং খায় নাকি?' ও জানত কৃষকরা আফিং বেচেই শুধু, সেই পয়সায় খাবার কেনে।

শান্তভাবে বলে এন্-লান্, 'তোমায় বলিনি আমি, ধনী গরীব সব এক!'

ওপরে চললো ওরা। পিওনীকে এও বলে রেখেছিল আই-ওয়ান্, বাবা মা আর ঠাকুর্দার দরবারে ওর দৈনিক হাজিরাটাও যেন ঠেকিয়ে রাখে ও।

সোজা ও চলে গেল নিজের ঘরে।

দরজাটা বন্ধ করতে করতে বলে আই-ওয়ান্ঃ 'বাস্ নিশ্চিন্ত, এক্ষুণি চা নিয়ে আসবে পিওনী।' লজ্জায়, আশঙ্কায় ওর কথা উত্তেজিত। এ বাড়ীর বড়লোকী দেখে কি জানি কি বলে এন্-লান্।

উত্তর দেয় না এন্-লান্। এক ধারে খালি মেজেয় দাঁড়িয়ে ঘরের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে।

তারপর একটু বিস্ময়ের সুরে বলে, 'এখান থেকেই রোজ যাও?'

এন্-লানের মুখের বিস্ময় চাবুক মারে আই-ওয়ানকে। ওর মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না। তুৎলে তুৎলে বলে, 'অভ্যেস হয়ে গেছে কিনা, কিছু মনেই হয় না।'

'আমার বাবার গোটা বাড়ীটা এই ঘরখানার মধ্যে পুরে ফেলা যায়।' বলে এন্-লান্ আবার গালিচার ওপর এসে পায়ের নীচে নীল রংএর পুরু

মখমলের মত কোমল বস্তুটির দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেঃ 'এটার দাম কত?'

'আমি জানি না, বরাবরই এখানে পাতা দেখছি।' লজ্জিতভাবে বলে আই-ওয়ান্। তারপর পেছন ফিরে টুপী আর জামা খোলে। এন্-লান্ অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকে ওর দিকে।

'এটা তোমার বিছানা বুঝি?' জিজ্ঞাসা করে।

'হুঁ।'

'এ রকম বিছানা তো কখনও দেখিনি।' বিস্ময়ে হতবাক এন্-লান্। 'সিল্কের ও জিনিসটা কি হে?'

আই-ওয়ান্ শুধু বলে, 'পর্দা।' তার পরই অস্থির হয়ে বলে ওঠেঃ

'কি করব বল! উপায় নেই। আমার জন্মই যে এর মধ্যে! এ ছাড়া অন্য কিছুই আমি জানি না।'

হাঁটুতে হাত দিয়ে একটা ছোট চেয়ারে বসে পড়ে এন্-লান্। তারপর ধীরে ধীরে বলেঃ 'তোমায় দোষ দিচ্ছি নে। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করছি—আমি যদি এ অবস্থায় থাকতাম এর মধ্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে পারতাম কিনা। আধপেটা খেয়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর জীবন ছাড়া তো আর কিছুই জানিনে আমি। ভাবতেও পারিনে। তোমার জায়গায় যদি আমি হতাম—কি জানি—জানিনে—।' আই-ওয়ানের দিকে তাকায় ও। আবার বলেঃ 'আই-ওয়ান্, আমার চোখে আজ তুমি আরো অনেক বড়।'

লজ্জা পায় আই-ওয়ান্। বলে 'ছিঃ ছিঃ, কি বলছ সব।'

'আচ্ছা আই-ওয়ান্, যে জিনিসের জন্য আমরা লড়ছি, তুমি তো জন্মসূত্রেই তা পেয়েছ, তবে আমাদের সাথে এলে কিসের জন্য?'

একথা ওর কখনও মনে আসেনি। সবই তো আছে ওর। সত্যি তো তবে ও লড়ছে কিসের জন্য?

'তোমার সব আছে।' আবার বলে এন্-লান্, 'সব!'

'বড় অস্বস্তি লাগে আমার', আই-ওয়ান্ বলে, 'কি রকম যে লাগে কি করে বোঝাব তোমায়! আমার দলের ছেলেদের সংগে যখন থাকি, ইচ্ছে হয় ওদের সবাইকে এখানে নিয়ে আসি। কিন্তু বোধহয় এখানেও ওদের ভালো লাগবে না। তোমার ভালো লাগছে, এন্-লান্?'

দুজনেই ঘরের চারদিকে তাকায়। এতদিন এ জায়গাটা শুধু ছিল আই-ওয়ানের কাজের আর ঘুমবার ঠাঁই। কিন্তু আজ এই প্রথম মনে হল—এতো শুধু একটা ঠাঁই নয়—একটা পুরোপুরি জীবন।'

'জানি নে,' ধীরে ধীরে বলে এন্-লান্, 'বড় সুন্দর, কিন্তু না,—জানি নে—পায়ের নীচে এই যে নরম জিনিষটা—মনে হয় অন্যায়, বড় অন্যায়—। কিন্তু আমি তো এই পরিবেশে জন্মাইনি, তাই হয় তো এমন মনে হয়।'

আবার বলে আই-ওয়ান্ঃ 'আচ্ছা, তোমার কি ইচ্ছে হয়...'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকে এন্-লান্। তারপর মাথা নাড়ে।

'না', দৃঢ়ভাবে বলে ও, 'না, যা আছি তাতেই আমি খুশি। কি হত এখানে থাকলে? ইচ্ছে করছে কি জান? জামাটা খুলে আদুড় গা হয়ে বসে, বেশ মেজেতে থুথু ফেলি প্রাণ ভরে।'

কেউ যেন ধড়াম করে আই-ওয়ানের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। হঠাৎ মনে হল এন্-লান্ ওর কেউ নয়, কেউ নয় ওই যাদের জন্য পথে নেমেছে ও। বড় একলা লাগে—মনে হয় অসহায় একলা শিশু ও বন্দী হয়ে আছে—আর ওর সঙ্গীরা মাতামাতি করছে চোখের সামনে ওই [illegible] রাস্তায়। ঘরে ঢুকল পিওনী—হাতে ধূমন্ত খাবার সাজানো ট্রে। নত দৃষ্টিতে টেবিলের কাছে গিয়ে বই সরিয়ে জায়গা করে খাবার নামিয়ে রাখে।

চালের গুঁড়োর পিঠে, মাংসের চপ আর লাল চিনির সরবৎ। শান্ত স্বরে বলেঃ 'ভাবলাম তোমাদের ভালো লাগবে, তাই একটু করে নিয়ে এলাম।'

এতটা করবে পিওনী, আই-ওয়ান্ ভাবতে পারেনি। ওকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে এন্-লানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

পরস্পরের দিকে তাকায় এন্-লান্ আর পিওনী। এন্-লান্ উঠে দাঁড়ায়। পিওনী চমকে উঠে বলে রুপোলী স্বরেঃ 'আপনি দাঁড়াচ্ছেন কেন? আমি তো এ বাড়ীর মেয়ে নই, বাঁদী।'

এন্-লান্ বলেঃ 'তাই যদি বলো, আমিও চাষার ছেলে, এমন জায়গা চোখে দেখিনি কস্মিন কালে।'

আবার পরস্পরের দিকে চায় ওরা। আরো বেশী করে আই-ওয়ানের নিজেকে একলা মনে হয়। আরো বেশী ক'রে মনে হয় বন্দী অসহায় ছেলেটার মত।

ধীরে ধীরে পিওনী বলেঃ 'আপনার ভয় হয়েছে আমি সব ফাঁস করে দেব, না? জেনে রাখুন, একটি কথাও আমার মুখ থেকে বেরুবে না।'

পিওনীরই মত ধীর অনুচ্চ স্বরে বলে এন্-লান্ঃ 'হাঁ, তা মনে হয়েছিল বটে। কিন্তু কেন জানিনে। হয়ত তোমায় চিনতুম না তাই।'

পিওনী আপনার মধ্যে ফিরে আসে। এন্-লানের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আই-ওয়ানকে বলে, 'ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে যে, গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও দুজনে। বসো।'

এন্-লান্ বেশ খুশির স্বরে বলেঃ 'দুজনে কেন? তিনজনেই বসি না!'

এত বছর এক বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও, আই-ওয়ান আর পিওনী কখনও এক সঙ্গে খায়নি। ওকথা মনেও আসেনি। তাই অবাক হল আই-ওয়ান্ এন্-লানের প্রস্তাব শুনে। ওর মনের ভাব লুকনো থাকে না পিওনীর কাছে। তাড়াতাড়ি বলেঃ 'আমি পরিবেশন করি; সাথে খাইনে তো!'

তবু জিদ করে এন্-লান্ ঃ 'আমি বসবই না তাহলে। একজন খাওয়াবে আর একজন খাবে, এসব থাকবে না বিপ্লবের পর। কি বল হে, আই-ওয়ান! সব সমান হয়ে যাব আমরা!'

আই-ওয়ানের মনে যেন আলোর ঝলক এসে পড়ে। তাইতো, এ কথাতো মনে হয়নি ওর। নিজের ঘরে কুলুপ এঁটে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছিল ও বাইরের জন্য! পিওনীর কাছে লজ্জায় ও মরে যেতে লাগল!

বললঃ 'বসো না, পিওনী আমাদের সাথে। কি হবে?'

লজ্জায় লাল হয়ে যায় পিওনী। আই-ওয়ানকে বলেঃ 'বাবা মা এদিকে এসে যদি দেখতে পান! তখন তো আর ও'দের সামনে বিপ্লব বিপ্লব বলে চ্যাঁচাতে পারব না!'

এন্-লান্ গিয়ে দরজার চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে এল। তারপর প্রায় হুকুমের স্বরে বলল: 'বোসো দিকিন।'

অগত্যা বসে পিওনী, একটু দূরে সরে। মুখের লালিমা তখনও মেলায়নি। আড়ষ্টভাবে পরিবেশন করতে আরম্ভ করে।

'দেখতো, কেমন চমৎকার লাগছে এখন!' উল্লসিত হয়ে এন্-লান্ বলে। ষাঁড়ের মত ক্ষিদে পেয়েছে আমার হে।'

আজকের এই বিচিত্র পরিবেশের সংকোচ কাটিয়ে উঠতে কয়েক মিনিট সময় লাগে আই-ওয়ানের। তারপর একসাথে খাওয়ার আনন্দে সব ভুলে যায়—একটু আগের একলা বোধও আর মনে থাকে না। পিওনী কাঠি দিয়ে আলতো করে শুধু একটু একটু ছোঁয় খাবারগুলো। একটু পরে এন্-লানের দিকে ঝুকে পড়ে বলে:

'বিপ্লবের কথা আর একটু ভালো করে বলুন আমায়। আমি বিশ্বাস করতে চাই।'

বলতে আরম্ভ করে এন্-লান্। পিওনীর মুখে কিসের আলো? ওই আলোর দিকে তাকিয়ে উপচিত বিশ্বাসে আই-ওয়ানের হৃদয় ভরে ওঠে।

মনে হয়—এসেছে বিপ্লবের প্রভাত। এই খানে এই ঘরে।

এন্-লান্ চলে গেলে আবার বসে পড়ে পিওনী। আই-ওয়ানকে বলে: 'তুমি তো আমায় অমন করে বুঝিয়ে দাওনি কখনও!'

পাল্টা জবাব দেয় আই-ওয়ান: 'আমার কথাতো তোর গায়েই লাগে না!'

হাসে পিওনী, 'হয় তো তাই। এত বড় অসম্ভব ব্যাপার এইটুকু পুঁচকে ছেলের মুখে শুনলে বিশ্বাস করা যায়! বিশেষ করে যাকে এইটুকুনি থেকে দেখছি। কিন্তু এন্-লানের কথা যেন বিশ্বাস না করে পারা যায় না।'

কি যেন ভাবে পিওনী চুপ করে। চিন্তার সঙ্গে মুখের ভাব বদলায়। বুঝতে পারে না আই-ওয়ান্, কিন্তু একটু হিংসা হয় মনে মনে।

'যেমন করেই হোক তোর যে বিশ্বাস হয়েছে রে শেষ পর্যন্ত, এই আমার ঢের।' বলে আই-ওয়ান্। 'এখন তোতে আমাতে দুটো কথা কইতে পারব। চুপচাপ বসে দিন গুনতে হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'যাই এখন,' পিওনী বলে, 'ঠাকমা হয়তো এতক্ষণে জেগেছেন।'

বাসন তুলতে তুলতে বলে, 'কি সুন্দর খেল ও। জোয়ান ছেলেরা হাসবে খেলবে, খাবে, খুব ভালো লাগে আমার দেখতে।'

'আসিস্ আবার কাজ সেরে লক্ষ্মীটি, কথা আছে তোর সাথে।'

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় পিওনী: 'না আজ আর নয়।'

অমিতবিক্রমে নদীপথে এগিয়ে আসছে বিজয়ী বীর চ্যাং-কাই-শেক তার বিপুল সেনা বাহিনী নিয়ে। কিউকিয়াং, আংকিং, উহু—একে একে নদী-তীরস্থ শহরগুলি পাকা ফলের মত টুপ্ টুপ্ করে খসে পড়ছে তাঁর হাতে। আশায় প্রতীক্ষায় টগবগ্ করে ফুটছে সাংহাই। রাস্তায় জনতার

অসংযত কোলাহল; রিকশওয়ালাদের ভাড়া খাটার তাগিদ নেই, ফিরিওয়ালার সওদা বেচার ব্যস্ততা নেই; সারাদিন রাস্তার পাশে বসে দাবা খেলে তারা। আর বলে ঃ

'চ্যাং কাই-শেক তো আসছেই, আর খাটে কোন ব্যাটা।'

যেন মস্ত বড় উৎসব। আই-ওয়ানদের বাড়ীর ভৃত্য-মহলেও লেগেছে তার হাওয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা বাইরে কাটায়। কর্ত্রী কিছু বললেই ফোঁস করে ওঠে ঃ 'জানেন আমরা ইউনিয়ন করেছি। যা খুশি তাই করতে পারি এখন।'

কর্তার কাছে নালিশ যায়। হুংকার দেন তিনি ঃ

'ওসব খুশি-টুসি এখানে চলবে না।'

'কিন্তু উপায়ই বা কি, বাবা?' আই-ওয়ান্ বলে। মনে মনে ওর বড় লজ্জা করে। অবাক হয়। রাগও হয় যখন যথা সময়ে খাবার পায় না। বিপ্লবে এদেরও অধিকার আছে, বুঝেও রাগ হয়। ভৃত্যদের ইউনিয়নের কথা ও শুনেছে আগেই।

'তাই বলে এসব বরদাস্ত করতে হবে?' সংক্ষিপ্ত জবাব দেন শ্রী উ, 'ছোটলোককে মাথায় উঠতে দিলেই হয়েছে! কখনও দেশের উন্নতি হবে?'

বাবার সঙ্গে একটু তর্ক করতে ইচ্ছে করে আই-ওয়ানের। কাঁধে পিওনীর স্পর্শ পেয়ে ইঙ্গিত বুঝে চুপ করে যায়।

ঝড় উঠেছে। প্রথম ঝাপটার পরের ক্ষণিক স্তব্ধতা। প্রথম উত্তেজনার পর ঘন প্রতীক্ষায় স্তব্ধ মানুষ। ভেতরে কি হচ্ছে জানে না আই-ওয়ান। যোগাযোগ সূত্র বিচ্ছিন্ন। নগরপালের হুকুমে সব স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, যাতে ছাত্রেরা দল পাকিয়ে হাঙ্গামা করতে না পারে। মিল্-এ, মিল্-এ চলছে ধর্মঘট। ফিরে আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আই-ওয়ান্ যাবে না ওদিকে। নেতার নিষেধ। কারণ, প্রত্যেকের ওপর কড়া নজর রেখেছে পুলিস। সুতরাং বিরাট নৈষ্কর্ম্যের বোঝা নিয়ে নিস্তব্ধ বাড়ীটায় প্রেতের মত ঘুরে ঘুড়ে বেড়ায় ও; বাগানে গিয়ে দেহ এলিয়ে বসে থাকে। কিন্তু ওর মন বলে, 'বন্দরের কাল হলো শেষ।' পিওনীই যা কথা বলার মানুষ; ও সব জানে— এই একটু সুবিধা।

কিন্তু পিওনী এক হেঁয়ালী। ওকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না আই-ওয়ান্। একদিন থাকতে না পেরে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে ফেলল ঃ

'তুমি সত্যি সত্যি আমাদের দলের?'

'জানিনে যাও,' জবাব দেয় পিওনী, 'দেখে তো নি আগে তোমাদের দৌড়টা।'

'আমাদের দৌড় যাই হোক না, তুমি বিপ্লবে বিশ্বাস কর কি না তাই জানতে চাই।'

'আমি তো আর তোমাদের মত পুরুৎ ঠাকুর নই। চ্যাং-কাই-শেক তোমাদের না হয় সাক্ষাৎ দেবতা। আমার কাছে তিনি মানুষই।'

'কে বল্লে চ্যাং-কাই-শেক আমাদের দেবতা! দেবতা-টেবতা আমি মানিনে। আমি জানি শুধু বিপ্লব।'

পিওনী বলে ঃ 'তোমাদের বিপ্লব মানে তো, এখনও দেখছি স্রেফ জনতার

স্বরাজ। তারা যা করে। তাদের মতিগতিটা একটু দেখি, রোসো। ভালো যদি হয় তবে থোরই আমি পেছনে পড়ে থাকব।'

আই-ওয়ান্ জানে ভুল করছে পিওনী। মানুষের কাজ দিয়ে তার বিশ্বাসের পরিমাপ হয় না। কোন কিছুর ভালো-মন্দের যাচাই হয়—তার আপন মূল্যে। কিন্তু পিওনীর কথা ও ভুলতে পারে না। রাতে শোবার আগে ডেস্কের কোণ থেকে পত্রিকা থেকে কাটা চ্যাং-কাই-শেকের ছবিখানা বের করে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে। তরুণ বীর। অনেকটা যেন এন্-লানের মত দেখতে। কোমলে কঠিনে, বাস্তবে, স্বপ্নে মেশান এক বিচিত্র মুখ।

'পুজো আমি করিনে। কিন্তু বিশ্বাস করি।' মনে মনে বলে ও।

শুধু আই-ওয়ানই নয়। বিশ্বাস করে সমগ্র জনতা। প্রতিটি সর্বহারা মানুষ—নর-নারী, বাল-বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী। ভ্রষ্টাচারী রাজ-বংশের পতনের পর জন-গণ একেবারে নিরবলম্ব হয়ে পড়েছিল। আঁকড়ে ধরার মত কোন অবলম্বন হাতের কাছে তাদের ছিল না। এতদিন পর আবার তারা ভরসা করবার মত জায়গা পেল, উঠে দাঁড়াবার মত শক্ত মাটি পেল। সান-ইয়াৎ সেন-এর মৃত্যুর পর বিশেষ করে তরুণদের জগৎ একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। ভালো করে চিনবার আগেই চলে গেলেন মহা-মানব। আশা-হত যুব-শক্তির সমস্ত আশা ভরসা তাই এখন বিপ্লবী-বাহিনীর এই তরুণ নেতার মধ্যেই আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

আর একটি মাত্র শহর বাকী—নান্‌কিং। অমিত-বিক্রমে, অমিতগৌরবে সিং সম্রাটরা একদা যেখানে রাজত্ব করেছিলেন। নান্‌কিং-এর পরেই সাংহাই। নান্‌কিংএর পতনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে প্রত্যেকটি মানুষ। সরকারী বাহিনী নগর প্রাচীরের সমস্ত প্রবেশ দ্বার আগলে আক্রমণ প্রতিরোধ করছে। বাইরে বিপ্লবী বাহিনী, ভেতরে বিপ্লব-কামী জনতা। শহরকে রক্ষা করবে কে?

শেষের কটা দিন আই-ওয়ান্ বিভোল হয়ে রইল এক বিপুল আনন্দে, বিপুল রোমাঞ্চে। সুখং নু, দুঃখং নু! যা কিছু করে ও, মনে হয় এই তো শেষ, মনে মনে জানা হয়ে আছে ওর এই তো শেষ! অন্তিম মুহূর্তের করণীয় ওর জানা আছে। চ্যাং-কাই-শেক্ এর জয়ের সংবাদ শোনা মাত্র এ-গৃহ ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরদিনের মত ছিন্ন করে আজন্মের নাড়ীর বন্ধন। তারপর প্রধান কেন্দ্রে গিয়ে এন্-লান্ ও অন্যদের সাথে মিলিত হবে। সেখানে কাজ বণ্টন হবে। নিজের ঘরে বসে পিওনীকে একদিন চুপি চুপি বলল এসব কথা। ধীর ভাবে শুনল পিওনী। আজকাল ও কেমন যেন আলাদা মানুষ হয়ে গেছে। আগের চাইতে আই-ওয়ানের ওকে অনেক বেশী ভালো লাগে। আজকাল পিওনী ওকে ছোঁয় না। খ্যাপায় না। মধুর লাস্যে ওর মনকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে না। পিওনী এখন শান্ত; সর্বদা কাজে ব্যস্ত। আজকাল আর ওর সান্নিধ্যে অস্বস্তি লাগে না আই-ওয়ানের।

অবশেষে একদিন বলল: 'আমার সঙ্গে তোকেও যেতে হবে, পিওনী।'

'জায়গা বলে দাও, বোধহয়—' কি যেন বলতে যায় পিওনী।

একটা জায়গার নাম লিখে দেয় আই-ওয়ান্। দেখে নিয়ে কাগজটা পুড়িয়ে ফেলে ও।

'প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞা করব না। ও আমি করিনে।' বলে ও।

কিন্তু লেখাটা দেখেছে পিওনী। আই-ওয়ান্ জানে কিছু ভোলে না ও মেয়ে।

ঠিক কখন কোন মুহূর্তে পালাবে সেই কথাই অনবরত বসে বসে হিসাব করে আই-ওয়ান্। জনতার বাঁধ ভাঙ্গবার আগেই যাওয়া দরকার। আই-ওয়ান্ চায় না এখানে তারা আসুক। অনেক সময় রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভয়ে কাঁপে ও। ইচ্ছে হয় বাবাকে সাবধান করে দিয়ে আসে। এগিয়ে যায় মন শক্ত করে, কিন্তু আবার পিছিয়ে আসে—বাবাকে ও জানে। ঐটুকু শুনেই ছাড়বেন না তিনি। অতএব এন্-লান্ এবং দলের অন্য বহুলোকের জীবন বিপন্ন হবে। তাই মর্মান্তিক হলেও নীরব থাকতে হয়।

তিন দিন পর। রাতে শহরে খবর ছড়িয়ে গেল নানকিং-এর পতন হয়েছে। তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেল আই-ওয়ান্। বাবা এক্ষুণি তো কত কি বলতে আরম্ভ করবেন। শুনতে পারবে না ও। কিন্তু ঘুম কিছুতেই এল না। আজই তো শেষ। আজ রাত এই গৃহের আশ্রয়ে। কাল কোথায় থাকবে কে জানে। যাবার আগে বাবাকে বলবে—না, নিজে নয়, বলে যাবে পিওনীকে। ও যদি যায় যেন বাবাকে সাবধান করে দিয়ে যায়, সময় থাকতে যেন পালিয়ে যায় সব। দুপুরের আগে কিছুই হবে না—কারণ বিপ্লব ঘোষণা করার সময় স্থির হয়েছে বেলা বারোটায়। ও বেরিয়ে যাবে ভোরের আগেই। কাজেই অনেক সময় থাকবে। কিন্তু বাবা মাকে পালাবার পথ করে দিলে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে না তো! মনটা কেমন সংশয়ে দোলে। পিওনীকে দিয়েই বা বলাচ্ছে কেন? নিজে কেন নিলো না এ ভার? ঘুম আসে না। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। দ্বিযাম পেরিয়ে—একটু তন্দ্রা এল—আধা স্বপ্ন আধা জাগরণ। স্বপ্ন দেখে ও— কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই......

তখনও ভোর হয়নি। বিষম ঝাঁকানীতে ঘুম ভেঙ্গে গেল আই-ওয়ানের। চোখ খুলেই দেখতে পেল তরল অন্ধকারে বাবার অস্পষ্ট মুখটা।

'শিগ্গির ওঠ্।' কঠিন স্বরের আদেশ আসে। নিমেষে জড়তা কেটে গেল আই-ওয়ানের।

আবার আদেশ করেন শ্রীযুক্ত উঃ 'শিগ্গির উঠে তৈরী হয়ে নাও।'

'কি হয়েছে?' ধড় মড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্।

চীৎকার করে ওঠেন বাবাঃ 'হতভাগা! শয়তান! আমার চোখে ধুলো?' আই-ওয়ান্ কথা বলে না। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে ও ভালোও বাসে, ভয়ও করে। আই-কো শুধুই ভয় করত। তাই সাহসে ভর করে আর একবার জিজ্ঞাসা করেঃ 'কি হয়েছে বাবা?' কি হয়েছে ও তো জানেই, তবু।

বাবা বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করেন—মস্ত বড় কাগজ, ছোট্ট করে ভাঁজ করা। একটা তালিকা। শ'য়ে শ'য়ে নাম রয়েছে তাতে। গ্রেফতারী-পরোয়ানা, আই-ওয়ানের হাতে তুলে দেন। এক এক করে পড়ে দেখে

ও স্কুল স্কুল ভাগ করে তালিকাটি তৈরী হয়েছে। ওদের স্কুলেরও নাম আছে—এবং তার তলায় নাম রয়েছে এন্-লানের, ওর এবং দলের সকলের। নাম নেই শুধু পেং-লিউর। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুদিন দেখেনি পেং-লিউকে। একবার বলে পাঠিয়েছিল, অসুখ করেছে তাই মিটিং-এ আসতে পারছে না। আবার কে যেন বল্লে—টাকা পয়সার অভাবে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছে। কেউ তেমন মাথা ঘামায়নি; গেছে তো গেছে। কিন্তু ওর নামটা তো নেই এই তালিকায়!

বাবা জিজ্ঞাসা করেন: 'জানো এটা কি?'

'জানি।' জবাব দেয় আই-ওয়ান্। নিজের মনকে বলে লজ্জা কিসের? ভয়ই বা কিসের? কোন অন্যায় তো করেনি! বাবার হাতে কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে: 'কোথায় পেলে?'

কঠিন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকান বাবা।

'তা দিয়ে তোমার কি দরকার? এখন শিগ্গির তৈরী হয়ে নাও। যে কোন মুহূর্তে সৈন্যরা এসে পড়তে পারে। আর রক্ষা থাকবে না তাহলে। চ্যাং-কাই-শেক এসে গেছেন।'

আই-ওয়ানের দেহ অবশ হয়ে আসে।

'চ্যাং-কাই-শেক!' জড়িত স্বরে উচ্চারণ করে ও।

'হুঁ, শহরেই আছেন। কাল এসেছেন।' বাবা বলেন।

'কিন্তু নান্‌কিং—' তেমনি জড়িত কণ্ঠে আবার শুধায় আই-ওয়ান্।

'কর্মচারীদের হাতে নান্-কিংএর ভার দিয়ে তিনি নিজে সোজা এখানে চ'লে এসেছেন। কথা কানে যাচ্ছে না? শিগ্গির কাপড় পরে নাও।'

'না, বাবা, পারবো না। কিন্তু...তুমি কি করে জানলে?' আই-ওয়ানের বুকের মধ্যে তোলপাড় চলছে। চ্যাং-কাই-শেকের কথা কি করে জানল বাবা? অসম্ভব—

'কাল দেখা হয়েছে আমার সাথে।' বাবা বলেন।

একটা তীব্র আশংকা বিদ্যুৎ চমকের মত হঠাৎ ওর ভেতরটাকে বিদীর্ণ করে দিয়ে যায়। বাবা আর চ্যাং-কাই-শেকের—!

বলে যান বাবা: 'হ্যাঁ, ব্যাংকারদের ডেকে ছিলেন কাল। আমরা বলেছি—টাকা চাই, টাকা দেব, গভর্ণমেণ্ট হাতে নিতে চাও নাও, যা খুশি কর। কিন্তু সাংহাইকে ছেড়ে দাও, বাপু, আমাদের ব্যবসা-পত্র নষ্ট করো না। হয়েছে, এখন ওঠ—তৈরী হবে, না মরতে চাও?'

'হতেই পারে না।' বলে ফেলে আই-ওয়ান্; শব্দগুলো যেন ওষ্ঠের কাছে এসে হোঁচট খায়। এ খবর কি করে জানাবে এন্-লানকে—আর দলের অন্যদের—?

বাবা বলেন: 'হতেই পারে না মানে? আলবৎ হয়েছে। ঘাস তো খায় না। চমৎকার মানুষ। বড় ভালো লেগেছে আমার—বুদ্ধি আছে, ক্ষমতা আছে, অথচ যা খুশি তা করে না। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে—শহরে একটি কম্যুনিষ্টও থাকবে না। হুকুম জারী হয়ে গেছে।'

দেহের সমস্ত রক্ত মুহূর্ত-পূর্বের শূন্য হৃদ্-পিণ্ডের দিকে ধেয়ে আসে। যেন বিদ্যুৎ-স্পর্শে ওর এতক্ষণকার দেহ-মন-জোড়া অবসাদ ক্রোধে আগুন

হয়ে জ্বলে ওঠে। আই-ওয়ান্ একটা জ্বলন্ত আর্ত চীৎকারে ফেটে পড়েঃ

'বিশ্বাস-ঘাতক! আমাদের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে!' বাবার সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে দুর্দান্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল আই-ওয়ান্ঃ 'কেন ...কেন...বিশ্বাস-ঘাতকতা...! আমরা যে বিশ্বাস করেছিলাম!'

জামা টেনে নিয়ে কোন মতে মাথা গলিয়ে দিয়ে বলেঃ 'আমি যাব...এক্ষুণি যাব...এন্-লান্ আর সবাই কোথায় আছে—খুঁজে খবর দিয়ে আসতে হবে—নইলে মরবে সব।'

লাফ দিয়ে উঠে বজ্র-মুষ্টিতে ছেলের হাত চেপে ধরে গর্জে ওঠেন শ্রী উ,

'খবরদার!—সোজা জাহাজ ঘাটায়। এক্ষুণি জাপানের জাহাজ ছাড়বে—। বাইরে গাড়ী তৈরী—'

ফোঁপাতে থাকে আই-ওয়ান্ঃ 'আমি যাব না।' ছেলেমানুষী, বোঝে, কিন্তু কান্না বাধা মানে না।

'যেতেই হবে।' কঠোর কণ্ঠের আদেশ আসে, 'এক্ষুণি, এই মুহূর্তে যেতে হবে। শুধু তোমার কথা নয়—সারা পরিবারের প্রশ্ন। আমি কথা দিয়েছি লিষ্টি থেকে তোমার নাম বাদ দেওয়া হলে তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবে আজই।'

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বাবার দিকে। ওর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। আবার বলেঃ 'তুমি আমাকে দিয়ে বিশ্বাস-ঘাতকতা করাতে চাও!' বাবার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু ওর কাঁধের ওপর লৌহ-বন্ধনীর মত শক্ত হয়ে আছে তাঁর দৃঢ় মুষ্টি।

'রেখে দাও বিশ্বাস-ঘাতকতা! তোমরাই বা করতে বাকী কি রেখেছ? সব কম্যুনিষ্টদের ফাঁসী হবে। হুকুম-জারী হয়ে গেছে। কম্যুনিষ্টদের কবল থেকে বিপ্লবকে মুক্ত করতে হবে। সব সাবাড় হবে এবার। কি ভেবেছ তোমরা। হাজার হাজার নাম আছে ওদের তালিকায়—'

আই-ওয়ানের চোখের সামনে ঘরটা যেন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে; তার মাঝখানে বাবার কালো চোখের তীক্ষ্ন দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ওর দিকে। সব মিথ্যা! সব মিথ্যা!

'পিওনী!' বাবা ডাকেন চীৎকার করে, 'পিওনী! শিগ্গির শুনে যাও!'

আই-ওয়ান্ বাবার বুকে ঢলে পড়ে।

'কোথায় রে, পিওনী?' বাবার উচ্চ কণ্ঠ কোলাহল হয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে পড়ল সারা ঘরময়। তারই মধ্যে প্রতিধ্বনির মত ভেসে এল ভৃত্যের চীৎকারঃ

'পিওনীকে পাওয়া যাচ্ছে না, হুজুর, কোথাও। সে নেই—। চলে গেছে!'

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্যামল রংএর ছোট ছোট দ্বীপগুলির ভিড় ভেঙে, আলোয় ঝল্-মল নীল জলের বুক বেয়ে এগিয়ে চলছে জাহাজ। বাতাসে উষ্ণতা। আকাশে নিবিড় শান্তি। চারদিক মৌন-মুখর। শুধু জাহাজের গতির মুখে জল-ভাঙার ছল্‌ছলানী শোনা যায়। দূরে দ্বীপের ফাঁকে ফাঁকে আনাগোনা করছে জাপানী জেলে নৌকার ঝাঁক। নীল আকাশের গায়ে তাদের শাদা পাল উড়ছে। ডেকে আরাম চেয়ারে এলিয়ে তাকিয়ে আছে আই-ওয়ান্ শূন্য মনে। কিছু ভাবতে পারছে না ও—ভাবতে চায়ও না। মনে আনতে চায় না। মনে এনেই বা লাভ কি? উপায় নেই, কিছু করবার নেই। কাজেই শূন্যতাই ভালো। অসীম শূন্যতা— হা হা করা শূন্যতা। শূন্যতার মধ্যে ডুবে যাক ওর অসহায়তা।

কিন্তু শূন্যতা ঠেলে পুরাণো কথাটাই মনে আসে বার বার—যদি এন্-লানকেও অন্ততঃ বলে আসতে পারত! মনে আস্‌তেই পাগল হয়ে ওঠে ও। না না—আর না,—আর ভাববে না—এসো, এসো মহাশূন্যতা—সমস্ত চিন্তা, স্মৃতি অতল কালোয় ডুবিয়ে দিয়ে নেমে এসো, ছেয়ে এসো।...খবর দিতই বা কি করে! কোন উপায় তো ছিল না। আর ততক্ষণ হয়তো প্রাণে বেঁচেও ছিল না এন্-লান্। পিওনীকে লিখে রেখে আসতে পারত ওকে খবর দেবার জন্য। তা সে মেয়েও উধাও! কিন্তু কোথায় গেল পিওনী? কখনই বা গেল? 'পিওনী? পিওনী চলে গেছে?' বলে বাবার সেই অবিশ্বাসের চীৎকারটি এখনও ওর কানে বাজে...একি?...আবার?...

দুই হাতে বুক চেপে আবার আহ্বান করে শূন্যতাকে। স্মৃতি ওর একে-বারে শূন্য হয়ে যাক। সব ডুবে যাক।

সব! সবের আছেই বা কি? সব তো ডুবেই গেল—এতগুলি প্রাণের

সম্মিলিত আশা—! দলের ছেলেদের কথা মনে হয়ে বুকটা টন্ টন করে, হয়তো মিল্ এই ফিরে গেছে তারা পুরাণো বন্দরের মধ্যে পুরাণো নৈরাশ্য বুকে বয়ে। ওকে মিথ্যাবাদী ভেবেছে ওরা; বিশ্বাস-ঘাতক ভেবেছে। নয়তো ভেবেছে মরে গেছে ও। তাই যেন হয়, তাই যেন হয়। মরে গেছেই ভাবুক। ওদের সাথে আর যেন কোনদিন দেখা না হয়...

দিনের পর দিন দৃষ্টির সামনে শুধু শূন্যতা...আকাশের শূন্যতা...জলের শূন্যতা। স্বপালু দ্বীপগুলি এক এক করে পাশ দিয়ে চলে যায়। বাবার ওপর ঘৃণা ফিকে হয়ে আসে। এখন বোঝে সাংহাই এ থাকা সম্ভব হত না। হয়তো প্রাণেই বাঁচত না; যদি বা বাঁচত, থাকতে পারত না ওখানে। কারণ আবার সেই উদ্দেশ্যহীন একঘেয়ে পুরাণো জীবনে ফিরে যেতে হত—সেই ইস্কুলে যাওয়া—আর ঘরে ফেরা—সম্ভাবনাহীন, স্বাদহীন ঘরে ফেরা—সেই রোজ জরতী ঠাকুরমার বন্ধ ঘর—আর আফিং-এর গন্ধ...তার ওপরে পিওনী নেই। কিছুতেই পারত না ও। পিওনীকে কি খুঁজবে ওরা? বাবা বলবেন—গেছে, বালাই গেছে। আর একজন এনে দেব।

ভাবতে পারে না আই-ওয়ান্। চোখ বন্ধ করে। চোখের পাতা ব্যথা করতে থাকে। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা যেন দুম্ড়ে মুচ্ড়ে ভেঙে যেতে লাগল। বুক তো কত কারণেই ভাঙে। ব্যর্থ প্রেমে ভাঙে, পড়েছে আই-ওয়ান্ বইয়ে। কিন্তু সত্যিকারের বুক ভাঙে, মানুষের স্বপ্ন ভাঙলে—যেরকম স্বপ্নই হোক না কেন।

শূন্যতার স্রোতে গা ভাসিয়ে এলিয়ে পড়ে থাকে আই-ওয়ান্। সমুদ্রের কোমল বাতাস স্পর্শ বুলিয়ে দেয় ওর দেহে। কোথায় কে একজন নাবিক কিসের হাঁক তোলে—নির্জনতার বুকে সঙ্গীতের ঢেউ তোলে সে ধ্বনি। কিন্তু ওর কাছে সব এখন অর্থহীন। রাত্রি এসে আড়াল করে দিক ওকে—দিনের আলো যেন ওর দিঠি খুঁজে না পায়।

জাহাজ থেকে নামতে যদি না হত! অনন্তকাল ধরে এমনি যদি ভেসে যেতে পারত! কিন্তু এসে গেছে নাগাসাকী—কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজ ভিড়বে ঘাটে। টিকিটের মেয়াদ ফুরিয়েছে। কি করতে হবে না হবে সব লিখে দিয়েছেন বাবা। আর একবার পড়ে নেয় নামবার আগে। সবই এখন সমান ওর পক্ষে। তাই বাবার নির্দেশ মত কাজ করলেও কোন লোকসান নেই। লিখেছেন বাবা মিঃ মুরাকী তাঁর পুরাণো বন্ধু। ব্যবসায়ী। জাহাজ-ঘাটা থেকে তাঁর বাড়িতেই ওকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই ও থাকবে। মিঃ মুরাকী তাঁর ব্যবসায়ে কিছু একটায় লাগিয়ে দেবেন। উপার্জনের প্রয়োজনে নয়। যা টাকা দেওয়া হল, ফুরোলেই আবার টাকা পাঠাবেন তিনি; তবু কাজ কর্মের মধ্যে থাকাই ভালো। অবস্থা অনুকূল হলে তবে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা যাবে।

'আর ফিরেছি!' মনে মনে বলে আই-ওয়ান্। যে চীন ওর স্বপ্নে ধরা দিয়েছিল, সে চীনেই যদি না ফিরতে পারল—তবে চির-নির্বাসনই ভালো। নেই, ওর দেশ নেই। ব্যাগ বন্ধ করে ডেকে বেরিয়ে এল আই-ওয়ান্। দুপুর গড়িয়ে গেছে। ধীরে ধীরে নোঙ্গর করছে জাহাজ।

বড় অদ্ভুত লাগছে জায়গাটা ওর! খাড়া পাহাড় উঠে গেছে প্রায় সমুদ্রের

ধার থেকে। পর্বত আর জলের মাঝখানের সরু ফালিতে ছোট্ট একটা শহর। বাড়িগুলো কোনাচে। টালির চাল ঝলমল করছে রোদে। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় একখানা জল-ভরা কালো মেঘ। জাহাজের চারদিকে ভিড় করে এগিয়ে আসছে বড় বড় কয়লার নৌকা। খাটো, পেটানো-দেহ জাপানী নারী ও পুরুষ কুলির দল ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজ থামলেই লাইন-বন্দী হয়ে এ কাঁধ থেকে ও কাঁধে চালান করে করে কয়লার বস্তা জাহাজে তুলে দেবে। ওদের কোলাহল কানে আসছে কিন্তু একটা কথাও বুঝতে পারছে না। কিছুই যেন নূতন লাগে না। নূতন লাগার মত কিছু নেই। সব ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে ওর জীবনে।

অন্য যাত্রীদের পেছন পেছন নড়বড়ে সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গিয়ে আর একটা লঞ্চে উঠল আই-ওয়ান্। জাহাজে এ পর্যন্ত কারো সাথে ও কথা বলেনি। কারো সাথে পরিচয়ও হয়নি। অধিকাংশই ছিল আমেরিকান ভ্রমণ-কারী। দেশ দেখতে বেরিয়েছে। মিস্ মাইৎল্যান্ড আর মিঃ রানার্ডের ইংরীজী শুনে খানিকটা অভ্যস্ত থাকায় ওদের ইংরাজী মোটামুটি বুঝতে পারে আই-ওয়ান্। মিঃ রানার্ডের কথা মনে হতেই মনে পড়ে যায় পেং-লিউর কথা। মিঃ রানার্ডের নাম চরম তালিকায় তুলতে চেয়েছিল পেং-লিউ। কিন্তু......! পেং-লিউ ছাড়া আর কারো কর্ম নয়। ওই ডুবিয়েছে সবাইকে। দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয় বৃথা চিন্তা। যা খুশি করুক পেং-লিউ! হয়তো এতদিনে আবার মিস্ মাইৎ-ল্যান্ডএর ক্লাস চলছে নিয়মিত। কয়েকটা আসন শুধু শূন্য পড়ে আছে...এন্-লান্? বেঁচে আছে এন্-লান্? না মরে গেছে? কে দেবে খবরটুকু?

নিস্তরঙ্গ জল ভেঙে এগিয়ে চলেছে লঞ্চ। খট্‌খটে রোদের মধ্যে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এল তির্যক রুপোলী ধারায়। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার থেমে গেল। লঞ্চ এসে ডকে লাগতেই সাহেবী পোযাক পরা এক জাপানী যুবক আই-ওয়ানের সামনে এগিয়ে এসে চীনে ভাষায় জিজ্ঞাসা করল: 'আপনি কি উ আই-ওয়ান?'

'আজ্ঞে হাঁ!' আই-ওয়ান্ বলে।

'আমি মিঃ মুরাকীর ছেলে বুঞ্জী। বাবা আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।' যুবক বলে হেসে।

সাদা ধব্‌ধবে দাঁতের পাটি, খুশিতে ভরা চোখ। চৌক মুখ। টুপীটা খুললে কালো চুলগুলি খাড়া হয়ে মাথাটা গোলাকার ব্রাশের মত হয়ে উঠল। মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠল যুবক:

'ইংরীজী চলবে? আমার একটু সুবিধে হয়। অবশ্যি আমার ইংরীজীও খুব খারাপ।'

'আমার আপত্তি নেই।' আই-ওয়ান্ বলে।

ছোট একখানা মোটর গাড়ীতে উঠতে উঠতে মনে মনে বলে আই-ওয়ান্—ভালই হল চীনে ভাষা আর বলবে না ও। দেশের কিছু আর রাখবে না জীবনে। এই মুহূর্ত থেকেই ওর পূর্ণ নির্বাসন। আর স্বপ্ন দেখবে না। করবে না আশা, বিশ্বাস করবে না কাউকে আর। মুহূর্ত ডিঙিয়ে কালের দিগ্‌বালে আর চোখ ফেরাবে না।

গাড়ী এসে একটা গেটের সামনে থামল। নীচু ইঁটের পাঁচিলের গায়ে খড়-ছাওয়া গেট। বুঞ্জী গাড়ীর দরজা খুলে লাফিয়ে নামল। নড়া-চড়ার ভঙ্গি ওর বিচিত্র। একেবারে মাপ-সই জ্যামিতিক কোণ রচনা করা—মাংস-পেশীগুলি যেন এক দুই তিন চার করে ড্রিল-দুরস্ত।

'এই যে আমাদের বাড়ী', বলে এক গাল হেসে বুঞ্জী আই-ওয়ানের ব্যাগটা তুলতে যায়।

বাধা দেয় আই-ওয়ান্। বুঞ্জী প্রতিবাদ করে। তারপর দুজনেই ধরা-ধরি করে নিয়ে চলে ব্যাগটা। কয়েক পা যেতেই এক বৃদ্ধ এসে ওদের হাত থেকে ব্যাগটা তুলে নেয়।

'আমাদের মালি', বলে বুঞ্জী।

বাগানের ভেতর দিয়ে পথ। কৃত্রিম পাহাড় আর হ্রদে সাজানো অপূর্ব রচনা। একটা ছোট ঝরণার ওপর লাল রং করা ছোট পুলটি পার হয়ে আঁকা বাঁকা পথটার শেষ প্রান্তে ওদের বাড়ি। নীচু ছাদ—ঘন সবুজ পাতায় ছাওয়া ফুলন্ত গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে ঝিলমিল করছে জানালার সাদা কাগজের খড়খড়ি। বাগানখানার নিখুঁত রূপ নয়ন-মনে লোভন। গাছের নীচে নীচে সবুজ শ্যাওলার গালিচা, একটিও ঝরা পাতা পড়ে নেই তাতে। ঝরণাটায় একটি পাথরও স্থান-ভ্রষ্ট নেই।

'আমার বাবার বাগান নাম-করা।' বুঞ্জী বলে। তারপরই সামনে হাত দেখিয়ে বলেঃ 'ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা'ঃ

দূরে রূপো রং-এর কিমনো-পরা তনু-দেহ এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন একটা চেরী গাছের নীচে। সময়ের আগেই ফুল ফুটেছে চেরী গাছটায়। একটা ডাল ধরে কুঁড়িগুলো দেখছিলেন তন্ময় হয়ে। ওরা কাছে আসতেই মুখ ফিরিয়ে ছেলেকে বললেন জাপানী ভাষায়ঃ

'আরে! তোরা এসে গেছিস্!' তারপর কেতাবী চীনে ভাষায় স্বাগত করলেন অতিথিকেঃ

'তোমার বাবা আমার কতকালের বন্ধু। এসো এসো। এ তোমারই বাড়ি মনে করো।'

প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লাগল ভদ্রলোককে। যে-অধ্যায় পেছনে ফেলে এল, সে অধ্যায়ে একদিন পণ করেছিল আই-ওয়ানবা শাসন ক্ষমতা হাতে এলে জাপানীদের সঙ্গে লড়াই করে সমস্ত হৃত বস্তু, হৃত অধিকার ওরা ফিরিয়ে আনবে। জাপানীদের একুশ দফা দাবীর পর জাপানী-বিদ্বেষ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল চীনে এবং সুযোগ পেলেই জাপানকে আঘাত করার প্রস্তুতি চলছিল বিপ্লবীদের মনে মনে। কিন্তু কিছুতেই এই মানুষটিকে ঘৃণা করতে পারল না আই-ওয়ান্। মাথায় রজত-শুভ্রতা, হাল্কা সোনালী গায়ের রং—কিন্তু গভীর কালো চোখ দুটিতে তারুণ্যের দীপ্তি। ক্ষুদ্রাকার মানুষটিকে আই-ওয়ানের মনে হয় শিশু। এমন মানুষকে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারে?'

উত্তর দেয় আই-ওয়ান্ঃ 'দয়া করে ঘরে তুলছেন আমায়, আমি যোগ্য নই এর।'

চেরীর ডালটি তখনো হাতে ধরা; মুরাকী বলেনঃ

'ও আবার একটা কথা! তোমার বাবা আমার বন্ধু। এখানকার সব কিছু নিজের মনে করবে—বুঝলে? খুব ভালো সময়ে এসে পড়েছো। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সারা জাপান ফুলে ছেয়ে যাবে।'

বুঞ্জী বলেঃ 'বুঝলে। বসন্তকালে এলেই বাবা চেরী ফুলের দিকে হন্যে হয়ে চেয়ে থাকেন, আর হেমন্তে আছে চন্দ্রমল্লিকা।'

খানিকক্ষণ সবাই কেমন অপ্রতিভের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন মুরাকীঃ 'হয়েছে, খুব হয়েছে, যা তো এখন। বেচারাকে একটু বিশ্রাম করতে দে গে।'

যেতে যেতে বলে বুঞ্জীঃ 'বাবা অবসর নিয়েছেন—আমার দুই দাদা কাজ দেখে এখন।'

'আর তুমি?' আই-ওয়ান্ জিজ্ঞাসা করে।

'ওঃ, আমি? আমি কেরাণী! মাল প্যাক করি আর বিল করি। আমাদের চালানী কারবার।'

প্রশস্ত একটা দরজার কাছে এসে পৌঁছুতেই সুন্দরী দুই তরুণী পরিচারিকা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে এল। গায়ে তাদের উজ্জ্বল রং-এর সুতী কিমনো। বুঞ্জী থেমে এক পা বাড়িয়ে দিল। একটি মেয়ে উবু হয়ে বসে ওর জুতো খুলতে লাগল। আই-ওয়ানের পায়ের কাছেও বসে পড়ল আরেকজন। আই-ওয়ান্ শুনেছিল আগেই। তাই স্ত্রীলোকের সেবা গ্রহণ করা কেমন কেমন লাগলেও চুপ করে রইল। জুতো খুলে নিয়ে নরম ঘাসের চটি / পরিয়ে দিল মেয়েরা। বুঞ্জীর পেছন পেছন ঘরে গিয়ে ঢুকল ও। এ ধরণের বাড়ি কখনও দেখেনি এর আগে। কাগজের খড়খড়ি দিয়ে পৃথক করা অনেকগুলি কামরা। ঝকঝকে তকতকে মস্ত বড় একটা মৌচাকের মত মনে হয়। মেজের ওপর পাতা পরিচ্ছন্ন গালিচার সুবাসের সাথে মিলেছে পালিসহীন কাঠের সৌগন্ধ। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে বাগান থেকে মধু ঋতুর মধু বাত।

বুঞ্জী বলেঃ 'বাবা সাবেকী কেতায় থাকতে ভালো বাসেন। তাই দেখছ না—কিন্তু তোমার ঘরে একটা চেয়ার দেওয়া হয়েছে। আমার ঘরেও আছে। আমার বড় ভাই শি-ও। বিয়ে থা করেছে। ইয়া-কোহামায় থাকে, তার প্রত্যেক ঘরে চেয়ার আছে। ও পুরো-দস্তুর সাহেব।

বুঞ্জী হো হো করে হেসে ওঠে। আই-ওয়ানও স্মিত হাসে। কিন্তু অন্তর রাজ্যে ওর নিথর নিস্তব্ধতা। ত্রিকাল থেকে ওর দুটি কালের হিসেব খসে গেছে। এখন শুধু প্রতি মুহূর্তের বর্তমান। এই মুহূর্তের সারা —আর পরের মুহূর্তের সুরু নিয়ে এখন ওর পথ চলা। কাজেই হাসির খোরাক পেলে হাসছে বটে, নূতন দেশের নূতন রং চোখেও লাগছে কিন্তু দাগ ধরছে না মনে।

'এই যে তোমার ঘর', বুঞ্জী বলে, 'আমার ঘর পাশেই। দরজা খুললেই বাগান পাবে।'

পর্দাটা সরিয়ে দিতেই দেখা গেল একখানা চৌক আকারের ঘর। খাট বিছানা নাই, আছে শুধু একটা বাঁশের আরাম চেয়ার আর টেবিল। ওদিকের কোণে একটা কবিতা লেখা পট ঝোলান। তার নীচে সবুজ ফুলদানীতে

হৃথর্ণ কুঁড়ির গুচ্ছ। এ ছাড়া আর কোন সজ্জা নেই ঘরে। আর একটা পর্দা সরিয়ে দেয় বুঞ্জী—বাগানের একটা টুকরো। যেন ঘরখানারই অংশ। ওধারে প্রাচীরের গায়ে একটা খর্বীকৃত মেপ্‌ল গাছ—লাল রং-এর কুঁড়িতে ছেয়ে আছে। তার তলায় ফুট দুই দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ছোট একটা পুকুরের মত, তার ধার থেকে উঠে গেছে কৃত্রিম পাহাড়।

'মালিরা ছাড়া এখানে কেউ আসে না', বলে বুঞ্জী। 'বেশ নিরালায় থাকবে। সম্পূর্ণ তোমার আপন রাজ্য। ঘুম পেলে হাত তালি দেবে, ঝি এসে বিছানা করে দিয়ে যাবে। আধঘন্টাখানেকের মধ্যেই খাবার তৈরী হয়ে যাবে। নাইবার জল এসে যাচ্ছে, ঠিক ঠাক হয়ে নাও। আমি এক্ষুণি আসছি।'

বুঞ্জী চলে গেলে ও বসে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সারা বাড়ি-খানা নিঝুম, নিথর, নিস্তব্ধ। শুধু দূর থেকে পর্দা সরানোর খস্‌খস্‌ শব্দ, আর কার যেন একটা অস্পষ্ট গুন্‌গুনানী ভেসে আসছে। বাগান খানার মতই বাড়িখানাও পরিপাটি করে সাজানো গোছানো। কোথাও এক কণা ধুলো পর্যন্ত নেই। সান-বাঁধান মেজের শেষেই নিপুণ হাতে ছাঁটা শ্যামল ঘাসের গালিচা বিছানো মাটি—। ঘর বাহির মেশামেশি হয়ে আছে। ঘর-খানাই যেন ওই সাজানো বাগানে বিস্তার পেয়েছে। গভীর শান্তি ভরা একটা আবেশ লাগে। যেন নির্ভাবনার আশ্রয়। জীবন এখানে সুবিন্যস্ত সুপরি-কল্পিত। ভারহীন, অস্পষ্টতাহীন, সম্পূর্ণ মালিন্য-হীন। গতি আছে, কিন্তু সাথে আছে পায়ের তলায় স্থির ভূমির নিশ্চিন্ততা। আছে স্থিতির দৃঢ়তা-বোধ। পুরুষানুক্রমে ঠিক একই স্থির ধারায় জীবন প্রবাহিত।

ভালোই হয়েছে এখানে এসেছে আই-ওয়ান্‌। ওর লক্ষ্য গেছে খোয়া, পথ হয়েছে প্রান্তর। সারা জীবন ওই প্রান্তরেই ও ঘুরে মরবে। তাই ভালো। কি লাভ হত দেশে থেকে! বুক ভরা এত আশা, এত স্বপ্ন একটি ফুঁয়ে নিমেষে উড়ে গেল, তখন কিসের আর জীবন। কোন মতে বেঁচে থাকা. এই যা। বড় ক্লান্ত মনে হয়। ঘাসের ওপর পা মেলে জলের দিকে তাকিয়ে মেজের প্রান্তে এসে বসে। মন ক্রিয়াশূন্য, হৃদ্‌পিণ্ড স্পন্দনহীন।

পর্দার ওধারে কার যেন কাশির শব্দ। বুঞ্জী।

'এসো!'

গাঢ় রং-এর সিল্কের কিমনো-পরা বুঞ্জী ঘরে এসে ঢোকে। চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে। খাঁটি আর একটি মুরাকামী। হাতে একটা সিল্কের জামা।

'নাও।' বলে বুঞ্জী। খুলে ধরে জামাটা। আর একটা কিমনো।

'নাই পরলাম এটা! কিছু মনে করবে না তো!' বলে আই-ওয়ান্‌। 'আমার সাথে আছে। তাই পরি, কেমন?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়! আমি ভাবলাম, তুমি আনোনি। কোট পেন্টুলান যা বিশ্রী। ওসব কাজের পক্ষে বেশ ভালো। কিন্তু অন্য সময় মোটে আরাম নেই।' বলে বুঞ্জী।

নীল রং-এর রেশমী আলখাল্লাটা খুলে পরে নেয় আই-ওয়ান্‌। শেষ-বারের মত বাড়িতে পরেছিল সেদিন দেশী পোষাক।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওরা—ভিন দেশের দুই ভিন্ন মানুষ—চোখের কালোয়, চুলের কালোয় আর জোয়ান বয়সে এক হলেও দু-জন দুরকম। বুঙ্জীর চেয়ে আই-ওয়ান্ মাথায় অনেকটা লম্বা, ছিপ্ছিপে দেহের গড়ন, মুখের কাট লম্বা ছাঁদের, হাত-পা নরম তুলতুলে। কিন্তু বুঙ্জী গাঁটা-গোট্টা জোয়ান।

বুঙ্জী বলেঃ 'আসলে আমাদের দেশ আলাদা হলেও, পোষাক প্রায় একই রকম। আমি যেটা পরেছি, তা তোমাদের দেশেরই সেকালের বস্তু। তুমি পরেছ একেলেটা। আরে দেখিনি তো। আস্তিনটা অত ঢলঢলে নয়, তাই না! ভারী সুন্দর তো! অত ঢলঢলে আস্তিন দুচোখে দেখতে পারিনে আমি। তা আমাদের পোষাকও খুব সুন্দর। আমার বোনটিকে তো দেখনি এখনও! সে মনে প্রাণে আধুনিকা। কিন্তু হলে হবে কি! বাড়িতে ওসব একেলে চাল চলে না। মেমসাহেবী পোষাকে সত্যি ভালো লাগে না ওকে দেখতে। যাক, চল এখন। তোমারও ক্ষিদে পেয়েছে। আর আমার পেটে তো দিনরাত্তির আগুন।'

খানিকটা হাসি দিয়ে উপসংহার করে বুঙ্জী। তারপর আই-ওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে আসে বাগানের দিকে খোলা আর একটা ঘরে। দরজার কাছে একটু থেমে মা-বাবাকে মাথা ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভেতরে ঢোকে।

'এই যে মা, আই-ওয়ান্।' পরিচয় করিয়ে দেয় বুঙ্জী।

শ্রীমতী মুরাকীকে অভিবাদন করে আই-ওয়ান্। এত সুন্দর! অবাক হয়ে যায় ও। ওর মা স্থূলাঙ্গী। কিন্তু এ মানুষটির একমুঠো ক্ষীণ তনু, বিষণ্ণ মুখ, চোখের তারায় উচ্চারিত স্তব্ধ ধৈর্যখানি—একেবারে আলাদা রূপ! পঞ্চাশোর্ধ বয়েস, চুলে পাক ধরেছে—তবু অপূর্ব মুখের কমনীয়তা আর লাবনিমা। ফিকে বেগুণী রং-এর সাধারণ মোটা সিল্কের কিমনো পরা। নীচু হলে গভীর বেগুণী রং-এর চওড়া বন্ধনী-বাঁধা কটিতটে রেখা এঁকে দেহখানি বেঁকে যায়। তারপর হাওয়ার ঝাপ্টায় নুয়ে-যাওয়া ফুলের মত আবার ধীরে ধীরে সোজা হয়ে ওঠে।

'ভারী খুশি হয়েছি, তোমার আসাতে।' বলেন শ্রীমতী মুরাকী গভীর নিশ্বাস ফেলে। 'বসো, বসো! আমার ইংরাজী শুনে কিছু মনে করো না। চীনে ভাষা কি আর শিখতে পারলাম! লজ্জায় মুখ দেখাবার জো নেই আমার।'

'তা আমি চট্পট্ জাপানী ভাষা শিখে নিচ্ছি দেখুন না। আপনার সাথে জাপানীতেই কথা কইব তখন।' বলে আই-ওয়ান্।

'বেশ বেশ!' কোমলভাবে জবাব দেন শ্রীমতী।

বাগানের সামনে খোলা দরজার মুখোমুখী পাতা নীচু টেবিল ঘিরে রুপোলী রং-এর আসন। ঘরের এক কোণে একটা পট ঝোলান,—তার নীচে রেকাবীতে নার্সিসাস্ ফুল। সামান্য সজ্জার কি অসামান্য রূপ। দিনটায় ঠাণ্ডার আমেজ। সমস্ত আবহাওয়াটাই ফুরফুরে হাল্কা, গভীর শান্ত আনন্দে মনোরম। কুঁচ-বরণ এক কন্যা খাবার নিয়ে এল। প্রত্যেকের সামনে সাজিয়ে দিয়েই বেরিয়ে গেল সে। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল বুঙ্জী। মা বাবাও হাসলেন একটু।

'আমার বোন', বলে বুজী, 'ভারী লাজুক মেয়ে। আজ আর এখানে খেতে বসছে না।'

আই-ওয়ান্ বলে, 'কি নিয়ম টিয়ম তোমাদের দেশের জানিনে তো। কথা তো বললাম না তোমার বোনের সাথে!' ভদ্রতার রীতি অনুসারে একবারও তাকায়নি আই-ওয়ান্ তরুণীর দিকে।

কি যেন বললেন শ্রীমতী মুরাকী অতি কোমল ক্ষীণ স্বরে। বুঝতে পারে না আই-ওয়ান্। অনুবাদ করে দেয় বুজী, 'মা বলছেন, ওতো এক্ষুণি আসবে আবার।'

তামা। কন্যার নাম তামা। কিন্তু আর এল না সে। মাছ নিয়ে এল ঝি। আবার হেসে উঠল বুজী।

সাথে সাথে হাসল সবাই। নিমেষে কি এক গভীর শান্তিতে আই-ওয়ানের চিত্ত ভরে উঠল। না, আর ভাববে না আই-ওয়ান্। রুদ্ধ করে দেবে এবার স্মৃতির দুয়ার। কিই বা আছে মনে রাখবার মত! এ গৃহের বাতাসে এত প্রসন্নতা! কি শুদ্ধ শুচিতা! আকাশে কি আলোর দাক্ষিণ্য! ঘরে ঘরে পালিশহীন কাঠের কি স্নিগ্ধ সুবাস! চারদিকে কোথাও কোন আগল নেই, কোন জটিলতা নেই। সহজ হাসি, সহজ কথা, চলার ছন্দ লঘু, কাজের ভঙ্গি লঘু। কোন দুঃখই যেন নেই।

'আমাদের গরীবের খুদ কুড়ো খেতে পারছ তো?' শ্রীমতী মুরাকী শুধান।

'আমার সব ভালো লাগে।' বলেই, নিজের অন্তরঙ্গতার সুরে লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্।

'বেশ! বেশ!' মুরাকী বলেন, 'জোয়ান ছেলেদের এমনিই তো হওয়া দরকার।'

স্বামী স্ত্রী দুজনে স্নিগ্ধ হাসি হাসেন। আই-ওয়ান্ বোঝে, ও সুস্বাগত।

কথা-বার্তা হল সামান্যই, কিন্তু স্বচ্ছন্দ। খাওয়ার পর এল চা। চা'র পর শ্রীমতী মুরাকী উঠলেন। একটা প্রজাপতি যেন ডানা গুটিয়ে চলে গেল। মিঃ মুরাকী আই-ওয়ানকে বলেনঃ

'তোমার বাবার ইচ্ছে, তুমি আমাদের এখানে কাজ শেখ। আমি ভাবছি —অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকলে, সকাল বেলাটা বুজীর সংগে গিয়ে একটু কাজ কর্ম দেখ শোন। বিকেলে পড়ো, শোন, খেল যা ইচ্ছে।'

কৃতজ্ঞতা জানায় আই-ওয়ান্। ভালোই হল—নিজের ভার নিজের আর বইতে হবে না। হাতড়ে হাতড়ে জীবনের পথ খুঁজে ঘুরে মরতে হবে না। একেবারে ঘন্টা মিনিট অবধি ছক কেটে পুরো নকসা তৈরী করে দেবে ওর হয়ে আর একজন। এমনিভাবেই চলতে চায় ও এখন। এই ভালো।

উঠে পড়েন মিঃ মুরাকী, 'বেশ তাহলে ওই কথাই রইল। ভালো না লাগলে আমায় বলবে, কেমন?' কতক প্রশ্ন, কতক আদেশের সুর, কিন্তু সৌজন্যের অভাব নেই।

'না না, ভালো লাগবে না কেন? খুব ভালো লাগবে আমার।' আই-ওয়ান্ বলে।

'বেশ! আমি চাই, কেউ অসুখী থাকবে না এ বাড়ীতে।' বলে বাগানের দিকে চলে যান মিঃ মুরাকী।

বুজীর চোখে দুষ্টুমী ঝিকমিকিয়ে ওঠে। বলেঃ

'এইবারে আমাদের তামারাণী আসবেন। তারপর আই-ওয়ান্! মহারাণীর অভ্যর্থনাটা একেলে ঢং-এ হবে না সেকেলে ঢং-এ?'

আই-ওয়ান্ লজ্জায়, ভয়ে বিব্রত হয়ে ওঠে। জিজ্ঞাসা করেঃ 'কি পছন্দ করে তোমার বোন?'

'সে আমি বলছিনে, নিজে দেখে নেবে,' বলে বুজী. 'এই, চুপ করে থেকো না, কথা বলতে থাক।'

কিন্তু মুখ বন্ধ হয়ে যায় দুজনেরই। কয়েক মুহূর্ত পর বুজী হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলেঃ 'কি কথা বলি বলতো?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না।' আই-ওয়ান্ বলে। বুজীর সঙ্গে সঙ্গে ও-ও না হেসে থাকতে পারে না।

'কি ছেলেমানুষী করছি দেখেছ? বাস্, এইবারে আর নো হাসি।' বলে বুজী।

'প্যাঁচা মুখই বুঝি তোমার বোন ভালোবাসে?' বড় ভালো লাগে একটু ছেলে-মানুষী করতে পেয়ে। কত খুনসুড়ি করেছে পিওনীর সাথে। কি আনন্দেই না দিন গেছে। বিপ্লব টিপ্লবের নাম গন্ধও শোনেনি তখন। হঠাৎ বুজী বলে ওঠেঃ 'এই চুপ! চুপ! তোরা শুনিস্নি কি তার পায়ের ধ্বনি! সে যে আসে—আসে—আসে—...।...হ্যাঁ. তারপর,—' জোরে জোরে গম্ভীর চালে বলে যায়, '...এই বিদেশী বাট্টার ব্যাপার, বুঝলে হে, ভারী গোলমেলে। ধর, আমেরিকা থেকে একটা বেশ মোটা অর্ডার পাওয়া গেল। কিন্তু বাট্টার হার গেল নেমে—বাস্ চোখে সর্ষে ফুল। কিন্তু টুক্ করে আগে ভাগে যদি বীমাটি করে রেখে দাও...কেল্লা ফতে।'

পর্দা সরে যায়; দেখা দেয় সরম-কুণ্ঠিতা, শুচি-স্মিতা তামা। গোলাপী রং-এর কিমনো গায়ে, জাপানী জুতো আর সাদা মোজায় ঢাকা পা, কোমরে সোনালী রং-এর বন্ধনী। জাপানী-নিয়মে কবরী নয় তৈল-চিক্কন, নয় ত্রি-পত্রী চুড়ো করে বাঁধা। পেছন দিকে টেনে আঁট করে খোঁপা-বাঁধা হয়েছে তৈল-হীন চুল। ঠিক মায়ের মত করে ডানা-গোটান প্রজাপতির ভঙ্গিতে অভিবাদন করে তামা।

বুজীর চোখে দুষ্টুমীর চল-বিদ্যুৎ। পরিচয়ের পালা শেষ হলে আই-ওয়ান্ উঠে মাথা নীচু করে অভিবাদন করে। কিন্তু তামা কর-মর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেঃ

'সে কি? বুজী যে বলছিল আপনি মবো (Mobo)?১ আমার ভারী ইচ্ছে করে মগা (Moga)২ হতে। কিন্তু বাবার পছন্দ নয়। কিউশু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ি আমি।'

আলতোভাবে তামার হাত ধরেই ছেড়ে দিল আই-ওয়ান্। ফুল-কুঁড়ির

(১) জাপানী ভাষায় মডার্ণ পুরুষ।
(২) „ „ „ স্ত্রী-লোক।

মত এতটুকু, কিন্তু যেন মুগুর-ভাঁজা হাত। তামা সহজ হয়ে উঠেছে, লজ্জা ঘোচে না আই-ওয়ানের।

একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে তামাঃ 'চলুন, চা খেতে খেতে একটু আড্ডা দেওয়া যাক্। কিন্তু, এই বুজী, বাট্টা টাট্টা......কি সব বক্তৃতা হচ্ছিল। ভূতের মুখে রাম নাম যে!'

তিন জনেই হেসে ওঠে। বুজী বলে,

'দেখলে তো, আমার ভগ্নীরত্নটি কেমন? আস্ত দুমুখো সাপ। বাবার সামনে কেঁচোটি—আর......।'

'দাঁড়াও না, মজা দেখাচ্ছি তোমায়।' তামা বলে।

'...আর আড়ালে...ফোঁস্ কেউটে ফোঁ, ফণা তুলে ছোবল্ দিতে এত কেন গো!' বুজী শেষ করে।

খুনসুড়ি করে ভাই-বোনে।

এক পিওনী ছাড়া কোন মেয়ের সাথে এত কাছাকাছি বসে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে কখনও কথা কয়নি আই-ওয়ান্।

আর পিওনী—সে কি মেয়ে ছিল, সহচরী হবার যোগ্য? সে ছিল কিংকরী। মনের মেঘ কেটে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে ও। বলেঃ

'কি ভাগ্য তোমাদের কাছে এসে পড়েছি। বাপরে কি গেছে ক'টা দিন। মনে হত যেন ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে তলিয়ে গেছি। সে অন্ধকারের আর বুঝি শেষ নেই। আজ সকালেও মনে হয়েছে, আমার ভবিষ্যৎ বর্তমান সব শেষ হয়ে গেছে। আমি বিলকুল ফুরিয়ে গেছি, মরে গেছি। কিন্তু ম্যাজিক জান তোমরা, কোথায় গেল সে সব ভয়-দেখানো কালো মেঘ!'

ওরা শোনে। হৃদয় দিয়ে হৃদয় বোঝে।

তামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'বুঝতে পারছি। মাঝে মাঝে আমারও অমন হয়। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না।'

'সে কি?' আই-ওয়ান্ বলে, 'মন খারাপ! এ বাড়ীতে? আমি তো ভেবেছিলাম এ বাড়ীতে কারো মন খারাপ হতেই পারে না।'

বুজীর চোখে চিন্তার ছায়া পড়ে। ভাই-বোন পরস্পরের দিকে তাকায়। দৃষ্টি অর্থ-পূর্ণ। আই-ওয়ান্ অবাক হয়ে যায়।

'তা ঠিকই বলেছ। কি বলিস তামা?' বুজী বলে।

'তা বটে। কিন্তু দাদা, ঢেঁকীর স্বর্গেও সুখ নেই। মেয়েমানুষের কপাল নিয়ে জন্মেছি তো শত হলেও!'

'তুই আর বলিসনে,' হেঁকে ওঠে বুজী, 'বাবার এক মেয়ে আদুরে গোপাল। কপাল কপাল করছিস কিরে? তোর কপাল তো সোনা-বাঁধানো।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দেয় তামা, 'সেই জন্যই তো আরো সুখ নেই মনে।'

তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে থাকে। হঠাৎ যেন কুয়াশায় সব আবছা হয়ে গেছে। কিসের কুয়াশা জানে তামা, জানে বুজী; কিন্তু আই-ওয়ানকে বলা চলে না। অস্বস্তির আবহাওয়াটা শেষ করে দিয়ে বলে বুজীঃ

'চলি রে তামা! আকিও হয়তো বসে আছে। সারা সকাল কিছু কাজ হয়নি। আকিও আমার মেজদা, আই-ওয়ান।'

তামা তক্ষুণি উঠে পড়ল।

'আচ্ছা, এস তোমরা।'

'আই-ওয়ান তো রইলই,' বুজী বলে, 'কষে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

তামা বলে, 'আপনার দেশের কথা আমায় শোনাবেন কিন্তু। আমার অনেক জানবার আছে। বুঝলেন? আমাদের সবই তো আপনাদের দৌলতে। অতি চিক্কণ আনুষ্ঠানিক সৌজন্যের সুর। তামা যেন মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

বলতে চাইল আই-ওয়ান, 'দেশ! ও নামও আর নয়।' কিন্তু বলল না। ছায়াটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হাসির উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। সহজের সুর গেছে কেটে।

'তৈরী?' বুজী জিজ্ঞাসা করে।

'জামা বদলাব না?' আই-ওয়ান বলে।

'আমারও বদলাতে হবে।' বলে বুজী।

ছোট্ট একটুখানি নমস্কার করে বেরিয়ে যায় তামা। আই-ওয়ান তাকিয়ে দেখে অপসৃয়মানাকে। নমস্কারের অমন সুকুমার ছন্দ আর দেখেনি ও।

বুজীকেও যেন অন্য মানুষ মনে হয়। কাজের কথা হ'লে হাসে না ও। হয়ত তাই।

'মুরাকী এন্ড সন্স' কোম্পানীর আফিসেও হাসি নেই। বহুমূল্য, দুষ্প্রাপ্য সৌখীন শিল্প দ্রব্যের (Curio) কারবার। জাপানের প্রধান প্রধান সহরগুলোতে বড় বড় ছ'টা দোকান চলছে। তারই প্রাণকেন্দ্র এই অত্যন্ত নীচু পাকা বাড়িটায়। সমুদ্রের খুব কাছে; হাতের কাছে ডক থাকায় সুবিধা হয়েছে। একটা গেট দিয়ে ঢুকে পাকা উঠনটা পেরুতে পেরুতে বলে বুজী:

'আফিস ইয়াকোহামায় সরাবার জন্য অনেক বলেছি বাবাকে। কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। খালি দাদাকে পাঠিয়ে দিলেন ওখানে, বাস্‌ হয়ে গেল। বাবা, তস্য বাবা সকলের জন্ম এই বাড়ীতে। তাই কিছুতে বাবা কিয়ুসু ছেড়ে যাবেন না। অসুবিধার চূড়ান্ত এখানে। আগে জাহাজ চলত কয়লায়। আর কয়লা নিতে হত এখান থেকেই। কিন্তু এখন চলে তেলে। কাজেই আর আসবে কেন এখানে? আমেরিকান টুরিস্টও মেলাই আসত। ফলাও টুরিস্ট ব্যবসা ছিল তখন। তাও এখন নেই। তবু যাবেন না বাবা। কি আর করি আমরা? বিকি কিনি ছাড়া সব কাজ এখানেই করতে হয়।

বাড়ির ভেতরটা অত্যন্ত শ্রীহীন, কিন্তু নিখুঁত পরিষ্কার। অনাবৃত পাকা মেজে। শূন্য দেয়ালে কেবল ক'টা মানচিত্র ঝুলছে। প্রকাণ্ড একটা ঘরে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে নিঃশব্দে কাজ করছে জন কুড়ি কর্মচারী। সকলের পরনে বিদেশী পোষাক।

বুজী বলে, 'এরা হচ্ছে আমাদের হিসাব-নবীশ ও কেরাণী। আর এই যে আমার দপ্তর। তুমিও সম্প্রতি এখানেই বসবে। চল এখন আগে আকিওর কাছে নিয়ে যাই।'

একটা বন্ধ দরজায় টোকা মারে বুজী।

'এসো।' গম্ভীর গলায় আহ্বান আসে।

দরজা খুলে ঢোকে বুজী। পরিচয় করিয়ে দেয় আই-ওয়ানকে।

নীচু টেবিলের সামনেই বসে আছে মানুষটি।

সারা আফিসে একমাত্র আকিওর পরনেই স্বদেশী বেশ। গম্ভীর দৃষ্টি তুলে ঈষৎ মাথা নত করে আকিও। পরিচয়ের স্বীকৃতি এবং স্বাগত। আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় মুখ। বিষাদ আর গভীর আবেগে যেন একটা তীক্ষ্ণতা রচনা করে জমাট বেঁধে আছে ওই মুখে। গাল বসে গিয়ে চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে। অপূর্ব ওষ্ঠ দুটিতেও বিষাদ লেখা। বুজীর সাথে কোন সাদৃশ্য নেই এ মানুষটির।

ইংরাজীতে বলে আকিও, 'আমি তো চীনে ভাষা বলতে পারিনে। তা জাপানী তুমি শিখে নেবে আশা করি।'

স্বরটা যেন গদগদ করে।

'নিশ্চয়ই!' আই-ওয়ান বলে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বুজী বলেঃ

'ওকে জায়গায় বসিয়ে দি?'

'দাও।' বলে আকিও। তারপর হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে যায় বুঝি যথা-রীতি সৌজন্য প্রকাশ হয়নি অতিথির সামনে। তাড়াতাড়ি উঠে নমস্কার ক'রে বলে, 'আশা করি কোন অসুবিধা হবে না তোমার।' কেমন একটা আনমনা ভাব।

দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায় বুজী আর আই-ওয়ান। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে বলে বুজীঃ 'ভারী ফ্যাসাদের মধ্যে আছে বেচারা। বাবার সঙ্গে মতের মিল নেই। যাক, কিছু দিন পরে বলবখন সব।'

কি বলবে? আই-ওয়ান ভেবে পায় না। আকিও সত্যি যেন ওই হাসি-খুশি-ভরা বাড়ীটার কেউ নয়।

'এই যে আমার সব।' বুজী বলে।

বর্গাকার ঘরখানা—দুটি ডেস্ক, আর খান কয় খাড়া-পিঠ চেয়ার আছে আসবাবের মধ্যে। ঘরময় একটা শূন্যতা যেন খাঁ খাঁ করছে। একটা ডেস্কের ওপর এক গুচ্ছ স্বর্ণ ফুল।

বুজী দেখিয়ে দেয়ঃ 'এটা তোমার টেবিল। ওখান থেকে সমুদ্র দেখতে পাবে তাই ওখানে দিয়েছি তোমায়।'

জানালা দিয়ে দেখা যায় দূরাম্বুধির শৈল-বন্ধুর তট-রেখা—তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে যেন সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাহাড়ের ওপর অল্প কয়েকটা পাইন গাছ—বাতাসের মার খেয়ে খর্ব হয়ে আছে। বুজী বলেঃ 'ভালো করে তাকালে হয়তো তোমার দেশও দেখতে পাবে।'

মুখ ফিরিয়ে নেয় আই-ওয়ান। দেশ! দেশ ওর নেই, ছিল না কখনও, থাকবেও না। দেশের মাটি থেকে ওর মূল ছিন্ন হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলায়ঃ 'কি করতে হবে বল এবার।' ওর টেবিলে স্তূপাকৃতি খাতা-পত্র রাখা।

'এই যে রেডী সব।' বুজী বলে; 'দশ বছরের দলিল দস্তাবেজ। বাবার হুকুমে হুজুরে পেশ করে দিলাম। এ গুলো দেখলেই আমাদের ব্যবসার ব্যাপার

সব বুঝতে পারবে সুরু থেকে। আকিওই আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল বোঝে ব্যবসা। শিও শুধু নামে কর্তা। কাজ করে আসলে আকিও। শিও তো শিল্পী মানুষ—, সে আমাদের মাল যাচাই করে। আর আমাদের একজন বড় খদ্দেরও বটে। এক এক সময় এক একটা জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকে, কিছুতে বেচতে দেবে না। তখন আবার ছোটে আকিও।'

টুপী কোট খুলে স্বস্থানে বসে যায় আই-ওয়ান্। একজন ভৃত্য এক জোড়া কাগজের তৈরী কাফ্ এনে দেয়। হাতে পরে নেয় ও। বুজীর হাতেও অমনি কাফ্। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে বুজী—চোখের ওপর শেড্ লাগান, ডান হাতে গণন-যন্ত্র নিয়ে বাঁ-হাতে নিবিষ্ট মনে গুণে চলেছে। আশ্চর্য ক্ষিপ্র হাত। হাতের সাথে ঠোঁট নড়ে নড়ে অনুচ্চারে হিসাব চলছে। ওই যন্ত্রটা এখানকার দোকানে দোকানে দেখেছে আই-ওয়ান্। ব্যবহারও জানে। কিন্তু বুজীর মত অমন আশ্চর্য হাত কারো নেই। গুণবার ঘুটিগুলো নিয়ে যেন খেলা করছে ও আর জাপানী মুদ্রার বড় বড় হিসেবের অংক লেখা পড়ছে ওর খাতায়।

আই-ওয়ান ধীরে ধীরে পড়তে আরম্ভ করে। প্রথমটায় ভারী বিরক্ত লাগে। ক্রমে ক্রমে ওর নেশা লাগে। ছবি, রেশমী জিনিষ, আসবাব, চীনে মাটির তৈজস্, হাতীর দাঁতের কাজ, ব্রঞ্জের মূর্তি, গালার কাজ—অজস্র জিনিস! মুরাকী কোম্পানীর হাতে পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত হতে কত বস্তু আহৃত হয়েছে, আবার ছড়িয়ে গেছে, দেশে দেশান্তরে বিশেষ করে আমেরিকায়। প্রতিটি জিনিষের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া রয়েছে এই সব খাতায় পাতায় পাতায়। খাতার পর খাতা শেষও হয়। কৌতূহল বাড়ে আই-ওয়ানের। ভারতবর্ষ, চীন, দক্ষিণ সাগর—কোথায় না পড়েছে মুরাকী কোম্পানীর জাল! আছে—ক্যান্টনের হস্তীদন্ত শিল্প, ক্যান্টনী সেগুনের, রুপো এবং জেতেউর কারুশিল্প; ফুচাও-এর নীল মাছরাঙার পালক; ফুকিয়েনের প্রাচীন চিত্র আর ভাস্কর্য; কিয়াংসির মৃৎশিল্প; শেওয়ানের নানারকম শিল্প-সম্ভার, পিকিং-এর রাজ প্রাসাদ থেকে সংগৃহীত পট—এমনি আরো কত কি। বিশেষ করে চীনের নামগুলি খোঁজে ও।

স্তম্ভিত হয়ে যায় আই-ওয়ান্—কেমন করে পায় এরা এসব জিনিষ? রাজপ্রাসাদের এই পটগুলো বেচলে কে? এগুলো তো জাতীয় সম্পদ, বিক্রীর তো নয়! আর একটু আলাপ হোক বুজীর সাথে, জিজ্ঞাসা করবে।

রাগও হয় কেন জানি। অথচ মুরাকী-কোম্পানীব দোষ কোথায়? মুঠো মুঠো মুনাফা খায় বটে বেচে, কিন্তু কেনেও তো পয়সা দিয়েই। লাভের অঙ্কগুলো দেখতে যাবে এমন সময় বুজী ডাকেঃ 'বাড়ি চল, একা ঠায় তিনটি ঘণ্টা বসে আছ, হুঁস আছে? রস পেয়েছ মনে হচ্ছে!'

'এত বেলা হয়ে গেছে! বুঝতে পারিনি।' আই-ওয়ান্ বলে।

চোখ তুলে তাকায়—পড়ন্ত সূর্যের দীঘল দীঘল আলোর রেখা সাগরের বুকে জ্বলছে। একসাথে বাড়ি ফেরে দু'জনে। বাগানে জলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট পুলটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে কে এক নীল-বসনা।

বুজী বলেঃ 'আরে তামা যে আমাদের আগে ফিরেছে আজ!' 'তামা!'

ডাকে বুজী। তেমনি তন্ময় তামা। 'কিসের স্বপ্ন দেখছে মেয়ে?' বলে বুজী।

বুজীর পেছন পেছন আই-ওয়ান্ ঘরে ঢোকে। মন অনেক হালকা হয়ে গেছে—ছোট্ট বাগানটির দিকে তাকিয়ে মাদুরে দেহ এলিয়ে দেয়।

কি আশ্চর্য! একটি নুড়িও এলোমেলো নেই। ক্ষীণ ঝরণাটি আশ্চর্য রচনা-কৌশলে কৃত্রিম পাহাড়টির ওপর দিয়ে পরিচালিত হয়েছে। তারপর এসে নীচের ছোট্ট জলাধারে পড়ছে কুলকুলিয়ে। সেই কুল্‌কুলও নিখুঁত আনুপাতিক হিসাবে পরিমিত। একমুঠো জায়গার মধ্যে এতটুকু পাহাড়, এতটুকু ঝরণা, এতটুকু সব—কিন্তু এমনি পরিপূর্ণ, এমনি সম্পূর্ণ, যেন মানুষের হাতের রচনায় প্রকৃতি আপনি এসে ধরা দিয়েছে। শুয়ে শুয়ে সেই কথাই ভাবে আই-ওয়ান্।

সবে ক'ঘন্টা হল এখানে এসেছে আই-ওয়ান। এরি মধ্যে প্রবাসের এই আশ্রয়কে মনে হচ্ছে ওর আপন ঘর। এখানকার এই পরম নিশ্চিততার মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করে দেবার জন্য প্রাণ ওর আকুল হয়ে ওঠে। এ ওর সেই মানসী ধরণী নয়। এ যেন এক মায়া-পুরী। বড় সুন্দর, মনোলোভন। জীবনের বৃহৎ স্বপ্নকে ডালি দিয়েও কেউ দেউলে হবে না এখানে।

আই-ওয়ানের স্বপ্নই বা কোথায়? স্বপ্ন তো মিলিয়ে গেছে।

এ ঘরখানা তো ঘর নয়, আরামের নীড়। কাজ করতে করতে মনে হয় মনে ওর রং ধরে। দিনের শেষে ওই নীড়ে ও ফিরে আসে; বিকেলটা ওর একলা কাটে তারই একান্তে। বড় ভালো লাগে। কিছু কিছু বই কিনতে আরম্ভ করেছে। ইংরীজী উপন্যাস আর কাব্য। এসব বই আগে পড়েনি। ছোট একটা পুরাণো বইএর দোকান থেকে কিনেছে বইগুলো। এন্-লান্ আর ও এতদিন যে ধরণের বই পড়েছে, সে বই-এর চাহিদা ওর ফুরিয়ে গেছে। তাই খোঁজেও নি। ছিলও না কোন দোকানে। নিষিদ্ধ বই, রাখার সাহস নেই ব্যাপারীদের।

প্রেমের কাহিনী এই প্রথম পড়ছে। মাঝে মাঝে বই বন্ধ করে ভাবতে বসে—এন্-লানের সাথে যে-পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল, এসব বইএ তার কথা লেখা নেই বটে, কিন্তু আর এক অজানা পৃথিবীর কথা লেখা আছে। আই-কোর কথা মনে হয়। প্রেম যে কত সুন্দর, এত বলিষ্ঠ, এত শুচি হতে পারে সে খবর জানে না ওই হতভাগা। আই-ওয়ান্ জেনেছে—বই-এর পাতায় পাতায় কত কাহিনী তার পড়েছে। পড়ে মুগ্ধ হয়েছে। যতই পড়ছে আরো বেশী মুগ্ধ হচ্ছে।

গ্রীষ্মের এক মধুর দিনান্ত। সান্ধ্য আহারের সময় হয়েছে। আই-ওয়ান্ খাবার ঘরে এল। একটি মেয়ে ফুলদানীতে ফুল সাজাচ্ছে। এদিকে ফিরতে দেখা গেল—তামা।

আই-ওয়ানের বুকটা দুলে উঠল; শিরায় শিরায় যেন গানের সুর জাগল। কিসের এ চঞ্চলতা! কেমন ভয় করে। কি জানি হয়তো তামা ভাবছে, তাকে একলা পেয়ে ইচ্ছে করেই এসে ঢুকেছে ও। দিন সাতেক হল এখানে এসেছে।

এর মধ্যে একলা তামার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্। অপ্রতিভের মত ফিরে চলে যায়।

তামা তাড়াতাড়ি বলে, 'আগে এসেছেন তো হয়েছে কি? ঘাব্‌ড়ে যাচ্ছেন কেন?'

কত সহজ তামা! ও কেন হতে পারে না?

কি কথা বলবে আই-ওয়ান্! তায় একলা। কিছুই মনে আসে না। মেয়েদের মন কি রকম কে জানে। পিওনী ছাড়া মেয়ে আর ও দেখেছে কোথায়! আর পিওনী—সেই কি মেয়ে ছিল? সে তো...।

একটা মুকুলিত ফুলের শাখা লম্বা ফুলদানীটাতে সাজাচ্ছিল তামা। আই-ওয়ানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল:

'কি সুন্দর!'

কাঁচি দিয়ে ডালটিকে একটু এদিক ওদিক ছেঁটে দিয়ে বলে তামা:

'জাপানী মেয়েদের এসব রীতিমত শিখতে হয়।'

তারপর ঠোঁট ফুলিয়ে আবার বলে, 'সে তো না হয় শিখলাম। আসলে যা শিখতে চাই তাতো কেউ শেখাবে না।'

আই-ওয়ান্ জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, 'কি শিখতে চাও?' এমন সময় পর্দা সরে যায়। মিঃ মুরাকী এসে ঢোকেন। চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে বলেন:

'আরে, এই যে! এসে গেছ দেখছি।'

তামা তাড়াতাড়ি উঠে রীতি অনুসারে বাবাকে অভিবাদন করে আবদারের সুরে বলে, 'ঠিক হয়েছে বাবা?'

এই মাত্র তামা আর আই-ওয়ানকে নিভৃতে একা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, নিমেষে ভুলে গেলেন সে-কথা। মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তামার হাত থেকে কাঁচি নিয়ে নির্মমভাবে ছাঁটতে আরম্ভ করলেন। ওরা দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ডালটা প্রায় নেড়া হয়ে গেল। কিন্তু ওই নির্মম রিক্ততার বুকে পরম অলংকারের মত দীপ্যমান হয়ে রইল সামান্য কটি মাত্র ফুল।

নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান মুরাকী। দুই চোখ ভরা শান্তি। বলেন: 'তামা মা—বাহুল্য রাখিস্‌নে কোথাও। না জীবনে, না শিল্পে। একই নিয়ম। কোথাও বাহুল্যের স্থান নেই।'

কতটুকুই বা সময়! একটা মুহূর্তও নয়। কিন্তু ওরই মধ্যে এক অনাস্বাদিত মধুর রাগিনীতে আই-ওয়ানের হৃদয়ের তন্ত্রী বেজে বেজে উঠতে লাগল রাতের অন্ধকারে।

তামার সঙ্গে দেখা শোনা কমই হয়। এবং সেদিনের পর সাবধান হয়ে গেছে ও। একা তামার সামনে যায়নি আর। সে চেষ্টাও করেনি। এদের আতিথেয়তার এত বড় দাক্ষিণ্যকে ও অমর্যাদা করবে না। সারাদিন তামা স্কুলে থাকে। ও, বুজী, মিঃ মুরাকী তিনজনে এক সাথে বসে খায় সন্ধ্যাবেলা। কখনও শ্রীমতী মুরাকী এসে বসেন। তামাও আসে মার সাথে।

ধীরে ধীরে বছর ঘুরে এল। ছোট পরিচ্ছন্ন শহরখানিকে আই-ওয়ান্ একটি বছর দেখেছে। দেখেছে বসন্তে, দেখেছে হেমন্তে, দেখেছে বিগলিত-

হিমানী-ধারায় স্নিগ্ধ তার রূপের পূর্ণতাকে। শহরখানি ওর চেনা হয়ে গেছে। সাংহাইএর মত জন-সংকুল রাস্তা এখানে নেই। সরু সরু পরিচ্ছন্ন পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে শিলাময়-পর্বতশ্রেণীর সমুন্নতিরেখার নিশানা ধরে। কোথাও বা গভীর গিরি-দরির ওপর সেতু রচনা করেছে, তারপর আবার বহু দূরের ওই দ্বীপমালার উন্মুক্তিতে নেমে এসেছে ধীরে ধীরে। কখনও বা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে মন্দিরে, পার্কে। কোথাও সোজা নেমে গেছে সমুদ্রের জলে। ভিড় নেই, জনতা নেই। এক অপূর্ব মালিন্য- হীনতায় প্রতিটি জিনিষ ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

নিজের দেশের চাইতে পরিচ্ছন্নতায় এদেশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেই হয় আই-ওয়ানকে। ভিখারী নেই এখানে, নেই দরিদ্রের ভিড়। কিংবা হয়তো দরিদ্রেরাও এখানে পরিষ্কার, সুবেশ। বাসন্তী প্রকৃতির মত সুন্দর ফুল-কাটা একটা সুতী কিমনো দাম মাত্র কয়েক সেণ্ট। বেশে বাসে ধনী-দরিদ্রের তফাৎ তেমন দৃশ্য নয়। তেমন ঠাণ্ডা না থাকলে বড়লোকরাও খালি পায়ে কাঠের জুতো পরে বেরয়। একদিন একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখল আই-ওয়ান্‌ রাস্তায়। কড়া শীত পড়েছে সে-দিন। খুব বরফ পড়ছে। রেস্তরাঁর দুইটি বেয়ারা খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। মাথায় ছিল খাবারের ঝুড়ি। সাইকেলে সাইকেলে ধাক্কা লেগে ঝুড়িগুলো পড়ে গেল। আই-ওয়ান্‌ ভাবল, এইবার লাগবে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ—চীনদেশে যা হয়ে থাকে এ অবস্থায়। কিন্তু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল দু'জনে। একজন বললেঃ 'আমারই দোষ!'

আরেকজন জবাব দিলেঃ 'ছিঃ ছিঃ কি যে বল তার ঠিক নেই। আমিই উজ্‌বুকের মত সাইকেল চালাচ্ছিলাম।'

নীচু হয়ে পরস্পরের জিনিষ তুলে দিয়ে যে যার পথে চলে গেল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আই-ওয়ান্‌। এমন সৌজন্য কোথায় দেখেছে কে!

এই ক্ষুদে দেশটার সরল, অনাড়ম্বর আর সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাত্রা মন কেড়ে নিল আই-ওয়ানের। রীতিমত প্রেমে পড়ে গেল দেশটার। ভালোবাসল এখানকার সিল্কের লেপ মুড়ি দিয়ে মেজের উপর পাতা পুরু বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন-দেখা-রাত গুলিকে আর সমুদ্রের নীলজলের গন্ধে মাতাল, আর পর্দা টানার শির-শিরানী শুনতে শুনতে ঘুম-ভাঙা-প্রভাতকে। সকালবেলায় স্নান করে নিজের ঘরে বসে একলা খাবার খাওয়া আর তারপর রোজ আফিস যাওয়া, তাও ভালোবেসে ফেলল।

বসন্তে সপ্তাহে দু'তিন দিন বুজীর সাথে স্নানাগারে যায়। প্রথমে ভৃত্যের হাতে সাবান দিয়ে রগড়ে বালতি বালতি জল ঢেলে দেহ-মার্জনা পর্ব। তারপর মস্ত বড় পুকুরটায় নেমে অবগাহন স্নান। মেয়েরাও একই সাথে নায়। প্রথম প্রথম আই-ওয়ানের ভারী অশ্লীল লাগত। বলতঃ 'আমাদের দেশে এসব চলে না।'

বুজী বড় বড় চোখ করে তাকাত।

'কেন? কি হয়েছে? ভদ্রলোকেরা নাইবার সময় মেয়েদের দিকে তাকায় না। তাকানো মানেই অপমান করা। মেয়েদের অপমান কোন সভ্য মানুষ করে না।

আই-ওয়ান্ নিরুত্তর। অদ্ভুত! অদ্ভুত এই মানুষগুলি। হয়তো মানুষ নয় ওরা, অন্য কিছু। ওদের ধমনীতে কি উষ্ণ রক্ত বয় না? না ওরা শিলা? ও তো পারে না। বিপ্লবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারই মননে ও কর্মে ও যতদিন ডুবে ছিল তখনকার কথা আলাদা। কায়-মন-বাক্য সেদিন নিয়োজিত ছিল ওর। অন্য কোন দিকে চাইবার মত অবসর ছিল না। আজ সে আদর্শ পেছনে ফেলে বহুদূরে চলে এসেছে আই-ওয়ান্। তাই আজ দেহ জানাচ্ছে তার রক্তের দাবী। আবেগে ঝড়ের দোলা লেগেছে। কোন্ শক্তিতে ঠেকাবে আই-ওয়ান্?

আকিও বুঞ্জীর মেজ ভাই। সে নীরবে আসে, নীরবে যায়, যেন এ বাড়ীর কেউ নয়। সান্ধ্য আহারের সময় নিয়মিত উপস্থিত থাকে—অত্যন্ত ভদ্র, অত্যন্ত সংযত বাক্—শুধু প্রশ্নের জবাব দেয়, নিজে কোন কথা বলে না। বহুদিন পরে বুঞ্জীর কাছে শুনল ও আকিওর ইতিবৃত্ত।

এক বারাঙ্গনার প্রেমে পড়েছে আকিও। তাকে ও বিয়ে করতে চায়। এই নিয়ে বাবার ভয়ানক রাগ। আকিওরও জেদ—সুমীকে—মেয়েটির নাম সুমী—সুমীকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। প্রায় বছর পাঁচ ধরে চলছে টানা-পোড়েন। বহুদিন আগে এক বন্ধুর মেয়ের সাথে ওর বিয়ে স্থির করেছিলেন বাবা। মাথা হেঁট হয়েছে সেখানে। সুমী অবশ্য মেয়ে বেশ ভালো। তাই বলে এ পরিবারে তার ঠাঁই হতে পারে না। 'কিছু অন্যায় বলেননি বাবা,' বুঞ্জী বলে। 'বিয়ের বয়েস তো হয়েছে আকিওর। কিন্তু হলে কি হবে? ভারি বিশ্রী......। কাজেই আকিও যদি মন ভার করে থাকে এবং তোমাকে যদি না ডাকে খোঁজে, কিছু মনে করো না। আমাদের কারো জন্যই ওর দরদ নেই। আশ্চর্য! এত ভালো ব্যবসা বোঝে, এত খাটে, সব বিষয়ে বাবার বাধ্য অথচ ওই বিয়ে ব্যাপারে ওর একেবারে ধনুর্ভাঙা পণ।'

'দেখেছ সুমীকে?' আই-ওয়ান্ শুধায়। ভাবে—প্রেম! আকিও প্রেমে পড়েছে! পারবে আকিও। বইয়ের মত করে ভালো বাসতে পারবে এ মানুষ।

বুঞ্জী বলেঃ 'যে সমাজের মেয়ে, সে হিসেবে বেশ ভালোই সুমী বলতে হবে। তা আমি তো বিশেষ কিছু জানি না ঐ সব ব্যাপার। বড় হয়েছি বটে, কিন্তু ওদিক মাড়াইনি এখনও। সময়, টাকা দুই-এরই শ্রাদ্ধ। আর আমি তো মবো। মবোদের এ-সব নেশা নেই। আমার বউও আধুনিকাই হবেন আমি যখন মবো। সে কি আর এসব পছন্দ করবে? সাবেককালের মেয়েরা কিছু মনে করে না। ঐ জন্য তো বাবার আরো রাগ। বাবার ভাবী বৌমা আধুনিকা নন। বাগ্দান হয়ে গেছে, এখন আকিও যদি বিয়ে না করে, তবে সে সাংঘাতিক কলংক।'

আকিওর শান্ত মুখখানা, আর বিষণ্ন চোখদুটি দেখলে, বুঞ্জীর কাছ থেকে শোনা কাহিনী মনে পড়ে। আকিও ওকে আকর্ষণ করে, কাছে টানে। বড় কাছের মানুষ মনে হয় আকিওকে; অথচ কত দূরে। যেন এ দুনিয়ার মানুষই নয়। কোমলে কঠিনে মেশানো—আশ্চর্য! সে তার নিজের পথে চলে। প্রায়ই বাড়ি থাকে না, কেউ খোঁজও করে না। অথচ পিতা-পুত্রের ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য নেই। বাক্-বিতণ্ডা কথা কাটাকাটি নেই। দুজনেই যেন

পরস্পরের কাছে হার মেনে আছে। অথচ হার কেউ মানে না, মানবে না। এমনি করেই দিন যায়।

আই-ওয়ানের কোন নালিশ নেই—তবু ওর অন্তরের শূন্যতা ভরে না। নূতন জীবনের সহস্র বৈচিত্র্যেও না। এক এক সময় মনে হয়, পড়ে পড়ে, আর ভেবে ভেবে যেন ওর মনের ক্ষুধা বাড়ছেই শুধু। ও বাঁচবে কি নিয়ে? কাউকে বা কিছুকে পুজো না করতে পারলে বাঁচে না আই-ওয়ান্। ঐ ওর স্বভাব। আজ পুজোর দেউল ওর শূন্য। এন্-লানের বন্ধুত্ব, বিপ্লব আন্দোলনের ব্যস্ততা, নেতা চ্যাং-কাই-শেকের ওপর আস্থা এক সাথে সব খুইয়ে একেবারে দেউলে হয়ে বসেছে আই-ওয়ান্। এন্-লান্—আছে বেঁচে? না, নেই! সত্যিই নেই? আচ্ছা, এন্-লানের ওপবে টান ওর আছে এখনও? নেই। না আশা, না আশঙ্কা। এই কিছু নেই-এর অর্থ, ব্যাখ্যা করে আই-ওয়ান্, এন্-লান্ নেই।

পিওনীও বোধ হয় নেই। সেও হয়তো ওই মরণ-যজ্ঞের আহুতি হয়েছে। নাগাসাকির কাগজগুলোতে ভরা থাকে কম্যুনিষ্ট-শোধনেব কাহিনী। হাজার হাজার তরুণ তরুণীকে হত্যা করা হচ্ছে প্রতিদিন। আই-ওয়ান্ তাদেরই একজন। ওরও তো সরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বেঁচে আছে ও। বাবার অর্থের জোরেই বেঁচে গেছে। অথচ এই অর্থের জোরকে কি ঘৃণাই না করত ও। ও বিশ্বাস-ঘাতক। অনিচ্ছায় হলেও বিপ্লবের প্রতি ও বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। মিল-শ্রমিকদের কাছে কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—কোথায় গেল সে সব? চোখের সামনে যেন দেখতে পায়—তারা আবার ফিরে গেছে সেই নরকে—অদৃষ্টের লেখন বলে মেনে নিয়েছে ভবিষ্যৎহীন, আশাহীন সেই তমিস্র অন্ধকারকে। আর বলাবলি করছে, তখনই বলেছিলাম—কিছু হবে টবে না। যত সব বাজে।

কাকে পুজো করবে? কি পুজো করবে? কিছু নেই। এখন সামনে নূতন দেশের নূতন বৈচিত্র্য, বুজীর হাসি-মস্করা, আর কাজে ভর করে সময়ের স্রোতে কোনো মতে গা ভাসিয়ে থাকা। অবশ্য এ বাড়িতে সত্যকার সুখ পেয়েছে ও। কিন্তু ওর ভেতরের শূন্যতা ভরবে কে? জানে না, জানে না আই-ওয়ান, কি করবে ও। একলা থাকলেই আরো হু হু করে বুকটা। শুধু বই আর পড়া। তার বাইরে আর কোন্ স্বপ্নের জগৎ খোলা আছে! সমস্ত আশাই তো অলীক হয়ে গেছে।

আর আশা করবে না ও। কিসের আশাই বা আছে। বাবার চিঠিগুলো পড়তে ব্যথায় বুক ভরে যায়—যেন বহুকাল পূর্বের কার লেখা—সে যেন আজ নেই পৃথিবীতে। মাসে একখানা করে নিয়মিতভাবেই আসে তাঁর চিঠি। লেখেন সব আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। ব্যবসার উন্নতি হচ্ছে। নূতন সরকার বহু পরিবর্তন সাধন করছেন দেশে। বিদেশে অর্থ লগ্নী করা হয়েছে। বিদেশীরা পুনর্গঠনের কাজে ঋণ দিতে আগ্রহশীল। র‍্যাডিক্যালরা সব পালিয়েছে। গত বছর নানকিংএর যুদ্ধে দৈবাৎ যে কয়েকজন বিদেশী হতাহত হয়েছিল তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এক কথায় পুরানো শান্তি শৃঙ্খলা সব শিগ্গিরই পুরোপুরি ফিরে আসছে আবার। বাড়ীর সবাই এক রকম। আই-কো এখনও জার্মানীতে। তার

হাতে টাকা দেওয়া হয় না, স্কুলে পাঠানো হয় সোজা। ছেলেরা কেউ কাছে নেই, মার বড় একা লাগে। তবে দেশের এত এত জোয়ান ছেলেরা মরেছে, তাঁর ছেলেরা যে বেঁচে আছে তাতেই উনি খুশী, ঠাকুরদা খুব ভালো আছেন। পিওনী ছাড়া ঠাকুরমার ভারী অসুবিধা হচ্ছে। ঝিগুলো কোন কাজের নয়। আই-ওয়ান্ যেন ভালো করে ব্যবসার কাজ শেখে। কিছুদিন গেলে ওর দেশে ফেরবার অনুমতির চেষ্টা করবেন। কিন্তু র‍্যাডিক্যাল মতবাদগুলো তার আগে মগজ থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি......। সব যেন অবাস্তব ছায়া......।

চিঠি পড়ে ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয় বাতাসে। বাবাকে লেখেঃ

'দেশে আর ফিরব না। এ জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছে।'

আর কিছু না হোক ভালো ব্যবসায়ী হতে পারবে আই-ওয়ান্। দ্বিতীয় বছরে ও পুরোপুরি কাজ করতে লাগল বুঞ্জীর মত। অন্যান্য কেরাণীরা যেমন ছুটি পায় তার বেশী ও নেয় না। খাবার টেবিলে সেদিন বললেন মিঃ মুরাকীঃ 'তোমার বাবার কাছে লিখে দিয়েছি, তুমি কেমন ভালো কাজ করছ।'

মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা জানায় আই-ওয়ান্। মনে হয় আর একজন কে যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তামা! সেদিন তামাও এসেছে। লক্ষ্য করে আই-ওয়ান্ টেবিলের ওই প্রান্ত থেকে তার কালো চোখ দুটি ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নেয় তামা।

বাবার ওপর এখন আর রাগ নেই আই-ওয়ানের। হয়তো বাবা আর মিঃ মুরাকীই ঠিক। এতটুকু কম্যুনিস্ট গন্ধ পেলেই হল, তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন মিঃ মুরাকী। কম্যুনিষ্ট কোন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়েছে শুনলেই দাঁত কড়মড় করে বলেন—স্বপ্ন-রাজ্যে বিহার করেন সব! স্বপ্ন দিয়ে তো কত হবে! তাই হয় তো হবে। ও, এন্-লান্ ভুলই হয়তো করেছে। কিন্তু এতেও সান্ত্বনা কোথায়? এতদিন যা ছিল প্রাণ-স্বরূপ, তাকেই আজ মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াবার ভূমি কোথায়? আরো বাড়ে আত্মার নৈঃসঙ্গ। কিন্তু অসহায় আই-ওয়ান্। তার চেয়ে আর ভাববে না ও। স্বপ্ন ওর স্বপ্ন হয়েই থাক। বর্তমান জীবনের নক্সার মধ্যেই ও নিজেকে মাপসই করে খাপ খাইয়ে নেবে। এও তো একটা জীবনই। বোঝাতে চেষ্টা করে নিজেকে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে লাভ নেই। করতে গেলে জীবন ভাঙবে না, ভাঙবে মানুষ।

বাবা আরও লেখেনঃ 'চ্যাং-কাই-শেক বুদ্ধিমান মানুষ। বিপ্লবীদের একেবারে কোণঠাসা করে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভেতর দিকে—যাতে নদীর ধারের বর্ধিষ্ণু শহরগুলিতে বিশেষ করে সাংহাইতে ওদের কোন আধিপত্য না থাকে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা বর্তমান সরকারের দৃঢ় সমর্থক ঐ কারণেই। সব দিকেই অবস্থা ভালোর দিকে। কারণ জনগণের ওপর অদ্ভূত প্রভাব চ্যাং-কাই-শেকের এবং অত্যন্ত সুচিন্তিত পথ গ্রহণ করেছেন তিনি।

তিন চারবার আই-ওয়ান্ বলেছে বুঞ্জীকেঃ 'দু'বছর তো হয়ে গেল, এখন আলাদা থাকি।' প্রতিবারই প্রবল প্রতিবাদ করেছে বুঞ্জী। মিঃ মুরাকীও সুযোগ করে ওর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর স্বাভাবিক ধরনে শান্তভাবে অত্যন্ত

কোমল করে বলেছেন, 'কেন যাবে তুমি ? বন্ধুর ছেলে, নিজের ছেলের মতই, ঘরের ছেলে ঘরেই থাকো, বাবা।'

সুতরাং আরো দুটি শীত গেল। ভোর বেলা চোখ খুলে লেপের তলার কোমল উষ্ণতায় শুয়ে শুয়ে ওর ছোট্ট বাগানটিতে তুষার ঝরা দেখে—তুলতুলে নরম, ঘনীভূত শুভ্রতা। দেখে ঠান্ডা মনে হয় না। যেখানে পড়ে সেখানেই লেগে থাকে। মাটির উষ্ণতায় নীচ থেকে ধীরে ধীরে গলে যায়। গ্রীষ্ম-কালে কাগজের পর্দায় ঘরগুলো চমৎকার ঠান্ডা থাকে, আর শীতের সময় থাকে গরম। তাছাড়া ঘরের একদিকে একটা গর্তের মধ্যে থাকে কড়া ভরা গনগনে আগুন ওপরে ছাই চাপা দেওয়া। ওপরে একটা উঁচু ফ্রেম বসিয়ে চাপিয়ে দেওয়া থাকে ভারী লেপ, কম্বল বা ঐ জাতীয় কিছু। তারই নীচে পা ঢুকিয়ে সন্ধ্যেবেলায় আরাম করে বসে থাকে আই-ওয়ান্। কখনও কখনও বুজী এসে ব'সে যায় কম্বলের তলায় পা ছড়িয়ে। খানিকক্ষণ গল্প-গাছা বা কিছু পড়াশোনা চলে। কোন কোন দিন বৈঠকখানায় সবাই মিলে বসে গরম লেপের তলায় পা দিয়ে। তামা বেশীর ভাগই থাকে না। এই শেষ বছর, মেলাই নাকি পড়া-শোনা তার।

এক একদিন আসে তামা। আই-ওয়ান্ চুপ করে বসে থাকে। তামা সামনে থাকলে ওর মুখে কথা সরে না; চোখ তুলে চাইতে পারে না। তামার মুখের দিকে চায় না আই-ওয়ান্; বুজী আর মিঃ মুরাকী যখন কথায় ব্যস্ত থাকেন সেই ফাঁকে লুকিয়ে লুকিয়ে এদিক ওদিক চাওয়ার অছিলায় একটু একটু দেখে নেয়। তামা ওর পাশে বসে না, বসতে পারে না জানে ও। তার জায়গা মায়ের পাশে। অতি শান্ত ধীর মুখখানায় বিদ্রোহ-ভরা উজ্জ্বল দুই চোখ; হৃদয়ের উত্তাপে টুক্‌টুকে রাঙা দুই গাল। তামা সুন্দরী, তামা মোহময়ী। কিন্তু সে-রূপের দিকে তাকাবার সাহস নেই আই-ওয়ানের। অবরোধ নেই বটে মুরাকী গৃহে—কিন্তু আছে অবরুদ্ধতা। যে-মুক্তি এখানে চোখে দেখা যায় তা যে উন্মুক্তি নয়—আই-ওয়ান্ তা বুঝেছে। মিঃ মুরাকী সকলের সামনে দাঁড়িয়ে জামা হয়তো বদলাতে পারেন, কিন্তু সে নিজে দেয়ালের দিকে মুখ করে। এবং পরিচারিকা, পরিজনও সবাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে।

একই নিয়ম তামার বেলায়ও। চলায় ফেরায় সে স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীন বলেই তার কাছে বসে একান্তে দুটো কথা বলতে পারে না, হাতখানি একটু ধরতে পারে না। আকারে, ইঙ্গিতে বা সামান্যতম ভাষণেও যদি এর ব্যতিক্রম ঘটে—আজ যে-গৃহে তোমার অবারিত অধিকার—সেই মুহূর্তে তার চৌহদ্দী থেকে বিতাড়িত হতে হবে। কেউ বলে না দিলেও ভালো করেই ঐ তত্ত্ব জানে আই-ওয়ান্।

সে বছরই গ্রীষ্মের সুরুতে তামা স্কুল ছাড়ল। [কেউ বলেনি আই-ওয়ানকে, তবু বুঝতে পারে ও]। এতদিন ভোরবেলা ও স্কুলের নীল পোষাক পরত—এখন সর্বক্ষণই কিমনো পরে থাকে। আগে ও ফিরত সন্ধ্যায়। আই-ওয়ানরা ফেরার অনেক পরে। এখন তার ব্যতিক্রম। এসেই যে দেখতে পায় তামাকে তা নয়। তবু তামা যে বাড়ীতেই আছে সে-খবর ওর অনুভূতিতে পৌঁছে যায়।

এক একদিন দেখা হয়ে যায়—হয়তো বাগানে ফ্ল তুলছে তামা, নয়তো ফ্ল সাজিয়ে রাখছে কোনও ঘরের ফুলদ্বাণিতে। চোখাচোখি হলে মৃদু হাসে। আই-ওয়ানের মনে হয়—হাসি নয় ও কান্না। স্কুল ছাড়ার পর এখন যেন আরো লাবণ্যময়ী হয়েছে তামা; আরো শান্ত হয়েছে। সারাদিন বাড়ীতেই থাকে সে, বড় ভালো লাগে ওর। কিন্তু এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল কি করে? এ বিষয়ে কেউ ওকে কোন কথা বলেনি—তামা বাড়ী গেল কি স্কুলে থাকল তার সাথে আই-ওয়ানের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু একদিন জিজ্ঞাসা করে ফেলল বুজীকেঃ 'স্কুল ছাড়ার পর অমন বদলে গেল কেন তামা?'

বৃষ্টি পড়ছে রিম্‌ঝিম্‌। বেড়াতে বেরিয়েছে দুজনে। কাদা ছপছপিয়ে চলতে চলতে জবাব দেয় বুজীঃ 'বিয়ের জন্য তৈরী হচ্ছে যে।'

'বিয়ে? সেকি? তামার বিয়ে?' আই-ওয়ান্‌ বলে। তা হবেই তো বিয়ে। বয়েস তো হলো; প্রায় ওরই সমবয়সী, কিন্তু এতদিন কথাটা ওর মাথায় আসেনি।

'এখনও ঠিক হয়নি অবশ্য।' বুজী জবাব দেয়। হাওয়ায় ছাতাটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সামলাতে সামলাতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে বলে বুজীঃ

'আমাদের নিয়মই হল, পড়াশোনা হয়ে গেলে, মেয়ে বাড়ীতে থেকে রান্না, সেলাই, চা-তৈরী, ফুল সাজানো, গান করা—অর্থাৎ ঘর-গৃহস্থালীর কাজ আর স্বামী-সেবা শিখবে। মানে বিয়ের তালিম।' তারপর ছাতাটাকে নামিয়ে বন্ধ করতে করতে বলেঃ 'বাবাঃ ঝক্‌মারী এই সব বিদেশী জিনিষ নিয়ে। এর চাইতে আমাদের পুরানো তেলে-কাগজের বর্ষাতি অনেক ভালো।'

আই-ওয়ানের মুখ শুকিয়ে যায়। বলেঃ 'তামার বিয়ে!'

'বাঃ! বিয়ে হবে না!' বুজী বলে, 'তা এখনও দেরী আছে। কত শিখতে হবে এখন ওকে—বিশেষ করে পুরুষদের বিষয়। পুরুষদের সম্পর্কে কিছুই জানে না ও। সুমীকে দেখ না—কেমন সুখে রেখেছে আকিওকে। নিজেও ঘরকন্না নিয়ে বেশ সুখে আছে। চায়ও তাই। আধুনিকাদের নিয়েই মুস্কিল। বাবা বলেছেন বিয়ের আগে সব একেলে-পনা মগজ থেকে সাফ করে দিতে হবে। সম্ভবতঃ কোন বুড়ো গীশা রেখে দেওয়া হবে ওর জন্য। এও প্রাগ-বিবাহ তালিমের অংগ।

চম্‌কে ওঠে আই-ওয়ান্‌। কিন্তু তামার বিয়ে হবে তাতে ওর কি? কিছু না, তবু অসহনীয়—শুধু একটি মানুষের সুখ-সন্তোষ বিধানের জন্য আপনাকে জলাঞ্জলি দেবে তামা! একটি মানুষ! কিন্তু কে সে? তামাকে বড় একটা দেখা যায় না। তবু ওই মেয়েই তো এ-গৃহের প্রাণ; ওরও। এই স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য ওর অনুভূতি জুড়ে আছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে তামার গোলাকৃতি সুন্দর মুখশ্রী, ওর নড়া চড়া কথাবার্তা ব্যবহারের লালিত্য। কখন দেখল এসব আই-ওয়ান্‌? মনে তো পড়ে না। কিন্তু আশ্চর্য! নিজেরই অজান্তে তামা এবং তামার সবকিছু ওর জানা হয়ে গেছে।

'তামার বিয়ে স্থির হয়নি, ঠিক জানো?' অশোভন প্রশ্ন। বুজীও হক্‌চকিয়ে থাকে, জানে। তবু জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্‌।

বুজী উত্তর দেয়ঃ 'অতশত জানিনে।' জানবার দরকারই বা কি? আই-ওয়ানের চওড়া মুখখানার আর উলটানো কলারের ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল

ঝরছে ধারায় ধারায়। ওর দিকে তাকিয়ে বলে আবার বুজীঃ 'শোন, তুমি আমার ভাইএর মত, তাই বলছি। বাবার ইচ্ছে জেনারেল সেকীর সাথে ওর বিয়ে হয়।'

জেনারেল সেকীকে জানে আই-ওয়ান্। কিয়ুসুতেই জন্ম। নামকরা লোক। দেশের মানুষ ওকে নিয়ে গর্ব করে, ভালোবাসে না। বয়স প্রৌঢ়ের সীমায়। বছর দুই আগে বিপত্নীক হয়েছেন—ভারী ঘটা করে স্ত্রীর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। আই-ওয়ান্ তখন সবে এসেছে। ঘটা দেখে নয়ন ওর সার্থক। শুধু ওর নয়, গোটা সহরের। কারণ এমন জলুষ অভূতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন সেকী নিজে—মোটা সুতী কাপড়ের পতাকা আর ফুল দিয়ে সাজানো মোটরে। ধীরে ধীরে চলছিল গাড়ীখানা। সামরিক সম্মান-চিহ্নে শোভিত বক্ষ, মুণ্ডিত মস্তক উঁচু কলারে অর্ধ-প্রোথিত, বিপুল দেহখানা নিয়ে সোজা হয়ে কোলা-ব্যাঙের মত বসেছিলেন জেনারেল সেকী। সবাই তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। ঠিক পেছনেই আর একখানা অপেক্ষাকৃত ছোট গাড়ীতে একটা ক্ষুদ্র পাত্র হাতে নিয়ে বসে ছিল এক প্রাচীনা দাসী। পাত্রটিতে এক মুঠি মনুষ্য-দেহ ভস্ম। ওই ভস্মটুকুই একদিন জেনারেল সেকীর অনুগতা পত্নীর রূপ ধরে ছিল।

সব চোখের সামনে ভেসে উঠল আই-ওয়ানের। আপন মনেই বিড়্ বিড় করে বলতে লাগলঃ হাতীর মত মোটা বুড়োটাকে বিয়ে করবে একটা কচি মেয়ে! এই বুড়ো হাতীর মনোরঞ্জনের জন্য তামার এত শিক্ষা চলছে? কেমন যেন পীড়িত বোধ হয় নিজকে।

'আমার বাবার বহুদিনের বন্ধু জেনারেল সেকী।' বুজী বলে। তাবপর হেসে ওঠেঃ 'ওসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না হে। প্রেমকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিও না—দেখছ তো আকিওকে?'

'প্রেম ট্রেম নয়।' ধীরে ধীরে বলে আই-ওয়ান্, 'আমি ভাবছি তামাব কথা।'

প্রেম নয়, শুধু ভাবনা! হঠাৎ ওর মনে হয়, ভাবনা আর প্রেম এক হয়ে মিশেই যায় যদি, কি ক্ষতি তাতে? তাইতো। কথাটা ভাবেনি তো কখনও!

সত্যিই প্রেম? তামাকে ভালোবাসে আই-ওয়ান্? দূর্, তা কেন হতে যাবে? দু'বছরের বেশী হল এক বাড়ীতে এক সাথে আছে দু'জনে। কই কিছু তো মনে হয়নি কখনও! না রং, না রোমাঞ্চ, না শিহরণ, না সরম। নিজকে চোখ রাঙায়। তামাকে দেখলেই গোপন দৃষ্টিতে পাঁতি পাঁতি করে দেখে নিজের মন যাচাই করে। এই তো মেয়ে—বেঁটে-বাঁটকুল, এতখানি চওড়া কাঁধ, মোটা মোটা ঠোঁট—এর জন্য প্রেম হয কখনও? পিওনীও তো এর চেয়ে সুন্দর।

এমনি করে, যাচাই-নিরীখের পালা বয়ে চলে গেল গ্রীষ্ম-ঋতু।

হ্যাঁ, পিওনী সুন্দর বটে, কিন্তু পিওনীকে ছুঁতে ইচ্ছা হয়নি কখনও। তামার একটুখানি স্পর্শের জন্য ওর কায়-মন ব্যাকুল। প্রতিদিন যখনই দেখে —ওই চওড়া-কাঁধ, বেঁটে মেয়ের মুখ, হাত পা, দেহেব ত্রুটির কথা ভুলে কেবলি একটু স্পর্শ চায় আই-ওয়ান্।

তামা-তামা-তামা। ওর মনের জগৎ তামাময় হয়ে গেল। মন কেবলি

শুধায়—সত্যি কি এ প্রেম? তামাকে কি ভালোবাসি? এই প্রশ্নের কাছে, কাজ বই, সব মিথ্যে হয়ে যায়। প্রথমে ভেবেছিল—থাক এখন, পরে যাচাই করে দেখলেই হবে। ভালো যদি বেসেই থাকে, বেশ তো! বিবাহের প্রস্তাব করা যাবে। বিয়ে? ভাববার কথা—চাট্টি খানি কথা নয়। বিশেষ করে তামাকে বিয়ে। কেন? ক্ষতিই বা কি? ওতো দেশে ফিরে যাচ্ছে না! এমন সুন্দর দেশ, পরম আত্মীয়ের মত ওকে কোল দিয়েছে। ও আর তামা দুজনে মিলে নূতন করে এখানেই ঘর বাঁধবে।

স্বপ্ন দেখে আই-ওয়ান্। ওরই জন্য কি নিজকে রচনা করছে তামা? এ সম্ভাবনা মনে হতেই সব কিছুর রং বদলে যায়। তাহলে তো ভালোই হয়েছে, এই যে স্কুল ছেড়ে বাড়ী বসে তামা রান্না শিখছে, শিখছে ব্যঞ্জনাময় করে ফুল সাজানো, বীন্ বাজানো; শিখছে প্রিয়-প্রসাদন.........দূরে বহু দূরে......কোন্ এক অজানা মেঘের পারে—দেখা যায় ছোট্ট একটি গৃহ—তামা আর ও দুজনের প্রেম দিয়ে বাঁধা নীড়......।

বাবা হয়ত প্রথমটায় আপত্তি করবেন। কিন্তু মিঃ মুরাকী আর মিঃ উ বহুদিনের বন্ধু। মিঃ মুরাকী তো ওর বাবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কথা উঠলেই গদগদ হয়ে বলেন—চমৎকার মানুষ মিঃ উ—যাকে বলে লৌহ-মানব। চীনে অমনি মানুষেরই দরকার এখন। শুধু চীন কেন, যে কোন দেশেই। জাপানের অত বড় বন্ধু আর নেই।

অমন লোকের ছেলেকে জামাই হিসেবে পেয়ে হয় তো খুশিই হবেন মিঃ মুরাকী। আর তামা? আচ্ছা ওই হোৎকা মানুষটাকে বিয়ে করার কথা কি করে ভাবতে পারল মেয়ে? ওর গা জ্বালা করে রাগে। কিংবা হয়তো জানেই না তামা। কিংবা হয়তো কর্তব্যের খাতিরেই বুড়ো সেকীকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বিপদ তো ঐখানেই। অদ্ভুত মেয়ে। জেদী, খাম-খেয়ালী, চলবে খুশি-মাফিক; কিন্তু আশ্চর্য ওর কর্তব্য-নিষ্ঠা।

সারা গ্রীষ্ম হেমন্ত নিজের সঙ্গে লড়াই চলল আই-ওয়ানের। এক এক সময় মন বলে প্রেম। একেলে পদ্ধতিতে মিঃ মুরাকীর কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করবে! কিন্তু মানুষটার সামনে দাঁড়ালেই ওর রক্ত জল হয়ে যায়। ঐ টুকু ক্ষুদ্র দেহে কি অপরিসীম ব্যক্তিত্ব। রীতিমত ভয় করে দেখলে। কাজ নেই অত সাহস দেখিয়ে—সব পন্ড হবে। তাছাড়া তামার মন না জেনে প্রস্তাব করেই বা কি করে! ওকে যদি নাই মনে ধরে থাকে তার। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আই-ওয়ান্। চেহারাটা সত্যি কুৎসিত! মুখটা কি বিশ্রী লম্বাটে। ফ্যাকাশে রং—নড়া-চড়া তো নেই। ঘাড় গুঁজে বসে থাকা দিন-মান। বুজীর মত মিছামিছি হাঁটতে ভালো লাগে না ওর। নাঃ, হাঁটতে হবে। পরক্ষণেই কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে যায়—সত্যি প্রেম তো? ভুল বুঝছে না তো? সত্যি ভালোবাসে তো তামাকে? তামা যদি ওকে না ভালোবাসে, ও কেন বাসতে যাবে? দূর ছাই! চুলোয় যাক্ ভালোবাসাবাসি। তামাকে ও শুধু এটুকু বলে দেবে, জেনারেল সেকীকে যেন কিছুতেই বিয়ে না করে। যে করে হোক সুযোগ করে ঐ টুকু বলবেই। বাস্ নিশ্চিন্ত।

কিন্তু সুযোগ মেলাই মুস্কিল। দেখা হতে মুস্কিল নেই। মুস্কিল কথা বলা। সে-চেষ্টা করতে গেলেই দেখা যায়, তামা আর একলা নেই।

হয়তো কোন পরিচারিকা এসে পড়ল কোন কাজে। নয় তো শ্রীমতী মুরাকী ঐদিক দিয়েই যাচ্ছিলেন [স্বেচ্ছাক্রমে নয়—দৈবাৎ]। দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা বলে যাবার সময় বিশেষ কাজে তামাকে নিয়ে গেলেন। আর দেখা হয়—তখন সবাই থাকে। এবং সকলের আগেই উঠে চলে যায় তামা।

কয়েক সপ্তাহ চেষ্টা করেও একটি মুহূর্তের জন্য একলা পেল না তামাকে। আসলে একলা কথা বলতে দেবে না ওরা। রাগ হয় আই-ওয়ানের। এতটুকু বিশ্বাস নেই? কিন্তু ব্যবহার কারো বদলায়নি। ঠিক আগের মতই আছে।

সেদিন বিকেলে বাড়ী ফিরে দেখে বাগানে পুকুরের ধারে তামা একটা পাথরের ওপর ঝুঁকে বসে আছে। শীত সুরু হয়েছে—জলের ওপর তুষারের হাল্কা আস্তরণ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল আই-ওয়ান্। এইবারে একলা পাওয়া গেছে। একটি মুহূর্ত নষ্ট করা নয়। সোজা বলতে আরম্ভ করে। কথা মুখে বেধে যায়। জাপানী ভাষায়ই বলে। বেশ জাপানী শিখেছে এখন।

'শোন,...... মানে—বহুদিন থেকে চেষ্টা করছি বলতে. ....'

চোখ তুলে তাকায় তামা। কালো চোখের তারায় বিস্ময়। বরফের ওপর একটা পাথর ঠিক করে রাখছিল, হাত দুটি এখনও সেই পাথরের ওপর রাখা। আই-ওয়ান্ ভাবে ঠাণ্ডার মধ্যে অমন করে হাত রেখেছে কেন তামা? ওই কালো চোখের ভরা দৃষ্টিতে যেন আমন্ত্রণ .. . বুকে সাহস আসে। তাড়াতাড়ি বলে যায়ঃ

'বুড়োকে বিয়ে করো না, তামা; জোড়-হাত কবি লক্ষ্মীটি!'

দ্বিতীয় কথা বলার আগেই দেখা যায় শ্রীমতী মুরাকী একটা শাল গায়ে দিয়ে এদিকে আসছেন দ্রুতপদে। অত তাড়াতাড়ি বড় একটা হাঁটেন না মহিলা। আই-ওয়ান্ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ল। কেন যাবে? অন্যায় তো করছে না কিছু! তামা মাকে দেখতে পেয়ে মার কাছে এগিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে যায়ঃ

'যাকে ইচ্ছে তাকে বিয়ে করব, বুঝলে?' ওর কোমল মুখ আর কোমল স্বরে এক অবর্ণনীয় দার্ঢ্য। চোখের নিমেষে একখানি সুখ আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে আই-ওয়ানের বুকে, মুখে, সর্বাঙ্গে।

মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন কথা বলে তামা। শুনতে পায় না আই-ওয়ান্। কি নিয়ে যেন একবার দু'বার তিনবার, চারবার মাথা নাড়ল। একটু হেসে নিজের ঘরে চলে যায় আই-ওয়ান্। বড় জেদী তামা। এক হিসেবে ভালোই। অকারণে খুশী হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্। বুকের ভার ওর নেমে গেছে।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ভালোই—লেখাপড়া শিখলেই ওরা জেদী হয়—ভাবতে ভাবতে টুপী জামা না ছেড়েই বসে পড়ে আই-ওয়ান্। বাগানে পাথরের ওপর ঝুঁকে-থাকা তামার চেহারাটি মনে পড়ে যায়। তামা সুন্দরী নয়। সুন্দরী ছিল পিওনী। অপূর্ব রূপসী। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে রূপই সব নয়। ওর মা বলতেনঃ

'মেয়েদের রূপ চাই বৈকি। কিন্তু বেশী রূপ আবার ভালো নয়। কথায় বলে অতি রূপসী সর্বনাশী!'

বিশেষ করে আই-কোর সামনেই বেশী বলতেন। তখন এর কারণ বোঝেনি আই-ওয়ান্। এখন বোঝে। অর্থাৎ মা বলতেন বৌ এর শুধু রূপ হলেই চলে না। এমন বৌ হবে যার ওপর নির্ভর করতে পারা যায়। তা তামার আছে সে গুণ। দেখতে ও ভালোই। কিন্তু সর্বোপরি আর একটি বস্তু আছে ওর মধ্যে যা আশ্বাসে বিশ্বাসে এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়। অর্থাৎ তামাকে দেখলেই মনে হবে তোমার, এখানে নির্ভর করতে পারা যায়।

সত্যি কি ভালোবাসে আই-ওয়ান্? জানবেই বা কি করে? ও তামার সঙ্গ চায়—সান্নিধ্য চায়—এই চাওয়াই না প্রেম। দিনান্তে বাড়ী ফিরে অনুভবে চায় পেতে তামাকে। এই পিপাসাও তো প্রেম! তাই না?

অন্ততঃ একটি ঘণ্টা তামাকে কাছে পেলে ও ঠিক নিজকে যাচাই করে নিতে পারত। কিন্তু তা হবার জো নেই। তামা অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা পাখী। ওড়বার আকাশ ওর আছে—কিন্তু সেই সাথে আছে সেই অদৃশ্য সুতোর টান।

হঠাৎ টুপী কোট নিয়ে উঠে পড়ে জাপানী পাইপ ধরায়। সম্প্রতি পাইপ ধরেছে ও। ওর ঘরের সামনের বাগানটিতে এসে জলাধারের স্বচ্ছ জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চারদিক প্রতিদিনের মতই পরিপাটি, সরস। কিন্তু কাল রাতের বৃষ্টির পর পাথরগুলোকে কে যেন তুলে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে, আবার স্ব-স্থানে রেখে দিয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে জমাট বাঁধা বরফের ফ্রেম থেকে একখানা পাথর তুলে নিয়ে দেখল। উল্টো দিকও একই রকম পরিষ্কার। সযত্নে আবার রেখে দিল পাথরটা। ছোট একখানা পাথর এদিক ওদিক হলেও টের পাওয়া যায় এ বাড়ীতে। মনঃস্থির করে নেয় আই-ওয়ান্—অপেক্ষাই করবে। নিজের মন জানতে হবে! জানতে হবে তামার মনও। ততদিন ও অপেক্ষা করে থাকবে।

বসন্ত শুরু হয়েছে। দফতরে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ মুখ তুলে বুঞ্জী বলে উঠল সেদিন, 'পাহাড়! পাহাড়ে যাব হে আজই। সেই নতুন বছরের পর থেকে স্রেফ নো ছুটি। না হেঁটে হেঁটে পাগুলো মরচে ধরে গেছে।'

থেকে থেকে এমনি খেয়াল চড়ে বুঞ্জীর। দেখে দেখে অভ্যেস হয়ে গেছে আই-ওয়ানএর। মাসের পর মাস ঘাড় গর্দান গুঁজে একটানা কাজ করবে; তারপর বলা নেই কওয়া নেই হুট করে একদিন কলম ফেলে ডেস্ক চাপড়িয়ে ঠিক এমনি করে 'পাহাড় পাহাড়' বলে লাফিয়ে উঠবে বেমক্কা।

আই-ওয়ানের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসল। বহুদিনের বহু কসরতের পর বুঞ্জীর সাথে পাহাড় চড়া খানিকটা রপ্ত হয়েছে। কাঁকড়ার মত ঠ্যাং দুটো পট্টি এঁটে চামড়ার বুট চড়িয়ে তর্ তর্ করে পাহাড় বেয়ে ওঠে বুঞ্জী। ওপরে সেই মাথায় চড়ে আই-ওয়ানএর জন্য অপেক্ষা করে। শত সাধনা করলেও বুঞ্জীর মত অমন করে পাহাড় বাইতে সাত জন্মে পারবে না আই-ওয়ান্।

বুজী জেদের সুর টেনে বললে, 'কাল এ্যাঞ্জেলিয়া ফুটেছে। আনুজেনে যাব।' তারপর একটু থেকে আই-ওয়ানএর দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে অত্যন্ত সহজভাবে বলল, 'তামাকেও নিয়ে যাব। তুমি আসবার আগে হামেসা আমরা দু'জনেই যেতাম।'

আই-ওয়ান ব্যস্ত হয়ে পাইপটা হাতড়ায়। বুকের মধ্যে সাত সমুদ্রের ঢেউ উঠেছে। বুঝতে পারছে না তো বুজী? যত জ্বালা! পাইপটা মুখে থাকলেও তো হত। একটা অবলম্বন পাওয়া যেত। যাই হোক। বলল, 'তাই নাকি?' বেশ ঠান্ডা স্বরেই বলতে পারল। বহুদিন বহু মাসের প্রতীক্ষায় সংযম এসেছে কণ্ঠে, চোখের চাহনীতে।

বুজী বলে, 'কে জানে বাবা।' ওর চোখে দুষ্টুমীর ফুলঝুরি, 'ঠাকরুনের মর্জি।' আই-ওয়ান্ জবাব দেয় না। বুজী বলে চলেঃ 'বকুনি খাবার ভয় আছে তো!'

জিজ্ঞাসা করতে যায় আই-ওয়ান, 'তার মানে—'

তার আগেই ঘাড় নাচিয়ে, 'আমার পিতৃদেব—' বলেই বুজী চুপ্।

'ওঃ।' নীচু স্বরে বলে আই-ওয়ান্।

'যা হয় হবে, দেখা যাবে'খন,' বুজী শান্তভাবে বলে, 'বলব তো একবার, তারপর শ্রীমতীর যা খুশি।'

হঠাৎ হোঃ হোঃ করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

'হাসছ কেন?' জানে আই-ওয়ান্, তবু জিজ্ঞাসা করে।

দুষ্টুমী-ভরা স্বরে বলে বুজী, 'কিছু না। জেনারেল সেকীর কথা মনে পড়ে গেল। কি বিশ্রী লোকটা! মনে করলেই হাসি পেয়ে যায়।'

উত্তর না দিয়ে পেছন ফিরে বেসুরো শিস্ ভাঁজতে থাকে আই-ওয়ান্।

নিঃশব্দে কাজে হাত দেয় আবার দু'জনে। মালের চালানগুলো পরীক্ষা করতে করতে ভাবে আই-ওয়ান—বুকের মধ্যে এই আগুন কিসের? প্রেম? হঠাৎ ওর মনে হয় তামা যদি না যায় কাল! শিউরে ওঠে। তাহলে ও-ও যাবে না। পারবে না যেতে। কিছুতেই না। একটা কিছু বানিয়ে বলে দেবে বুজীকে। কোথাও যাবে না। ঘরে বসে থাকবে। যদি. . .সারাটা দিন তামাকে পাওয়া যায় কাছে—। না না তামা যাবে হয়তো।

কাজ করে চলে আই-ওয়ান্। করতেই হয়। ওর হাতের মধ্যে তো নয় সব। হয় তো তামা যাবে, হয় তো যাবে না। আশাই শুধু করতে পারে ও। বুক-ভরা, প্রাণ-ভরা আশা। জানে, নেহাৎ পাগলামো। কিন্তু...। হয় তো তামার যাওয়া হবেই না। যদি বৃষ্টি হয়! হলই বা। বৃষ্টিতে পেছুবার ছেলে বুজী নয়। কিন্তু তামা! সে যদি পিছিয়ে যায়। মেয়ে-মানুষই তো! মেয়েরা এক এক সময় আবার বড্ড এক-রোখা হয়। একবার মুখ থেকে বেরুল তো, বাস্। তামাও হয় তো অমনি। যাবে যখন বলেছে, যাবেই। বৃষ্টিই হোক আর বাদলই হোক। কে জানে কেমন মেয়ে তামা। কতটুকুই বা তার জানে ও!

যদিই বা বৃষ্টি হয়! ভয়ে ও হিম হয়ে যেতে লাগল। তিন বছর আছে ও এই মুরাকীদের সাথে। কাল, কাল, এই কালকের দিনটার জন্যই যেন তিনটি বছর পথ চেয়ে আছে ও। ছুটির পরে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে

গেল। সমুদ্র থেকেই তো বৃষ্টিরা আসে—মানে পাহাড় থেকেই। আর কোত্থেকে আসবে নয় তো!, পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। সমুদ্র, পাহাড় যেখান থেকেই হোক এই মুহূর্তে তো আকাশে মেঘের লেশ নেই। মনটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বাড়ি ফেরে আই-ওয়ান্।

রাত্রিবেলা ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠে। বৃষ্টি! পড়ি কি মরি করে ছুটে বেরিয়ে আসে বাগানের ধারে। কোথায় বৃষ্টি। ফুটফুটে বাসন্তী জ্যোৎস্নায় ছোট্ট বাগানখানা ভেসে যাচ্ছে। তরাসে ঝরনার অশ্রান্ত ঝরঝরাণীকে বৃষ্টির শব্দ বলে মনে হয়েছিল। মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল আই-ওয়ান্।

কিন্তু ভোরবেলা তামাকে দেখে ও অবাক হল না। সে আসবে যেন জানাই ছিল। সেই মিষ্টি, প্রতিদিনের চেনা মেয়েটি। ঘরোয়া পোষাক-পরা। সুতী পোষাক, কৃষক-বালার মত নীল-সাদার ফুল-কাটা কাপড়, বুকের ওপর আড়াআড়ি হয়ে ভাঁজ পড়েছে। তার ভেতর থেকে চাঁপা রঙের গলাটি উঠেছে, যেন কোমলতার লতা। তার ওপরে মুখখানা যেন সদ্য-ফোটা গোলাপ ফুল। সরসতায়, উষ্ণতায় ঢলঢল করছে। তামার দিকে তাকিয়ে আই-ওয়ানের চোখ-দুটি খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল।

'যাচ্ছে তাহলে।' মনে মনে ভাবে আই-ওয়ান। বুকের মধ্যে ওর দাপা-দাপি চলছে। কথা বলতে পারে না। কিন্তু তামা শান্ত। কিছুক্ষণ পরে আই-ওয়ান্ সহজ হয়ে এল। কেনই বা চঞ্চল হবে! প্রথম দর্শন তো নয়। কতকালের চেনা! আজকের তো নয়! সেই কবে থেকে পাশাপাশি আছে ওরা।

'ও বুঞ্জী, লাঠিগুলো কোথায়, বলনা ছাই! এই যে ধর, আমাদের খাবার, আর কাপড়ের শুক-তলীগুলো। লাগবে না পাহাড় চড়ার সময় জুতো ঢাকতে! নইলে তো সব পপাত।'

রওনা হয়ে গেল ওরা। যেন তিনটি ভাই বোন। বাজে ভাবনা ভেবেছে আই-ওয়ান্ এ দু'দিন। অমন স্বাস্থ্যবতী সহজ স্বাভাবিক মেয়ে। এ মেয়ে কি প্রেমে পড়ে! প্রেমে যারা পড়ে তারা আলাদা চীজ। তাদের কথা বহু শুনেছে বুঞ্জীর কাছে। ইচ্ছে না থাকলেও আজ মনে পড়তে লাগল। তামা হয় তো ওর কথা একবারও ভাবছে না। মনটা মুহূর্তের জন্য মুষড়ে গেল। ভালোই যদি বাসবে তাহলে অত ফূর্তি ওর আসছে কোত্থেকে?

কিন্তু চমৎকার দিন—অমন দিনে বেশীক্ষণ গুমরে থাকা যায় না। চাষীরা ক্ষেতের পানে চলেছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে ডেকে দুটো কথা বলে যায়। শ্যামলা পাহাড়ের গায়ে সূর্যের আলো পড়ে ঝলমলিয়ে উঠেছে।

বলেই ফেলে আই-ওয়ান, 'এদ্দিন এসেছি জাপানে, আজের মত এমন সুন্দর দিন একদিনও হয়নি।'

তামা বলল, 'তা বটে। এমন দিনটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। জাপানেই মেলা ভার।'

সত্যি, আশ্চর্য দিন। শান্ত, স্নিগ্ধ; আলো আর রোদে আমেজ-লাগা।

হাওয়ার পাগলামী নেই। মধু! মধু! মধু বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। আজ যেন কোথাও কিছুতে অসংগতি নেই। প্রতিটি বস্তু যেন আজের এই প্রসন্ন আকাশ, বাতাস, আলোর সাথে পরিপূর্ণভাবে মিল খেয়েছে। কোথাও বৈসাদৃশ্য নেই, বেমানান নেই। এগিয়ে চলেছে ওরা, ছবির পর ছবি ভেসে যাচ্ছে চোখের সামনে—মনোহরণ, মনোলোভন। যতই এগোয় ততই যেন রূপের দল মেলে। সবে ভোর হয়েছে। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় এসে পেঁছুল ওরা। পথটা হঠাৎ মোড় ঘুরে একটু ভেতর দিকে চলে গেছে। একটা ছোট্ট ঝরণা ছলছলিয়ে নেচে নেচে, দুহাতে শীকরোৎক্ষেপ করে একটা জলাশয়ে গিয়ে পড়ছে। পায়ের গোড়ালী-ডোবা জলে দাঁড়িয়ে স্নানার্থিনী এক গ্রাম্য-বালা। নিরাবরণ তার বর-তনু ছেয়ে সাবানের ফেনা। দীঘল কালো চুলের রাশ মাথার ওপর চূড়ো করে বাঁধা। আচম্বিতে ছবিখানি পড়ল চোখের সামনে। নিজেকে সামলে নেবার সময় পেল না আই-ওয়ান্। একেবারে সোজাসুজি কন্যার চোখে গিয়ে মিলল ওর দৃষ্টি। পরক্ষণেই পেল লজ্জা। কিন্তু কন্যার সেই কালো চোখের কালো মেঘের মত দৃষ্টি আকাশেরই মত স্বচ্ছ সহজ। শিশুর মত সরল বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সে ওদের দিকে। তারপর ডেকে মধু-ঋতুর অভিনন্দন শুনিয়ে দিল। বুজী কথা কইল না। তামা প্রত্যভিনন্দন জানাল। কন্যা ডেকে শুধাল: 'কোথায় যাচ্ছ গো সব?'

তামা হাঁকে: 'উষ্ণ ঝরণায়।'

'তা যাও যাও। যাবার মত দিনই বটে।'

চলল ওরা এগিয়ে। তামার সামনে ভারী লজ্জা করতে লাগল আই-ওয়ানের। কিন্তু খুশিতে ডগমগ হয়ে মেয়েটা বলে কিনা:

'দেখলে কি সুন্দর মেয়েটি। টলমলে জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভেজা গায়ে। চমৎকার!'

বুজী সায় দেয়: 'যা বলেছিস।'

আই-ওয়ানের মনে হয়—সত্যি সুন্দর। আজের এই রূপময় দিনটির সাথে এই বিবসনা সুন্দরীর যেন কবিতার মিল। কিন্তু এ রস সবখানি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়। কিছু যেন ইন্দ্রিয়াতীত।

পাহাড়ের মাথায় পেঁছুতে দুপুর গড়াল। একটা সরাইখানা আছে ওখানে। তারই মধ্যে উষ্ণ-ঝরণায় স্নানের আয়োজন। আই-ওয়ান্ ভাবে—তামা নাইবে তো সাথে? চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে গেল কৃষক-বালার সেই অভিষেক-শুচি নিরাবরণ রূপ। ও যেন ডুবে গেল সেই অনবদ্যতার স্বপ্নে। ও তো রূপ নয়—গান। সংগীত। পথ চলতে চলতে আচম্বিতে ভুবন ভরে উঠল গানে। চোখ মুখ গরম হয়ে উঠল ওর। একবার মন চাইছে, নাইবে তামা ওদের সাথে। আবার বলছে, না থাক। কিছু বলতে পারছে না বুজীকে। বক্‌বক্ করে চলেছে সে, কিন্তু একটা কথাও বলতে পারছে না আই-ওয়ান্। তামা হাত নেড়ে এক দিকে চলে গেল। ওরা আর এক দিকে। ওর মনের পটে রং-এর তুলি চলছে...মস্ত বড় বাষ্পায়িত জলাশয়—টলমল স্বচ্ছ নীল জলের ধারা মাটির তলা থেকে উঠছে। রূপোলী বুদ্‌বুদের দল ঝলমল করছে তার বুক জুড়ে। তারই মধ্যে তামা......ভুবন-

মনো-মোহিনী......। রূপ-পাগল হয়ে ওঠে ওর মন। আবার ভয়ে বুক দুরু দুরু করে। চোখ তুলে চাইতে পারবে আই-ওয়ান?

মাজা-ঘষা শেষ করে বাইরে আসে বুজী আর আই-ওয়ান। কোথায় তামা? জলে নামে গিয়ে দুজনে। উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে বুজী: 'কি আরাম! ফুরফুরে হালকা মনে হচ্ছে না?'

'সত্যিই ভাই, বড় আরাম।' আই-ওয়ান্ বলে।

ছোট্ট ছেলের মত ঝাঁপাই খেলায় মাতে দুজন। জল ছিটিয়ে পরস্পরকে ক্ষেপিয়ে তাড়িয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু আই-ওয়ানের বুকের তলায় ঘন প্রতীক্ষা।

তবু এল না তামা। স্নান সেরে জামা কাপড় পরে বাগানে এসে দেখে কন্যা সেখানে আছেন। মুখখানিতে তাজা সরস গোলাপী আভা। ভেজা চুল।

'কি রে নাওয়া-টাওয়া হল ভালো করে?' শুধায় বুজী।

'হয়নি আবার। ছোট্ট একটা পুকুর, আর একলা আমি।'

বেশ হয়েছে এই ভালো হয়েছে—ভাবে আই-ওয়ান্। ভালোই হয়েছে, দূরে ছিল তামা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ও। শত হলেও ও তো জাপানী নয়। নিজেকে ভারী পরিচ্ছন্ন মনে হল। মুহূর্তে যেন বুকে বল এল, এল স্বাস্থ্য আর আনন্দ। কিন্তু কেন, বুঝতে পারল না। সোনালী-রোদ-ভরা দিন তো আরো এসেছে—মন খুশিতেও ভরেছে। ও হেসেছে, হাসবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কিন্তু আজ যেন সব সুন্দরতর, পরিপূর্ণতর। পাহাড়ী আকাশ স্বচ্ছতর মনে হয়; সরাইখানাটা মনে হয় আরও একটু বেশী পরিষ্কার; বুড়ো খালি-পা সরাই-ওয়ালাটাও যেন আজ একটু বেশী ভদ্র।

খেলায় মাতে তিনজনে—যেন পিছিয়ে গিয়ে শৈশবে ফিরে এসেছে ওরা। জলে ক্ষয়ে পাথরটার চেহারা হয়েছে একটা শয়তানের মুখের মত। হাসিতে ঢলে পড়ে ওরা। ছোট্ট ডোবাটায় এসে উঁকি মারে দল বেঁধে। কাঁকড়া মশাই দাড়া গুটিয়ে গুটিশুটি পালাচ্ছে—এই দেখ! দেখ! হেসে কুটোপাটি সব। বিশেষ করে বুজী হাসলেই ওরা হাসে। তামা আই-ওয়ানের চোখাচোখি হয়। এতো শুধু চোখের চাওয়া নয়। চোখে চোখে আলিঙ্গন। আই-ওয়ান কেবলি ফাঁক খোঁজে; যতবার ওই নীল চোখের দিকে চায় পৃথিবী যেন নতুন করে সুধায় ভরে ওঠে। কি মধুক্ষরা দৃষ্টি!

আবার ডাক আসে। ঘরের এক ধারে ছোট্ট টেবিল পড়েছে। সরাইওলা বলে: 'ঘরখানাকে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছি। দেখুন না কেমন হয়েছে।'

পর্দাটা সরিয়ে দেয়। ছবি—ছবি ফুটে ওঠে—পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেপল বনে যেন আগুন লেগেছে। স্বচ্ছ নীল আকাশের পটে সেই আগুনের শিখা। আই-ওয়ানের চোখ নেচে উঠে তামার দৃষ্টি খোঁজে। তামার চোখে ব্রীড়া-জড়িত ঘন প্রতীক্ষা। অপরূপ এই সাধারণী মেয়ে। আই-ওয়ানের হৃদপিণ্ডটা যেন ছিটকিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। হৃদয়ের লাল গালে এসে লহর তোলে। লজ্জা ঢাকবার জন্য বলে আই-ওয়ান্:

'এইখানে বসো, তামা। এখান থেকে সব দেখতে পাবে।' পাহাড়ী দৃশ্যটা দেখতে পাওয়া যায় এমনি জায়গায় কুশনটা টেনে দিল।

'জো হুকুম।'

কি নম্র, বাধ্য মেয়ে। মাথা ঘুরতে থাকে আই-ওয়ানের। কথা হারিয়ে যায়। এত বাধ্য তো নয় তামা এমনিতে। ওর মাথা তো নোয় না। অত্যন্ত সুস্পষ্ট, ধারাল, কঠিন নিজস্বতার একবগ্গা ঘোড়ার মত ও মেয়ে।

বুজী ভাঁড়ামী করে চলেছে। খাবার-কাঠি দুটো হাতে নিয়ে পেটুকের মত ভঙ্গি করছে। কখনও বা বাটি হাতে নিয়ে ভিক্ষে চাইছে। এবারে আর হাসি পায় না আই-ওয়ানের। বেতস-পত্রের মত সারা দেহ ওর বেপথুমান। তামা হাঁটুগেড়ে বসে থালা বাটি নিয়ে ব্যস্ত—মুখে মিষ্টি হাসি! থেকে থেকে চাইছে আগুনের আলপনা-দেওয়া পাহাড়ী আকাশের দিকে। কিছু একটু বললে হত না! ভাবে আই-ওয়ান। দু'টো কবিতার লাইন, পড়া-পুঁথি থেকে প্রাচীন কোন বিদগ্ধের দুটো বা নীতি-কথার উদ্ধৃতি, কিছু একটু। কিন্তু মন একেবারে শূন্য......কিছু মনে আসছে না, কিছু ভাবতে পারছে না—। শুধু তামার দৃষ্টি দিয়ে ওর মনের আকাশ এপার ওপার ছাওয়া। হঠাৎ বোকার মত বলে উঠল, 'ভারী সুন্দর, না তামা?'

বলেই আফসোস। মূর্খ, মূর্খ, আমি একটা আকাট মূর্খ। কি ভাবলো তামা। ঘেন্না করবে আমায়। কি যে ছাই হয়েছে আজ!

কিন্তু তামার মুখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। আনন্দে মাথাটি নেড়ে সায় দিল। চার চোখ আবার মিলল। ওর বাটিটা নিয়ে সাদা ফুরফুরে ভাত ভরে হাত বাড়িয়ে দিল তামা। দু'হাতের অঞ্জলিতে তুলে নিল আই-ওয়ান্। মুহূর্তখানি যেন উৎসব হয়ে উঠল। এর অর্থ কি—জানে কি আই-ওয়ান? জানে না।

'তামা!' ডাকে আই-ওয়ান। নাম-ডাকা ক্ষণটি চোখের নিমেষে আকাশে উঠে ফেটে গিয়ে হাজার হাজার আলোর ফুলঝুরি ঝরতে লাগল। এ তামার যাদু। তামা! তামা! সাধারণকে অসাধারণ করার যাদু জানে তামাই। আর কেউ জানে না। এ যেন আবিষ্কার। বিহ্বল হয়ে গেল ও। বুক দুরু দুরু করে ভয়ে। কিন্তু কেন ভয়? এই মুহূর্তটির জন্যই না ও দিন গুণেছে এতদিন।

সারা রাস্তা বুজী ক্ষেপাল ওকে।

'কি হল হে, আই-ওয়ান্? মুখে ছিপি এ'টে একেবারে রাম-গড়ুরের ছানা বনে গেলে যে! বুঝলিরে তামা! পাহাড়ী মামদো ওর ঘাড়ে চেপেছে।'

'এই, কি যাতা বলছ, দাদা!. পাহাড়ে সত্যি যাদু আছে!'

পাথর-কাটা ঢালু পথ। তাড়াতাড়ি নামছে ওরা। তামা আগে আগে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি ও আগে আগেই চলছে। বুজীর পা বারে বারে পিছলে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে ও পায়ে ভারী মিলিটারী বুট নিয়ে। মিলিটারী ট্রেনিং-এর সময় পেয়েছিল জুতো জোড়া।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বলছিল: 'মিলিটারীতে গিয়ে কচু হল, যা লাভ এই জুতো জোড়া।'

ধমকে ওঠে তামা: 'খবরদার বুজী! ওসব বলবে না। জান? দেশের দরকার হলে লড়তে হবে। আমাদের তৈরী থাকা উচিত।'

জোরের সঙ্গে জবাব দেয় বুজী: 'ওসব আমার দ্বারা হবে না। লড়তে-টড়তে পারব না বাবা, কারো সাথে।'

অত্যন্ত সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ের মত তামা বলল: 'খাড় পারবে তোমার, দেখো তখন।' সেই তামাই আবার বলে পাহাড়ের আত্মা আছে। আই-ওয়ান শুধায়:

'সত্যি বিশ্বাস কর, তামা?'

এদিকে মুখ ফিরিয়ে এলো চুলগুলোকে মুখ থেকে সরিয়ে দেয় তামা। রোদে আর হাওয়ায় ওর গালের গোলাপীতে মেটে রং ধরেছে।

'আলবৎ করি।'

'আর এদিকে 'মগা' বলে গুমর করিস?' হাসে বুজী।

'নয় তো কি! একশো বার। তাই বলে আত্মায় বিশ্বাস করব না এমন কি কথা আছে?' বলে তামা।

'মগা না হাতী!' বুজী বলে।

'আলবৎ মগা, সাতশো বার, হাজার বার;...' বলতে বলতে ছুটে পালায় তামা। তরতর করে নামে পাথর-কাটা সিঁড়ি দিয়ে। হাওয়ায় উড়ছে ওর বসন। অপরাহ্নে সোনা-ঢালা সূর্যের আলো। হঠাৎ আই-ওয়ান্ তামার পেছনে ছুটল। তার পেছনে আসছে বুজী—থপ্ থপ্ থপ্ শোনা যাচ্ছে তার জুতোর শব্দ। তামার মতই হাওয়ার আগে নিশ্চিত পদক্ষেপে। ছুটছে আই-ওয়ান্। ধরে ফেলল এসে তামাকে। তামা থেমে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু পায়ের গতি থামাতে পারল না আই-ওয়ান; হাত বাড়িয়ে দিল তামা। শক্ত করে ধরল ও। বুজী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছুল: 'বাপ্‌স্ কি ছোটাই ছুটতে পার তোমরা!'

হেসে উঠল তিনজনে। ওই হাসির সহজ আবহাওয়ার মধ্যে আই-ওয়ানের মনে হয় আর একটুখানি ধরে রাখতে পারে প্রিয় হাত দুখানি। এর আগে তামাকে ও স্পর্শ করেনি। সবার সঙ্গে ও-ও হাসছে বটে, কিন্তু ওর সমস্ত অনুভূতিতে তামার ছোঁয়া লেগে আছে, হাতখানা কি দৃঢ়—যেন পিটিয়ে পিটিয়ে গড়া, অথচ কি কোমল, তুলতুলে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় পিওনীর কথা। যখন তখন ওর হাতের মধ্যে নিজের হাতখানিকে সে গুঁজে দিত। ও হাত ছিল একেবারে অন্য রকম। রোগা লিক্‌লিকে এই এতটুকুন একটা ফোঁটা হাত। তেলোটা সব সময় গরম—আঙুলগুলো কাঁপত থিরথিরিয়ে। একবার একটা পাখীর ছানা ধরেছিল আই-ওয়ান্; ছোট্ট বুকটা কি ধুকপুক করছিল ভয়ে। ঠিক যেন ঐ রকম।

কিন্তু তামার! বলিষ্ঠ হাত, শীতল তার স্পর্শ। ওর হাতের মধ্যে কই এতটুকুও তো ঝিমিয়ে গেল না। বরং শক্ত করে ওর হাতখানাকে ধরে আছে। কিন্তু স্পর্শটুকুকে ভালো করে অনুভূতির মধ্যে রসিয়ে নেবার আগেই হাত টেনে নিয়ে ছুটল দুষ্টু মেয়ে। তারপর ছুট্ ওর পিছনে একেবারে টিলার নীচে বাস-লাইনের ধারে। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

হাই তুলে বুজী বলে উঠল, 'খিদেয় নাড়ীভুঁড়ি সব জ্বলছে রে বাবা। আর পা যা টাটাচ্ছে।'

আই-ওয়ান্ শুধায়: 'তামা, তোমার পাও ব্যথা করছে নাকি?'

মাথা নাড়ে তামা। হাঁটার অভ্যেস আছে ওর। গলার স্বরটা শান্ত বটে, কিন্তু বুঝতে পারছে আই-ওয়ান্ ওর ভেতরটা কি এক গোপন সুখে উচ্ছ্বসিত।

জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন লাগল দিনটা? ভালো লেগেছে তো?'

'লেগেছে।' তাড়াতাড়ি জবাব দেয় তামা।

চারধার কাঁপিয়ে ঝম্‌ঝম্ করতে করতে বাস এসে গেল। আবার সেই বাড়ি—পাইন-বনের ছায়ায় ঘেরা পালিশ-করা কাঠের বাড়িখানা। আলো নাচে তার জানালায় জানালায়।

শেষ হয়ে গেল স্বপ্ন-রঙীন দিনটা। সত্যি শেষ? না, এ দিনের শেষ নেই, নেই ক্ষয়। টেবিলের ওপর একখানা চিঠি। বাবার। পড়ল না আই-ওয়ান; চিঠি পড়ার দিন আজ নয়। আজ ও আপনাকে আবিষ্কার করেছে, আপনাকে ও জেনেছে। তামাকে ভালোবাসে ও। তামা ওর প্রিয়া। এ বরাঙ্গনাকে বধূরূপে না পেলে ওর চলবে না। কিন্তু এই খবরটা জানতে ওর এত দেরী হল! ছিঃ! প্রথম দেখার ক্ষণেই ওর বুকের তন্ত্রী কেন বেজে উঠল না?

অফিসে ডেস্কে বসে ছিল আই-ওয়ান্। চোখে, বুকে ওর গত দিনের স্বপ্ন। রাত্তির বেলা ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টি পড়ছিল। আঁধারে শুয়ে বৃষ্টির ঝির্ ঝিরানী শুনতে শুনতে মনে হল—তামাও শুনছে আজ। মিঠে শব্দ আরও মিঠে হয়ে উঠল। বুক ভরা মধু নিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ল। ভোর বেলা জেগে দেখল, ছোট্ট বাগানখানা নেয়ে ধুয়ে একেবারে মধুক্ষরা হয়ে উঠেছে। তামাও দেখছে এ রূপ-সম্ভার। কিন্তু তামাকে তো দেখা চাই। না দেখে যে থাকতে পারছে না ও।

কোথায় তামা? জিজ্ঞাসা করাও যায় না কাউকে। অশোভন। হয়ত ঘুমুচ্ছে এখনও। কাল যা ধকল গেছে। চোখের সামনে যেন দেখতে পায়—ফুলকাটা লেপের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে তামা রোদে রাঙা ফুলটির মত। বুঞ্জী আর ও যখন বেরিয়ে এল অফিসের জন্য—তখনও বাঁকা রেখায় রেখায় ঝির-ঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। একজন ঝি এসে আ-ভূমি নমস্কার করে বিরাট বিরাট দুটো কাগজের ছাতা এগিয়ে দিল। পথে আসতে আসতে ভাবল আই-ওয়ান্—মুরাকী মশায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা করে পাঠাতে হবে। নিজে করলে চলবে না। ঘটক দেখতে হবে। বলবে বুঞ্জীকে?

হঠাৎ বুঞ্জী বলে উঠলঃ 'বাবা যা চটেছে তামার ওপর!'

তামার নামে চমকে উঠল আই-ওয়ান্।

'তামা? তামার ওপর চটেছেন?'

'হুঁ।' খস্ খস্ করে কলম চলছে বুঞ্জীর? হিসেবের খাতায় পড়ছে একের পর এক অঙ্ক। 'জানতাম, বুঝলে, হে! আমাদের সাথে কাল যে গেছল, উরে বাবা! যা বকুনিটা দিয়েছেন কাল রাত্তিরে!' চোখ নাচতে থাকে বুঞ্জীর। বলে, 'আজ তো হাসছি! কাল হাসি থাক, হাত পা সব যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছিল পেটের মধ্যে। আমিই কি ছাড়া পেয়েছি?' ঠোঁট বাঁকায় বুঞ্জীঃ 'জানি, জানি বুড়োর কেন এত রাগ।'

'কেন?' আই-ওয়ান্ শুধায়। ভেতরটা ওর গরম হয়ে ওঠে।

'আর কি? জেনারেল সেকীর সাথে বিয়েটা আর আটেকানো গেল না। সে বেটারও আর তর সইছে না।'

মাথা ঘোরে আই-ওয়ানের।

বুজী বলে: 'করছে তামা ও ব্যাটাকে বিয়ে। সাত জন্মেও না। হাজার ...হাজার...দুত্তোর ছাই! আমেরিকায় সেই যে হাতীর দাঁতের খেলনার চালানটা...পোনের হাজার...বুঝলে কিনা...'

'তামা বিয়ে করবে না জেনারেল সেকীকে?' আই-ওয়ান্ জিজ্ঞাসা করে। কণ্ঠ তালু ওর শুকিয়ে কাঠ।

'ওঃ সে অনেক কথা,' বুজী বলে, 'আমরা কেউ চাইনে এ বিয়ে, মা শুদ্ধু না। তবে কি জানো! সেকেলে মানুষ তো মা! মুখ ফুটে না বলতে পারছেন না। শুধু এটা সেটা ভাঁওতা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছেন এত দিন। কিন্তু এ ভাবে আর কদিন চলবে বল!'

'তাহলে?'

হাসতে হাসতে বুজী বলে: 'তাহলে আর কি? তাহলে—যার ব্যাপার তিনি জানেন! এ হোৎকা বুড়োর সাথে উদ্বাহের চাইতে উদ্বন্ধনই করে বসবেন তিনি। আমরা বুঝলে হবে কি। কিন্তু যে-কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, তিনি বুঝলে তো? দেখতেই ভালো মানুষ। গোঁ-খানা তো পরখ করনি! মেয়েও আমাদের কম নয়! ওর জেদ বাবা তো চেনেন না। বোঝাবে কে তাকে? ঠেকে তবে শিখবেন। এখন চলুক সেয়ানে সেয়ানে ঠোকাঠুকি।'

দেরাজ খুলে আরেকটা হিসেবের খাতা বের করে বুজী।

আই-ওয়ান্ তুৎলে তুৎলে বলে: 'এত সব কাণ্ড হচ্ছে, আর তুমি...!'

'তা কি করা যাবে। এই সব প্রেম পীরিতের লাঠালাঠি তো ঘরে ঘরে হর ঘড়ি চলছে বাপু আজকাল! বুড়োরা চায় তাদের কালের মত নিজেদের খুশি মত ছেলে মেয়ের বে দেবে। আর যুবোরা চায় প্রেম করে বিয়ে করবে।' হোঃ হোঃ করে আবার হেসে ওঠে বুজী। 'আমার বাপু ওসব ঝামেলা নেই। প্রেম ট্রেমে পড়তেই পারলাম না।'

বুজী হাসে, কিন্তু আই-ওয়ান্-এর হাসি আসে না। শুধায়, 'তা এই জেনারেল...কি নাম বললে না—হাঁ সেকী, রাজ্যে এত মেয়ে থাকতে তামা ছাড়া কি আর কাউকে খুঁজে পেলেন না?'

তুলি খস্ খস্ করতে করতে জবাব দেয় বুজী: 'বুঝছ না ব্যাপার। মস্ত বড় মানুষ সেকী—টাকা, পদ, মান, সম্মান অঢেল। তার ওপর আমাদের স্বঘর। আর পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। তামার স্বাস্থ্যখানা দেখছ তো। বস্ আর কি! বাবাও ক্ষেপে উঠেছেন—দেশের সেবা! বুড়ো সেকীর খানদানী রক্ত আর তামার স্বাস্থ্যে মিলে—বুঝছ না! বুড়োগুলো দেশ দেশ আর সম্রাট্ সম্রাট্ করে গেল।'

'তুমি কি ভাবছ?' আই-ওয়ান্ শুধায়। 'ভাবছি? কিস্সু না! ওসব ভাবা টাবার মধ্যে আমি নেই। পোষায় না। সেই যখন ইস্কুলে পড়ি, দেখলুম কতগুলো ছেলে ভাবতে শুরু করলে। বাস্ দফাটি ঠাণ্ডা। 'একদিন গট্-গটিয়ে এক দঙ্গল সেপাই এল—এই সেকীরই চেলা-চামুণ্ডার দল। বুঝলে, ওদের নিয়ে আবার গট্গটিয়ে চলে গেল। সেই যে গেল আর ফিরল না

বাছাধনেরা। সেকীর আওতায় ওসব ভাবা টাবার কারবার চলবে না। অতএব আমি স্থির করিয়াছি, কোন কিছুতে মাথা না ঘামাইয়া খাইয়া দাইয়া ফুর্তি করিয়া জীবন কাটাইব। বুঝেছ স্যাঙাৎ?' বুঞ্জী জবাব দেয়।

রাস্তায় ঘাটে হামেশাই কত ছাত্র দেখেছে আই-ওয়ান্। চশমা পরা বোকা বোকা দেখতে ছেলেগুলোর পেটে পেটে এত? কে ভাবতে পারে, বল! জিজ্ঞাসা করেঃ

'বিপ্লবী দল টল এখানেও আছে নাকি?'

শ্বাস বন্ধ করে চাপা গলায় চীৎকার করে ওঠে বুঞ্জীঃ

'আরে মলো যা! এই চুপ্! চুপ্! কে কোথা শুনতে পাবে।'

দরজাটা বন্ধই ছিল। তবু আর একবার উঠে গিয়ে বুঞ্জী দরজা খুলে চার দিকে উঁকী মেরে দেখে এল। কেউ কোথাও নেই। নিশ্চিন্ত। তাড়াতাড়ি বললঃ 'ওসব কথা আমি মুখে আনিনে, শুনিনে। আমার কাজ কর্ম আছে।'

আর এদিক ওদিক তাকাল না, ঝুপ করে খাতাপত্রের মধ্যে একেবারে ডুব মারল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আই-ওয়ানও খাতা-পত্র টেনে নিল। কিন্তু মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল ওর চিন্তা। খানিক পরে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল—কোন একটা অজুহাত করে একবার বাড়ি ফিরে যাওয়া যায় না! শুধু একটুখানি দেখবে তামাকে—বুঝিয়ে বলবে, কেন কাল কিছু বলতে পারেনি ও। এত সুখ—ওই সুখে সব ভুলে বসেছিল। পারল না আর থাকতে আই-ওয়ান্। বুঞ্জীর কাছে এলঃ 'বুঞ্জী, ভাই, একবার, একটুখানি...তামাকে...তুমি না হলে হবে না...'

'বলছ কি হে?' বুঞ্জী তাকিয়ে বলেঃ 'জান, বাবার হুকুম? তিন দিন তিন রাত্তির তামা তার ঘরে লক্ আপ্।'

তি-ই-ই-ন দিন! তিন দিন তামার দেখা পাবে না। তিন দিন।

'এই কি প্রথম ভেবেছ? গত বছর শীতকালে সেকীর সাথে বিয়ের কথা উঠল একবার। তামা বললে বাবাকে, বেশ, বলছ যখন তোমার কথা রাখব, করব বিয়ে। কিন্তু তার পর বুকে ছুরি মেরে মরব। বাবা রেগে কাঁই। হুকুম হল তিন দিন ঘরে বন্ধ।'

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল আকিও। কেমন ক্লান্ত বিষণ্ণ চেহারা। অমনিই থাকে ওর সর্বদা। একখানি চিঠি বাড়িয়ে দিল।

'প্যারিস থেকে এসেছে, দেখ কি লিখেছে। হার্ন্ কারখানা থেকে যে চীনে-মাটির ঘোড়াগুলো পাঠানো হয়েছিল তাদের কালো কাঠের স্ট্যান্ডগুলো নাকি সব ভেঙে গিয়েছে। যেমন করে বলেছিলাম, তেমন করে প্যাক করোনি না কি?'

লাফিয়ে উঠল বুঞ্জীঃ 'কেন? খড়ের কুঁচি দিয়েই তো প্যাক করে দিয়েছিলাম!'

'প্রথমে যে সাটিন কাগজ দিয়ে জড়িয়ে নিতে বলেছিলাম, নিয়েছিলে?' আকিও বলে।

ভয়ে কালো হয়ে ওঠে বুঞ্জীর মুখঃ 'ভুলে গিয়েছিলাম স্রেফ।'

'যা ভেবেছি! সব মাল পাল্টে দিতে হবে। বহু টাকা লোকসান হল।'

'নিজের হাতে গুলি করে মরতে ইচ্ছে করছে আমার,' বুজী বলে, আমার দ্বারা কিস্‌সু হবে না।'

'সর্বক্ষণ অত হাসলে কাজ হয়?' আকিও বলে, 'হাসতে হাসতেই তোর ওই হাল।'

দরজা বন্ধ করে চলে গেল আকিও। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বুজী, 'আমার দ্বারা কস্মিন কালে কিস্‌সু হবে না। দরকারীটিই কি সব্বার আগে ভুল! আকিও বলেছিল বটে। কে জানে কি ভাবছিলাম তখন।'

আই-ওয়ান্ বলে ওঠে হঠাৎঃ 'কোনও মতে একবার দেখা হতে পারে না—?'

বুজী কট্‌মট্ করে তাকাল। 'কি বললে?'

'একটি বার...না হলে মরে যাব।'

'কেন শুনি?'

উত্তর দিতে পারে না আই-ওয়ান্। স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বুজীর দিকে। দেহের সব রক্ত ওর মনে হয় ওর ঘাড়ে গালে ধাওয়া করেছে।'

'মানে, তুমি, বলছিলাম, এই প্রেমে...'বুজী বলে।

'ঠিক ধরেছ।' আই-ওয়ান্ বলে।

এতখানি হাঁ হয়ে গেল বুজীর মুখ। তারপর হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল ও।

কঠোরভাবে জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্ঃ 'হাসবার কি হলো, শুনি?'

হেসে গড়াতে গড়াতে বুজী বলেঃ 'তোফা! তোফা! বেশ বাবা বেশ! বাড়িখানাকে দিব্যি পীরিতের হাট করে তুলেছ। আকিও—তামা—তুমি—বেড়ে ফুর্তিতে আছ, আর বুড়ো বাবা বেচারী...'

'তা অত হাসির কি হল!' গম্ভীরভাবে শুধায় আই-ওয়ান্।

বুজী বলেঃ 'সেকীর সাথে বিয়েটা যদি আরো এগিয়ে আনবার সাধ থাকে, তবে কর দেখা আমি আর কি বলব।'

ইতস্ততঃ করে আই-ওয়ান্। বুজীর চোখ মুখের ভাবে ওর উত্তেজনা হিম হয়ে যায়।

দৃষ্টি চলে যায় জানালার বাইরে। ধূসর আকাশের ধূসর রং অঙ্গে মেখে এলিয়ে আছে সমুদ্র তার অসীম বিস্তারে। ভাবে আই-ওয়ান...কিন্তু সারাদিন ভেবেও কোন কূল কিনারা হয় না। শুধু একটা বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছায়—ও ভালোবাসে তামাকে।

সন্ধ্যা-বেলায় রোজকার মতই সবাই খেতে বসেছে। ঘরের আবহাওয়াটা একটু যেন কেমন কেমন। মানুষগুলি যেন বদলে গেছে। বুজীকে সুদ্ধ অচেনা মনে হচ্ছে। বড় অদ্ভুত লাগছে সব। নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে সবাই। মিসেস মুরাকী আগে আগেই উঠে চলে গেলেন ক্ষমা চেয়ে। আকিও-ও উঠে দাঁড়াল।

তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ মুরাকীঃ 'এ মাসের মালের হিসেব দাখিলা দিয়েছ, আকিও?' এই প্রথম কথা। এতক্ষণ একটিও কথা বলেননি

ভদ্রলোক। ঠাণ্ডা, বাদলা রাত; আগুন কাছে নিয়ে ছোট একটা বাঁশের পাইপে তামাক টেনেছেন শুধু।

শান্ত স্বরে জবাব দেয় আকিওঃ 'হয়ে গেছে, বাবা।' স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে পিতা-পুত্র। তারপর মিঃ মুরাকী চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেনঃ

'বেশ!' আকিও বেরিয়ে চলে যায়।

ঘরের মধ্যে মিঃ মুরাকী বুঞ্জী আর আই-ওয়ান্। এমনি কত দিন গেছে। বড় ভাল লাগত আই-ওয়ানের মিঃ মুরাকীর কথা শুনতে। কথা যখন না বলতেন অমনি চুপচাপ বসে ওর তামাক টানা দেখতেও বড় ভাল লাগত। কিন্তু আজ বড় ভয় করছে ওর। এই সদয় ভালো' মানুষ চেহারার মানুষটি বন্দী করে রেখেছে ওর প্রিয়তমাকে এই বাড়িরই কোথায় কোন আঁধার কক্ষে। পিতৃ-আদেশে স্বগৃহে বন্দিনী তামা।

'তুমি যেতে পার বুঞ্জী' স্তব্ধতা ভেঙে বলে ওঠেন মিঃ মুরাকীঃ 'আই-ওয়ানের বাবার চিঠি এসেছে ওর সাথে কথা আছে আমার।'

চম্‌কে উঠে আই-ওয়ানের দিকে চায় বুঞ্জী। কিন্তু নিরুপায়। প্রণাম করে বেরিয়ে যেতে হয়। আই-ওয়ানের বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে। স্থির কঠিন প্রৌঢ়ায়মান মুখখানার দিকে তাকিয়ে আই-ওয়ানের মনে হয়, কেন ভয় করার আছে কি? তবু ভয় করে। যে-জীবনকে এতদিন জেনে এসেছেন শ্রী মুরাকী সেই পরিচিত জীবনেরই দৃঢ় অভিব্যক্তি ওই মুখের রেখায় রেখায়। অভ্যস্ত ধারার বাইরে আর কিছু মানে না, মানবে না এ মানুষ। একবার ভাবে আই-ওয়ান্ সোজাসুজি কথা বলবে ও মিঃ মুরাকীব সাথে। তাঁর পথে, তাঁর ধারায় ও ধরনেই ও এগুবে। নইলে দগ্ধ-ভাগ্য নিয়ে কপালে করাঘাত করতে হবে চিরকাল। আবার ভাবে, না থাক—দেখাই যাক না। মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে থাকে।

ধীরে ধীরে মিঃ মুরাকী বলেনঃ 'তোমার কাজ-কর্ম সম্বন্ধে আমি লিখে-ছিলাম তোমার বাবাকে। ভারি খুশী হয়েছেন ভালো করে কাজ করছ শুনে।'

একটু থামেন মিঃ মুরাকী। ছোট্ট পিতলের চিমটেটা দিয়ে এক টুক্‌রো কয়লা তুলে দেন কলকেতে। তারপর আবার বলেনঃ 'হাঁ আব লিখেছেন, তোমাদের দেশের অবস্থা এখন অনেক ভালো। বিপ্লবীদের কড়া হাতে দমন করা হয়েছে। কম্যুনিষ্টরা তাড়া খেয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। গোলমাল টোলমাল নেই, কাজ-কর্ম শৃংখলা মতই চলছে।'

উত্তর দেয় না আই-ওয়ান্। মিঃ মুরাকী কি জানেন কেন আই-ওয়ানকে তার বাবা পাঠিয়েছেন এখানে?

একটানাভাবে বলে যান মিঃ মুরাকীঃ 'হতেই হবে, অরাজকতা আর কদিন চলতে পারে। শেখা দরকার ছেলে ছোকরাদের, লাফালাফি করলেই হয় না। যা চাইব তাই হতে হবে— তা কি আর হয়। ইচ্ছে দমন করতে হয়। আইন শৃংখলা বলে তো একটা বস্তু আছে। মানতেই হবে তা—। হঠাৎ যোগ করে দেন, 'দশের ভালোর জন্যই মানতে হবে।' তাবপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে আর একটু উঁচু করে আবার বলেন, 'তা চমৎকার কাজ শিখেছ তুমি;

আমি ঠিক করেছি ইয়াকোহামায় আমার ছেলে শিও থাকে; তার কাছে কিছুদিন থেকে বাকী কাজ কর্ম শিখে নাও। ওখানে বেশ বড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পড়াশোনা করতে চাইলে তাও পারবে। হ্যাঁ থাকবে অবশ্য শিওর বাড়িতে নয়, কেরাণীদের জন্য হোস্টেল আছে সেখানেই ব্যবস্থা করে দেব।' চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে আই-ওয়ানের, বুঝেছি, বুঝেছি, তোমার মৎলব সব বুঝেছি! তামার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাও আমায়! কেন, কেন আমাদের মিলন হবে না? কেন আমরা সুখী হতে পারব না!'

কিন্তু একটি কথাও বলতে পারল না। আগুনের পাশে বসা ওই ঋজু মূর্তিটি গাম্ভীর্যে মর্যাদায় এমনি সুন্দর, এমনি কঠিন, যে একটি কথা ওর মুখ দিয়ে বেরুল না। শুধু আপনা থেকে মাথাটা কাৎ হয়ে গেল, গলা দিয়ে মিন্‌মিনিয়ে বেরিয়ে এল—যে আজ্ঞে!

আবার বললেন মুরাকী, 'দেখ, কেমন একটা স্বভাব আমার—যা করব বলে ঠিক করি, তক্ষুণি না করে পারি না। কালই যাচ্ছ তুমি, তাহলে। আকিও-ও যাবে। মাসে একবার যেতে হয়। ভালোই হবে তোমার। এরোপ্লেনে চড়েছ কখনও?'

'না।' কালই? কালই যেতে হবে? ভাবে আই-ওয়ান্।

'তাই নাকি? তাহলে তো আরও ভালো লাগবে তোমার। জাপানী প্লেনগুলি ভারী চমৎকার! আচ্ছা, এস তাহলে!'

একটা ধন্যবাদও দিতে পারল না আই-ওয়ান্। দিতে গিয়ে ওর গলায় স্বর ফুটল না। কোন মতে শুভ-রাত্রি জানিয়ে চলে এল।

'শুভরাত্রি!' প্রতি-সম্ভাষণ জানান মিঃ মুরাকী।

বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে বুঞ্জী। 'কি বলল হে?'

'ইয়াকোহামা। কালই।'

'জানি, কিছু একটা না হয়েই যায় না', বলে বুঞ্জী, বাড়িতে ঢুকেই আঁচ করেছিলাম। কর্তার মেজাজ বিগড়োলে চাকরগুলোও বোঝে। বাঘের মত ভয় করে সব বুড়োকে।'

কি বলবে আই-ওয়ান্? নিজের পিতার বিরুধে বিদ্রোহ চলে। নিজের দেশে বসে যা খুশী তাই করা চলে। বিদ্রোহ লেগেই তো আছে অহরহ ওখানে। ছেলেমেয়ে বাপমায়ের, শাসিতেরা শাসকের বিরুধে হামেশাই বিদ্রোহ করছে। চীনের মানুষ মুক্তি-পাগল। খোলা হাত পায়ে থাকতে চায় তারা। তাই তারা উচ্ছৃংখল, তাই তারা উদ্দাম, তাই তাদের বাঁধন-ভাঙার অমন নেশা! ওই নিয়েই চীনের কারবার। কিন্তু এখানকার কথা আলাদা। এদেশের বাগানে খুশি মত একটা পাতা গজাতে পারে না। নিষ্ঠুর কাঁচির মুখে ছাঁট-কাট হয়ে, ছক্-কাটা হয়ে থাকতে হয় প্রকৃতিকে। আজ ওর মনে হয় এ বাড়ির বিপুল শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শৃংখলা কোন এক নিষ্ঠুর নির্মম কাঁচিরই বিধান।

'তারপর?' জিজ্ঞসা করে বুঞ্জী।

'জানিনে। বিছানায় গা ঠেকাতে পারব না আজ—'

'বৃষ্টি পড়ছে। নয়তো বেড়িয়ে আসা যেত।' বুঞ্জী বলে।

'হোক বৃষ্টি, চল।' মরিয়া হয়ে উঠেছে আই-ওয়ান্। তামাকে না দেখেই চলে যেতে হবে। পরশু তার বন্দিত্বের মেয়াদ ফুরোবে।

'বেশ, তাহলে বর্ষাতি চড়িয়ে নাও।'

বর্ষাতি পরে বেরিয়ে এল দুজনে। জন-শূন্য পাথুরে রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল সমুদ্রের ধারে। আঁধার বেয়ে ভেসে আসছে বাঁধের ওপর ঢেউ-ভাঙার কলোচ্ছ্বাস। সমুদ্রের শক্তি প্রতিহত হয়েছে ওই বাঁধে। বন্দরের এ-দিকটায় পুকুরের মতই শান্ত নিরুচ্ছ্বাস তার বন্যতা।

অনেকক্ষণ নীরবে পার হয়ে গেল। হঠাৎ বুঞ্জী বলে উঠল ঃ

'জান, একবার বাঁধ ছাপিয়ে সমুদ্রের জল ফেঁপে উঠল বিশ ফুট উঁচু হয়ে। বন্দর ভাসিয়ে, জাহাজগুলোকে ভেঙে চুরে তছনছ করে দিয়ে গেল। ছোট জাহাজগুলো স্রোতের টানে কোথায় যে ভেসে গেল তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না।'

'সে কি ? বাঁধে আটকাল না ?' চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্।

'সমুদ্রে যখন কোটাল ডাকে, বাঁধ তো নস্যি !'

দুই বন্ধু উদ্দেশ্যহীন হয়ে চলেছে তো চলেইছে।—আই-ওয়ানের মুখে বৃষ্টির ছাট লাগছে; ভিজে চুলের জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে ঘাড় বেয়ে। ভ্রূক্ষেপ নেই। বুকের মধ্যে হু হু করছে কান্না—আর দেখা হবে না...হবে না...কি হবে তামার ?

ছোট্ট একটুকু চারকোণা বাগানের মধ্যে ছোট একখানা বাড়ি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বুঞ্জী।

'আই-ওয়ান্ !'

'উঁ ? কি বলছ ?'

'আকিওর বাড়ি এটা।' বুঞ্জী বলে।

'য়্যাঁ ? কি বললে ? আকিওর বাড়ি ?'

'হাঁ। সুমীও এখানে থাকে।'

আই-ওয়ানের চিন্তা-স্রোত ক্ষণিকের জন্য থেমে গেল। আকিও ? সেই রহস্যময়, স্বল্প-বাক্ গম্ভীর মানুষটি—কলের মত কাজ করে যায় সেই মানুষটি ? এখানে থাকে ?

'যাবে ?' বুঞ্জী শুধায়।

'যাব ?' বলে আই-ওয়ান্।

'চল না ! আমি তো প্রায়ই আসি। সুমীর সাথে আমার খুব খাতির। বড় ভালো মেয়ে। মাও এসেছেন কবার।'

আই-ওয়ান্ দোমনা; বলে ঃ 'চল'। যেতে যেতে ভাবে কিভাবে চলবে আকিওর সামনে ? আর সুমী ! এ ধরনের স্ত্রীলোক কখনও দেখেনি আই-ওয়ান্। বাবার জোর-হুশিয়ারী ছিল—এসব মেয়েমানুষের ধার মাড়াবে না কখনও। তাছাড়া তখন ও ছিল বিপ্লবী দলে। এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। তারপর এল জাপানে। জাপানী মেয়েদের দিকেও ওর চোখ গেল না। ও শুধু জানল তামাকে, চাইল তাকেই। আকিও তাহলে বড় ফ্যাসাদে আছে।

বুঞ্জী ধাক্কা দিতে দরজা খুলে গেল।

অন্ধকারে একটা কোমল স্বর ভেসে এলঃ 'কে, বুজী ?'

'আমি আর আমার চীনা বন্ধু।' জবাব দেয় বুজী। মাথার ওপর আলো জ্বলে উঠল। স্থূলাঙ্গী, অপগত-যৌবনা, তবু সুন্দরী এক নারী দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। ডাক দিলঃ

'এসো, এসো।' গভীর আন্তরিকতার ডাক। এগিয়ে এসে বুজীর হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে এল।

'একেবারে ভিজে গেছ যে! হ্যাঁ! এই বুঝি আই-ওয়ান? শুনেছি আকিওর কাছে। খুব খুশি হলুম। নাও এখন বর্ষাতিগুলো খুলে ফেল দিকিন্! জুতোও ভিজেছে? পা ভেজেনি তো?

বুজী পা ঝাড়া দিয়ে জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেলল; মহিলা নীচু হয়ে ওর গা পা পরীক্ষা করে দেখলেন।

'পাও তো ভিজে কাই! দুষ্টুগুলো! খোল দিকিন মোজা! ঘরে আকিওর মেলা মোজা আছে, আনছি রোসো।'

বড় কোমল, সহজ মহিলা! এমন আন্তরিকতার ছোঁওয়া তার কথায়, ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেল আই-ওয়ান্। মনটা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এল। সারাদিন পরে এতক্ষণে বুকের ওপরকার ভারী বোঝাটা নেমে গেল। মহিলা ওদের নিয়ে এলেন আর একখানি ঘরে। শুকনো ঝরঝরে, আলোয়, উত্তাপে সরস। আগুনের কাছে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল আকিও। হাসি, খুশী, উচ্ছল, উদ্ভাসিত। একেবারে আরেক মানুষ। এ আকিও আই-ওয়ানের কাছে নূতন।

'আরে বুজী যে!' উচ্ছ্বসিত আকিওঃ 'আই-ওয়ান্ও এসেছ! এসো হে, এসো।' যেন সম্মানিত অতিথি ওরা।

'সুমী, আরো দু' কাপ।'

পাশের ঘর থেকে সুমীর স্বর ভেসে এল, 'আনছি গো, আনছি সব ঠিক করে। কি ব্যস্তবাগীশ মানুষরে বাবা!'

আকিও হাসে। আশ্চর্য! ভাবে আই-ওয়ান। আকিও হাসতে পারে?

সেই মুহূর্তেই ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল সুমী। হাতে দুটি পেয়ালা আর দু'জোড়া শুকনো পরিষ্কার মোজা। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সুমীকে —গাঢ় এপ্রিকট রং-এর বড় বড় সাদা ফুল-দার সিল্কের কিমনো পরা; কালো চুলের রাশ সাবেকী ধরনে প্রজাপতি করে বাঁধা। লাল টুকটুকে অতি পেলব সূক্ষ্ম দুটি ওষ্ঠ। ওষ্ঠ তো নয়; তার রেখা। স্নিগ্ধ আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে সুমীকে।

'নাও বাপু, ধর। শুনছ আকিও! গরম থাকতে থাকতে সাকেটুকুন ঢেলে দাও দেখি ওদের! আর এই দুষ্টুরা! ভেজা মোজা বদলাও শিগ্গির।'

আগুনের চারধারে গোল হয়ে বসল সবাই। একটু একটু করে পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল। উষ্ণতায়, আরামে আমেজ লাগছে। মন ছাড়া পেয়েছে খোলা আকাশে। এখানে যেন ভয় নেই, ডর নেই, বাধা নেই। ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে এক দুর্ভেদ্য দুর্গের নির্ভয় আশ্রয়।

প্রাণ খুলে কথা কইছে আকিও—যে-আকিও কদাচিৎ ঠোঁট খোলে বাড়িতে। বুজী হাসছে না, নিবিষ্ট চিত্তে শুনছে। সুমী নিঃশব্দে উঠে একটা গালার

কাজ করা বাক্স নিয়ে এসে সেলাই বের করে বসল। হাতে সেলাই থাকলেও, নজর আছে আকিওর দিকে, ওর পেয়ালা খালি হলেই সাকে ঢেলে দেয়, কখনও বা উস্কে দেয় আগুনটা।

এক গোপন পুরীর দুয়ার খুলে দিয়েছে বুঞ্জী আজ আই-ওয়ানের সামনে। ও স্তম্ভিত, অভিভূত, হতবাক হয়ে গেছে। পুরোপুরি জাপানী ধরনের ঘরখানা। সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘর। খাঁটি দেশী—এতটুকু আধুনিক বা বিদেশীর ভেজাল নেই। একধারে পালিশ-করা কাঠের নীচু শেল্ফ্-এ কয়েকখানি বই। দেয়ালে ঝোলান অনাড়ম্বর একখানি ফুলের পট। তারি নীচে কুলুঙ্গিতে বোতলের আকারের ফুলদানীতে দুটি পাতার মধ্যে একটি লাল লিলি ফুল। মেজের গালিচা, মাদুর পরিষ্কার ঝক্ঝক্ করছে। কথা বলতে বলতে খবর কাগজখানা এলোমেলো করে ফেলে রেখেছে আকিও, তাছাড়া সারা ঘরখানি ছিমছাম পরিপাটি।

আকিওর একটি কথাও শোনেনি আই-ওয়ান। ও শুধু অবাক হয়ে আকিওকে দেখছে। এই উষ্ণ, উজ্জ্বল ঘরখানায় বসে কি শান্ত আর সহজ সুরে কথা কইছে মানুষটা। এতদিন যাকে দেখেছে, সে আকিও নয়। তার খোলস।

কথা হচ্ছিল যুদ্ধের। লাফিয়ে উঠল সুমী। আর্ত স্বর।

'না না, যুদ্ধ টুদ্ধ নয়। ওসব কথা বলো না তোমরা। আমার ঠাকুর্দা মারা গেলেন যুদ্ধে—তখনও আমার জন্ম হয়নি। সেই যে-বার চীনের সাথে লড়াই হয়েছিল। দুদিনেই অবশ্য জিতলাম আমরা। সবাই রাস্তায় বেরিয়ে এল লড়াই-ফেরা সেপাইদের অভ্যর্থনা কববার জন্য। ঠাকুরমাকে বের করা গেল না। দরজা জানালা সেঁটে বসে রইলেন ভেতরে আর সে কি কান্না...! সেই থেকেই যত দুর্দশা আমাদের. .। যাক্গে এসব। গান শুনবে?'

সুমী নিয়ে আসে তার ছোট্ট বীণাটি। কি গলা! যেন কিশোরীর কণ্ঠ। বরফ আর পদ্ম ফুলের গান। 'সেই গাঁয়ে শিখেছিলুম ছোট্ট বেলায়।' বললে সুমী। আই-ওয়ানের শুধু মনে হয়—মধু! মধু! চারদিকে মধু এই গৃহের। এরই বিরুদ্ধে মুরাকী সাহেবের রক্ত-চক্ষু নিষেধ! কিন্তু তবু তো দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা সেই রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা করে!

রাত হল। ওঠে বুঞ্জীরা। দরজার কাছে এসে সুমী ওদের নমস্কার করে বিদায় দেয়।—কি হাসি-খুশি সহজ সারল্য! শিশুর মত আগ্রহশীল প্রাণ। আকিও পাশে দাঁড়িয়ে। নূতন আকিও। রাস্তায় আসতে আসতে এ ছবিই মন প্রাণ ভরে রইল আই-ওয়ানের।

'অত্যন্ত অন্যায়।' হঠাৎ বলে ওঠে আই-ওয়ান্।

' তা তো অন্যায়ই,' বুঞ্জী বলে, 'কিন্তু করা যাবে কি?'

'কি চমৎকার মানুষ সুমী!' তবু বলে আই-ওয়ান্।

'জানি তো, কিন্তু আকিওর ঘরনী হবার ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি ও।' বুঞ্জী বলে।

'কে কার ঘরনী হবে, সেই জোট বেঁধেই মানুষ জন্মায়—তোমারও বুঝি সেই বিশ্বাস!'

'আলবৎ,' অত্যন্ত সহজভাবে বলে বুঞ্জী,' 'মাও তো তাই বলেন। ভালো-

বাসার ব্যাপার অন্য। তবে এটা ঠিক, বিয়ে স্রেফ নির্বন্ধ। কার সাথে কার জোট হবে সে ঠিক হয়ে আছে। সেই জোট মিললেই তবে বিয়ে সুখের হয়। আকিওরই তো দোষ। ওর কপালে যে মেয়ে লেখা আছে, তাকে ও বিয়ে করবে না!'

'কে সেই পাত্রীটি হে, জানো?' আই-ওয়ান্ শুধায়।

'বাবার এক বন্ধুর মেয়ে। সব্বাই বলে মেয়েটি নাকি ভারী ভালো। কিন্তু আকিও ঢিট হয়ে আছে। বাবা বলেন, আমাদের সঙ্কলের সর্বনাশ ডেকে আনছে ও। ওরে বাবা! প্রথম প্রথম, সে কি কাণ্ড! আকিও দেখতে তো ভেজাবিড়ালটি। কিন্তু কি জেদ, যদি দেখতে। বাবার সুন্ধ আক্কেল গুড়ুম।'

সমস্ত বাড়িখানা শান্ত, নিস্তব্ধ। শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের নিজের ঘরে চলে এল ওরা। ঘরের পর্দা ফেলা। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আই-ওয়ানের। টান মেরে সরিয়ে দেয় পর্দা। শুভ্র কুহেলিতে ছেয়ে আছে বাগান খানা। শুভ্র জালায়নে ঘেরা ওই পুরীর মধ্যে আই-ওয়ান্ বন্দী একা, সংগীহীন।

কে জানে ত্রিযামা রাত্রির কয় প্রহর তখন—জেগে উঠল আই-ওয়ান্, তামাকে দেখা চাই! চাই! ঘুমিয়েছিল কি? না ঘুময়নি ও 'সুদীর্ঘ. সংগীহীন রাতের প্রহর চলে গেছে ওর জাগ্রত চোখের ওপর দিয়ে। হঠাৎ মনে হল. সব অর্থহীন, যুক্তিহীন। বুড়োর অবাধ্য হয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে আকিও।

একবার. শুধু একটিবার দেখবে তামাকে। ইয়াকোহামা যাওয়া ওর সহজ হবে তা হলে।

দুর্বার আকাংক্ষা। দেখা করা চাইই তামার সাথে। ওর ঘরখানা দেখেনি কোনদিন, তবে জানে কোথায়। বলেছিল একদিন তামা, সেই ছোট্ট ফোয়ারাটার ঠিক সামনে। 'ঝরনার ছলছলানী আমার ঘুম পাড়ায় আর ঘুম ভাঙায়। জানেন?' একেবারে ওধারে, ওর মা বাবার ঘর পেরিয়ে। সুবিধে এই দরজা জানালা একদম বন্ধ করে শোন মিঃ মুরাকী। রাতের হাওয়া নাকি বুড়োদের ধাতে সয় না।

তামাও হয়তো জেগে আছে। শুনছে—ঝরনার গুঞ্জন। কুয়াশায় দেখা যাচ্ছে না কিছু, কিন্তু ওই শব্দ শুনে ঠিক যেতে পারবে আই-ওয়ান্। ভুল হবে না। আকিও তো নিজের পথ নির্ভুল চিনে নিয়েছে। ও-ও নেবে। মন স্থির করে ফেলে আই-ওয়ান্।

বেরিয়ে চলে এল বাগানে। নরম নরম ভিজে ঘাস। সন্তর্পণে হালকা পায়ে চলল এগিয়ে। মিঃ মুরাকীর ঘর পেরিয়ে দালানের কোণায় এসে দাঁড়াল। কুয়াশায় গা ঢাকা দিয়ে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। ওই তো ঝরনা ঝির্ ঝির্ করে একতানে ঝরে চলেছে। শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল হাত বাড়িয়ে ঝোপঝাড় অনুভব করতে করতে। পায়ের নীচে সান ঠেকল। নিদাঘ-কুঞ্জ থেকে ঝরনায় আসার রাস্তা। পথ ধরে চলল। শব্দ আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দেয়। হাতে জল ঠেকে। ঝরনার ঠিক সামনেই তামার ঘর। ঝরনার দিকে পিঠ করে দাঁড়ানো যাক। তাহলেই

তামার ঘরের মুখোমুখি হবে। আলো তো নেই কোথাও, যদি ঘুমিয়ে থাকে তামা? একটু শব্দ করে জাগাতে হবে ওকে। আচ্ছা' ভুল করে যদি মুরাকীর ঘরে গিয়ে ওঠে? কি সর্বনাশ! না, ঠিক সোজা লাইনে যেতে হবে।

এক-দুই-তিন—! হংস-কদম ধরল। সোজা লাইনে চলা যায় হংস কদমে। এতদিন ওর কি রকম বোকা বোকা মনে হত এ জিনিষটা। কিন্তু আজ কাজে লাগছে। কি ভাগ্যিস শিখেছিল। উত্তেজনায় দুরু দুরু করছে বুক কিন্তু হাসিও পাচ্ছে। ভারী মজা, কিন্তু সর্বনেশে মজা! কিরকম দেখাচ্ছে ওকে? নিশ্চয়ই উজবুকের মত। তামা যদি দেখে ফেলে? কি ভাগ্যিস কুয়াশা হয়েছিল! পায়ে কি যেন ঠেকল। হাত বাড়িয়ে অনুভব করে। বারান্দা। ওই তো দরজা খোলাই রয়েছে।

ইঁদুরের মত গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায়। দরজায় টোকা মারবে? না থাক, আর একটু দেখা যাক। হ্যাঁ, ওই যে ফোয়ারার শব্দ ঠিক পেছনে। ঠিক, এই তো তামার ঘর। আস্তে আস্তে দরজার গায়ে নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। এত নিস্তব্ধ, নিঝ্ঝুমে রাত্রি ডাকতে সাহস হল না।

কি বলবে তামা! কেমন যেন ভয় করতে লাগল। যদি তামা বাবার অবাধ্য হতে রাজী না হয়? আশ্চর্য নেই। বোঝা যায় না ওকে। নূতনে পুরনোয় মিশিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত। কখন যে ওর কি মতি কিছু বোঝার যো নেই।

খানিকক্ষণ কোন শব্দ নেই। কেউ যেন নেই ঘরে। তারপর শোনা গেল একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ। একখানা হাত যেন আছড়ে পড়ল বিছানায়। ঘুমিয়েই আছে হয়তো। না, ঘুমন্ত মানুষের দীর্ঘ-শ্বাস নয় ও। এই তো আবারও শোনা যাচ্ছে—।

আস্তে আস্তে ঠুক্ ঠুক্ করে একটা তাল বাজাতে লাগল দরজায় আই-ওয়ান্। একটু থামে আবার বাজায়। পর্দার ওদিকে একটা ম্লান আলো থির্ থির্ করে কেঁপে ওঠে। তামার ছায়া দেখা যাচ্ছে—দীঘল কালো চুলের রাশ এলিয়ে আছে পিঠ ছেয়ে। উঠল তামা, কান পাতল। আবার ঠুক্ ঠুক্ করে আই-ওয়ান্। এবারে বোঝে তামা কেউ এসেছে। এগিয়ে আসে একটু আবার পেছয়। ভয় পেয়েছে হয়তো।

'তামা!' চাপা কোমল স্বরে ডাকে আই-ওয়ান্।

ছুটে আসে তামা। এলায়িত কেশ, আলু-থালু বেশ।

'আই-ওয়ান!' ভয়ার্ত ব্যাকুল স্বর।

'তামা', মিনতির স্বর, 'কি করব, পারলাম না থাকতে। আমায় ইয়াকো-হামায় পাঠিয়ে দিচ্ছে যে। কালই। কবে আসব আবার কে জানে! বুঞ্জী বলেছে তোমার বাবা, ভীষণ চটেছেন তোমার ওপর। বলতো, একটু না দেখে অমনি কি করে চলে যাই!'

'কিন্তু! কিন্তু! বাবা জানতে পারলে যে একেবারে চীনে ঠেলে দেবেন!'

'না, টের পাবেন না', আর্ত হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্, 'পাবেন না, তুমি আমার সহায় হও তামা!'

'সহায়? কি করে?'

'অতটা জাপানী নাই হলে তামা। তুমি, আমি...সেই পাহাড়ে বেড়াবার কথা ভুলে গেছ? মাত্র তো কালকের কথা।'

'ভুলিনি...ভুলিনি...'

'আজ আকিওর ওখানে গিয়েছিলাম, জান? বুজী আর আমি। দেখলাম আকিও আর সুমীকে। সত্যি শ্রদ্ধা হল আকিওর ওপর। সুমীকে মর্যাদা দিয়েছে, প্রেমকে সম্মান দিয়েছে। আশ্চর্য সাহস দেখিয়েছে আকিও। উচিত তো তাই। জানি যখন ভুল করছিনে, ভয় কিসের?'

অবাক হয়ে শুনছিল তামা।

'ভেতরে...জানিনে...আমি...' তামা কি বলতে যায়।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে আই-ওয়ান্ ঃ 'না, যাব না ভেতরে। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি আর একটু কাছে এসো, বাগানের এ ধারটায়। দুটো কথা বলি। লক্ষ্মীটি এসো। কাল তো চলেই যাচ্ছি।'

জবাব দেয় না তামা। তাড়াতাড়ি গিয়ে ফু দিয়ে মোম বাতিটা নিবিয়ে দেয়।

'কেউ যদি দেখে ফেলে—', ফিস্‌ফিসিয়ে বলে তামা। আই-ওয়ান্ অনুভব করে ওর পাশটিতে বারান্দার ধার ঘেঁষে মাটির ওপর বসল ও। হাত বাড়িয়ে দেয়, তামার কাঁধে ওর হাত ছুঁয়ে যায়।

আই-ওয়ানের বুক তোলপাড় করে। চাপা স্বরে ডাকে 'তামা!' ইচ্ছে হয় দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে বুকের মধ্যে। কিন্তু সাহস হয় না।

ফিস্ ফিস্ করে বলে তামা, 'বসো আমার পাশে। না না, অত কাছে নয় তাই বলে। আর একটু সরে বসো। কেউ যদি শুনতে পায় কি হবে বলতো, আই-ওয়ান্! তাড়াতাড়ি কথা শেষ কর।'

'বলছি, বলছি।'

মিথ্যে নয় তামার ভয়। যদি ধরা পড়ে ওরা—ভাবা যায় না পরিণাম। চীন দেশেও তো অমনি। শুনেছে আই-ওয়ান্ ঠাকুর্দার কাছে তাঁর এক বোনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল বাবার হুকুমে। কোন দোষ ছিল না বেচারীর। ভালোবাসতো একটি ছেলেকে। একদিন বাগানে শুধু একটু কথা বলছিল দুজনে; সামান্য দু'টি কথা। ধরা পড়ে গেল। ব্যস্, তারপর—। মিঃ মুরাকী তার চেয়েও কঠোর। তুলনাই হয় না ওই চীনে ঠাকুর্দার সাথে।

'হ্যাঁ, জেনারেল সেকীর কথা বলছিলাম।' তাড়াতাড়ি বলে আই-ওয়ান্, 'তাকে বিয়ে করবে না তো?'

'সাত জন্মেও না।' দৃঢ়ভাবে বলে তামা। আই-ওয়ান্ এসে বসেছে তামার পাশে। দু'জনের কাঁধ ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়।

'তা যদি করো, সইতে পারব না। ফিরে আসব আমি। দেখো, যে করেই হোক, ঠিক ফিরে আসব।'

'এখানেই থাকব আমি।' ফিস্‌ফিসিয়ে জবাব দেয় তামা।

তবু কাকুতি মিনতি করে আই-ওয়ান্, 'আমি ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না বলো। কাউকে না!'

কিছুক্ষণ দু'জনেই স্তব্ধ। তারপর একেবারে কানের কাছে শোনে আই-ওয়ান্ ঃ' 'পারবোই না আর কাউকে বিয়ে করতে।'

হঠাৎ যেন বিপুলে সুখের বন্যায় ও ভেসে যায়। তামার কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'আশ্চর্য আজের এই কুয়াশা না ?' গলা ধরে ওঠে, আবার বলে, 'আমাদের আড়াল করে রাখার জন্যই যেন রাতটি এই কুয়াশা মুড়ি দিয়ে আছে, তাই না ?'

'দেবতা পাঠিয়েছেন খুশী হয়ে', জবাব দেয় তামা।

'চিঠি লিখব তো আমি ?' শুধায় আই-ওয়ান্, 'কত কি যে কথা আমার জমে আছে। কিন্তু কোথায় কেমন করে লিখব ?'

'সুমীর ঠিকানায়। ও রেখে দেবে। আমি তো যাই মাঝে মাঝে। নিয়ে আসব। এমনি ক্ষিপ্রতার সাথে জবাব দেয় তামা, যেন আগে থাকতেই ভেবে ঠিক করে রেখেছিল।

আশ্চর্য যোগাযোগ!' আই-ওয়ান্ বলে, 'আজই কেন সুমীর কাছে গেলাম বলোতো ? এক মুহূর্ত আগেও তো ওখানে যাবার কথা মাথায় ছিল না!'

'একেই বলে ভাগ্য।' তামা বলে।

'কে জানে কোন ভাগ্য নাচছে আমাদের কপালে!'

'নাচছে বৈকি কিছু একটা। কিন্তু সে তো দেবা ন জানন্তি।' জবাব দেয় তামা।

চীৎকার করে বলতে চায় আই-ওয়ান্—জানি, আমি জানি। চিরকাল আমরা পরস্পরকে এমনি করে ভালোবাসব। কিন্তু বলতে পারল না। ভালোবাসা! বুকের মধ্যে একেবারে নূতন রূপে নূতন অর্থ নিয়ে জন্ম নিয়েছে কথাটি। এ অর্থে কথাটা কাউকে কোনদিন বলেনি আই-ওয়ান্; না ওকে কেউ বলেছে। একেবারে নূতন কথা! ভয়ে কাঁটা হয়ে এমনি করে বিড়ম্বনার মধ্যে বসে সাত তাড়াতাড়ি এ-কথা কি কাউকে বলা যায়! এখন থাক। সময় হোক; লগ্ন আসুক। তারপর বলা যাবে।

'দেখ, ভাগ্য নিয়ে জবরদস্তিও চলে না, তাকে খণ্ডানও যায় না।' তামা বলে।

'ভাগ্য, ভাগ্য.' আই-ওয়ান্ বলে, 'তুমিও দেখছি অদৃষ্ট-বাদী।'

'নিশ্চয়ই!' তামা বলে।

আবার স্তব্ধতা। অন্ধকারের একান্তে কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে বসে আছে দুজনে। একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে যায় আই-ওয়ানের সমস্ত হাতখানায়। হাতটা নাড়তে গিয়ে তামার হাত ছুঁয়ে গেল। দুটি হাতই চমকে সরে গেল।

সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে তামা, বলে ,'এবারে যাও তুমি। তুমি ঠিকানা দিলেই চিঠি লিখব আমি। কপালে থাকলে আবার দেখা হবে।'

'কপালে থাকলে মানে ? আলবৎ আছে কপালে,' জোর দিয়ে বলে আই-ওয়ান্।

হাতে হাত মিলে যায়। পর মুহূর্তেই তামাক ঘরে পর্দা টানার শব্দ শোনা যায়। পাশে নেই তামা। কুয়াশার আঁধারে হাতড়ে একা ফিরে আসে আই-ওয়ান্।

এবারে যেখানে বলবে ..ইয়াকোহামা হোক, যেখানে হোক, স্বচ্ছন্দে, খুশী

মনে চলে যেতে পারবে ও।...আজ ঘুমুতে পারবে না ও, ঘুমুবে না...শুয়ে শুয়ে ভাববে তামার কথা......। কিন্তু নিমেষ না ফেলতে দুই চোখ জুড়ে এল।

এরোপ্লেনে বসে, জানালা দিয়ে নীচে অপসৃয়মানা শ্যামলী মাটির দিকে চেয়ে ছিল আই-ওয়ান্। ওর প্রিয়া রয়েছে ওখানে, ওই শ্যামলা মাটির বুকে। পরিষ্কার স্বচ্ছ দিন। কুয়াশা কেটে গেছে। উঃ কি ঘুমই ঘুমিয়ে ছিল। জেগে দেখে রোদে ঘর ছেয়ে গেছে। কি ভাগ্যি কুয়াশা ছিল কাল রাতে— ওদের আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন প্রসন্ন দেবতা। আজ আড়ালের দরকার নেই, তাই নেই কুয়াশা। আজ ওদের মাঝখানে উদার দিনের আলোর স্বচ্ছতা।

হঠাৎ আকিও বলে উঠল; 'দেখছ, ওই ধোঁয়া রং-এর ইমারৎ আর দুর্গ-গুলো!' দূরবীন জোড়া এগিয়ে দেয় আই-ওয়ানকে। পূব পশ্চিম দক্ষিণ জুড়ে চলে গেছে দুর্গের সারি। হেসে বলে আই-ওয়ান্,—

'আপনাদের দেখছি চতুর্দিকেই জুজুর ভয়!'

'তা করতে হয় বৈকি। চারদিকে সব বড় বড় রাজ্য। বেড়া জালের মধ্যখানে আমাদের এই ক্ষুদে দেশটুকু। সব দিকে চোখ রাখতে হয়।'

আই-ওয়ান্ একটু উত্তেজিত হয়ে বলে: 'বড় বড় রাজ্য থাকলেই যে সর্বক্ষণ তারা আপনাদের ওপর থাবা বাড়িয়ে থাকবে তার মানে নেই। তাই বুঝি ভাবেন?

'তা ভাবি বৈকি! আমরা জাপানীরা সব সময় যুদ্ধের সম্ভাবনাটাকে মনে করে রেখে দি।' একটু ইতস্ততঃ করে বলে আকিও। 'অন্ততঃ সেই শিক্ষাই পাই আমরা।'

আই-ওয়ানের কানে বিশেষ কিছু যাচ্ছিল না। দূরবীন এঁটে ও তখন খুঁজছে দূরগতা পৃথিবীর বুকে একখানি বাড়ি। লোকজন এখনও তো দেখা যাচ্ছে—যদিই...যদিই—বাগানে একবারটি...। না সমুদ্র পেরিয়ে গেল শ্যামল দ্বীপখানিকে বুকে নিয়ে। ঐ হোথা আছে তামা, ওর নিভৃত হৃদয়ের মণি-দ্বীপ। দূরবীন ফিরিয়ে দিল আকিওকে।

আকিও আজ বড় খুশী। ও মুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু কথা কইতে ইচ্ছে করছে না আই-ওয়ানের। আসনে গা এলিয়ে নীচের উজ্জ্বল নীল সাগরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে ও। অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছে ওরা। বড় বড় জাহাজগুলোকে মনে হচ্ছে শামুকের খোলা।

আঙুল দিয়ে দেখায় আকিও, 'এই দেখছ একটা জাহাজ! আমাদের যুদ্ধ জাহাজ ওটা। পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, হয়তো চীন দেশেই।'

'আমাদের দেশে?' অলস মন্থরভাবে বলে আই-ওয়ান্। আজ আর এ-সবের দাম নেই ওর কাছে। সে তখন ছিল, এন্-লান্ যখন বিরক্ত হয়ে বলত— 'কেন বিদেশী যুদ্ধ জাহাজ আমাদের দেশে আসবে? আমাদের জাহাজ তো কোথাও যায় না!'

না বলে থাকতে পারতো না আই-ওয়ান্: 'আমাদের থাকলে তো!'

'আছে কি না আছে, সেকথা তো হচ্ছে না!' বলতো এন্‌-লান্‌, থাকলেও যেতে দিতাম না আমরা।'

আচ্ছন্নভাবে মনে মনে বলে আই-ওয়ান্‌, কে জানে থাকলে কি করতাম! থাকলে নিশ্চয়ই হাত নিস্‌পিস্‌ করত।'

তারপর একটু জোরেই জিজ্ঞাসা করে আকিওকে: 'কেন যাচ্ছে জাহাজটা?'

'যে-সব জাপানীরা ওখানে আছে তাদের নিরাপত্তা-ব্যবস্থার জন্য। অন্ততঃ আমাদের তাই করা হয়।'

আই-ওয়ান্‌ হেসে জবাব দেয়: 'আচ্ছা আমি তো আছি আপনাদের দেশে, কই আমার রক্ষার জন্য তো কোন ব্যবস্থা নেই!'

'দরকারটাই বা কি! তোমার বিপদটা কোথায়? আমরা সবার সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করি,' কুণ্ঠিতভাবে বলে যায় আকিও, 'জাপানীদের সাথেও অত ভালো ব্যবহার করিনে। বরঞ্চ উল্টো। নিজেদের বেলায় ভারী কড়া আমরা।'

আই-ওয়ান্‌ তখন ভাবছে, কাল তামাকে এলো চুলে মোমের আলোয় কি চমৎকার দেখাচ্ছিল। ওই মূর্তি ধ্যান করেই বুঝি ও সারা-জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে চমক ভাঙে। এরোপ্লেন নীচে নেমেছে। নীল উর্দি পরা কতগুলো লোক এসে তাড়াহুড়ো করে ওদের তুলে দিল ছোট্ট আর একটা প্লেন এ। খুব নীচু দিয়ে যাচ্ছে এবারে ওরা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নীচের সব। ছোট্ট ছোট্ট ধান ক্ষেতগুলি গায়ে গায়ে ছিম ছাম সাজানো। কৃষকেরা আঁটি আঁটি করে সোনা রং-এর ধান কেটে তুলছে।

আকিও বোঝায়, 'এ প্লেন লড়াইয়ের কাজেও লাগে।'

'এত যুদ্ধ-প্রস্তুতি কেন, বলুন তো?'

'ওই আমাদের জীবন-দর্শন।'

'ভালো লাগে যুদ্ধ?' শুধায় কৌতূহলী আই-ওয়ান্‌।

চশমাটা খোলে আকিও, ভালো করে মুছে আবার পরে। তারপর স্বভাব কুণ্ঠায় জড়িয়ে বলে: 'আমি বৌদ্ধ। জীবহত্যায় বিশ্বাস করিনে।'

'যদি কখনও লড়াই-এ যাবার হুকুম হয়?'

'ভেবে দেখিনি কি করব।'

এমনি অস্বস্তিতে ভরে ওঠে ওর মুখখানা, আই-ওয়ান্‌ অপ্রস্তুত হয়ে যায়; বলে:

'থাক, ওসব বাজে কথা।'

জবাব দেয় না আকিও। আই-ওয়ান্‌ মাঝে মাঝে এক আধটা কথা বলে। মনে মনে চলে তার তামার কাছে চিঠির মুসাবিদা।

কি ভাষায় লিখবে? চীনা ভাষায় লিখলে ঠিক পড়তে পারবে তামা। ক্লাসিক্যাল জাপানী আর চীনা ভাষা একরকম। সুন্দর হাতের লেখা তামার। একটা পাখার ওপরে একটা কবিতা লিখেছিল, আই-ওয়ান্‌ দেখেছে সেটা। কিন্তু পুরানো ঢং-এ লিখবে না চিঠি। সোজা সুজি শুরু করবে, 'যাচ্ছিলুম অনেক ওপর দিয়ে একেবারে আকাশের নীল ছুঁয়ে। কিন্তু ওগো রাণী, সে

শন্ধন আমার এই দেহটা। কলজেটা আমার শায়ক-বেঁধা পাখীর মত তোমার বাতায়নের পাশে ডানা ঝাপটাচ্ছিল......'

পাতার মত ভেসে ভেসে প্লেন এসে ঠেকল ইয়াকোহামার মাটিতে। স্বপ্ন ভেঙে গেল।

বোম্বাই একটা বাসে ওকে ঢ়ুকিয়ে দিল কে। হন্ হনিয়ে ছুটল বাস সহরে রাস্তার ভেতর দিয়ে। কি বিশ্রী, কাঠ-খোট্টা নেড়া নেড়া রাস্তা। দু'ধারে ব্যাঙের ছাতার মত সার-বাঁধা ছাই রং এর কংক্রীটের বাড়ি। চারদিকে কোলাহল; হন্ত দন্ত, ব্যস্ত হয়ে সবাই কেবল ছুটছে। কোথাও একটি নিরালা পার্ক বা বাগান নেই। খানিক দূর গিয়ে একটা ফুটপাথের ওপর ওদের মালগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল বাস থেকে। আকিও আর আই-ওয়ান্ সাথে সাথে নেমে এল। একজন উর্দি-পরা দরোয়ান এসে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে গেল।

'এই যে, আমাদের আফিস,' আকিও বলল, 'শিও হয়তো আমাদের জন্য বসে আছে।'

আকিওর সঙ্গে ভেতরে যেতে যেতে বলল, আই-ওয়ান্ঃ 'এ ধরনের বাড়ি তো দেখিনি আর!'

'ভূমিকম্প-নিরোধক', বুঝিয়ে বলে আকিও, 'সেই বড় ভূমিকম্পের পর থেকে ইমাকোহামার সমস্ত বাড়ি এরকম।'

একটা নূতন আফিস-ঘরে এসে ঢুকল ওরা। একজন তরুণী ওদের স্বাগত জানিয়ে বললঃ 'শিও মুরাকী আপনাদের দয়া করে একটু বসতে বলেছেন।' সামনের দাঁত উঁচু মেয়েটির। তাঁর ফাঁক দিয়ে কথা বেরিয়ে যায়। পরনে অত্যন্ত খাটো কালো রং-এর স্কার্ট আর সাদা ব্লাউস্। পায়ে কালো ফুল মোজা এবং ঐ রং-এরই চামড়ার ভারী জুতো। হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সমস্ত পা। ঐ পোষাকে বড় কুৎসিত লাগে মেয়েটাকে আই-ওয়ানের। কিন্তু ওর চশমা-পরা কুরূপ মুখখানায় আপ্যায়নের গভীর আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে। দাঁতের ফাঁকে ফিস্ ফিসানী তুলে আবার বলে মেয়েটিঃ 'ন্যুইয়র্ক থেকে এসেছেন এক আমেরিকান ভদ্রলোক। তাঁর সাথে একটু কথা কইছেন, এই হয়ে গেল বলে।'

অভ্যাগতের মত বসে রইল ওরা। আকিওকে দেখে মনে হল এই রীতিতে অভ্যস্ত সে। আকিও বলছেঃ 'একটা কাজে সে-বার আমেরিকায় গিয়েছিলাম। কি না—? ভুলে যাচ্ছি! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পিকিং রাজ প্রাসাদের একটা স্ক্রীন—গালার ওপর সোনার কাজ করা। আমেরিকান এক ভদ্রলোকের ভারী সখ। নানা রকম দুষ্প্রাপ্য শিল্প সংগ্রহ করেন। অন্যান্য কতগুলি জিনিষের সাথে ওই স্ক্রীনটাও চেয়েছিলেন ভদ্রলোক। আমিই নিয়ে গেলাম। বাবা অত দামী জিনিষটা অমনি পাঠাতে ভয় পাচ্ছিলেন কিনা! তাছাড়া কোনও কারণে চাইছিলেনও কিছুদিনের জন্য আমি জাপানের বাইরে থাকি। যোগা-যোগ ঘটে গেল। জাহাজে উঠে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম ইয়াকো-হামার দিকে। সুমী এসেছিল আমায় তুলে দিতে। যতক্ষণ না জাপানের শেষ রেখাটি মিলিয়ে গেল তাকিয়ে রইলাম। তারপর সুমীকে আর দেখা গেল না। কিন্তু আকাশের গায়ে উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর চূড়া তখনও দেখা

যাচ্ছিল। ভারী চমৎকার চমৎকার উ'চু উ'চু বাড়ি ছিল তখন।' সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে তারপর আবার বলে চলল: 'তারপর হল ভূমিকম্প। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম আমি। এসে দেখি, কোথায় সে সব!'

'সে কি?' জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্।

'কোত্থেকে থাকবে? সব বাড়ি ঘর পড়ে গিয়ে মাটি একেবারে চৌরস। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। স্রেফ মরুভূমি সব। সুমীও কিছু লেখেনি আগে। ওর ইয়াকোহামায় এসে থাকবার কথা ছিল যে—?'

হঠাৎ হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে আকিও।

'তারপর জাহাজটা আসতে দেখি ডকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কে একজন নাদুস্, নুদুস মেয়ে দাঁড়িয়ে। ওমা, সুমী! বাঁচা গেল! সুমী আছে, তো সব আছে।' দুজনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠে এবার।

আকিও আবার বলতে আরম্ভ করে: 'তা এক্ষুণি সব কোমর বেঁধে লেগে গেল। এই দেখ আবার কেমন সব নূতন করে তৈরী হয়েছে। আমরা জাপানীরা আমাদের নসীব জানি। ভীরু নই আমরা।'

এমন সময় শিওর ঘরের দরজা খুলে গেল। মেয়েটি বলল: 'আসুন আপনারা।' বিপুল দেহ একজন আমেরিকান বেরিয়ে এল—পেছন পেছন এল ছাই-রং-এর পোশাক পরা ছোট খাট আর একটি মানুষ। শিও। মিঃ মুরাকামী যেন বয়েস খুইয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন।

গম্‌গমে গলায় সাহেব বলে: 'আচ্ছা, মুরাকামী তাহলে ওই কথাই রইল। প'চাত্তর হাজার খাঁটি মার্কিনী ডলার। ভাঙলে সে দায়িত্ব আপনার।'

'ভাঙবে না।' অতি পরিষ্কার জোরাল কণ্ঠে শিও বলে।

'বেশ, বেশ! সে আপনি যা হয় করবেন,' সাহেব বলে, 'আচ্ছা আসি তাহলে। আপনার সঙ্গে একটা সম্পর্ক হয়ে খুশী হলুম।'

একটা মস্ত বড় লাল হাত বের করে দেয় সাহেব। শিও নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবে ছোট হাতখানাকে সেকেণ্ড খানেকের জন্য থাবাটার মধ্যে তুলে দেয়। সাহেব চলে গেলে, দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় আবার। ভেতরে এসে শিও খানিকটা যেন গোপনেই রুমাল দিয়ে হাত মোছে।

আকিওর দিকে তাকিয়ে হাসে শিও: 'আরে, এসেছিস তোরা!'

কালো গোঁফ-জোড়ার নীচে অতি-শুভ্র দাঁত ঝিক্‌মিক্ করে উঠল।

আকিও হেসে আই-ওয়ানের পরিচয় করিয়ে দেয়।

'বেশ, বেশ,' শিও বলে, 'বাবা লিখেছেন তোমার কথা।' তোমার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ! ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম, বসে থাকতে হয়েছে তোমাদের। কিছু মনে করো না।'

'না, না, তার জন্য কি হয়েছে। সৌজন্য-সুন্দর ভঙ্গিতে বলে আই-ওয়ান। হঠাৎ কেমন জানি বড় লজ্জা হল ওর।

'এস ভেতরে এস।' শিও ডাকে।

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান ঘরখানা। শ্রী-ছাঁদ-হীন, একেবারে নেড়া-মুড়ো। ছাই রংএর সিমেন্টের পলেস্তারা করা দেয়াল। শক্ত শক্ত হলদে রং করা কাঠের চেয়ার, বসতে একটুও আরাম লাগে না। সেই মেয়েটি চা নিয়ে এল সবার জন্য।

আই-ওয়ান্ চারদিক ভালো করে দেখবার আগেই শিও কি একটা মোড়ক খুলতে আরম্ভ করল।

'দেখ হে!'

হাতির দাঁতের তৈরী চীন দেশীয় দয়া দেবীর মূর্তি। দুই ফুট উঁচু মূর্তিটা। আশ্চর্য শিল্প-নৈপুণ্য। শান্ত সমাহিত চোখ দুটি, বেশ-বাস, সব কিছু থেকে অপূর্ব শান্তির জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বোধহয় অনেক দিনের পুরোনো, কেমন লালচে হয়ে গেছে।

'আঃ! এতদিনে!' আকিও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল।

মূর্তিটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শিও বলল: 'হ্যাঁ, এতদিনে।' কথাগুলো যেন ব্যথায় ভেজা: 'কিন্তু রাখতে তো পারবে না। আমেরিকায় পাঠাতে হবে। পুরো একটা মিউসিয়াম কিনে নিয়েছে ওরা। পিকিং-এর সেই লি-মিউসিয়াম।

'য়্যাঁ? সম্পূর্ণ?' অবাক হয়ে আকিও জিজ্ঞাসা করে।

'থাক ওসব কথা এখন,' শিও বলে। তার পর স্বর নীচু করে জিজ্ঞাসা করে, 'বাড়ীর খবর বল দেখি। ভালো আছে সবাই?'

'ভালোই আছে।'

আই-ওয়ান্ লক্ষ্য করে আকিওর চোখে মুখে কেমন দ্বিধার ভাব। পারিবারিক কথা হয়ত ওর সামনে বলতে পারছে না। ভদ্রতার রীতি অনুসারে একটা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল আই-ওয়ান্, যাতে ওদের পারিবারিক আলোচনায় বাধা না ঘটে।

হঠাৎ কানে এল, 'ভারী রেগে গেছেন বাবা। এবারে জেনারেল সেকীর সাথে বিয়েটা চট্পট্ সেরেই-ফেলবেন বোধ হয়।'

কিছু বুঝতে বাকী রইল না আই-ওয়ানের। যেন আঁধি এসে ওর মাথার মধ্যে সব তছনছ করে দিয়ে গেল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দেবী মূর্তি-টির দিকে। ওর ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন দেবী—মূক রহস্যময়ী দাক্ষিণ্য-ময়ী; কাল বয়সের ঊর্ধ্বে এক শাশ্বতী সত্তা। এই তো আশ্রয় আই-ওয়ানের, অশরণের পরম-শরণ। কিন্তু দেবীর ক্ষমতা কোথায়? তিনি নিজেই অসহায়। মানুষের হাতের ক্রীড়নক। কিন্তু বৈক্লব্য নেই। যেখানেই অ স্থুক দেবী, আমেরিকায় হোক, হোক জাপানে—দেবী দেবীই। আত্মস্থা, স্বরূপ-স্থিতা। কিন্তু...ছিঃ পাগল হল আই-ওয়ান! একটা হাতির দাঁতের পুতুল, তাই নিয়ে ডুবে গেছে ও! কানে আসে, 'আর বোধহয় দেরী করবেন না বাবা, বিয়েটা আর ঝুলিয়ে রাখবেন না।'

অত্যন্ত অমায়িকভাবে আই-ওয়ানকে বলে শিও: 'যাও ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করে নাও গে।'

'হ্যাঁ, তাই ভাবছিলাম।' ক্ষীণ কণ্ঠে বলে আই-ওয়ান্, যেন বহু দূরে থেকে বলছে।

'তাড়াহুড়ো করো না। ধীরে আস্তে খাওয়া-দাওয়া কর। আমি ততক্ষণ একটু আকিওর সাথে কথা বলেনি। কাল তোমার কাজ-কর্ম দেখিয়ে দেব, কেমন! আজ একটু ব্যস্ত আছি। উত্তর চীন থেকে দামী দামী কতগুলি ভারী দুষ্প্রাপ্য জিনিস এসে পড়েছে।' শিও বলে।

উত্তর চীন থেকে! আই-ওয়ান্ অবাক হয়ে গেল।

তরুণী এসে সামনে দাঁড়াল। 'এই যে আসুন।'

ব্যাগ হাতে নিয়ে আই-ওয়ান চলল সাথে। রাস্তাটা পেরিয়ে লম্বা এক-তলা একটা বাড়ি। কর্মচারীদের বোর্ডিং।

৫১ নং ঘর—বলে দিল বোর্ডিং-এর ভারপ্রাপ্ত কেরাণী। ঘর নয়তো কুঠুরী। কিন্তু আছে সব—খাট, টেবিল, চেয়ার, হাত-মুখ ধোবার ব্যবস্থা সব। মেজে, দেয়াল ছাই রং-এর সিমেন্ট-করা।

হাতে মাথা গুঁজে ধপ্ করে বসে পড়ে ও বিছানায়। তামাকে লিখতে হবে, এক্ষুণি এই মুহূর্তে। ব্যাগ খুলে কাগজ কলম বের করে নেয়। শান্ত নিরালা সেই ঘরখানা। কতই বা দূর। কিন্তু ও যেন হাজার বছর পেরিয়ে, হাজার হাজার মাইল পেছনে ফেলে এসেছে সেই ঘরখানা।

সোজাসুজি লিখল: 'তামা, সর্বনেশে খবর শুনলুম। আকিও বলছিল...' খস্‌খস করে কলম চলছে, আবোল-তাবোল অর্থহীন প্রলাপ। 'তামা ঠেকাও, কোনমতে ঠেকাও...নইলে আমি বাঁচব না। অসুখের ভান কর......কিছু একটা কর। কি করলে জানাও পত্রপাঠ। আমার ঘুম খাওয়া সব গেছে......'

খাম বন্ধ করে টিকিট লাগিয়ে দিয়ে এল ডাকে দেবার জন্য। বড় অবসন্ন মনে হল শরীর। কিছু খেতে হবে। খুঁজে একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে খাবার ফরমাশ দিয়ে ঘরে এসে বসে বসে ভাবতে লাগল চিঠিখানার কথা। আজই সকাল বেলা নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রদীপ্ত নীল আকাশের বুকে পাড়ি দিতে দিতে যে-লিপির মুসাবিদা করেছিল তুলিতে রামধনুর রং মাখিয়ে, কোথায় গেল সে চিঠি! যে প্লেনে ওরা এল হয়তো সেই ফিরতি প্লেনেই যাবে এই চিঠিখানা। কেমন যেন ভয় করতে লাগল। সারা শরীর কুঁকড়ে উঠল। ক'বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল। ঘুমিয়ে ছিল ও। নিষ্ঠুরভাবে নাড়া দিয়ে ওর স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিলেন বাবা। ওর বিছানার ওপর ঝুঁকে-পড়া বাবার সেই মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ঠিক অমনি করে কে যেন আজ আবার ওর স্বপ্ন ভেঙে দিতে আসছে......।

ঘুম যখন ভাঙল, ভোর হয়ে গেছে। হল থেকে ভেসে আসছে অন্য ছেলেদের হৈ-হুল্লোড় হাসি কলরব। ওর ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে তারা আনাগোনা করছে। ধীরে ধীরে তাদের পায়ের শব্দ, হাসি কোলাহল মিলিয়ে যায়। রাস্তায় ফিরি-ওয়ালার হাঁক শোনা যায়—কাঁকড়া চাই, তাজা জ্যান্ত কাঁকড়া......

শুয়ে শুয়ে আড়ামোড়া ভাঙে আই-ওয়ান্। মনে পড়ে কালকের কথা। সারারাত কেবলি স্বপ্ন দেখেছে—অতি কাছে এসেছে দু'জনে বার বার, কিন্তু কি জানি কেন, কিছুতেই তামাকে পেল না ও। না ও কিছু নয়। ভয়। ভয়েরই প্রতিক্রিয়া। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক করে নেবে তামা। আশ্চর্য শক্ত মেয়ে! আশ্চর্য সেই দৃঢ়তার কোমলতায় অভিব্যক্তি।

বাঁশের জাফ্‌রীর ভিতর দিয়ে ছোট ছোট ঢেউয়ের ছায়া নাচছে দেয়ালে। আই-ওয়ান্ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। নাঃ, খুব ভালো করে কাজ করবে,—শিওর কাছ থেকে নিশ্চয়ই শুনবেন মিঃ মুরাকী। তখন হয়তো আর বিয়েতে আপত্তি করবেন না। অবশ্যি ওর নিজের ঠাকুর্দাও যে জাপানী

নাত্‌বৌ পছন্দ করবেন তা নয়। কিন্তু চীন-জাপান-মৈত্রীতে আস্থাবান ওর বাবা। ✓

আজ চিঠি পাবে তামা। নাও তো পেতে পারে! হয়ত আজ সুমীর ওখানে যাবে না ও। কি করে জানবে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে পাগল ছেলে চিঠি লিখে বসবে! ওই ঠিকানায় ওর চিঠি আসবে এ কথাটা বলতেই হয়তো আজ সুমীর ওখানে যাবে তামা। একটা টেলিগ্রাম পাঠালে হত না? সর্বনাশ! যাক, তামা যা করে। নির্ভর করবে ও তামার ওপর।

মনটা খুশী হয়ে উঠল। রেস্তরাঁয় গিয়ে প্রাতরাশ খেতে বসল—মাড়ভাত, ডিম, সেদ্ধ-তরকারী, আর এক গ্লাস আমেরিকান মল্ট মেশান দুধ। মুখ দিয়ে জিনিসগুলো গলায় নেমে গেল মাত্র। টেরও পেল না কখন কি মুখে গেল। কাল আসতে পারে তামার চিঠি। যদি হাওয়ার ডাকে লেখে তবে…। উঠে দাম দিয়ে চলে গেল আফিসে।

দরজা খোলাই ছিল শিওর ঘরের। বাইরে দাঁড়িয়ে একটু কাশল আই-ওয়ান্‌।

'চলে এসো', একেবারে মিঃ মুরাকীর গলা। কেমন যেন মুষড়ে পড়ল আই-ওয়ান। চেয়ারে বসে আছে শিও—চশমা-পরা ছোট্ট এতটুকু মানুষ—একটু উগ্র রকম ফিট্‌ফাট। কালো কুচকুচে তীক্ষ্ণাগ্র গোঁফ। দেখলে ভারী রাগী কড়া মেজাজের বলে মনে হয়। কিন্তু পুরু কাঁচের তলায় মস্ত বড় বড় —(জাপানীদের অত বড় চোখ হয় না সাধারণতঃ) চোখের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি কোমল সরল ব্যঞ্জনায় যেন শিশুর চোখ। কড়া হাকিমী-ভাবটা ওর খোলস; সম্ভবত সামরিক বিদ্যালয়ের আমদানী। শিওকেও সামরিক শিক্ষা নিতে হয়েছে। সামরিক শিক্ষা জাপানী ছেলেদের পক্ষে আবশ্যিক।

'সুপ্রভাত! আমার সেক্রেটারী তোমার জায়গা দেখিয়ে দেবে। চীন থেকে আজ কিছু মাল আসবে। চালানের সাথে যে লিস্টি আছে ভালো করে মিলিয়ে নিও। তারপর মাল এলে, খুলিয়ে আর একবার মিলিয়ে দেবে। কিছু যদি বুঝতে না পারো, তক্ষুণি আমার কাছে এসো, কেমন? সব মাল খোলা, মেলান হয়ে গেলে আমি নিজে একবার দেখে নেব।'

'ধন্যবাদ', গুনগুনিয়ে বলে আই-ওয়ান।

ছোট্ট মানুষ, আর ওই শিশুর মত চোখ; তবু কি তার ক্ষমতা! এই মানুষটির কর্তৃত্ব মেনে তার বশংবদ হয়ে থাকা ওর অধীনস্থদের প্রায় সহজাত প্রবৃত্তির মত। একটা ঘণ্টা টিপল শিও। কালো স্কার্ট আর সাদা ব্লাউস-পরা মহিলা এসে নিয়ে গেল ওকে আর একটা ঘরে। প্রশস্ত ঘরখানা, বর্গাকার। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে জন দশেক কেরাণী কাজ করছে। জানালার পাশের ডেস্কটার সামনে এসে মৃদু হেসে মহিলা বলল: 'এই যে আপনার জায়গা।' তারপর ছোট্ট একটুখানি নমস্কার করে চলে গেল।

তাকিয়ে রইল আই-ওয়ান্‌ জানালার বাইরে। চওড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা, দুই ধারে শুধু বাড়ি আর দোকান। গাছ-পালার চিহ্ন নেই। দূরে রৌদ্রোজ্জ্বল বন্দর, নীলাম্বুর নীলে নীল; সারি সারি জাহাজ আরামে ঝিমিয়ে আছে নোঙর-বাঁধা হয়ে। ঘরের মধ্যে ওর চারদিকে এতগুলি প্রাণী—এতটুকু

নড়ছে না কেউ। এতটুকু শব্দ নেই কোথাও—যেন পাষাণপুরী। একবার শুধু কয়েকটি চোখের গোপন অপাঙ্গ দৃষ্টি চাকতে উঠেই আবার নেমে গিয়েছিল। এতদিন পরে আজ ওর প্রথম মনে হল জাপানে ও প্রবাসী। অচেনার হাটে একলা মুসাফির। বুঞ্জীকে মনে পড়ল।

অদ্ভুত কঠিন শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত সব। কেউ মাথা তোলে না, কেউ নড়ে না। কি করবে ভাবছে আই-ওয়ান। হঠাৎ চোখ পড়ল দরজার দিকে। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ওকেই দেখছেন।

'কাজ বুঝে পেয়েছেন তো, মিঃ উ?' প্রশ্ন আসে।

'পেয়েছি।'

'বেশ।'

বোঝে আই-ওয়ান, বেশ মানে কাজ শুরু করোনি কেন। কাগজপত্র খুলে নিয়ে বসে পড়ল। চারধারে একটি মাথাও নড়ল না।

তিন দিন পরের কথা। তামার চিঠি এসেছে। লিখেছে সেঃ 'ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। ভাগ্যে কি আছে যথাসময়ে বোঝা যাবে।' আরো লিখেছে, 'বিয়ের ব্যাপার এতদিন মা-ই ঠেকিয়ে রেখেছেন এবং রাখবেন আরো। ও-কৌশল একা মারই জানা. ....' আশ্চর্য হয়ে যায় আই-ওয়ান। বাক্যহীনা সামান্যা নারী, যিনি আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। এত ক্ষমতা তাঁর? একা নয় তাহলে তামা। · অত বড় আশ্রয় রয়েছে তার।

বছর ঘুরে আসে। রাগ, দুঃখ, আনন্দ, আশা, নিরাশা ঢেলে নিয়মিত চিঠি লিখেছে আই-ওয়ান। কিন্তু ধৈর্যশীলা তামা ববাবর একই কথা লিখে এসেছেঃ 'অস্থির হয়ো না। মা রেখেছেন ঠেকিয়ে .'

একটি বছর কেটে গেল—

... ইয়োকোহামার এই একটি বছর আই-ওয়ানের জীবনে দীর্ঘতম অধ্যায়...।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেন্সিল হাতে দাঁড়িয়ে দাগ দিয়ে দিয়ে মাল নিকাশী চলছে। করাতের গুঁড়ো আর খড় দিয়ে প্যাক্ করে রকম বেরকমের মাল এসেছে—চীনে-মাটির, হাতীর দাঁতের, স্ফটিকের, নানারকম দামী পাথরের, কারুকার্য করা লাল-কালো কাঠের কাজ; মাছ-রাঙার আকাশী রং-এর পালক বসান রুপোর খেলনা...আরো কতকি। কিন্তু কোনদিকে নজর নেই আই-ওয়ানের। বড় দেরী হয় তামার চিঠি আসতে। এতদিন কাটিয়েছে কোনও মতে। কেননা জানে আই-ওয়ান্ নিয়মিত চিঠি পাবার সুবিধে নেই তামার। সেই যেদিন সুমীর ওখানে যেতে পারবে। অনেক সময় এক সাথে পাঁচ ছয়খানা চিঠিও জমা হয়ে থেকেছে। তারপর চিঠি দিনে পড়বার সুযোগও নেই বেচারীর। রাতে ঘরে গিয়ে তবে। কিন্তু এদিকের এ কয়টা মাস বড় ভাবনা হচ্ছে তামার জন্য। ইদানীং-এর চিঠিগুলোতে কেমন যেন চাপা চাপা একটা সতর্ক ভাব। তা ছাড়া গত সপ্তাহে তো পরিষ্কার মানাই করেছে এত ঘন ঘন আর যা খুশি তা যেন না লেখে। এর অর্থ কি? মন বদলে গেল নাকি তামার? মনে পড়ল, ওকে বিয়ে করবেই এমন কথা তো কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি সে। না, আর তামার ভাগ্যের দিকে হাঁ করে পড়ে থাকবে না ও।

জানতে হবে কেন তার মত বদলেছে। তক্ষুণি বসে পড়ে চিঠি লিখেছিল ও অনেক কাকুতি মিনতি করে—জানাক তামা কি হয়েছে তার। আর বাবাকে সব কথা খুলে বলে ওর ফিরে যাবার অনুমতি চেয়ে নিক। চারদিন অপেক্ষা করবে আই-ওয়ান্। আজ সেই চতুর্থ দিন। আজ রাত পর্যন্ত যদি কোনও চিঠি না আসে, তবে কাল ও ঠিক কিয়ুশু রওনা হবে। ছটা বাজতে এখনও এক ঘন্টা দেরী। সময় যেন আর কাটে না।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল শিও।

বড় বড় টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সদ্য-খোলা জিনিষগুলি। ওর চোখে মুখে আনন্দ যেন উথ্‌লে উঠছে। কাছে এসে প্রতিটি জিনিষ তুলে তুলে দেখে। খাটো খাটো স্থূল আঙ্গুল গুলির স্পর্শ নিশ্বাসের মত হাল্কা। প্রতিটি জিনিসের বৈশিষ্ট্য খুঁটিনাটি ওর জানা।

'আরে এই তো সাদা জেডের খোদাই করা দৃশ্যটা।' হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে শিও। 'উঃ দশ দশটা বছর আমি চেষ্টা করেছি এটার জন্য। এটা ছাড়ছিনে আমেরিকান ব্যাটাদের হাতে, দশ লাখ দিলেও না।' আনন্দে প্রায় ওর চোখে জল এসে গেল। মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে জেড্‌টা। মস্ত বড় আস্ত এক খন্ড পাথর—বরফে ঢাকা পাহাড়ের আকারে কাটা। 'এটা থাকবে জাপানে। আমরা জাপানীরা ছাড়া, এ-শিল্পের কদর কেউ বুঝবে না।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আই-ওয়ান্। পাথরটাকে নিয়ে কতরকম ভাবে আদর করছে শিও...আপন মনে কি বলে চলেছে। পাগল হয়ে গেছে শিও! সেই শিও! সমস্ত ব্যাপারটা কেমন বিশ্রী, কুৎসিত মনে হতে লাগল আই-ওয়ানের। হঠাৎ যেন চাবুক মারল কে ওকে—'আচ্ছা, এ জিনিসগুলো কোত্থেকে এসেছে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আই-ওয়ান্। ছুটি হয়েছে। কর্মচারীরা কোলাহল করতে করতে অফিসের কোট দস্তানা খুলে রাখছে। দু-হাতে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে সটান ঘরে চলে এল ও। চিঠি? থাকলে টেবিলের ওপরই থাকবে।

না নেই তো। কিন্তু বিছানায় ও কে? বুজী—একেবারে নির্ভর প্রসুপ্ত।

চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়ে সামলে নিল। বুজী সুন্দর না কুৎসিত তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কোনদিন। অবশ্য সুপুরুষ নয় বুজী। সে নিজেও জানে। নিজের চেহারা নিয়ে নিজেই রগড় করে কম নয়।

হাসতে হাসতে কতবার বলেছেঃ 'আমার চেহারাটা' ভাঁড়ের মত, না? হোক গে, বয়ে গেল। আধুনিকারা তো আর আমার প্রেমে পড়তে যাচ্ছে না!' বহুদিন দেখেনি বুজীকে। ঘুমন্ত অবস্থায় তো কোনদিনই নয়। আজের ঘুমন্ত বুজী যেন বুজী নয় অন্য মানুষ। নেমে আসা ভ্রূ, ভারী চোয়াল, পুরু ঠোঁট, বড় বেশী রকম জাপানী ওর চেহারা......

চোখ খোলে বুজী। হাসতে হাসতে লাফিয়ে উঠেই 'আই-ওয়ান্' বলে হাঁক দেয়। আই-ওয়ান্ ভাবে, সেই বুজী!

'তুমি এখানে?' শুধায় আই-ওয়ান্।

হাই তুলে, চোখ কচলাতে কচলাতে বলে বুজী,

'কে জানে কেন। হুকুম হয়েছে কাল আকিও আর আমায় টোকিওতে গিয়ে সামরিক দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে। দুটো দিন আছে হাতে। একটু ফুর্তি করেনি যাবার আগে!'

'আর আকিও?'

'জানিনে বাপু কোথায় কোন চুলোয় চাঁদের আলোয় ফুজি-সান্‌এর দিকে তাকিয়ে বসে আছেন দেবা দেবী। সুমীও এসেছে কিনা! কি যে ওরা পেয়েছে ফুজীর মধ্যে ওরাই জানে। ফি গরমের সময় দুজনে যাবেই ওখানে।'

'টোকিওতে আবার ডাক পড়ল কেন?'

জুতো পরছিল বুজী। জবাব দিল: 'ওই কথাটাই কত্তাদের জিজ্ঞাসা করব।'

তামার খবর কি বুজী?' টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে আই-ওয়ান্‌।

বিছানায় বসে, সরলভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুজী। পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলে: 'দাঁড়াও বলছি। আরে একটা চিঠি ছিল যে। কিন্তু তামার হুকুম আমার কাছ থেকে সব ভালো করে শুনে তারপর চিঠি খুলবে।' একটা সরু লম্বা লেফাফা পকেট থেকে বের করে বুজী।

চেনা হাতের অতি-চেনা সেই হালকা গোলাপী রং-এর ফুল আঁকা খাম। হাত বাড়ায় আই-ওয়ান্‌। হাত গুটিয়ে নেয় বুজী:

'উহুঁ, শোন আগে', শক্ত হয়ে বলতে আরম্ভ করে।

'শুধু ধরে থাকব হাতে, ভয় নেই তোমার। দাও লক্ষ্মীটি।'

'বেশ,' চিঠিটা দিয়ে এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকে বুজী। তারপর গলা ঝেড়ে বলতে আরম্ভ করে: 'হ্যাঁ, তারপর......'

কথা যেন ফোঁটা ফোঁটা করে চুঁইয়ে পড়ছে। ধৈর্য থাকে না আই-ওয়ানের, অস্থির হয়ে তাড়া দেয় বুজীকে। ধীরে ধীরে হিসেব করে, প্রতিটি কথা ওজন করে বলে বুজী:

'সবুর সবুর! হ্যাঁ তারপর, এই দিন দুই আগের কথা। বেশ আছে তামা, যেমনটি থাকবার কথা। ঝাড়পোঁছ করছে, ফুল সাজাচ্ছে। রোজকার মতই। আমায় চুপ করে এসে বললে এক ফাঁকে, আকিওকে বলে দিও, সুমীকে যেন বলে আজ সন্ধ্যে বেলায় আমি যাব। কেন যে গেল জানিনে। দুজনের ভেতরে কিছু একটা ব্যাপার থেকে থাকবে...। আরে রোকো, সে তো পরে'

'পরে? মানে কিসের পরে?'

'মানে জেনারেল সেকী বাবার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তার পরে।'

'জেনারেল সেকী?'

মাথা নাড়ে বুজী: 'হাঁ গো হাঁ! জেনারেল সেকী। তামাকেও ডেকে পাঠান বাবা। অনেকক্ষণ ধরে ওর সঙ্গে কি সব কথা বললে তারা। আমার ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল সেদিন। একটা আমেরিকান ছবি দেখতে গিয়েছিলাম কিনা! কি ছবি? কি ছবি? দাঁড়াও মনে করি...'

'দুত্তোর। নিকুচি করেছে ছবির...' কাতরভাবে বলে আই-ওয়ান্‌।

হাসে বুজী: 'তাই তো, ঠিক বলেছ...কিন্তু ভারী সুন্দর একটি মেয়ে। শোবার ঘরে ডাকাত ঢুকেছে। পরে চিনতে পারল মেয়েটি—চেনা মানুষ।

বাস্ তারপর বিয়ে...দূর ছাই...কি যেন...হ্যাঁ তামার কথা বলছিলাম, না? ফিরতে দেরী হয়েছিল। দেখি তখনও বাতি জ্বলছে...কথা চলছে...'

'আমার চিঠিটা পেয়েছিল তামা?'

বুজী তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। চোখে প্রশ্ন। কিন্তু ব্যাখ্যা করার সময় নেই আই-ওয়ানের। এক টানে খামটা ছিঁড়ে ফেলে ও।

'শেষ করিনি তো...' বুজী বলে।

'আর পারছিনে আমি', রূঢ়ভাবে জবাব দেয় আই-ওয়ান্।

'প্রায় তো শেষ করেই এনেছিলাম, বন্ধু!' বুজী বলে। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়ঃ 'যত ঝামেলা। উঠা নামা প্রেমের তুফানে...'

আই-ওয়ানের কানে পৌঁছায় না ওর কথা। চিঠিটা যেন গিলছে ও।

'আই-ওয়ান্, তোমাকে বলেছিলাম, বিয়ে আমি করতে চাইনে। কিন্তু আজ বাবা বললেন ডেকে, শিগ্গিরই চীনের সাথে যুদ্ধ বাঁধবে আমাদের। সব উল্টে গেল। মাও এখন বলছেন, জেনারেল সেকীকেই বিয়ে করা উচিত। কারণ যুদ্ধে যাবে সে—স্বদেশকে বাঁচাতে। অতএব মাও বাবার দিকে এখন। সত্যি তো—কর্তব্যই তো আমার। বুঝছি এই আমাদের বিধিলিপি।

তামা।'

'তামা'র আগে আর একটা কথা এমনভাবে কাটা রয়েছে যে বোঝা যায় না। বুঝল আই-ওয়ান্ লেখা ছিল 'তোমার তামা।' 'তোমার'টাকে কেটেছে। কর্তব্য যেন জাপানীদের রক্তকে বিষিয়ে দিয়েছে। কর্তব্য! কর্তব্য। কিন্তু যদি তামার মা...না এক মুহূর্তও দেরী নয়।

'কিসে গেলে আগে পৌঁছান যাবে বলতো? ট্রেণে না প্লেনে?' জিজ্ঞাসা করে বুজীকে।

উঠে বসে বুজীঃ 'কোথায় হে? '

'কিউশু।' চীৎকার করে উঠল আই-ওয়ান্।

মাথা নাড়ে বুজী। সহানুভূতির স্বরে বলেঃ 'তামার সাথে দেখাই হবে না। বাবা দিলে তো!

জোর দিয়ে, শপথের সুরে জবাব দেয় আই-ওয়ান্ঃ 'আলবৎ হবে।'

'দেখ', দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে জবাব দেয় বুজীঃ 'রাতের ট্রেণ তো চলে গেছে। সকালে যে ট্রেণটা যায় তার থেকে প্লেনে গেলেই তাড়াতাড়ি হবে। কিন্তু ঝড় ঝাপটা যদি হয়!'

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে আই-ওয়ান্, পরিষ্কার আকাশ, নির্মেঘ। ফুট্ ফুট্ করছে জ্যোৎস্না। বলেঃ

'ঝড় হতে যাবে কেন? কি জ্যোৎস্না—ফুজী-সান অবধি দেখা যাচ্ছে। প্লেনেই যাব কাল।' ঠিক করে নেয় ও। রাতটা কোন মতে কাটিয়ে দেবে!

বুজী জেদের সুরে বলেঃ 'আমি কিন্তু ঘুমব, বলে দিচ্ছি।'

'আমার খাটে ঘুমও। আমার ঘুম টুম আসবে না আজ।'

হাতে মাথা গুঁজে টেবিলে এসে বসে আই-ওয়ান। কি করবে? কি? কি?......

আয়েসের সুরে বুজী বলেঃ 'কালই যে আমায় হাজিরা দিতে হবে, উপায় নেই। নইলে দেখতাম কি করা যায়।'

গুনে গুনিয়ে বলে আই-ওয়ান্ঃ 'যে প্লেনটা সরাসরি যায়, সেটা তো দুপুরের আগে ছাড়ছে না।'

'তা অবশ্যি ঠিক। দেখি ওখান থেকে যদি ঠিক সময় আসতে পারি, তাহলে তোমার সাথে চলে যাব। অবশ্য শিওর যদি কোন দরকার না থাকে। আর দেখ একখানা চিঠি লিখে রাখ। ওর সঙ্গে যদি দেখা তোমার নাই হয়, তাহলে পরে তামাকে দিয়ে দেব আমি।'

লাফিয়ে ওঠে আই-ওয়ান্, 'ভালো কথা বলেছ। সত্যি বুজী, তোমার মত বন্ধু...'

'থাম তো! তবে...কি জান...বড় মায়া পড়ে গেছে তোমার ওপর!' হাসতে হাসতে কাপড় ছাড়ে বুজী।

এরই মধ্যে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে শুরু করে দিয়েছে আই-ওয়ান্। কাকুতি মিনতি আর রং ঢেলে এক সুদীর্ঘ প্রেম পত্র। নিশা নিশীথিনী হলো। ছুটে চলেছে কলম...'যুদ্ধ হলই বা তামা তোমার দেশে আর আমার দেশে, তাতে আমাদের কি! তুমি আমি—আমরা আমরাই। তুমি আমার, আমি তোমার। অচ্ছেদ্য আমাদের বন্ধন। আমাদেব দুই সরকারে যদি.. ...' স্বদেশের প্রতি আনুগত্য ভুলে যায় আই-ওয়ান্। না চীন ওর মাতৃভূমি নয়!

গভীরভাবে ঘুমুচ্ছে বুজী। স্থির লয়ে উঠছে পড়ছে তার নিশ্বাস প্রশ্বাস। লেখা শেষ হয়। ভালো করে আর একবার চিঠিটা পড়ে খামে বন্ধ করে উঠে যখন দাঁড়াল আই-ওয়ান্ চাঁদ ডুবে গেছে। শেষ যামের অন্ধকাবে প্রভাতের খবর এসে গেছে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বুজীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল কাপড় জামা না ছেড়েই। মুহূর্তে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল আই-ওয়ান্।

একটু নড়তেই ঘুম ভেঙে গেল বুজীর। 'কটা বাজলো হে? মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করে ও।

ঘড়িটা হাতে বাঁধাই ছিল। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে দেখে আই-ওয়ান্। সাড়ে আটটা।

লাফিয়ে উঠে ওকে ডিঙিয়ে নেমে পড়ে বুজী।

'সর্বনাশ! আকিওর সাথে ন'টার সময় ট্রেণ ধরতে হবে যে!' উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে এল হাত মুখ ধোওয়াব গামলার কাছে। এক খাবলা জল মুখে ছিটিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ইস্ সেকি এখানে? অনেকটা রাস্তা যে! একটু খাবারও তো কিনে নিতে হবে!'

হুড়োহুড়ি করে কোন মতে তৈরী হয়ে বেরিযে গেল বুজী। বলে গেল শিওর যদি দরকার না থাকে ও-ও যাবে আই-ওয়ানের সঙ্গে।

ঘুমিয়েছে তো রাতে। তবু অসীম ক্লান্তি জড়িয়ে আছে সর্ব দেহে। ধীরে আস্তে উঠল আই-ওয়ান্। মুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে টেবিলে এসে বসল। তামার চিঠি, আর তাকে লেখা চিঠিখানা আর একবার ভালো করে পড়ল। তারপর একেবারে স্বাভাবিক ভাবে গেল রেস্তরাঁয়, তারপর কাজে।

সেই জেড্খানা নেই। নিশ্চয়ই শিও বাড়ি নিয়ে গেছে। হঠাৎ ভারী রাগ হল। যেন ওর নিজেরই বহুমূল্য সম্পদ খোয়া গেছে। ভয়ানকভাবে

কাজে লেগে গেল তবু। হোক হোক যা খুশি হোক। সর্বনাশ হয়ে যাক। শুধু ও যেন তামার কাছে পৌঁছুতে পারে ঠিক সময়ে। কিন্তু...কিন্তু...কি বলবে তামাকে? কোন পথ দেখাবে? কোথায় নিয়ে যাবে তাকে? এত বড় পৃথিবীতে দুজনের জন্য কোথাও কি একটু আশ্রয় নেই?'

কে যেন কাঁদছে বাইরে। চীৎকার করে ওর নাম ধরে ডাকছে। বুজীর গলা না? ঝড়ের মত ঘরে এসে ঢুকল বুজী। উদ্‌ভ্রান্ত চোখ, মুখ তীব্র কান্নায় বিকৃত।

'শিও কোথায়? শিও?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করে বুজী। ভয় পেয়ে যায় আই-ওয়ান্। বলেঃ 'দেখিনি তো! বুজী, বুজী......' হাতের জিনিসটা পড়ে যায়ঃ 'কি হয়েছে বুজী, কি হয়েছে?'

ফুঁফিয়ে কেঁদে ওঠে বুজী, 'ওঃ হোঃ হোঃ......আকিও...আকিও...' একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরে আই-ওয়ানের দিকে। আকিওর হাতের মুক্তোর সারি...

'বাবা, আর আমার ভাইয়েরা, ভালো করে বিচার করে তবে এ পথ বেছে নিলাম। সৈন্য বিভাগে নাম লেখাবার জন্য ডাক পড়েছে আবার। কেন তা জানি। লড়াই করতে যেতে হবে চীনে। কিন্তু যুদ্ধের স্বপক্ষে জীবনের কোন দিক থেকেই কোন সায় পাচ্ছিনে। নিরপরাধ মানুষ হত্যা—সে যে জাতিরই হোক না কেন—নাই বা হলেম তার অংশীদার। মনকে মানাতে পারছি না। কিন্তু সম্রাটের হুকুম। দেখলুম এ ছাড়া আর পথ নেই। ফুজী-সানকে নিবেদন করে দিলুম এ দেহ। এ চিঠি যখন পাবে, তখন আমি আর নেই। আমার চির সঙ্গিনী সুমীও আমার সঙ্গেই রইল......'

আই-ওয়ানের মুখে কথা সরে না। কোন মতে জিজ্ঞাসা করেঃ 'কখন... কখন...?'

আবার কেঁদে ওঠে বুজীঃ 'স্টেশনে গেলাম পাস আনতে..আমার নাম বলতেই চিঠিখানি এগিয়ে দিল, কে নাকি দিয়ে গেছে। পড়ে দেখি...... আমায় কাঁদতে দেখে এক অফিসার হাত থেকে নিয়ে চিঠিটা পড়ে রেগে কাঁই। বললে, বিশ্বাসঘাতক! সম্রাটের দরকারের সময়ই মরতে ছুট্‌ল! এ সময়ে মরার কোন অধিকার ছিল না...'

অঝোরে চোখের জল ঝরছে বুজীর।

'শিও জানে?' আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্।

মাথা নাড়ে বুজী।

বুজীর চওড়া থাবাটা নিজের কোমল হাত দিয়ে চেপে ধরে, 'চল' বলে আই-ওয়ান্ নীরবে শিওর আফিসের দিকে চলল। নিজের টেবিলেই ছিল শিও। সে মাথা তুলবার আগেই আই-ওয়ান্ আকিওর চিঠিখানা সামনে রেখে দিল। পড়তে পড়তে ঘন ঘন চোখের পলক পড়ে শিওর; মুখের রং বদলাতে থাকে। প্রথমে অবাক হয়ে যায়, তারপর হতবুদ্ধি, তারপর—ধীরে ধীরে যেন বুঝতে পারে—ওষ্ঠ আর মুখের পেশীগুলি থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে।

'জানতাম আমি', শান্তভাবে বলে শিও, 'ও যে একদিন এরকম করে বসবে তা আমি জানতাম। সেই ছোট্ট বেলা থেকে কিছু হলেই বলত—মরব! মরা বাঁচা দুইই সমান ছিল ওর কাছে। দুইই সমান মিঠে...'

একটা শিলীভূত স্তব্ধতায় থমথম করে ঘরের বায়ুমণ্ডল। বলে শিওঃ

'বুজী, এক্ষুণি তুই বাড়ি চলে যা। আমি দেখি একটু চেষ্টা চরিত্র করে যদি ওদের দেহগুলির কিছুও পাওয়া যায়। অনেক সময় লাফ দিতে গিয়ে ধারে আটকে যায়।'

বুজী জবাব দেয়ঃ 'কেমন করে যাব? আজকে বিকেলেই যে অফিসে হাজিরা দিতে হবে! এবেলাটার শুধু সময় দেওয়া হয়েছে আমায়।'

চমকে ওঠে শিও আর আই-ওয়ান্।

'মাঞ্চুরিয়ায় পাঠাবে। তিন দিনের মধ্যেই রওনা হয়ে যেতে হবে।' হিমায়িত স্বরে বলে বুজী।

কি বলবে! আছে কি বলবার? পাষাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে তিন জনে।

গলা ধরে আসে বুজীর। বলেঃ 'জাপানী আমি। কাজেই যেতেই হবে।'

'জানি', আই-ওয়ান্ বলে, 'বুঝি সব।'

শিওর দিকে তাকায় ও। কি যেন ভাবছে শিও। আই-ওয়ান্ বলেঃ 'যদি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন তাহলে বুজীর জায়গায় আমি যেতে পারি।'

'তাই যাও, তাহলে। বাবাকে বলো আকিওর ওপর যেন রাগ না করেন। ... আকিওর মৃত্যু তামার সাথে মিলনের দ্বার খুলে দিল।....

প্রথম একাই দেখা করলেন মিঃ মুরাকী। শুনলেন সব, পড়লেন চিঠি-খানা, এতটুকু করে ভাঁজ করে রেখে দিলেন পকেটে। তারপর বললেনঃ

'তামা ও তার মাকে খবর পাঠাও।'

আই-ওয়ান্ উঠে গিয়ে একজন ঝিকে বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে আবার এসে বসল। একটু পরেই পর্দা সরিয়ে ভেতরে এলেন শ্রীমতী মুরাকী। উঠে দাঁড়াল আই-ওয়ান অন্য দিকে তাকিয়ে। অন্তঃপুরিকাদের দিকে তাকান ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কিন্তু বুঝতে পারল তামাও এসেছে। মাটিতে লোটান তার নীল কিমোনোর ধার দেখা যাচ্ছে।

'বস', বলেন মিঃ মুরাকী।

আকিওর চিঠিখানা বের করে স্তব্ধ হয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। দাঁতে দাঁত চেপে বসে, চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে পড়তে আরম্ভ করেন, ধীরে ধীরে অতি শান্ত স্পষ্ট উচ্চারণে। শেষ হলে আবার ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেন চিঠিটা। নিস্তব্ধ, মৃত্যু পুরীর মত ঘরখানা। একবার একটুখানি ফোঁপানীর শব্দ শোনা গেল। শুধু এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই চাপা পড়ে গেল। তামা—বুঝতে বাকী রইল না আই-ওয়ানের। চকিতে একবার দেখে নিল চোখ তুলে, ঠোঁট কামড়ে প্রাণপণে কান্না চাপছে তামা। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে আছেন মিসেস মুরাকী—দুই গাল বেয়ে অশ্রুর বন্যা। জামার হাতে চোখটা একবার মুছে নিলেন। নির্বাক, স্তব্ধ শব্দ-হীন স্থির প্রতিমা।

বলে উঠলেন মিঃ মুরাকীঃ 'যে ছেলে এত অবাধ্য, সম্রাটকে মানে না,

বাপকে মানে না, সে ছেলে নয়। তার জন্য অশৌচ হবে না এ বাড়িতে।' যে স্বরে চিঠিখানা পড়েছিলেন, ঠিক তেমনি স্বর। কঠিন, স্থির।

হাত দুখানা হাঁটুর ওপর চিৎ করে রাখা। কাঁপছে যেন। একটু কেশে বললেন: 'বাস্, এবার যেতে পার। আই-ওয়ান্, তুমি তো থাকছ রাতে, তোমার ঘর ঠিক তেমনিই আছে।'

ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আই-ওয়ান্। শ্রীমতী মুরাকীও রীতি অনুসারে অনুমতি নিয়ে উঠে গেলেন। আই-ওয়ান্ চকিতে একবার তাকাল তামার দিকে। অশ্রু-বিহ্বল দুই চোখ মিলে গেল ওর চোখে। কি গভীর আকুতি ভরা আমন্ত্রণ ওই চোখের ভাষায়। ওর প্রতীক্ষায় বুঝি বসেছিল তামা!

মাঝ রাত গড়িয়ে গেছে। তামার ঘরের সামনে এসে নীচু ছাঁচের তলায় অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে এসে দাঁড়াল আই-ওয়ান্। আস্তে আস্তে পরিচিত ভঙ্গিতে টোকা মারল জানালার শিকে। জানালাটা খুলে গেল। তামা উঠে এল। ছিটকে পড়া চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে ওর পাণ্ডুর মুখখানা। মুখে আঙুল দিয়ে ইসারা করে কথা কইতে মানা করল তামা। বাতাস যেন গোলাপের সুগন্ধে ভরে উঠল। দাঁড়িয়ে রইল আই-ওয়ান্ নিশ্চল নিথর তামা-ময় হয়ে। নিশ্বাসও বুঝি পড়ে না।

'উঠে এসো বারান্দায়,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলে তামা। মৌপাখীর ডানার শব্দের চাইতেও মিহি ওর কণ্ঠের স্বর।

এগিয়ে আসে আই-ওয়ান্। একটা গালিচা বিছিয়ে দেয় তামা যাতে পায়ের শব্দ না হয়। চোখে চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। হাত বাড়িয়ে দেয় আই-ওয়ান্। তামাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আজ পরম নির্ভরতায় ওর দেহ-লগ্ন হয়ে আছে একটি নারী দেহ! এই বিহ্বল মুহূর্তেও অবাক হয়ে গেল ও। এই প্রথম নারী-দেহের অন্তরঙ্গ স্পর্শ।

আই-ওয়ানের হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়ায় তামা। চাপা-স্বরে কেঁদে কেঁদে বলে: 'ভেবেছিলাম তুমি এলে দেখাই করব না......'

'আমার কাছ থেকে পালাবে কোথায়, মণি? যেখানে যাবে। খুঁজে বের করব।' আই-ওয়ান্ গম্ভীরভাবে জবাব দেয়।

'না না, আই-ওয়ান্, অমন করো না।'

'করব বই কি!'

'শুনেছ তো যুদ্ধ বাঁধছে।'

'আমাদের দুজনের মধ্যে তো নয়!'

'না, না, আমি আর পারছিনে। কোন উপায় নেই। আমার কর্তব্য আমায় করতেই হবে!'

'ঐ বুড়োকে বিয়ে করা তোমার কর্তব্য হল? যাকে দুচোখে দেখতে পারো না, তাকে বিয়ে করাই কর্তব্য! এ কর্তব্যের কথা এত দিন তো ভাবনি, তামা!'

'না ভাবিনি। সব যে উলট্ পালট্ হয়ে গেল। যুদ্ধ বাঁধলে জাপানী

পুরুষেরা যুদ্ধ করতে যায়, আর মেয়েরা ঘরে থেকে আগামী পুরুষের জন্ম দেয়।'

আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে তামাকে। হৃদ্-পিণ্ডটা যেন উলট্ পালট্ হয়ে যাচ্ছে।

'না, না, তামা। হবে না তা। হতে পারে না। তুমি আর আমি—চল পালিয়ে যাই আমরা—যেখানে লড়াই নেই, যেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। যেখানে আমি চীনা, তুমি জাপানী এ বিভেদ কোন হিসেবের খাতায় উঠবে না। চল, চল, তামা...'

কাৎরে ওঠে তামা : 'সংসারে কোথায় আছে অমন জায়গা !'

'আছে, আছে। আমি বলছি আছে। শুধু কথা দাও আমায় ও লোকটাকে তুমি বিয়ে করবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে তোমায় বলব !'

কার পায়ের শব্দ। একটা ডাল ভাঙলো কে। ভয়ে শিউরে ওঠে ওরা। কে ? মিঃ মুরাকী—বাড়ীর কোণ ঘুরে এদিকে আসছেন। তামা আই-ওয়ানকে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। পর্দার পেছনে গুটি মেরে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। মাত্র কয়েক গজ দূরে মিঃ মুরাকী; ফোয়ারাটার সামনে এসে থামলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন মাথা নীচু করে। একহাতে শুভ্র মার্টল ফুলের গুচ্ছ। তুলে এনেছেন বাগান থেকে। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন এক ভাবে। আশংকায় সারা দেহ হিম হয়ে এল তামা আর আই-ওয়ানের। অনেক ক্ষণ পরে নীচু হয়ে ফোয়ারার নীচেকার জলাধারে ফুলের গুচ্ছটা ভাসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেহটাকে কোনমতে টানতে টানতে টলতে টলতে বাগানের ওধারে মিলিয়ে গেলেন।

না আর নয়। আর দেরী করার সাহস হয় না। আই-ওয়ানের মুখ নেমে আসে তামার তাজা এপ্রিকটের মত ঘন সুগন্ধে ভবা পেলব গালে।

'বল, বল, কথা দাও।' কানে কানে বলে আই-ওয়ান্।

'যাও, যাও, চলে যাও !' চাপা স্বরে তামা বলে।

মিনতি করে আই-ওয়ান্ : 'শুধু বল অপেক্ষা করবে তুমি। অন্তত, সত্যি লড়াই বাঁধবে কিনা সেটুকু জেনে নিতে দাও। হতে ও তো পারে, কিছুই হবে না !'

তামার ওষ্ঠ দুটি বন্ধুর গালে স্পর্শ খুঁজে ফেরে।

'যাও, যাও এবার আবার কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

ছুটে চলে গেল আই-ওয়ান্ নিজের ঘরে। শুয়ে শুয়ে ভাবে এই সংসার -সমুদ্রে কোথায় সে-দ্বীপ যেখানে যুদ্ধ নেই, নেই মানুষের তৈরী হাজারো বিড়ম্বনা। আছে, আছে সে স্থান আছে। হঠাৎ খেয়াল হল, কই কথা তো দেয়নি তামা !

'এই যে', মিঃ মুরাকী বলছেন, 'জেনারেল সেকী।'

একাই প্রাতরাশ খেয়েছে আই-ওয়ান্। তারপর মুরাকী-গৃহের আধুনিক বৈঠকখানায় সবে এসে ভাবতে বসেছে। এমন সময় এলেন মিঃ মুরাকী, তাঁর পেছনে মিলিটারী উর্দি পরা এক ভদ্রলোক।

'ইনি হচ্ছেন চাইনীজ ব্যাংকার উ-য়ুং-সিন্-এর ছেলে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আই-ওয়ানের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়েন জেনরেল সেকী।

আই-ওয়ান্ মিঃ মুরাকীর দিকে তাকিয়ে বলেঃ 'আমি আসি তাহলে।'

জবাব দিলেন জেনরেলঃ 'না, দাঁড়ান। এখন যাওয়া হবে না আপনার।'

নূতন উর্দি, কড়া কলপ দেওয়া। অনেক কষ্টে বসলেন জেনরেল। তলোয়ারটা ঝন্ ঝন করে উঠল চেয়ারে লেগে।

মিঃ মুরাকী মৃদু কণ্ঠে বলেন জেনারেলকেঃ 'বেশ তাই হবে।'

একটা খাড়া কাঠের চেয়ারের ধার ঘেঁষে বসল আই-ওয়ান। ভারী অস্বস্তি লাগছে ওর। মস্তিষ্কের মধ্যে যেন প্রলয় চলছে। তার মধ্য থেকে চিন্তাগুলো সবে থিতিয়ে উঠছিল। অমনি কোত্থেকে এল এই মূর্তিমান কুরূপতা! চেহারাটা কচ্ছপের মত; বুলেটের মত মাথাটা খাড়া, কলারের গর্তে বেমালুম ডুবে আছে। চ্যাপ্টা চার কোণা মুখ, সাদায় কালোয় গোঁফ, কিন্তু কুরূপ যতই হোক চেহারায় বয়সের আঁচড় পড়েনি।

জেনরেল সেকী বললেনঃ 'কিছু সংবাদ দরকার। হয়ত আপনি দিতে পারবেন। আচ্ছা মাঞ্চুরিয়ার কোন কোন শহরে আপনাদের ব্যাংকেব শাখা আছে, বলুন তো!'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আই-ওয়ানের এন্-লান্ বলতো, দরকার থাক না থাক হাঁড়ির খবর টেনে বের করবে জাপানীরা। .না, কিচ্ছু বলা হবে না। তাই জবাব দিলঃ 'আমি জানি না কিছু।'

জেনারেল সেকী একটু থেমে তারপর আবার বললেনঃ 'আশ্চর্য! কিছুই জানেন না।' খানিকক্ষণ কটমট্ করে তাকিয়ে থেকে বললেনঃ 'আচ্ছা থাক্।'

'আমার হেড্‌কোয়ার্টারে সব খবরই আসে। মিঃ মুরাকীর সাথে একটা প্ল্যান আলোচনা করছিলাম কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আচ্ছা পিকিং থেকে হারবিন কত দূর, এবং যেতে ক'ঘণ্টা লাগে তা হয়তো বলতে পারবেন।'

'আমি বরাবর সাংহাইএ ছিলাম।' জবাব দেয় আই-ওয়ান্।

জেনারেল সেকীর কপালে একটা নীল শিরা ফুলে নেচে উঠল। মিঃ মুরাকীর দিকে ফিরে জোরে জোরে বললেনঃ 'আচ্ছা ও আলোচনা থাক এখন। যুদ্ধ টুদ্ধ হবে বলে মনে হচ্ছে না। একটু আধটু খোঁচাখুঁচি হতে পারে। তা ঠাণ্ডা করতে বাস্ এই সপ্তাহ তিনেক। আচ্ছা আজ আসি; এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। তারপর ফিরে এসে ছুটি নেব, বুঝলেন। মানে আমার জীবনের সব থেকে আনন্দের ছুটি।'

শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেঃ 'ওদিক থেকে কোন প্রতিরোধের সম্ভাবনা নেই?'

উদ্ধতভাবে জবাব দেন জেনারেল সেকীঃ 'চীনেরা যদি বাধা দেয়, তবে বোমা চালাব—'

আই-ওয়ানের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে যত ঘৃণা ছিল সব বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত ফুঁসে উঠল। কিন্তু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। ঘৃণা থাক এখন। যুদ্ধ হবে না—আসল খবর পাওয়া গেছে।

আনন্দে মাথা ঘুরে ওঠে। পেছন ফিরে টলতে টলতে বেরিয়ে যায় আই-

ওয়ান্। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে একটু দাঁড়ায়। বড় পীড়িত বোধ হয়, নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু আত্ম-হারা হয়নি ও। মাথা চমৎকার ঠাণ্ডা, পরিষ্কার। তামাকে খুঁজে খবরটা দিয়ে আসতে হবে যে জেনারেল সেকী নিজেই বলেছেন—যুদ্ধ নাও লাগতে পারে।

একটা নূতন ফুল-সাজান ফুলদানী নিয়ে যাচ্ছিল একজন পরিচারিকা। জিজ্ঞাসা করল তাকেঃ 'তামা-সান্ কোথায়?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে উত্তর দেয় পরিচারিকাঃ 'বারান্দায়, ফুল সাজাচ্ছেন।'

পুরুষেরা সাধারণতঃ অন্দর মহলে যায় না, আই-ওয়ানও কখনও আসেনি। কিন্তু আজ সোজা চলে গেল। চারকোণা বারান্দাটায় একাই ছিল তামা। সামনের টেবিলে ফুল পাতা স্তূপ করা। লাল রংএর লিলি ফুলের সাথে রূপোলী ঘাস মিলিয়ে সাজাচ্ছিল একটা ফুলদানীতে। আই-ওয়ানকে দেখে ওর হাত থেমে গেল।

'আই-ওয়ান্, তুমি—?'

ওর কথা শেষ না হতেই বলে উঠল আই-ওয়ান্ঃ 'তামা! লোকটা ভীষণ বিশ্রী!'

রূপোলী ঘাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে তামা। আই-ওয়ান্ দেখে—ওর চোখে বেদনা ঘনিয়ে উঠেছে। চাপা স্বরে বলে তামাঃ 'জানি। কালই দেখেছি—কথা দেবার পর—'

আবার বলে ওঠে আই-ওয়ান্ঃ 'যুদ্ধ হবে না! শুনেছ? যুদ্ধ হবে না। সেকী বলেছে।' তারপর যা যা শুনেছে সব বলল। বাবার কথা মনে হয়। নিতান্ত নির্লজ্জের মত বলে ফেলেঃ 'আমার বাবার মত মানুষরা জাপানেব সাথে যুদ্ধ হতে কখনও দেবেন। আমার বাবার অনেক ক্ষমতা আছে, তামা—টাকা—'

হয়তো পুরানো মনোভাবের ছিটে-ফোঁটা তখনও একটু তলানী পড়ে ছিল। বলতে বলতে মনটা বড় ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। এন্-লান্ থাকলে এ কথা শুনে ওর মুখ দেখত না। এই জাপানী মেয়েটিকে যে ও কতখানি ভালোবাসে তাই কি বোঝান যেত এন্-লান্‌কে? জাপানীদের যে কেউ ভালোবাসতে পারে কিছুতেই বুঝত না ও।

ধীরে ধীরে তামা বলেঃ 'যুদ্ধ যদি না হয়, তবে তো কথাই নেই। শুধু যদি বাবাই আমায় জোর করতেন—'

'আমি বলছি যুদ্ধ হবে না।' আই-ওয়ান্ প্রায় চীৎকার করে ওঠে।

পরিচারিকার দল চঞ্চল হয়ে আনাগোনা শুরু করল নানা অজুহাতে। কেউ এল ঘর ঝাঁট দিতে, কেউ ঝাড় পোঁছ করতে। কেউ বা এগিয়ে এসে মিহি সুরে শুধালঃ 'কিছু কাজ আছে? দিন করে দি—'

আই-ওয়ানের চোখ কঠিন হয়ে ওঠে। তামাকে বলেঃ 'বাপরে বাপ্, বোলতার ঝাঁক। একটুও একা থাকতে দেবে না! আমিও যাচ্ছিনে যতক্ষণ না জানতে পারছি তুমি নিরাপদ। মানে, তোমার মতিস্থির হলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।'

ডাগর ডাগর কালো চোখ তুলে তাকায় তামা। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। নিজের মনের উদ্বেগে এতক্ষণ খেয়াল করেনি আই-ওয়ান্।

তামা বলে ঃ 'বেশ তাই হবে। যুদ্ধ না হলে আমি সেকীকে বিয়ে করব না।'

'বেশ! নিশ্চিন্ত থাক তাহলে। যা করার আমি করব। যথা-সময়ে জানতে পারবে।'

হাতের ফুলগুলি নিয়ে নীরবে গালে মুখে ছোঁয়ায় তামা।

গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় আই-ওয়ান্। একবার ফিরে দেখে—পরিচারিকা-পরিবৃতা হয়ে আছে তামা। শ্রীমতী ছিলেন বাগানে। হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন তিনি। করুক এখন যার যা খুশি। আই-ওয়ানের ভাবনা নেই। যা বলার ছিল ওর, বলা হয়ে গেছে।

কাউকে কিছু না বলে আই-ওয়ান্ ইয়াকোহামায় ফিরে এল।

অবশেষে সংবাদপত্রে ঘোষিত হল, মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ-সম্ভাবনা নেই। রাস্তায় রাস্তায় মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ হবে না বলে চীৎকার করতে লাগল খবরের কাগজ ফিরিওয়ালারা। আই-ওয়ানও আন্দাজ করেছিল। কাগজেও লিখল 'ব্যবস্থা' করা হচ্ছে। জাতি-সংঘের বৈঠক হয়েছে। তার মানেই চীন সরকার অর্থাৎ চ্যাং-কাই-শেক যুদ্ধ চাননি। এর পেছনে ওর বাবার অদৃশ্য হাত দেখতে পায় আই-ওয়ান্।

যাই হোক এ সব ও আর ভাববে না। লাভ নেই, ও তো আর কিছু রদ বদল করতে পারবে না। শান্তি! শুধু শান্তি চায় ও। ওর কাছে তামাই একমাত্র শান্তি। তামা এবং ও দুজনে মিলে দীর্ঘদিন সুখে ঘর করবে। সেই ওর শান্তি। তামার সাথে ওর তারা-মৈত্রী নয়,—ভেবে ওর আনন্দ হয় আজ; চারটি বছর ধরে তিল তিল করে পরিচয়, সৌহার্দ্য ও স্নেহের মধ্য দিয়ে এ প্রেমকে রচনা করেছে ও। সমস্ত কিছুর সম্মুখীন হয়ে, এ বিবাহের জন্য প্রস্তুত হবার সময়ও পেয়েছে। অতএব বিয়ে যদি হয়—যদি আর নয়, হবেই—তবে তা শান্তিময় হয়ে অক্ষয় হয়ে থাকবে। কাজে, পড়ায় আনন্দে নিজস্ব ধরনে চলবে ওর জীবন। তামাও তাই। শান্তিতে, সার্থকতায় সুদীর্ঘকাল পূর্ণ হয়ে থাকবে ওদের মিলিত জীবন। জাতির কথা জাতি ভাববে। ওরা ভাববে ওদের ব্যক্তিগত সার্থকতার কথা। নিজের হাতে রচা ছোট্ট জগৎটি না থাকলে কোন বুদ্ধিমান মানুষ সংসারে জীবনের আস্বাদ পাবে না।

নিঃশব্দে আই-ওয়ান্ কাজ করে চলল। পেশাদারী একজন ঘটককে আগেই জানত। তার কাছে এল ও। অগ্রিম পারিশ্রমিক হাতে পেয়ে প্রসন্ন চিত্তে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে মিঃ মুরাকীর কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হল ঘটক। বলল, 'হ্যাঁ বাবা ভালো কথা, তোমার দুখানা ছবি চাই যে!

'অনেক দেখেছে আমায় তারা, ওসব লাগবে না, বলতে যাচ্ছিল আই-ওয়ান্। কিন্তু বলল না। রীতি সঙ্গতভাবেই চলুক কাজ। বেশী খরচ দিয়ে ছবি তুলে এনে দিল ঘটকের হাতে।

'কনের ছবি এনে দেব তোমায়।' রসের হাসি হেসে বলল ঘটক।

আই-ওয়ান জবাব দিল ঃ 'লাগবে না, কনে আমার দেখা।'

'হোক। কিন্তু পাওনা ছাড়বে কেন হে? তা ছাড়া ছবিখানা কাছে থাকবে যখন খুশি দেখবে। উঁকি ঝুঁকি না মেরে বাপু ছবিই দেখো।'

আই-ওয়ান্ হাসে।

সংকীর্ণ অথচ প্রসন্ন-সুন্দর রাস্তাটা ধরে চলতে চলতে আই-ওয়ান্ ভাবে,—যুদ্ধ হবে না। ভালোই। কিন্তু জীবনটা এরই মধ্যে কী নাড়া খেল। একটা খবরের কাগজ কিনে পড়তে পড়তে চলল। কিছু বোঝবার জো নেই। জেনারেল সেকীর মত লোকেরা যা বলায় তাই বলে খবরের কাগজগুলো। বড় বড় শিরোনামায় ফলাও করে বলা হয়েছে—দলত্যাগী সৈন্যরা আর দস্যু বোম্বেটের দল হাঙ্গামা বাঁধাচ্ছে। জাপানীদের কাছে নতি-স্বীকার করবে না বলে তারা বদ্ধ-পরিকর। অনেক কষ্টে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছে এবং জাপানীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এন্-লান্ বেঁচে থাকলে সেও বোধ হয় এসব দলে থাকত। কিন্তু এন্-লান তো বেঁচে নেই। শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এই সব কথা দিয়ে কি বোঝাতে চায় এরা?

আই-ওয়ান্ এখন শান্তি চায়; চায় শান্তির ফল ভোগ করতে। অর্থাৎ তামাকে চাই, যে ওর সহধর্মিণী হবে, রচনা করবে ওর নীড়। মোটামুটি ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সব হয়ে গেলেই তামার বাবার কাছে লিখবে ও। কাগজখানা ও হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। ঘুড়ির মত উড়তে উড়তে কোন নিরুদ্দেশে ভেসে গেল কাগজটা কে জানে।

বৃদ্ধ ঘটক ঠাকুর খুব তাড়াতাড়ি যে কিছু করবে তা আশা করেনি আই-ওয়ান্। কাজেই ধৈর্য ধরেই আছে ও। কিন্তু রাতে ঘুম ভেঙে যায়। শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবে। অন্ধকার যেন বুকের ওপর চেপে বসে। হয়তো বড় বেশী আশা করেছে ও। হয়তো যতটা ভেবেছে তত শক্ত নয় তামা। কিন্তু দিনের আলোয় মনে পড়ে চলে আসার সময় তামার সমস্ত ব্যক্তিত্বে কি স্থির সংকল্পের স্বাক্ষর দেখেছিল। এ মেয়ে সংকল্প-চ্যুতা হবে না। পিওনীর মত ছেলেমানুষী স্বভাবের মেয়ে নয়। যদি বলে করব—তবে করবেই তামা। স্থির জানে আই-ওয়ান্। কর্তব্য ও করবেই। আজীবন কর্তব্য পালনের শিক্ষা পেয়েছে। কর্তব্য জেনেই জেনারেল সেকীকে বিবাহ করতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে সেকেলে মেয়ের মত অন্ধভাবে পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করবে না তামা। যে-জেদে আজ ও এক পথে যাবে—যদি ন্যায় বোঝে কাল সেই দৃঢ়তা নিয়েই ও সে পথ পরিত্যাগ করবে।

তামার ওপর গভীর বিশ্বাসে ওর অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। শান্ত, সুস্থ মনে কাজ কর্ম করে যায় আই-ওয়ান।

মাল নিয়ে প্রতিদিন নূতন নূতন জাহাজ আসে যায়। ওর দেশের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উজাড় করে আসছে। দিনের পর দিন বাক্সগুলি খুলতে খুলতে মন কঠিন হয়ে ওঠে। মাল খোলা হলেই শিও এসে ঝুঁকে পড়ে। একটি একটি করে প্রতিটি জিনিষ শুধু দেখে না, নিরীক্ষণ করে। যা ভালো লাগে নিয়ে যায়। বিশেষ করে যত দুষ্প্রাপ্য অমূল্য বস্তু ও বেছে বের করবেই এ সম্বন্ধে একটা সহজ বুদ্ধি জন্মেছে ওর।

একদিন বোঝাতে বসে আই-ওয়ানকে, কতকটা যেন সাফাই দেবার সুরঃ 'বুঝলে কিনা, এই শাদা-চামড়াগুলো কি এসব জিনিষের কদর বোঝে? খালি

দুষ্প্রাপ্য হলেই জিনিষের দর বাড়ে না। দেখতে হয় শিল্প-সৃষ্টির সৌকর্য। ওদের কি আর অত সূক্ষ্মতা বুঝবার ক্ষমতা আছে! শিল্প-সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি জাপানে থাকবে। সত্যি কথা বলতে গেলে ওসব জাপানেরই। আমাদের মত সুন্দরকে এমন করে বুঝবে কে? কে অমন মর্যাদা দেবে?'

উত্তর দেয় না আই-ওয়ান। শিওর কথার কখনও জবাব দেয় না ও। সৌন্দর্যকে শিও যেন গণ্ডূষ ভরে পান করে; তার রসে ডুবে যায় ওর পিপাসিত চিত্ত। কারু-কার্য করা চীনা-মাটির বাসন, হাতীর দাঁতের কাজ, ছবি, টেপেস্ট্রী ...যা দেখে—সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে ও গ্রহণ করে। ছোট্ট মানুষ; খায় কম খাটে প্রচুর। ক্লান্তি আসে সহজেই। হয়তো একটা জেড্, নয় তো বিচিত্রিত একটা মৃৎ-পাত্র, অথবা একটা ফুলদানী নিয়ে পরম আদরে হাত বুলাতে থাকে। অপূর্ব শান্তিতে সর্ব ক্লান্তি ওর জুড়িয়ে যায়; অঙ্গে অঙ্গে নামে শক্তির ঢেউ—বহুদিনের অনাহারী মানুষ খাদ্য পেয়ে যেন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ওর হাতে সর্বদাই অতি প্রাচীন এক খণ্ড শুভ্র জেড্ থাকে। সুদীর্ঘকালের স্পর্শে ওটার রূপ হয়েছে মসৃণ, তৈলচিক্কন, মাংসের মত উষ্ণ। কর গুণে গুণে মস্ত মস্ত হিসেবের আঁক কষে শিও, জেড্ সুদ্ধ হাতখানার মুঠোর ওপর গাল রেখে। ও বলে ওতে মাথা ধরে না হিসেব কষতে কষতে। শুধু শিও কেন, এদেশের প্রতিটি মানুষ সৌন্দর্য-পাগল। ভিখিরী যে, পেটের সংস্থান নেই, দুটো পয়সা পেলে সব ফেলে আগে একটা ফুলের টব আর বীজ কিনবে। তামাও ফুল দিয়ে ওর ঘর সাজাবে। ও শিখেছে, ফুল না থাকলে ঘর ঘরই নয়।

বড্ড বেশী দেরী করছে ঘটক। আই-ওয়ান অস্থির হয়ে ওঠে। দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম আসে না। ছট্‌ফট্ করে কাটে। নিজেই যাবে, মনে মনে ঠিক করে। সেদিন মাসের আঠারো তারিখ। রাতে বাড়ি ফিরে দেখে ঘটক ঠাকুর বড় চেয়ারখানায় গা এলিয়ে বসে আছেন। আই-ওয়ান আনন্দে লাফিয়ে ওঠেঃ

'আরে! কোথায় উধাও হয়ে ছিলেন এতদিন!'

'কেন, কাজ নিয়ে যাইনি বুঝি! যাক্ বাপু, অনেক এগিয়ে এনেছি। সে কি কম ঝামেলা! সেই পুরানো পাত্তর। তাকে ঠেকাতে হবে তো! তা আমাদের কনে—সাবাস মেয়ে! হাসিল তো সেই করলে। বাপ গোঁ ধরে বসেছিল—পাকা কথা হয়ে গেছে, পুরানো পাত্তর ফেরান যাবে না। মান খোয়ানী যাবে। যাই হোক আমাদের কনে ঢিট করে দিল বাপকে।'

'মানে?...সে কি?'

'আরে কোমরে গোঁজা ছিল ছোরা। পট্ করে সেটা নিয়ে সটান কব্‌জীতে দিলে বসিয়ে। বললে—আত্মঘাতী হব।'

আই-ওয়ান্ ভয়ে কাৎরে ওঠেঃ 'সে কি...? আত্মঘাতী...? না... না...'

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে যায়ঃ 'হাঁ হে হাঁ, ঘ্যাস করে এক কব্জীর ওপর পোঁচ দিয়ে, ছোরা বাগালে আর এক কব্জীর ওপর। মা কেঁদে উঠে মুচ্ছো...বাপ্ বললে, রোস্। বেটী থামল। কাটা হাতটা দিয়ে ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত। গালিচা টালিচা ভিজে কাই।' বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলে বৃদ্ধ। ভয়ে আই-ওয়ানের মুখ কালো হয়ে গেছে। ও স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

'মার মূর্ছো ভাঙল খানিক পরে। তারপর সে কি কান্না গুঙিয়ে গুঙিয়ে —এতগুলো ছেলে-মেয়ে ছিল একটাও রইল না গো! আচ্ছা তুমি না বলো ওদের ছেলে আছে গুটি কয়।'

আই-ওয়ান্ উত্তর দিলঃ 'দু ছেলে ছিল। একজন এই কদিন হল মারা গেছে। আর একজন কোলেরটি গেছে চীন দেশে সৈন্য হয়ে।'

'তাই বল!' কৌতূহলে মুখ-ব্যাদান করে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ।

'তারপর বাপ বললে, দাঁড়াও, ভেবে দেখি। তারপর আর কি! আমিও রইলাম বসে, কাণ্ডটা দেখি একবার। শেষটায় পাত্তরের জন্য আর একটি কনে জুটিয়ে দিয়ে তবে খালাস। তা কনেটি খাসা হয়েছে। কিয়োটার এক পেল্লায় জমিদারের বেটী—অতবড় হোমরা-চোমরা জামাই পেয়ে দু'হাতে লুফে নিয়ে গেল তারা। আসলে কি হয়েছিল জান? ও-মেয়েরও বিয়ের পাটি-পত্তর সব ঠিক হয়েছিল। বিয়ের গয়না-গাটি, কাপড়-চোপড় সব ঠিক। কিন্তু সে-ব্যাটা পালিয়ে গিয়ে একটা মগা বিয়ে করেছে। কি কেলেঙ্কারী বল তো। ঠিক এমনি সময় পাওয়া গেল এই পাত্তর। মেয়ের ঠাকুদ্দার বয়সী বটে, তেমনি হাতীর মত মোটা গোদা—তা কি হবে, তারা সব মগা হাতে পেয়েছে। এই সব করে কম্মে তবে তো আসা। আর কি। এখন সাজতে লেগে যাও। দিন-পত্তর সব ঠিক। সটান্ চলে যাও। কিন্তু ও-বাড়িতে উঠবে না। শহরের দক্ষিণ দিকে সমুদ্দুরের ঠিক ধারে একটা হোটেল আছে। সেইখেনে উঠবে। বাস্ তারপর দু হাত এক...।'

'ওর হাতটা?' আই-ওয়ান জিজ্ঞাসা করল।

'তা, ভয়ের ব্যাপার ছিল বৈকি। কিন্তু ওই রক্তটুকু না পড়লে বাপ ব্যাটা তার গোঁ ছাড়ত কি না! কিন্তু বাবা, যা দেখলুম, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।' জবাব দিল ঘটক।

তারপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল, টাকা পাওনা আছে। কাশি পেলে পকেটের ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে তার মধ্যে থুথুটুকুন ফেলে পরিষ্কার করে মুড়ে সন্তর্পণে টেবিলের ওপরে রেখে দিল। চাকর-বাকররা ঝাঁটপাট দেবার সময় ফেলে দেবে।

আই-ওয়ান্ হেসে উঠে বাকী টাকাটা এনে দিয়ে বললেঃ 'বিয়ের দিন আবার ঠিক এতটাই দেব আপনাকে।'

বৃদ্ধ ওঠে, নোটগুলোকে ছোট করে ভাঁজ করে কোমর-বন্ধে গুঁজে রেখে বলেঃ 'এই তোমরা চীনেরা—বাপু, এক মানুষ! কাল পেরিয়ে আর পরশুতে নজর যায় না। কাল মানে তো আর কালই নয়—পরশু, তরশু, নরশু—যত কাল আসবে আর যাবে তার গোড়া। বিয়ের মন্তর পড়া মানেই কি বিয়ে হয়ে গেল? বিয়ের সে তো সবে আরম্ভ।'

তারপর উঠে, কেশে, মাথা নেড়ে চলে গেল। কাজ হয়ে গেছে তার। এখন যা হয় হোক। বিয়ে ঘটান ওর পেশা। তারপর কি হবে, না হবে, তা নিয়ে ওর মাথা ঘামাবার নয়। এটা ফস্কেই যাচ্ছিল হাত থেকে। মেয়ে আত্মঘাতী হতে গিয়েছিল বলেই না সব কূল রক্ষা।

গোছাতে বসে আই-ওয়ান্। কাল সকালেই রওনা হবে। ছুটি নিতে হবে শিওর কাছে। শুনে কি করবে শিও? কিছুই না, এতো আর দুষ্প্রাপ্য

প্রাচীন যুগের শিল্প-নিদর্শন নয় যে মেতে উঠবে। তা হোক, সে এখন ওর বড় ভায়ের মত। অনুমতি নিতে হবে বৈকি! অন্তত তামার খাতিরেও নিতে হবে। তামা ওর জন্য প্রাণ দিতে পারে, আর ও এটুকু পারবে না!

প্রাগ্‌বিবাহ অনুষ্ঠান। আই-ওয়ানের হোটেলেই আয়োজন হয়েছে নিয়মানুসারে। সম্বন্ধ করা বিয়ের মত ও যেন সেই অচেনা বর—আচার কৃত্য পুরোপুরি সেভাবেই চলছে। তামার দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সব করে যাচ্ছে আই-ওয়ান্। আনুষ্ঠানিকভাবেই এলেন কন্যার পিতা-মাতা অনুষ্ঠানের পোষাক পরে। গাঢ় সবুজ সিল্কের পোষাক, এ বেশে ওদের আর কখনও দেখেনি আই-ওয়ান্। সঙ্গে এলেন বহু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—যাদের অনেককেই ও ইতিপূর্বে দেখেনি। তামাও একবার চোখের সামনে ঝিলিক্ দিয়ে গেল। এ যেন নূতন তামা—অভূত-পূর্বা, অদৃষ্ট-পূর্বা। জাপানী পদ্ধতিতে তৈল-চিক্কণ চুল পালিশ করে উল্টো করে আঁচড়িয়ে বাঁধা। লাল আর সাদা রংএ বিচিত্রিত মুখ। নত হয়ে নমস্কার করবার সময় মৃদু হাসিতে মুখখানি আলো হয়ে উঠল—সুশিক্ষিত জাপানী কুমারীদের মত শিষ্টাচার-সম্মত শূন্য অর্থহীন হাসি। কি বলবে ওকে আই-ওয়ান্! চার চোখে ক্ষণিক মিলন হল। প্রদীপ্ত আলোয় জ্বলছে তামার দুই ডাগর চোখ। বুক ভরে উঠল আই-ওয়ানের।

মিঃ মুরাকী জানালেন আই-ওয়ানের বাবার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করা দরকার। নিঃশব্দে মেনে নিল আই-ওয়ান্। জানে সে সম্মতি তিনি দেবেনই। শুধু দেবেন না, জাপানের সাথে মৈত্রী প্রকাশের এই সুযোগকে তিনি অভিনন্দিত করবেন। ছেলে তো তাঁর ঘরের ছেলেই থাকবে। বৌ যেখানকারই হোক, লোকসান নেই। তামা জাপানী হোক আর যাই হোক—তার দাম বৌ হিসাবে।

মিঃ উ লিখলেন মিঃ মুরাকীকে, উভয় দেশের মধ্যেকার মৈত্রীর সম্পর্ক আরো দৃঢ় হল এই বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা। এবং এই মহান সুযোগ পেয়ে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। আরও লিখেছেন—দুই দেশের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করাই আমাদের লক্ষ্য। সে-দিক থেকে বৈবাহিক সম্পর্কের চাইতে উৎকৃষ্টতর উপায় আর কি হতে পারে?

আই-ওয়ানকে লিখলেন—জাপানী মেয়েদের মত অমন সুশীলা সুশিক্ষিতা, নম্র বিনয়ী মেয়ে দুর্লভ। ঘর কন্নায়ও তাদের জুড়ি নেই। সুতরাং পারিবারিক জীবনে আই-ওয়ান্ সুখী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বধূমাতাকে যেন এখনই দেশে না নিয়ে আসে। সাম্প্রতিক গোলমালের দরুন চীনেরা ভীষণ চটে আছে জাপানীদের ওপর। সাধারণ লোক অজ্ঞ। মাঞ্চুরিয়ার পরিস্থিতির একটা যুক্তি-সঙ্গত রফা হয়ে যাবেই। যাই হোক দুটো দিন সবুর করতে হবে। •

মৃদু হেসে বাবার চিঠিখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখে আই-ওয়ান্। তামাকে নিয়েই হোক, আর না নিয়েই হোক ফিরে আর যাচ্ছে না ও। আর যেতে যদি হয়ই, তামাকে ছেড়ে 'নৈব নৈব চ'।

বিবাহও হবে হোটেলেই। এ কয় দিন তামার মুখ রক্ষার জন্যই তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেনি। নির্দিষ্ট দিনে হোটেলের আধা-জাপানী, আধা-বিদেশী ঢং-এর ঘরগুলি কন্যা-পক্ষীয়দের সমাগমে ভরে উঠল। আগের বারে যারা এসেছিলেন তারাই এলেন। যথা সময়ে এলেন মিঃ মুরাকামী, শ্রীমতী মুরাকামী, সস্ত্রীক শিও, এবং সব পেছনে তামা।

বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে কেমন জানি একলা মনে হতে লাগল আই-ওয়ানের। তামা পাশে দাঁড়িয়ে, তার দুকুল-অলংকৃত কাঁধ ছুঁয়ে আছে ওকে। তবু মনে হয় চিত্রালি-শোভিত মুখখানা যেন আর কার মুখ। পরিচিতা সেই প্রিয়া-মুখ নয়। তামাকে—সত্যিকারের তামাকে দেখেনি কতকাল। কতকাল শোনেনি তার কণ্ঠ। বার বার আজ নিজেকে বোঝাতে হচ্ছে চোখে আঙ্গুল দিয়ে—ওরে এ তোর সেই চিরন্তনী তামা। শাস্ত্রের অনুজ্ঞা মেনে তবে এ তামাকে সে লাভ করেছে। মেনেছে বলেই মিঃ মুরাকামী বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন। ওর ইচ্ছে ছিল দু'টিতে গিয়ে নিরালায় নিভৃতে বিবাহের মন্ত্র-পাঠ করবে। কিন্তু বিবাহ তো ব্যক্তির নয়, পারিবারিক অধিকার।

শ্রী ও শ্রীমতী মুরাকামীর পেছনে কাকা, মামা, দাদা বন্ধু বান্ধবের দল। সাগ্রহ, সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে সবাই। ক্ষুদ্রকায়, গম্ভীর অতি-ভদ্র মানুষগুলি। সবাই যেন একরকম দেখতে। তামাও। হঠাৎ মনে হয় আই-ওয়ানের, এ উদ্বাহ তামার সাথে নয়—জাপানের সাথে। বিশ্বাস-ঘাতকতা—প্রচণ্ড বিশ্ব্যস-ঘাতকতা করেছে ও। কিসের বিশ্বাস-ঘাতকতা, কার প্রতি, কেমন করে, সব গুলিয়ে গেল। একটা বিচিত্র উন্মথিনী পীড়ায় সমস্ত অনুভূতি ওর ওলট্ পালট্ হতে লাগল। হঠাৎ কানে এল, পাশে দাঁড়ান ঘটক-ঠাকুর বলছেনঃ

'যাও, এখন কাপড় চোপড় বদলে এসোগে। কনেও তৈরী হয়ে আসছেন। গাড়ী তৈরী।'

সম্বিৎ ফিরে এল। মনে পড়ল ওরা যাবে পাহাড়ে, উষ্ণ-প্রস্রবণের পাশেব সেই ছোট্ট হোটেলটায় একটা সপ্তাহ থাকবে। ক্ষণিকের উন্মাদনায় ভুলেই গিয়েছিল সব।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। এবারে হবে সত্যিকার বিবাহ ওদের একান্ত-মিলনের লগ্নে। ছুটে চলে এল নিজের কক্ষে। বিছানার ওপর সাজানো আছে গভীর নীল রংএর নূতন পাশ্চাত্ত্য পোষাক আর লাল টাই। নিজে পছন্দ করে কিনে এনেছে ও আজ সকালে। স্বহস্তে সযত্নে রেখেছে হাতের কাছে সাজিয়ে। বর আজকাল বিদেশী পোষাকই পরে। আধুনিক ফ্যাশন তাই। ক্ষিপ্র হস্তে তৈরী হয়ে, নূতন হ্যাট্টা হাতে নিয়ে ছুটে চলে এল নীচে। তামা পর্দা-ঘেরা গাড়ীতে আগে থাকতেই বসে আছে। কে একজন দরজাটা খুলে ধরল। আই-ওয়ান্ গিয়ে গাড়ীতে বসল। একটা ঝাঁকানী দিয়ে গাড়ী ছুট্‌ল। ঝাঁকানীতে পরস্পরের গায়ে লুটিয়ে পড়ল ওরা। তামা হেসে উঠল। পরিচিত দুনিয়া ফিরে এল।

'তামা!' আই-ওয়ান্ উচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকে।

মুখের রং আর নেই তামার। চুল উল্টে বাঁধা। গাঢ় সবুজ রংএর পোষাকে ওকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

হাসতে হাসতে শুধায় তামাঃ 'চেন না আমায়?' সেই তামা, সেই গোলাপী হাসি, হাসি-সুন্দর মুখ।

আই-ওয়ান্ নির্বাক। ব্যগ্র বাহু ছুটে আসে। ধরা দেয় তামা। সত্যকার তামা। জীবনের সব কিছু থেকে সত্যতর বাস্তবতর আজ তামা। ওর গালে গাল রাখে আই-ওয়ান্। সদ্য-ধোয়া ত্বকে সাবানের মৃদু সুগন্ধ; কেশে তৈলের স্নিগ্ধ সুবাস।

সুখে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আই-ওয়ানের। কানে কানে বলে, 'তামা! সত্যি বিয়ে হল আমাদের!'

মাথা নাড়ে তামা। ওর হৃদয়ের বলিষ্ঠ স্পন্দন রিনি রিনি বেজে ওঠে আই-ওয়ানের দেহের তারে তারে। স্বামীর আলিঙ্গনে স্বীকৃতির সুর ঘন হয়ে ওঠে। তামার শিরায় শিরায় জাগে সুখের কম্পন।

দৃঢ় কণ্ঠে বলে তামাঃ 'বিয়ে হল বটে, কিন্তু ভুলো না আমি মগ্যা। সেকেলে নই।'

হাসে আই-ওয়ান্। তামার দৃষ্টিতে দুষ্টমী ঝিলিক দিয়ে ওঠে; বলেঃ 'কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

'হচ্ছে গো হচ্ছে। সাতশোবার হচ্ছে।' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয় আই-ওয়ানঃ 'দেবীর বিধান শিরোধার্য।'

'বেশ, বেশ! বউনিটা ভালোই দেখা যাচ্ছে,' বলে তামা।

আবার হেসে ওঠে আই-ওয়ান্। দীঘল কালো চুল আঁচড়াচ্ছে তামা। শুয়ে শুয়ে দেখছে ও। উষ্ণ ঝরনা থেকে এইমাত্র স্নান সেরে এসেছে দুজনে। চুলগুলো চুড়ো করে বেঁধে নিয়েছিল তামা, তবু খানিক ভিজে গেছে। যা জল-ছিটোছিটি করেছে। অঙ্গ-মার্জনা হতে না হতেই স্নানাগারের পরিচারিকাকে সরিয়ে দিয়েছে ওরা। পরস্পরকে একান্তে পাবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। মুখ ফিরিয়ে হাসাহাসি করেছে পরিচারিকারা। করুক, বয়ে গেছে আই-ওয়ানের। দরাজ হাতে বক্শিস দিয়ে রেখেছিল তাদের—ওদের নাওয়া না হওয়া পর্যন্ত অন্য স্নানার্থীদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য। তামাকে বলেনি অবশ্য, কিন্তু আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল আই-ওয়ান্, আর কারো সামনে নাইবে না তামা। চীন দেশে ও সব চলে না। শুধু ওর সামনে নাইবে ওর বৌ।

সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে তামা—পরিপূর্ণ বিবসনা। কোন সংকোচ নেই, শিশুর মত সরল। বুজীর সাথে পাহাড়ে যাওয়ার পথে যে স্নানরতা কৃষক বালাকে দেখেছিল—তার মধ্যেও এমনি শিশুর মত নিষ্কলুষ সহজ সঙ্কোচ-হীনতা ছিল। দেহ সম্বন্ধে এদের আত্ম-চেতনা নেই। সবসন, বিবসন দুইই সমান।

কেমন যেন একটু রাগ হয় ওর—এতটা কেন! বেশী বেশী ছেলেমানুষী দেখানো। ঝিদের সামনেও তো অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তামা তাহলে। ভাবতেও অসহ্য লাগে। কিন্তু কি করে বোঝাবে তামাকে? ও বুঝতেই পারবে না। ওরা অন্য ধরনে মানুষ।

হঠাৎ বলে ওঠে আই-ওয়ান্ ঃ 'দেখি তোমার কব্জীটা!'

কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দেয় তামা। লম্বা একটা কাটা দাগ, এখনও লাল হয়ে আছে। আই-ওয়ান্ দাগের ওপর ওর গালটা রাখে।

'এমনি করেই বুঝি মগারা কাজ হাসিল করে?' জিজ্ঞাসা করে ও। মনে মনে ভাবে কি জানি যদি কোন দিন রাগ টাগ করে ফেলে তামার ওপর! তাহলে...! না হবে না, হতে দেবে না ও। ওই হাতখানার দিকে নজর পড়লে রাগ যাবে কোন চুলোয়।

শান্তভাবে তামা জবাব দেয়, ঃ 'এ ছাড়া তো বাবাকে বোঝাবার উপায় নেই কিনা!'

কি মধুর! মধুময় হয়ে ওঠে পুরুষের বুক। কিন্তু আরো বেশী চাই যে ওর।

'আচ্ছা, যুদ্ধ হলেও আমাকে ছাড়া নিশ্চয়ই আর কাউকে বিয়ে করতে না! জানি, করতে না।'

তখনও তামার হাত ওর হাতে রয়েছে। ওর চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে আই-ওয়ান্।

মাথা নাড়ে তামা—ওর দৃষ্টিতে যে গভীর সারল্য ফুটে ওঠে, তাকে অবিশ্বাস করবে কি করে?

'না, আই-ওয়ান্। যুদ্ধ হলে তোমার সাথে আমার বিয়ে হত না। তখন তো আমি আমার থাকতাম না! হতাম দেশের। নিজের ওপর আমার কোন অধিকারই থাকত না। তাই হয় লড়াইয়ের সময়। কেউ তখন নিজের নয়। সবাই দেশের।'

'দেশ মানে তো ওই বুড়ো সেকী নয়।' বিদ্বেষের সুরে বলে আই-ওয়ান্।

হঠাৎ অদ্ভুত লাগে আই-ওয়ানের। ওর হাতের মধ্যে ধরা হাতখানা যেন তামার নয়। আর কারো। আচ্ছা, তবে অমন করে হাতে ছুরি বসাতে গেল কেন তামা? এই মসৃণ পেলব শুভ্রতার বুকে ওই লাল দাগটা বড় করুণ, বড় বিস্ময়ের বস্তু মনে হয়েছিল এতক্ষণ। কিন্তু অকস্মাৎ তার রং বদলে গেল।

তামা সংক্ষেপে বলেঃ 'জেনারেল সেকী খুব বড় একজন সেনাপতি। সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বাস-ভাজন।'

'সম্রাট' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় তামার স্বর আপ্লুত হয়ে উঠল। যেন ও ভগবানের নাম করছে। একটা অকারণ বিদ্বেষ আবার উদ্বেল হয়ে উঠল আই-ওয়ানের বুকের মধ্যে। উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠল ও ঃ

'না, না, আমায় ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। শুধু আমায় ভালোবাসবে।' বলতে বলতে হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসে তামার কোমর জড়িয়ে ধরল। তামার বুকের ধুক্‌ধুকানী যেন শুনতে পাচ্ছে আই-ওয়ান্।

দুই হাতের মধ্যে আই-ওয়ানের মাথাটা নিয়ে শান্তভাবে বলে তামা ঃ

'হ্যাঁ, শুধু তোমায়ই তো ভালো বাসি, আর বাসবও।'

'তবে ওই যে বললে—যুদ্ধ বাঁধলে—কেন, কেন বললে ও কথা?' ওর ইচ্ছা

তামা বলে দুনিয়া রসাতলে গেলেও ওদের আলাদা করতে কেউ পারত না; এমনি কাছাকাছি এমনি মেশামেশি হয়েই থাকত ওরা সর্ব অবস্থায়।

'অন্য জায়গায় বিয়ে হলেই বা কি হত? যেমন ভালোবাসি তোমায় তেমনি বাসতাম; ভালো আমি যাকে খুশি বাসি না কেন, কর্তব্য ঠিক থাকলেই হল।' আলতোভাবে স্বামীর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলে তামাঃ 'কেন বুঝতে পারছ না, আই-ওয়ান্ লক্ষ্মীটি। জাপান দেশের মেয়ে হিসেবে আমার কর্তব্য হচ্ছে আগে দেশের কল্যাণ।'

'চুপ চুপ!' শুনবে না আই-ওয়ান্। কর্তব্যের কথা আর শুনতে চায় না ও। বলেঃ 'কর্তব্য! আমিই তোমার কর্তব্য। আমি ছাড়া আর কারো ওপর তোমার কোন কর্তব্য নেই।'

আবার হাতখানা তুলে নেয়—আপনাকে একেবারে ঢেলে দিয়ে কাটা দাগটার ওপর জিভ্ বুলায়। ফিস্‌ফিসিয়ে বলেঃ

'চুপ! কথা নয়, কথা নয়। কোন কথা নয়।'

শুধু অনুভব করতে চায় আই-ওয়ান্। অনুভূতির গভীরে একাত্ম হয়ে যেতে চায় দয়িতার সাথে। ওদের ধমনীর রক্তে একই ছন্দ, একই কামনার সিঞ্জিণী বাজছে আজ। ওই তো নর-নারীর সম্পর্কের একমাত্র ভূমি। নীরবে ধরা দেয় তামা। কোমল স্পর্শে, পেলব ভঙ্গিতে স্বামীর লীলা-সঙ্গিনী হয়ে ওঠে। হঠাৎ ওর হাতের এক বিশেষ ভঙ্গিতে চম্‌কে উঠে ছিট্‌কে দূরে সরে যায়। কুমারী কন্যা, সবে আজ তার বিবাহ হয়েছে, কি করে সে এত জানে? আই-ওয়ান্ স্তম্ভিত। অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলে সরে যায়।

'কি বলছ?' জিজ্ঞাসা করে তামা।

'বলছিলাম...কি...কি.. করে...এ...এসব...শিখলে?'

অবাক হয়ে যায় তামাও। যে-ভাবে ছিল সে-ভাবেই শুয়ে শুয়ে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে আই-ওয়ানের দিকে তাকায়। নিষ্কলুষ সরল শিশুর বিস্ময়।

ব্যগ্র স্বরে বলে, 'কোথায় আবার? শিখিয়েছে। খুব ভাল, একজন বয়স্ক গীশা (Geisha) আমার জন্য রেখে দিয়েছিল যে মা!'

আই-ওয়ান্ মুগ্ধ। এত সরল, এত পবিত্র? ভয়ও পায়। সোজা হয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। ওর ভেতরে তীব্র সংগ্রাম চলছে। বুঝতে পারে না কোনটা প্রবল, ভয়, না ভালো-লাগা।

'কিন্তু হল কি, আই-ওয়ান্?' শুধায় তামা।

কোন মতে বলে ফেলে আই-ওয়ান্ঃ 'তোমাদের এই সব...ভয় করে আমার।'

ভেবেছিল, বুঝতে পারবে না তামা। কিন্তু অমূলক সন্দেহ। খানিক-ক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে স্বাভাবিক শান্ত স্বরে নিতান্ত ব্যবহারিক-ভাবে বলতে লাগলঃ

'অবুঝ হয়ো না। বুঝতে চেষ্টা কর একটু। তোমার সংসার করা, তোমার জামা কাপড় গোছান, পছন্দ মত রান্না করে খাওয়ান, তোমার ছেলে মানুষ করা, সব শিখলাম। আর আমরা দুজনে যখন একান্তে থাকব, তখন কিসে তোমার ভালো লাগবে সে টুকুই শিখব না? মেয়ে বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘর করতে আসবে, অথচ জানবে না স্বামীকে সোহাগ করতে। খুব ভালো

হয় বুঝি? বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই তো সব চেয়ে বড় কথা —দেহের মধ্যে হৃদপিণ্ড যেমন ঠিক তেমনি। হৃদপিণ্ডটি যদি পোক্ত থাকে, তাহলে সারা দেহটিই সুস্থ থাকে। বুঝলে?'

তবু আই-ওয়ান্ গুমরায়ঃ 'বেশ্যাদের মত—'

আই-ওয়ানের হাত ছেড়ে দিয়ে আর্তস্বরে বলে তামাঃ 'ছিঃ ছিঃ, কি বললে?' প্রচণ্ড ঘা খেল তামা। ক্ষিপ্রভাবে উঠে পড়ে জামার জন্য হাত বাড়ায়। কি আশ্চর্য তফাৎ দুজনের মধ্যে। কিন্তু কিসের তফাৎ? মনে পড়ে সেই পাহাড়ে যাবার দিন খোলা জায়গায় কৃষক-মেয়েটিকে বে-আব্রু হয়ে নাইতে দেখে ও কি রকম চমকে উঠেছিল। বুজীর কোন ভাবান্তর হয়নি। নির্বিকারভাবে জবাব দিয়েছিলঃ 'কি হয়েছে? কাপড় ছেড়ে নাইবার সময় তাকাতে নেই মেয়েদের দিকে। খুব খারাপ।' বুঝতে পারেনি আই-ওয়ান্, কিন্তু মেনে নিয়েছিল। তামা সরে গিয়ে একেবারে ওই ওদিকের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পোষাক পরে নিল। চওড়া কোমর-বন্ধটা খুব কষে বেঁধে নিল। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকলেও ও দেখতে পাচ্ছে আই-ওয়ান-এর হাত থর থর করে কাঁপছে।

'বেশ্যাদের মত...!' কান্না উথলে ওঠে তামার স্বরেঃ 'আমি না তোমার স্ত্রী? আমিই না তোমার সন্তানের মা হব!'

জামার আস্তিন তুলে চোখ মোছে তামা।

বড় মায়া হয় আই-ওয়ানের। ঠিক যেন একটি অবোধ শিশু। যা শিখেছে তাই জানে ও। উচ্ছ্বসিত আবেগে কাছে আসে আই-ওয়ান।

'ক্ষমা কর। করেছ? করতেই হবে ক্ষমা।'

'খবরদার হুকুম করেছ তো।' মুখ না ফিরিয়েই বলে তামা। ভুলো না আমি মগা। হুকুম সইতে পারিনে আমরা। স্বামীরও নয়। তাছাড়া হুকুম করবেই বা কেন? তোমার যা ভালো লাগে তা তো এমনিতেই করব।'

ঠোঁট কাঁপে তামার। হঠাৎ হাসি পেয়ে যায় আই-ওয়ানের। এ-মেয়ে ওর প্রিয়তমা—ওর মাথার মধ্যে যা খুশি থাক; নাই বা ওকে বোঝা গেল। ভালো মন্দ, বোঝা না বোঝা সব নিয়েই ও সর্বান্তঃকরণে এ-মেয়েকে গ্রহণ করেছে।

'এদিকে এস।' ডাকে আই-ওয়ান্ দৃঢ় স্বরে।

এবারে মাথা ফেরায় তামা। গোপন দৃষ্টিতে স্বামীর দৃষ্টি খোঁজে। চার চোখ মিলে যায়। আই-ওয়ান্ দেখে জলের ওপর আলোর নাচনের মত তামার চোখে হাসি দুলছে। প্রতীক্ষায় ঘন হয়ে ওঠে ও। এইমাত্র বাঁধা কোমরের ফিতেটা নীরবে খুলতে আরম্ভ করে তামা।

অনেক সময় আই-ওয়ান্ বসে বসে ভাবে—এই বিবাহকে সূত্র করে নিজের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হল ও নিজে, স্বজন-গোষ্ঠি-বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করল তামাকে। চীনা আর জাপানী সাধারণ হিসেবে পরস্পরের কাছে বিদেশী। ওদের পূর্ব-পুরুষদের রক্ত ছিল আলাদা; দেহের কাঠামো অবধি আলাদা। তামার আর ওর নিজের দেহ-গঠনেও এই বিভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট। আই-ওয়ান্

লম্বা, দোহারা; ভারী নরম গড়ন। তামা বেঁটে; চওড়া শক্ত-পোক্ত মজবুত শরীর। স্থূলাঙ্গী নয় কিন্তু সাধনা করলেও আই-ওয়ানের দেহের তনুতা ওর কদাচ লভ্য হবে না। ওদের দেহ ভিন্ন, কিন্তু আত্মা এক হয়ে গেছে। এত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও ওই দেহখানি বড় প্রিয় আই-ওয়ানের; বড় অন্তরঙ্গ, বড় আপন হয়ে ওর কাছে এসেছে। শুধু অঙ্গ নয়, আই-ওয়ানের কাছে সে বরাঙ্গ। ওই বরাঙ্গকে ও ভালোবাসে, ভালোবাসে বরাঙ্গীর সহজ-সুন্দর প্রকৃতিকে। অনেক সময় ঠাট্টা করলেও তামার শিশুর মত সারল্য সত্যি ওর বড় ভালো লাগে।

তামার মত অত সহজ ও হতেই পারে না। তাই আরো ভালো লাগে তামাকে। তামার স্বভাবই শুধু সহজ নয়—তার পথ-পদ্ধতিও সহজ—শেখা পথে একেবারে সোজা টানা পথ। একটা কিছু করে আই-ওয়ানের ভাবনার অন্ত থাকে না, খুঁত খুঁতির শেষ থাকে না—নিশ্চয় আরো ভাল হতে পারত, অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু তামার রকম বেরকমের সমস্যা নেই; কারণ ওর রকম, একই রকম—সেই ছোট-বেলা থেকে যা শিখে এসেছে। শেখা পথের সোজা রাস্তাই একমাত্র রাস্তা। কাজেই তামার জটিলতা নেই, তামা সহজ। তামার অহংকার আছে—ও স্বাধীন-চেতা, ও আধুনিক। প্রতি পদে ও ঠিক যে ভাবে শিখেছে সে ভাবেই চলে নিষ্ঠা দিয়ে এবং গোঁ দিয়ে। এক চুল এদিক ওদিক হয় না। আই-ওয়ানের মনে হয় ওই গোঁই তামার স্বাধীন-চিন্ততা। কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করে ও, তামা কিছু বোঝে না। এই যেমন সেদিন হল।

মধু-চন্দ্রিকার সাতটা দিন যেন হাওয়ায় ভর করে চলে গেল। নাগা-সাকীতে ফিরবে পরের দিন। ছোট্ট একটা বাড়ি নেওয়া হয়েছে সেখানে শহর-তলীতে পাহাড়ের ধারে। ওখানেই থাকবে এখন। বুজী নেই—তার জায়গায় কাজ করবে আই-ওয়ান। শেষ সন্ধ্যাটিকে একটু বিশেষ করে তুলতে চাইল তামা। খাবার আয়োজনও তাই একটু বিশেষ হল। নীচু টেবিলটা নিজেই টেনে নিয়ে গেল তামা ঘরের অন্য প্রান্তে খোলা জানালাটার সামনে—যেখান থেকে দেখা যায় দূর-বিসারী পাহাড় আর সমুদ্র আর দীপের মালা-পরা রাতের অন্ধকার। আই-ওয়ান্ সাহায্য করতে এলে ওকে সরিয়ে দিল তামা, সে নিজেই সব করবে।

কর্মহীন আই-ওয়ান্ তামাকে দেখতে লাগল বসে বসে। মনে মনে ভারী হাসি পেল ওর গিন্নীপনা দেখে। মহা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে তামা। খুঁটিনাটি সব কিছুর ওপর কড়া নজর। খুঁটিনাটিই বা কোথায়—সবই মহা জরুরী। ফুল সাজাবার জন্য ঘাস-ফুল দরকার। ছোট তক্ষুণি। সারা বিকেল দুজনে তার জন্য পাহাড় চষেছে। ফিরে এসে সেই যে মেয়ে বসল ফুল নিয়ে, সারা বিকেল নিবিষ্ট মনে মুখ গুঁজে ফুল বাছল। বাছতে বাছতে প্রায় সবই ফেলে দিল। যাও বা রইল তাও কেটে ছেঁটে সাজিয়ে গুছিয়ে উঠতে প্রায় একটি ঘণ্টা। কিন্তু দেরী যতই হোক আশ্চর্য ওর হাত আর রুচি-বোধ। কটি তো মাত্র রুপোলী পালক-ওলা ডাঁট। দীঘল দীঘল সবুজ পাতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, কে বলবে হাতে সাজানো। আই-ওয়ান্ যদি স্বচক্ষে ওর সাজানো না দেখত তাহলে বলে ফেলত মাঠ থেকে ঝাড়সুদ্ধ অমনি এনে চৌক ফুলদানীটায় রেখে দিয়েছে।

টেবিলে থালা সাজাল তামা। চায়ের পাত্র এনে রাখল। কোথায় কে বসবে, প্রথমে কি খাবে আগে থাকতে ঠিক করে রাখা হয়েছে। সব হয়ে গেলে হঠাৎ হাততালি দিয়ে হেসে উঠল ঃ

'এসো না বাপু, এবারে মজা করে খাই।'

'কেন গো, এতক্ষণ তো দিব্যি মজা করলে! সেই থেকে তো দেখছি। এই যে সব সাজালে গোছালে, কম সুখটা হয়েছে তোমার!'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায় তামা।

'মানে? কি আর করলাম! এটুকু না করলে চলবে কেন?'

'চলা টলা নয়, আসলে করতে ভালো লাগে তাই করেছ। এই এত সব খুঁটিনাটি সাত সতের জিনিস, সব দরকার বলতে চাও? খাবার আসবে খেয়ে নেব। বাস্।'

'ওঃ, আই-ওয়ান্!' কান্না কান্না গলার স্বর। 'কি বলছ? ছিঃ। সব কাজই তো আর এক ভাবে করা যায় না। এক একটা এক এক রকম করে করতে হয়। ঘর ঝাঁট দেওয়া, চা দেওয়া, খাবার পরিবেশন করা—সব কিছুর আলাদা আলাদা নিয়ম আছে। এত কষ্ট করে কি শিখলাম তাহলে এতদিন!'

'বাঃ বাঃ! চমৎকার আধুনিকা......।' উল্লসিত হয়ে চীৎকার করে আই-ওয়ান্।

থমকে যায় তামা। 'তার মানে—তুমি ব-ব-বলতে চা-চা-ও...' কথা সরে না ওর মুখ দিয়েঃ 'মগাদের এ-এ সব—দ-র-কার নে-ই...' তারপর খুব ধীরে ধীরে বলেঃ 'হয়তো সত্যি আমি খুব সেকেলে। শুধু সেকেলে নই, তার বাড়া—'

তামা আহত হয়েছে। ওর আনন্দটুকু নষ্ট হয়ে গেল। নিজের ওপর ভারী রাগ হয় আই-ওয়ানের।

তাড়াতাড়ি বউএর মনোরঞ্জন করতে তৎপর হয়ে ওঠে। বলেঃ 'আরে না না—সত্যি বলছি আমার এসব ভীষণ ভালো লাগে। আর তুমি! তুমি করবে, আমার ভালো না লেগে পারে! একটুখানি ক্ষেপাচ্ছিলাম, মণি! আর ক্ষেপাব না, সত্যি বলছি। দেখে নিও!'

'তাই বুঝি! আই-ওয়ান্, কি যে বলছ! ক্ষেপাবে না কেন?' ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে তামাঃ 'আমিই বরঞ্চ না ক্ষেপতে শিখে নেব।'

সাংঘাতিক গম্ভীর হয়ে গেল তামা। টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে গেল আই-ওয়ান, ঠিক এমনি সময় মাছের বাটি নিয়ে পরিচারিকা এসে ঢুকল। মুহূর্তে সব ভুলে গেল তামা।

'দেখেছ, আই-ওয়ান্, কি রকম মাছ?' তামা উচ্ছ্বসিত, 'পুকুর ধারে গিয়ে নিজে পছন্দ করে এনেছি, জান? খেয়ে দেখ। কি চমৎকার। আমি নিজে রাঁধতে দেখিয়ে দিয়েছি।'

'তাহলে ভালো না লেগে পারে! সত্যি চমৎকার মাছ।' বলে আই-ওয়ান।

বাটি বাড়িয়ে ধরে ও। তামা মাছ তুলে দেয়। আই-ওয়ান্ বলেঃ

'দেখছ তো কেমন লক্ষ্মী ছেলে! যাহা দাও, তাহাই খাই।'

সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে তামার চোখ। বলেঃ 'সে কি কথা? আমি তো তা চাইনে। আমি চাই, তুমি চাইবে, আর আমি দেব।'

'জানি গো জানি।' বলে আই-ওয়ান্। বোঝে, অতি সাবধানে ধীরে ধীরে পথ করে চলতে হবে বৌকে নিয়ে। ও এখনও কুঁড়ি, পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠেনি এখনও। প্রাচীনে নবীনে শিশুতে নারীতে মিশিয়ে আছে। ওর এই প্রত্যেকটি রূপকে আলাদা আলাদা বুঝে আবার সব মিশিয়ে গোটা মানুষটাকে হিসেব করে মানিয়ে চলতে হবে ওকেই।

মুহূর্তে খুশী হয়ে ওঠে তামা। বুজীর কথা ওঠে। খেতে কী ভালোই বাসে ও। আজ থাকলে কত ফূর্তি করে খেত। কোথায় যে পড়ে রইল—চীন দেশের কোন প্রান্তে কে জানে।

'চীনের কথা আমায় বলো, আই-ওয়ান্।' শুধায় তামা; 'আমাদের দেশের মত ?'

মাথা নেড়ে আই-ওয়ান্ জবাব দেয়ঃ 'হাঁ—না—কি জানি। না না, এরকম নয়।' মনে পড়ে যায় তামার আর ওর দেহের জাতিগত বৈষম্য। উভয়ের মনে, চিন্তাধারা ও অনুভূতির মধ্যে অবধি ওই বৈষম্য অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। তাই বারে বারে সংঘর্ষ। এবং চলবেও।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তামা উঠে একটি ছাড়া সব বাতি নিবিয়ে দিল। বাসন তুলে নিয়ে চা দিয়ে গেল পরিচারিকা। নিজের চায়ের বাটিটা হাতে নিয়ে স্বামীর পাশে এসে বসল তামা। চীনের কথা ভুলে গেল। আনন্দ আর শান্তি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সামনের পাহাড় পেরিয়ে বহু দূরের পানে। আই-ওয়ানও চেয়ে থাকে। নিবিড় নীরবতায় দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, বৈষম্য লুপ্ত হয়ে যায়। এক হয়ে মিশে যায় দয়িত-দয়িতা। সন্ধ্যার প্রশান্তিতে মিলনের লগ্ন বাজে। নারী-পুরুষের এই মহা-মিলনেই তো জীবনের রস। জাতি, ধর্ম, মৃত্তিকার বিভেদকে অতিক্রম করে উচ্ছৃত হয় সেই অমৃত-ধারা। আই-ওয়ান আজ নির্ভয় হল। ওদের এই বৈষম্যের বিবাহ নিয়ে ওর কোন ভয় নেই। বৈষম্যের বুকেই ওরা ফুল ফোটাবে, ফল ফলাবে দুই হাত এক করে। এই জীবন সাধনায় আপনাকে উৎসর্গ করে দেবে আই-ওয়ান্। নইলে আর রইল কি ওর ? ওর দেশ রইল না, মাটি রইল না, আত্মীয় পরিজন রইল না। মাতৃ-ক্রোড়-চ্যুত সন্তান কোথায় যাবে ? হাত ধরে কোথা নিয়ে যাবে জীবন সঙ্গিনীকে ? নিজের স্বর্গ থেকে ও ভ্রষ্ট হয়েছে। তাই তামার দুনিয়াই ওর দুনিয়া হয়ে উঠুক। না তা নয়। নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করবে ওরা—ও আর তামা। নূতন ? একটা পরিচিত ব্যথায় বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। না না, তাই হোক, তাই হোক। সৃষ্টিই করবে ওরা। নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করবে দুজনে মিলে। সেখানে ঘর বাঁধবে—সত্যিকার ঘর। চিরকালের ঘর। বড় চাইনে—ছোট্ট একটুকু, একটুখানি আশ্রয়ের নীড়। সেখানে থাকবে তামা, আই-ওয়ান্ আর তাদের সন্তানেরা। ওদের মত ওদের সন্তানদেরও তো দেশ থাকবে না, মাটি থাকবে না। তাদের জন্যই একখানি সুদৃঢ় নিরাপদ আশ্রয়ের দরকার আরো বেশী। নইলে—হঠাৎ শিউরে ওঠে আই-ওয়ান্—হয়তো সন্তানেরা ওকে অভিশাপ দেবে। হয়তো কোন মুহূর্তে তাদের মনে হবে কেন আই-ওয়ানের ঘরে জন্ম হল ওদের। জেনারেল সেকীর ঘরে জন্ম হলে তো এমন সর্বহারা বাস্তু-হারা হত না। ওর পিতৃত্বকে সেদিন বিড়ম্বনা মনে হবে ওর বংশধরদের। মনে পড়ে, ও সাংহাইএ দেখেছে,

সঙ্করদের কোথাও ঠাঁই নেই। কিন্তু সে তো সত্যি সঙ্কর—শ্বেত আর পীত রক্তের সঙ্কর। তামা আর ওর সন্তানেরা তো তা হবে না।

'কি ভাবছ, তামা?' নীরবতাকে চূর্ণ করে দিতে চায় আই-ওয়ান্। তামার কণ্ঠের স্বর শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অত্যন্ত শান্ত স্বরে জবাব দেয় তামা: 'ভাবছি নূতন বাসার কথা।' কেমন করে কোথায় কি রাখব, কেমন করে ঘর সাজাব, সেই কথা।'

আই-ওয়ান্ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে ওঠে: 'এখানেই যদি থেকে যেতে পারতাম চিরকাল! ভয় ভাবনা কিচ্ছু নেই। বেশ থাকতাম দু'জনে।'

তামা যেন আঁৎকে ওঠে: 'ওরে বাসরে! এই অসুবিধার মধ্যে! তায় আবার চিরকাল! না পাওয়া যায় আনাজ-পাতি, না পাওয়া যায় মাংস! পোড়ার জায়গা। কয়লা অবধি পাওয়া যায় না। এমন করে সংসার চলে? দু'চার দিন বেড়িয়ে গেলাম সে এক কথা।'

তাই তো!...সংসার...! কথাটা মনে আসেনি আই-ওয়ানের।

দিনগুলো যেন তীরের বেগে ছুটেছে। একটা দিনকে একটু ভালো করে আস্বাদন করবার আগেই তেড়ে ছুটে আসে আর একটা দিন। কোনওখানে বেরয় না পর্যন্ত আই-ওয়ান্ শুধু অফিস আর ছুটি হতে না হতেই ছুটে আসা ছোট্ট নীড়খানায় যেখানে তামা আছে। দিনের পর দিন যায়, যায় মাসের পর মাস। একঘেয়ে লাগে না, অরুচি হয় না, পুরানো হয় না। এই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে গৃহখানিকে, তামার মত শুচিস্মিতা নারীকে আপনার করে পাওয়ার মধ্যে জীবনের মহা নূতনকে পেয়েছে আই-ওয়ান্। নূতন ওর জীবনে নিত্য হয়ে আছে। তাই ওর ক্লান্তি আসে না। আর তামা প্রাত্যহিক জীবনের অধিষ্ঠাত্রী হয়েছে—তাই—তারও ক্লান্তি নেই। আই-ওয়ানের মনে হয় এতদিন তামাকে ও বোঝেনি। এখন বুঝেছে।

বুঝেছে গৃহ ও গৃহস্থালীই তামার স্বাভাবিক বিকাশ-ভূমি। সেখানে ও সহজ, স্বচ্ছন্দ, পরিস্ফুট। বিবাহোত্তর মধু-চন্দ্রিকার দিনগুলোতে তামাকে দেখে ও মুগ্ধ হয়েছে, তামাকে ওর মনে হয়েছে পরিপূর্ণা, হয়তো তারও কিছু বেশী। কিন্তু এখন ওর মাঝে মাঝে মনে হয় সে-দিনও এই গৃহিণী তামাই ছিল। ভাবী ভূমিকার নক্‌সাটি ছকে নিয়ে তাই ও গভীর নিষ্ঠায় মক্‌শ করেছে মধু-চন্দ্রিকার মধু-রাত্রি, মধু রস-নিষিক্ত দিনেও। আজ তো এই সংসারই ওর জীবন।

সংসারটিকে নিজের মনের মত করে গড়ে নিতে গিয়ে উৎসাহ ও ব্যস্ততায় ও চুল আঁচড়াতে ভুলে যায়; কোমর-বন্ধটি ইস্ত্রী করতে ভুলে যায়; একটা সুতী কিমনোকে সেই কাপড়েরই একটা ফালি দিয়ে কোমরে এঁটে ঝিদের মত আস্তিন গুটিয়ে এলো চুলে ছুটোছুটি করে। অধিকাংশ দিন দুপুর বেলা খেতে এসে দেখে ওর নাকে মুখে কালি লেগে আছে। খেয়ালও নেই সেদিকে।

রীতি-মত ভোজন-বিলাস আজকাল। পাকা রাঁধুনী তামা। ভালোও বাসে রাঁধতে। একটা সুপ ও আর দুটো পদ থাকবেই রোজ। কিন্তু রান্না

সব নিত্য নূতন। নূতন নূতন খাবার করে স্বামীকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য তামা ব্যগ্র। ঢাকনা-সুদ্ধ পাত্র সামনে এনে ছেলে মানুষের মত চোখে ঝিলিক তুলে বলবে, 'বলতো কি?'

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্‌ও: 'এত শিখলে কোথায়, বলতো?' গদ্‌গদ্‌ হয়ে।

'এ আর কি!' বলে তামা: 'আরো কত জানি। এখনও তো খাওনি সে সব।'

এতদিন আই-ওয়ান্‌ খাওয়া সেরেছে যেন তেন প্রকারেন—বাঁচতে হলে দুটো পেটে দিতে হয়—বাস্‌ এ পর্যন্ত। কুলি মজুরদের মত সস্তার হোটেলে গিয়ে এক বাটি খুদের জাউ আর একটু মাছ বা মাংসের ঝোল দিয়ে খাওয়া সেরেছে যেন নিজেদের বাড়ির অজস্র অপচয়ের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই।

কিন্তু এখন ভালো লাগে—সুস্বাদু, সাজান, অন্নব্যঞ্জনের পূর্ণ পাত্র। তামা হিসেবী; ওর ব্যবস্থায় পর্যাপ্ততা আছে—কিন্তু অপচয় নেই। কপাল কুঁচকে যখন হিসেব করতে আর ভাঁড়ার মাপতে বসে ও, ভারী মজা লাগে আই-ওয়ানের। মনে পড়ে চীনে ওদের নিজেদের বাড়িতে কি অঢেল নষ্ট হয়। এন্‌-লান্‌-এর কথা মনে হয়—এখন একবার যদি ওর সংসার এসে দেখত! নিজের ঘরে এখন স্ব-প্রতিষ্ঠিত আই-ওয়ান্‌। ধনী দরিদ্র কারো কাছেই আর ওর লজ্জা নেই।

শহরের একান্তে পাহাড়ের ওপর একটা সমতল কোণের ওপর ওদের বাড়িখানা। জায়গাটুকু অতুলনীয় আই-ওয়ানের কাছে। অসাধারণ নয়, কিন্তু অতি পরিচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশ। ঘরের মেঝেতে পাতা দুধের মত শাদা গালিচা; দেয়ালে দেয়ালে কাগজের পর্দা। দিনের বেলা একধারে গুটিয়ে রাখে—তখন ঘরখানা যেন অনেক বড় হয়ে যায়। রাতের বেলা পর্দা টেনে টেনে খোপ খোপ করে নেয়—কোনটা বা পড়ার ঘর—সন্ধ্যে বেলা তামা যখন রান্না বান্না করে আই-ওয়ান্‌ বসে পড়তে পড়তে পাইপ টানে; কোনটা বা শোবার ঘর—নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় যেখানে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোয় ওরা। চির-প্রেমিকের নির্ভর-প্রসুপ্তি। বাড়ির চারদিক ঘিরে বাগান। রবিবারে রবিবারে ওরা গাছ লাগায়, জল দেয়। মিঃ মুরাকী আসেন প্রায়ই—বাগান সম্বন্ধে উপদেশ পরামর্শ দেন।

তার ওধারে সমুদ্র।

অনেক ভেবে একদিন বলেন মিঃ মুরাকী: 'বাগানখানি তো সমুদ্রের সাথে মানানসই হওয়া চাই। নীল সমুদ্র যে ওর পটভূমি হয়ে আছে, দেখছ না। অতএব এমনি হওয়া চাই তোমার বাগান যেখানে বাধা বন্ধ আড়াল থাকবে না—বাগানের সীমা পেরিয়ে দৃষ্টি চলে যাবে ওই যেখানে সাগরে আকাশে মেশামিশি হয়ে আছে।'

পাহাড়ী পথ ভেঙে প্রতি রবিবার আসেন বৃদ্ধ—ওদের নিয়ে লাগেন বাগানে—একটি একটি করে গাছ সাজিয়ে বসান, একটি একটি করে কেয়ারী রচনা করেন। আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠেন। এই মানুষই বজ্রের মত কঠিন হয়ে মৃত ছেলের অশৌচ অবধি পালন করতে দেয়নি, একমাত্র কন্যাকেও

বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয়নি! ভাবতেও পারে না ওরা আজ। এই স্নেহ-প্রবণ, অতি-কোমল স্বভাবের মানুষটি বজ্রের মত কঠিন হতে পারে।

অভ্যস্ত নিপুণ হাতে নিষ্ঠুরভাবে মুরাকী পুরানো ঝাড়গুলোর ডাল-পালা ছাঁটেন—আই-ওয়ান্ ভয় পায়—এর পর যে আর কিছুই থাকবে না। এই তো এক মুঠো বাগান।

কিন্তু শেষ হবার পর দেখা যায়, সত্যি মুরাকী শিল্পী। যা বাহুল্য তাই শুধু বর্জন করেছেন। কাঁচির স্পর্শে শ্যামলের অঙ্গে কত বিচিত্র রূপ রচনা করেছেন পটভূমির সাথে মিলিয়ে। মনে হয় সমুদ্র আপন হাতে নিজের ছন্দে ছন্দে এক সুরে এই বাগানখানি রচনা করেছে।

উত্তেজনায় টগ্‌বগ্ করতে করতে ঘর্মাক্ত মুখে ডাকেন: 'ওরে তোরা আয়, দেখে যা একবার।'

ঘরের মধ্যে মিঃ মুরাকীর পাশে এসে দাঁড়ায় ওরা—দেখে দেখে 'নয়ন না তিরপিত ভেল।'......বাগানখানা যেন পথ হয়ে বুক মেলে দিয়েছে—ওপারে থৈ থৈ নীল সাগরের দিকে। মাঝখানে পথ আগলানো ঘন গাছের সার। বাতাসের দাপটে মাঝখান ফাঁক হয়ে ওই নীল-তীর্থের তোরণদ্বার চিরদিনের মত উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

হেমন্ত এসে গেল। এত তাড়াতাড়ি! বিশ্বাস হতে চায় না আই-ওয়ানের। সেদিন ভোরবেলা তামা এসে বলে গেল, কাল রাত্তিরে তুহিন ঝরেছে। সত্যিই তাই, বাগানে কাজ করতে এসে দেখল আই-ওয়ান্—ঘাসের শীষে শীষে যেন মোতির দানা। পাথরের ধারে ধারে কুয়াশা জমে গুঁড়ো গুঁড়ো রূপোর রেণুর মত। বিকেলবেলা বাড়ি এসে দেখল তামা বাগানে ঝরা-পাতা ঝাঁট দিচ্ছে। পাতা ঝরার পালা শুরু হয়েছে আজ।

'সত্যি হেমন্ত এসেছে?' আই-ওয়ান্ চোখে মুখে অবিশ্বাস মেখে শুধায়। মাথা নাড়ে তামা। হিমেল হাওয়ায় লালিম হয়েছে তামার মুখ। ওর বয়স যেন ক'বছর কমে গেছে।

'চন্দ্র মল্লিকার কুঁড়িগুলো ফুটতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এ দুটোর রং দেখেছ?'

হাত ধরে আই-ওয়ানকে টানতে টানতে নিয়ে চলল তামা। মাসখানেক আগে এক ফিরিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছিল এ দুটো।

'কি চেয়েছিলাম, আর কি হল! কোথায় হবে লাল আর সোনালী, না এই ফ্যাট্‌ফেটে হলদে?' বিরক্তির সুরে তামা বলল।

ওর রাগ দেখে হেসে ফেলে আই-ওয়ান্। আরও চটে যায় তামা। বলে: 'দাড়াও না, দেখতে একবার পাই হতভাগাকে, একটি অবধি পয়সা আদায় করে ছাড়ব।'

হাসতে হাসতে ভেতরে গিয়ে ঝাঁটা এনে আই-ওয়ান্‌ও লেগে যায় বৌ-এর সাথে।

হঠাৎ ঝাঁটা থামিয়ে তামা বাঁশের বেঞ্চিটার ওপর বসে পড়ে।

'সেকি? এর মধ্যেই ক্লান্ত?' অবাক হয়ে শুধায় আই-ওয়ান্।

মাথা নাড়ে তামা: 'সত্যি, বড় ক্লান্ত লাগছে।'

আশ্চর্য! অত সহজে ক্লান্ত হবার মেয়ে তো নয় ও!

'অসুখ বিসুখ করেনি তো?'

'না—গো না?'

ঝাঁট দিতে দিতে আই-ওয়ান্ ফিরে ফিরে তাকায়।

একভাবেই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে আছে তামা।

আর থাকতে না পেরে কাছে এসে আই-ওয়ান্ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে:

'অমন করে কি দেখছ, বলতো!'

'শ্বশুর শাশুড়ী কেমন, জানলাম না,' হঠাৎ বলে ওঠে তামা, 'জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম; ঐ জলটুকু পেরুলেই তো আমার শ্বশুর ঘর। কিন্তু তবু সে শ্বশুর ঘর জানবার কপাল আমার হল না! বড় ইচ্ছে করে—'

কতকাল বুঝি হয়ে গেল—বাপ মায়ের কথা মনেও করেনি আই-ওয়ান্। সেই বিয়ের পর একখানা চিঠি লিখেছিল; বিয়ের পোষাকে তোলা ওদের ছবিও একখানা পাঠিয়ে দিয়েছিল। অতি ভদ্রভাবে বাবা তার জবাব দিয়েছিলেন। মার চিঠি পত্র লেখার অভ্যাস নেই। কিন্তু সিল্ক আর সাটিনের ফুলকারী-করা কত জিনিস যে পাঠিয়েছিলেন বৌকে। যত্ন করে সব উঠিয়ে রেখেছে তামা।

গোধূলি আলোয় সাগরের অথৈ জল সোনা হয়ে গেছে। তারই ওপারে বহু বহু দূরের একখানা গৃহের ছবি চোখের সামনে জেগে ওঠে। বিরাট বাড়ি—ওর শৈশবের গেহ ,বাল্যের, যৌবন-প্রারম্ভের লীলাশ্রয়। বহুদিনের ওপার থেকে ভেসে আসে সেই গৃহের বাতাসে জড়ানো গন্ধ—ঠাকুরমায়ের আফিমের গন্ধ, মাটি পর্যন্ত ঝোলান পর্দাগুলোর পুরানো পুরানো সোঁদা সোঁদা গন্ধ, ধূলোভরা মোটা গালিচাগুলোর মেটে গন্ধ, পালিশ করা কাঠের গন্ধ —সব মিলিয়ে মিশিয়ে কেমন জানি এক রকম। গন্ধখানি প্রতিদিন যেন ওরই প্রতীক্ষায় থাকত। স্কুল থেকে ফিরে দরজা খুললেই ওকে জড়িয়ে নিত নিবিড় আলিঙ্গনে। গভীর নীল নির্মল সাগরের হাওয়া আই-ওয়ান্ বুক ভরে গ্রহণ করে। যাক, যাক, ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যাক ওই চেনা পুরানো দিনের গন্ধ।

'কেন দেখতে ইচ্ছে করছে, বল দিকিন?' শুধায় আই-ওয়ান্। ধীর গম্ভীরভাবে জবাব দেয় তামা, 'কেন? আমি যে ঐ পরিবারেরই একজন হব:

আই-ওয়ান্ প্রথমটায় বুঝতে পারে না।

তামা লক্ষ্য করে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়:

'এ পর্যন্ত আমি একা তোমারই ছিলাম, তোমারই এক অংশ। কিন্তু আমার যে ছেলে হবে! তা'হলে আমি আর আমার থাকব না, তখন আমি শ্বশুর-কুলের। আমাদের দেশের এই নিয়ম।'

কত দিন কত রাত আজের এই মুহূর্তখানির কথা ভেবে স্বপ্নের জাল বুনেছে আই-ওয়ান্। ভেবেছে কিন্তু বলেনি, লজ্জা করেছে। মনে মনে আশ্চর্য হয়েছে, কেমন করে এমন খবরটি জানাবে তামা ওকে!

ভাবী পুত্রদের কথা কত যে ভাবে আই-ওয়ান্। সত্যি সত্যি ও ছেলে

চায় কিনা, তাও ভেবেছে। মেয়ে নিয়ে ঝঞ্ঝাট কম। বড় হবে, ভালো দেখে জাপানী ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে, বাস চুকে গেল। কিন্তু ছেলে হলে? কি হবে তার বংশ পরিচয়? চীনা? কিন্তু তারা যখন শুধাবে, কেন তা'হলে নিজের দেশের মাটি ছেড়ে পরদেশে আছে ও! কি জবাব দেবে আই-ওয়ান্? অজ্ঞাত আত্মজদের কথা মনে করে কত সময় ও গোপন ভয়ে কেঁপেছে। আর আজ তামা সেই ভয়ের জায়গাটাই ছুঁয়ে দিল। বাড়ির কথা বিশেষ বলেনি তামাকে। কেন যে ওর বাবা ওকে দেশ ছেড়ে এখানে পাঠিয়েছিলেন তা ঘুণাক্ষরে জানতে দেয়নি। প্রয়োজনও ছিল না। ওর অতীত—সে ওরই; একান্ত নিজস্ব। তামার সাথে তার সম্বন্ধ নেই।

কতবার ইচ্ছে হয়েছে নিজের কথা সব খুলে বলবে তামাকে। কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে এসেছে। বুঝবে কি তামা? বিপ্লবকে তামা ভয় করে। ভয় করতেই ও শিখেছে। অবশ্য আই-ওয়ান্ নিজেও বিপ্লবী নয়। ছিলও না কোন কালে। এখন বুঝতে পারে কথাটা। বিপ্লবী যদি বলতে হয় সে ছিল এন্-লান্।

একেবারে জাত-বিপ্লবী। যেখানেই থাকুক বিদ্রোহ ওরা করবেই। নিজের দেশে না পারে ভিন্ দেশে। বিদ্রোহ করতেই ওসব মানুষের জন্ম। এন্-লান্ও তাই বিপ্লবী হয়েছে। লড়েছে। স্রেফ্ লড়াইএর নেশায় লড়েছে। পরার্থে নয়, সর্বহারাদের দরদে গলে গিয়ে নয়। আই-ওয়ানও মানুষকে ভালোবাসে। কিন্তু ভালোবাসে না যুদ্ধ, রক্ত-পাত। নিজের মনকে ও পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে, যাচাই করে দেখেছে। তাই ভাবে, ঠিকই করেছে ও, তামাকে বলেনি ওর বিপ্লবী-জীবনের ইতিহাস, বলেনি এন্-লানের কথা। কি হত জেনে? সে-অধ্যায় নিশ্চিহ্ন, নিঃশেষ হয়ে গেছে। তামা আজের আই-ওয়ান-কেই জানুক। এই আই-ওয়ান্ই বাস্তব, বেশী সত্য। তাই এই আই-ওয়ান্কেই দেখুক আর চিনুক ওর জীবন-সঙ্গিনী। কেন যে তামাকে বাড়ি নিয়ে যায়নি সে-কথাও আই-ওয়ান্ জানতে দেয়নি ওকে।

'এখন তো বাড়ি যাব আমরা, তাই না, আই-ওয়ান্?' শুধায় তামা। 'কথা বলছ না যে? ছেলে চাও না বুঝি?'

আই-ওয়ানের চোখের দৃষ্টি বদলে যায়। ভয় করে তামার। বুঝতে পেরে ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে আই-ওয়ান্। বলেঃ

'ছেলে চাই না! কে বললে তোমায়? এতদিন বসে কার তপস্যা করলাম তবে! কিন্তু তাই বলে বাড়ি যেতে হবে কেন?'

'কেন! শ্বশুর শাশুড়ীর কাছেই যে থাকতে হয় এখন!'

'সেকি গো!' ঠাট্টার সুরে বলে আই-ওয়ান্, 'কেমনতরো আধুনিকা মেয়ে তুমি! মগারা যে আবার এমন শাশুড়ী পাগল তাতো জানতাম না!'

'নিশ্চয়ই আমি মগা। কে বললে নই!' তামার স্বর দৃঢ়। নিজকে মগা বলে জাহির করতে ভালোবাসে তামা। শুনতে বেশ মজা লাগে আই-ওয়ানের। কিন্তু আজ ও হাসল না পাছে তামা আঘাত পায়। আই-ওয়ান্ বুঝতে শিখেছে ওর জাপানী-প্রিয়া স্বামীর ঠাট্টা ভালোবাসে না। তামার অসমাপ্ত কথার জের টেনে ও বলেঃ

'কিন্তু তাই বলে কি কর্তব্য ছাড়ব—তাই না?'

'কি করে বুঝলে আমার পেটের কথা?' তামা জিজ্ঞাসা করে। আই-ওয়ান্ বলতে পারতো—এখনও বুঝব না? শুনতে শুনতে কান পচে গেল যে—কিন্তু ঠেকে শিখেছে এমন কথা বলতে নেই। সুতরাং চেপে গিয়ে বলল ঃ

'ও যে তোমার মনের কথা! তোমার মনের কথা আমি না বুঝলে কে বুঝবে?'

'নিশ্চয়! কর্তব্য করব না! বিশেষ করে এখন।' গম্ভীরভাবে জবাব দেয় তামা। এক মুহূর্ত থেমে আবার বলতে আরম্ভ করে ঃ

'আশ্চর্য, কিন্তু ছেলে পেটে এলে মেয়েদের কি হয় জানো? একেলে টেকেলে তখন আর মনে থাকে না। তখন কেবল মনে হয় আলাই বালাই দূর করে কি করে বুকের ধনকে আগলে রাখব। তাই পরিবারের কথা দশজন আত্মীয় স্বজনের কথা মনে হয়।'

নিস্তেজ স্বরে জবাব দেয় আই-ওয়ান্ ঃ 'আমার পরিবার তোমার সন্তানকে হয়তো রক্ষা করতে পারবে না, তামা।'

'তোমার বাবা না খুব বড়লোক!' তামার স্বরে প্রশ্ন, 'তাছাড়া তুমিই তো বলেছ খুব ক্ষমতাশালী লোক তিনি।'

আই-ওয়ান্ ভাবতে বসে তামাকে সত্য কথা জানিয়ে দেওয়াই হয়তো ভালো। ওর বাবার যত ধন-দৌলত আর ক্ষমতা-প্রতিপত্তিই থাকুক, জাপানী মায়ের ছেলেকে রক্ষা করতে তা অক্ষম। এই নিষ্ঠুর সত্য কেমন করে বলবে তামাকে! কেমন করে ভাঙবে এই ক্ষুদ্র গৃহের নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ততার শান্তিকে! সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কিছুই আর বাকি থাকবে না। দুঃসাধ্য ব্যাধির মত তামার বুকের তলায় বাসা বাঁধবে ভয়। ভুলতে পারবে না তামা, কখনই পারবে না যে ওদের পায়ের তলায় মাটি নেই। হয়তো একদিন ওরই বিরুদ্ধে তার মন বিষিয়ে উঠবে। না না, পারবে না আই-ওয়ান্, পারবে না বলতে—আমার দেশের মানুষ তোমায় ঘৃণা করে, তামা। সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও যে ভালোবাসে তামাকে! যাকে ভালোবাসে এমন করে তার বুক ভাঙা যায়। তাছাড়া আজ ওদের সন্তান আসছে—এই শিশুর মধ্যে ওদের মিলন হবে অক্ষয়। মিলনের এই মহা-লগ্নে কেমন করে ও বলবে এই কথা!

দুই হাতে প্রিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে বলে ঃ 'তামা, তুমি শুধু আমার, শুধু আমার হয়েই থাকবে। সেকেলে হয়ো না, মণি! পরিবার! পরিবার দিয়ে কি হবে আমাদের! তুমি আমার আমি তোমার, আর আমরা দু'জনে আছি আমাদের সন্তানের। এই তো আমাদের ঢের। তাই না!'

তামার দুই চোখে সংশয় দুলে ওঠে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে ঃ 'চিরকাল শুধু আমাদেরটি নিয়েই থাকবে ওরা? তাই কি হয়? চিরকাল তো আমরা বেঁচে থাকব না! আমরাও তো একদিন বুড়ো হব, মরব!'

'কিন্তু ওরাও তো আর একলা থাকবে না! আমাদের যে অনেক অনেক ছেলে মেয়ে হবে। নিজেদের জড়িয়েই যাতে ওদের মন ভরে থাকে, সেই শিক্ষাই আমরা ওদের দিয়ে যাব।'

'এটুকু বাড়িতে ধরবে কেন সব?' শুধায় তামা।

'তা কেন? ওই টিলাটাকে কেটে সমান করে আরো ঘর তুলব।' জবাব দেয় আই-ওয়ান্।

'তার চাইতে একটা বড় দেখে বাড়িতে উঠে গেলে খরচ কম হবে।' তামা চিন্তান্বিতভাবে উত্তর দেয়।

না, রাজী নয় আই-ওয়ান্। 'না, না, তামা, এ বাড়ি ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না। যদি কখনও যেতে হয় বুঝব, দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

'তুমি আবার ও সবে বিশ্বাস কর নাকি! আদ্যি কালের বদ্যি বুড়ো কোথাকার!'

হো হো করে প্রাণ খুলে হাসে দুজনে। জামার আস্তিনে চোখের জল মুছে তামা বলেঃ 'দেখ দিকিন্, কি পাগল আমরা। আচ্ছা কি কথা নিয়ে এত কাণ্ডটা হল?'

'আমাদের বাচ্চা হবে—তাই না বলছিলে তুমি। মেয়ে হবে, কেমন!'

'না না কক্খনও নয়, ছেলে হবে।' তাড়াতাড়ি সংশোধন করে তামা।

'না, বেশ সুন্দর ছোট্ট একটি খুকুমণি হবে।' আই-ওয়ান্ বলে।'

'আমার কিন্তু খোকা চাই, বাপু!' তামা বলে দাবীর সুরে।

সব কিছু ভুলে আবার হেসে ওঠে দু'জনে।

বুঙ্জী এখনও ফিরল না। সাংহাইতে কি গোলমাল হয়েছিল বছর খানেক আগে। খবরের কাগজরা বললে, ও কিছু নয়। একদল দলত্যাগী চীনা সৈন্যের সাথে কিছু জাপানী সৈন্যের একটু ঠোকাঠুকি হয়েছে।

এর কিছুদিন পরেই এল মিঃ মুরাকী আর বুঙ্জীর সাংহাই যাওয়ার হুকুম। তখনও কিছু মনে হয়নি। কিন্তু একটা বছর চলে গেল; বুঙ্জীর ছুটি মিলল না। মিঃ মুরাকী বললেন, তা গরমের সময় আসবে। এদিকে বসন্তের মাঝামাঝি আই-ওয়ানের প্রথম ছেলের জন্ম হল।

সৃষ্টির এই বিচিত্র পর্বটার সাথে আই-ওয়ানের পরিচয় ছিল না। এন্লানের মত গাঁয়ের ছেলে হলে অবশ্য কিছু জানতে বাকী থাকত না। কারণ, সেখানকার সাধারণ সমাজে নারী পুরুষের মিলন, সন্তান-জন্ম, সবই খাওয়া-শোওয়ার মত সহজ স্বাভাবিক মানব ধর্ম। সুতরাং শুধু সৃষ্টির ব্যাপারে আব্রু বাহুল্য। কিন্তু আই-ওয়ানদের সেই বিরাট বাড়িটার বিদেশী ব্যবস্থার মধ্যে এ সবই ছিল দৃশ্যান্তরালে!

সুতরাং ওর নিজের সন্তানের জন্ম-লীলা ওর কাছে এক পরম বিস্ময়ের বস্তু হল। ছেলে শক্ত-পোক্ত হবে, শাঁসাল মগজ হবে, দাঁত হবে তার সাদা ঝক্ঝকে আর সোজা, চোখ আর চুল হবে কালো, গায়ের চামড়া হবে মোলায়েম —আকারে খুব বড় হবে না, নইলে প্রসবে অসুবিধা হবে,—কত প্রক্রিয়া তার জন্য তামার! সাবধানে খায়, কত কি করে। ভারী আশ্চর্য লাগে ওর। সেই প্রথম দিন থেকে কোমরে এক পট্টি বেঁধেছে, খাওয়া দাওয়া ফেলেছে বদলে, ছেলের শরীর যাতে ভাল হয় অথচ খুব বাড় না হয়। আশ্চর্য! এত জানে কি করে ও মেয়ে!

একজন ভাল বয়স্কা ধাই রেখে নিল তামা আগে থেকেই। কিন্তু তাই

বলে তার নিজের কাজের চাকা থামল না। নিজের হাতে ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না, বাসন মাজা বাগানের কাজ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সব ঠিক তেমনিই চলল। খাটলে নাকি শরীর ভালো থাকবে। ডাক্তারের কথা হলেই বলেঃ 'নিদানে ডাকলে ডাক্তার ডেকো। তার আগে আমার এই ধাই মা আছে। বেশ চলে যাবে। ভালো করে জিনিষ পত্র, হাত টাত গরম জলে ধুয়ে নিতে শিখিয়ে দিয়েছি।'

প্রতিবাদ করতে যায় আই-ওয়ান্—একেলে মেয়ে, কোথায় ভালো বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করবে, না সেই সেকেলে দাই! দুহাতে মুখ চেপে ধরে তামা। মিনতি করে বলেঃ

'ওগো ডাক্তার ডাকলেই তো বলবে যাও হাসপাতালে—বারো গণ্ডার হাটের মাঝে বাছা আমার কোথায় আর এক ঘরে পড়ে থাকবে। না গো না, সে হবে না! আমাদের দুলাল আসছে, এইখানেই তার নিজের ঘরেই প্রথম পা ফেলবে। আমি নিজের হাতে তার যত্ন করব। কিসে কি হয় সব আমি শিখেছি, আই-ওয়ান্।'

চুপ করে থাকে ও। আই-ওয়ান্‌ও তাই চায়।

আরো বলে তামাঃ 'যখন সময় হবে, বুঝলে, খবরদার এদিকে কিন্তু থাকবে না, একেবারে ত্রিসীমানা ছেড়ে চলে যাবে। আমার সাড়া শব্দ যাতে কানে না যায়। ঝি গিয়ে খবর দিলে তবে আসবে। তার আগে এসেছ তো দেখবে।'

'সে কি?' চীৎকার করে ওঠে আই-ওয়ান্, 'তোমায় ফেলে যাব কি করে?'

থামিয়ে দেয় তামাঃ 'আলবৎ যাবে। আমার কি এগিয়ে দেবে, শুনি? যা করার আমি করব।'

এই জোরের সামনে আই-ওয়ানের বাধা ভেসে যায়।

তারপর প্রথম নিদাঘের এক কোমল প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে দেখে আই-ওয়ান্—কেমন যেন হয়ে গেছে তামা।

'পালাও, পালাও,' বলে ওঠে তামা, 'শিগ্গির যাও এখান থেকে, আমার ব্যথা উঠেছে।'

'কোথায় যাব? কোথায়?' আর্ত স্বর আই-ওয়ানের।

'কেন? কাজ কর্ম নেই?' জবাব দেয় তামা।

কি বলে মেয়েটা! হতভম্ব হয়ে যায় আই-ওয়ান্। তামা বলেঃ

'রোজ কোথায় যাও?'

'কাজ!' অবাক হয়ে যায় আই-ওয়ান!'

হাঁপাতে হাঁপাতে বলে তামাঃ 'নয় তো কি। যাবে বৈকি—যাও কাজে যাও, লক্ষ্মীটি! কি হয়েছে? কিচ্ছু তো হয়নি। কেন ভাবতে পারছ না, কিছু হয়নি তোমার তামার—এতো নেহাৎ স্বাভাবিক ব্যাপার! কতবার আরো হবে তার ঠিক নেই। কাজ কর্ম ছাড়লে চলবে কেন!'

'কাজে হাত উঠবে না আজ।' বলে আই-ওয়ান্।

'উঠবে না কি! ঠিক উঠবে। খেয়ে নিয়ে চলে যাও সোজা।'

নিজের হাতেই রোজকার মত খাবার দিল তামা। নিষেধ শুনল না। সেই কথা—ছেলে শক্ত হবে। মা শক্ত হলে তবে তো ছেলে শক্ত হবে! কোন কথাই শুনবে না জেদী মেয়ে। কি আর করবে আই-ওয়ান। তামার মুখটা

বেশী কালো হয়ে উঠছে। কন্ঠে আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চায়। অতি কষ্টে চেপে রাখছে ও। স্বচ্ছ মসৃণ চামড়ার ওপরে বড় বড় ঘামের বিন্দু ফুটে উঠছে। ছুটে বেরিয়ে যায় আই-ওয়ান্। যেতেই হবে, তামার হুকুম। ও হুকুম অন্যথা করবার ক্ষমতা নেই ওর। তাই হোক, তাই হোক ভুল হয় না, হবে না তামার।

'দুপুরের আগেই ঝি এসে খবর দিয়ে গেল ছেলে হয়েছে। সব ফেলে পড়ি কি মরি করে ছুটল আই-ওয়ান্ উদ্ভ্রান্তের মত। জীবনে কোনদিন বোধ হয় এমন করে ছোটেনি। দু'পাশে রিক্সা-ওয়ালারা চ্যাঁচায়—আসুন বাবু, আসুন। ও তাদের ঠেলে দিয়ে ছোটে—'ওরা যাবেন তাড়াতাড়ি! তোদের চাইতে আমার ঠ্যাঙের জোর বেশী জানিস্।' রিক্সা-ওয়ালারা হো হো করে হাসে, বিদ্রূপ করে।

সহ্য হয় না। দাঁড়িয়ে পড়ে আই-ওয়ান্। চীৎকার করে বলেঃ 'আমার ছেলে হয়েছেরে, হতভাগারা, আমার ছেলে হয়েছে।' তারপর আবার পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে বাড়ির দিকে ছোটে।

শ্রীমতী মুরাকী বেরিয়ে আসেন। কোমল মুখখানা আনন্দে ডগমগ করছে।

'কি সুন্দর জবরদস্ত ছেলে হয়েছে, বাবা। আকিও অমনি হয়েছিল। তা ছাড়া আর একজনও আমার অমন সুন্দর হয়নি।'

পায়ের গতি সংযত করে আনে আই-ওয়ান্। ঐ যাঃ, শাশুড়ীকে নমস্কার করা হয়নি তো! হঠাৎ মনে হয় আজের দিনে মরা-মানুষটার কথা না তুললেই পারতেন। মায়ের কাছে শুনেছে এমন সময় মড়ার কথা বলতে নেই, নবজাতকের নাকি অকল্যাণ হয়।

কিন্তু ছেলের মুখ দেখে সব ভুলে গেল ও। জন্মের পর কদিন পর্যন্ত কেমন বুড়ুটে মুখ থাকে শিশুদের। তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হয় আই-ওয়ানের —এ যেন একেবারে ওর ঠাকুর্দার মুখ—সেই বৃদ্ধ জেনারেল। চোখ কোঁচকান মহামহিমান্বিত এই ক্ষুদে মানুষটির চেহারায় তামার ছিঁটে ফোঁটা সাদৃশ্যও নেই। চৈনিক রক্তেরই জয় হয়েছে।

খোকনের বয়স তিন মাস পুরল। মুখে ভাত দিতে হবে এবার। কোমর বেঁধে লেগে গেছে তামা। বিরাট আয়োজন—তামা আই-ওয়ানকে ব্যাপারটা বোঝায়—পরমান্ন মুখে দিয়ে অন্ন-গ্রহণ সুরু করবেন খোকন মণি। একেই বলে অন্ন-প্রাশন। আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। খবর এল বুঞ্জীও আসছে।

বুঞ্জীর এই ঘরে ফেরা নিয়ে একটা অজানা ভবিতব্যের সূচনা হল। আনন্দের মধ্যে তা তখন বোঝা যায়নি। কিন্তু ক'বছর পরই আই-ওয়ান্ বুঝেছিল। তামার আনন্দ ধরে না, ঠিক অন্ন-প্রাশনের দিনেই দাদা আসছে। কি মজা! ছেলেটার পয় আছে। আই-ওয়ানও উল্লসিত—কতদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। ওর ছেলে দেখবে বুঞ্জী।

মিঃ মুরাকীর সাথে জাহাজ-ঘাটায় গেল আই-ওয়ান। জাহাজ লাগল

এসে। সাংহাই-ফেরা সৈন্যের দল কাঠের তক্তাটা পড়তে না পড়তেই বন্যার মত নামতে লাগল। বুঞ্জী সকলের পেছনে।

ওদের দেখতে পায়নি বুঞ্জী। নেমে এসে থমকে দাঁড়াল একবার। উদ্ভ্রান্তের মত তাকাতে লাগল চারদিকে। চীৎকার করে ডাকল আই-ওয়ান, কিন্তু ও শুনতে পেল না। ধীরে ধীরে দলের সাথে সাথে চলতে লাগল। আই-ওয়ান্ দৌড়ে এসে ওর কাঁধ ধরে চেঁচিয়ে উঠল ঃ

'এই কোথায় যাচ্ছ! আমরা যে সবাই তোমায় নিতে এলাম।' চমকে তাকাল বুঞ্জী। এ কি? এ কেমন হয়ে গেছে বুঞ্জী? আই-ওয়ান্ অবাক হয়ে গেল। হবেই বা না কেন, এত বছরের জঙ্গীপনা। অবশ্যি বাঁকা পায়ে পট্টি-আঁটা সামরিক পোষাকে এই প্রথম দেখল ও বুঞ্জীকে। কিন্তু নূতন বেশেই নূতন লাগছে না মানুষটাকে। আগা-গোড়া চেহারাটাই বদলে গেছে। সেই কচি কচি কোমল শান্ত ভাবটা কোথায় উবে গেছে। তার জায়গায় এসেছে অতি কুৎসিত রুক্ষতা আর রূঢ়তা। মুখে সর্বক্ষণ বিশ্রী, প্রায় অশ্লীল হাসি; অদ্ভুত এক বর্বরতায় ঠোঁট দুটো কুঞ্চিৎ।

পুরানো বন্ধুকে দেখে বুঞ্জী হেসে উঠল। সেই আগের দিনের প্রাণ-খোলা হাসির মতই অনেকটা।

'তোমার বাবাও এসেছেন। অপেক্ষা করছেন', আই-ওয়ান্ বলে; 'আর আমার ওখানে আসছ আজ, বুঝেছ? খোকনের অন্ন-প্রাশন।'

'আরে, তাই নাকি?' এগুতে এগুতে বলে, 'কিন্তু রোসো, নেয়ে ধুয়ে ধরা চুড়ো পাল্টেনি। সেই বাড়ি থেকে যাবার পর একদিনও ভাল করে নাওয়া জোটেনি।'

এতদিন পরে হারা-ধন ফিরে পাওয়া। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ছেলের দিকে মিঃ মুরাকী। কিন্তু স্থির শান্ত মূর্তি— কোন চঞ্চলতা, উচ্ছ্বাস, খুশির একটি রেখাও কোথাও নেই। শুধু বললেন ঃ 'আছেরে, সব ঠিক আছে। চল এখন তাড়াতাড়ি।'

সকলে গিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসল।

'তারপর!' বুঞ্জী বলে, 'তোদের একটা ছেলে অবধি হয়ে গেল, য়্যাঁ?'

আই-ওয়ান্ জবাব দেয় ঃ 'ঠিক আমার ঠাকুর্দার চেহারা, বুঝলে! একেবারে হুবহু; দেখলে হাসি পাবে তোমার। এখন আবার ততটা লাগে না। প্রথম দিন তো মনে হল, চীনে জেনারেলের পোষাকটি পরিয়ে, বুকে একটি মেডেল ঝুলিয়ে দিলেই বাস্—।'

মিঃ মুরাকীর মুখে মৃদু হাসি খেলে যায়। আর বুঞ্জী হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে তীক্ষ্ন স্বরে বলে ঃ 'কিন্তু, জাপানী জেনারেলের পোষাকই একদিন বেশী মানাবে, হে!'

উত্তর দেয় না আই-ওয়ান্। বুঞ্জীর দিকে চায়—বুঝতে পারে না ক্ষ্যাপাবার জন্যই বলল, না সত্যি সত্যি। ক্ষ্যাপাবার জন্যই হবে।

ঠিক তেমনিই আছে বুঞ্জী; কিন্তু তবু যেন তা নেই। কোথায় যেন একেবারে ওলট পালট হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি করেই কথা বলে, চলে, ফেরে, হাসে। মনে হয়, এ শুধু বাইরের। আগেকার বুঞ্জী ভেতরে বাইরে ছিল

এক। এখন কথা বলার সময় ওর বাইরেটাই যেন বলে। মনটা কোন ভাবনায় কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। ওর হাসির তলায় যেন বড় অন্ধকার।

কিন্তু এখন এসব চর্চার সময় নয়। মিঃ মুরাকীর বাড়িতে ওদের পেঁাছে দিয়ে চলে এল আই-ওয়ান্। আসার সময় জিজ্ঞাসা করল ঃ

'ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আসছ তো ?'

'দুটোর সময়।' জবাব দিলেন মিঃ মুরাকী।

কিন্তু বুঞ্জী কিছু বলল না। কি এক ভাবনায় ডুবে আছে ও।

হোটেলের ঘরখানা নিমন্ত্রিত অতিথিতে ভরে গেছে। খাওয়া দাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আই-ওয়ানের পাশেই বসেছে বুঞ্জী; কিন্তু কথা বার্তা বলেনি বড় একটা। মুখে-ভাত দেওয়া ও অন্যান্য ক্রিয়া কলাপ যথারীতি হয়ে গেছে। ছেলে দেখে সকলেই খুব খুশী। মুখে পায়স দিলে সে কি কান্ড! নতুন জিনিস, দাঁত চেপে রইল, কিছুতে গিলবে না। তারপর থু থু করে সিল্কের জামাটার ওপর ছিটিয়ে ফেলে দিল; আর চীৎকার করে সে কি কান্না। হেসে অস্থির সবাই। আজই প্রথম ওকে ছেলের পোষাক পরান হয়েছে। নতুন করে মাথা কামান হয়েছে—তালুটা গোল করে চাঁছা আর চার দিকে কোমল কালো রেশমী চুলের ঝালর। খোকাকে নিরীক্ষণ করে দেখে দেখে আই-ওয়ানের দিকে তাকিয়ে বুঞ্জী বলে ঃ

'ছেলেটাকে জাপানী বলে তো মনেই হয় না হে!'

'জাপানী হলে তো মনে হবে।' উত্তর করে আই-ওয়ান্।

এতক্ষণে নজর পড়ে আই-ওয়ানের—বুঞ্জী ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জিঘাংসায়, ঘৃণায় ওর চোখে আগুন ঠিকরে পড়ছে। ও তো দৃষ্টি নয়—উদ্যত ছুরির ফলা। ও তাকান নয় দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করা, দহন করা। আই-ওয়ান্ স্তম্ভিত হয়ে গেল। উৎসব-মুখর মানুষের কলরব গুঞ্জিত এই কক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও কিছু বলতে পারলে না—। অন্য দিকে তাকিয়ে শুধু সরে গেল। ভাবতে চেষ্টা করল কেন বুঞ্জীর এই ভাবান্তর।

সাংহাইতে ওর বাবার সঙ্গে কিছু হয়েছে কি বুঞ্জীর? যতদূর জানে দেখাই হয়নি দু'জনের। বুঞ্জীর রেজীমেন্টের নাম ঠিকানা সব বাবাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ও। কিন্তু বাবা লিখেছিলেন জাপানীদের সাথে দেখা সাক্ষাতে বর্তমানে বিপদ আছে। একজন জাপানী সেনাধ্যক্ষের সাথে দহরম-মহরমের অপরাধে কে এক জন ব্যাংকার নাকি গুপ্ত দলের হাতে খুন হয়েছে। কিন্তু মিঃ মুরাকীকে তিনি অত্যন্ত বিনয় সহকারে লিখেছিলেন অসুস্থতা নিবন্ধন বুঞ্জীর সাথে গিয়ে দেখা করতে পারেননি। আই-ওয়ানের জন্য যা করেছেন মিঃ মুরাকী তার তুলনা নেই। কিন্তু সামান্য কর্তব্যটুকুও না করতে পারার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত তিনি। যাই হোক তিনি আশা করেন, মিঃ মুরাকী ভুল বুঝবেন না, এবং ভবিষ্যতে...ইত্যাদি। মিঃ মুরাকী লিখলেন ভুল বোঝার অবকাশ নেই—নাতি রূপ মিলন-সূত্রে বাঁধা পড়িনু দোহে।

তামা বড় বড় চোখে তাকিয়ে শুধিয়েছিল ঃ 'তোমার বাবা বুঞ্জীকে পছন্দ করেন না কেন বলতো ?'

ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে জবাব দিয়েছিল আই-ওয়ান্ ঃ
'বাবা ওকে দেখলেনই না মোটে—অপ্রছন্দের কথা উঠল কি করে বলতো ?'
ছেলেকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে চিন্তিতভাবে জবাব দিয়েছিল তামা ঃ 'কি জানি,. জানিনে বাপু।'
তামা আর কিছু বলার আগেই, 'আমিও জানিনে' বলে পাশে বসে পড়ে দুই হাতে মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছিল আই-ওয়ান্। কানে কানে বলেছিল ঃ
'সুখে আমার বুকটাকে কানায় কানায় ভরে দিয়েছ, তামা।' তামাও স্বামীর হাতখানা তুলে নিয়ে তার ওপরে গাল রেখে সুখে স্তব্ধ হয়ে ছিল।
আজ বুঞ্জীর সাথে কোন কথা হল না। শোভনও নয়। পরে বলবে—জানতে হবে ওর মনের কথা। এ উৎসবের হোতা আজ ও—সে কর্তব্য ওকে পূর্ণভাবে পালন করতে হবে।
সকলের হাসি, খুশী সৌজন্যে, উৎসব সর্বাঙ্গ সুন্দর হল। তামা অতিথিদের খাওয়াচ্ছে; ভারী ব্যস্ত ও। কে কি খেল না খেল, প্রত্যেকের ওপর ওর সযত্ন দৃষ্টি। ঝির পিঠে ঝোলায় খোকা ঘুমুচ্ছে।
বুঞ্জী বলে আই-ওয়ানকে ঃ 'ভাগ্নে আমার জাপানী কায়দায় ঘুমুচ্ছে।'
'তার মানে ?' চমকে উঠে আই-ওয়ান্ শুধায়।
বুঞ্জী খোকার এলিয়ে-পড়া মাথাটার দিকে দেখিয়ে মাথা নাড়ে ঃ
'আমরা জাপানীরা যেখানে সেখানে ঘুমুতে পারি কিনা! আমাদের ও ভাবেই জীবন শুরু। হৈ হল্লা, চলতি ফিরতি সব অবস্থার মধ্যে আমরা ঘুমুতে পারি; এমন কি কামান দাগতে দাগতেও ফাঁক করে ঘুমিয়ে নি। আমরা ঘুমের রাজা। তাই সহজে লড়াইয়ে কাবু হই না।'
পুত্রের শান্ত নিষ্কলুষ মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে আই-ওয়ান্। চোখ দুটি বোজা, টুক টুকে গোলাপী ফোলান দুটি ঠোঁট। হাসতে হাসতে বলে ঃ 'দেখতো হে, জঙ্গী চেহারা তো মনে হচ্ছে না!'
জবাব দেয় না বুঞ্জী। ধীরে ধীরে পান পাত্রে চুমুক দিয়ে চলে। হঠাৎ বড় একা মনে হয় আই-ওয়ানের। মনে হয়—আজই প্রথম মনে হয়, ও যেন বহু দূরে পথের প্রান্তে ছিট্কে পড়ে গেছে; ও সবার থেকে আলাদা, সবার থেকে দূরে। নিজের ছেলের থেকেও আলাদা, ছেলের কাছেও দূরের মানুষ। বাইরের মানুষ।
জিজ্ঞাসা করি করি করেও হয়ে উঠ্ছে না। প্রথমতঃ—ও না হয় বলল বুঞ্জীকে তুমি বদলে গেছ ভাই। কিন্তু বুঞ্জী কি জানে তার পরিবর্তনের কথা! দ্বিতীয়তঃ আফিসে দু'জনের স্থান নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পুরানো সম্পর্ক ঝালিয়েও তোলা যায় না। অবশ্যি মিঃ মুরাকীর সুবিধার জন্য ও ওর বর্তমান পদ ত্যাগ করেছে। পদত্যাগ পত্র মঞ্জুরও হয়েছে। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেও ব্যথা বেজেছিল। মিঃ মুরাকী ছেলেকেই প্রথম স্থানে বসিয়েছেন—ওকে দিয়েছেন দ্বিতীয়টি, বেতনের তফাৎ তেমন হয়নি। সে দিক দিয়ে আই-ওয়ানের বলার কিছু নেই। আই-ওয়ানের মাইনে কমেনি। খালি বুঞ্জীর মাইনে একটু বেড়েছে।
বাড়ি গিয়ে আরও আঘাত পেল আই-ওয়ান্—যখন তামা অবধি এই ব্যবস্থাকে, নিতান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে গ্রহণ করল। বলেই

ফেলল : 'বাবার মত এমন মানুষ সত্যি দেখা যায় না। বুজী ফিরে এল তবু আমাদের মাইনে কমাননি।'

এখন বুজীর নীচে কাজ করতে হবে ওকে। পদে পদে ওর হুকুম নিতে হবে। কেরাণীরা এখন আর ওর কাছে আসবে না, যাবে বুজীর কাছে। অসম্ভব! কিছুতেই পারবে না আই-ওয়ান। কিন্তু তামাকে বোঝাবে কি করে এ-কথা? সব থেকে ভাবনার কথা হল বুজীর পরিবর্তন। আগে সে ছিল আলা-ভোলা নিতান্ত সহজ মানুষ। সহজেই খুশী করা যেত। কিন্তু এখন সে ভারী হুঁশিয়ার। আই-ওয়ানের খুঁটিনাটি অবধি হিসেব করে যাচাই করে নেয়। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে সস্তা দামের কিছু বাসন চালান যাচ্ছিল, তার বাঁধা-ছাঁদা নিজে গিয়ে দেখেনি বলে আই-ওয়ানকে একদিন বকে পর্যন্ত দিল। একটু হাসল আই-ওয়ান। না বলে থাকতে পারল না—'এর থেকে অনেক খারাপ কাজ করতে তুমি। কম নালিশ করেনি আকিও।'

'মিলিটারীতে গিয়ে মানুষ হয়েছি।' পাল্টা জবাব দিয়েই অফিসে গিয়ে ঢোকে বুজী। ওর নিজস্ব অফিস—একা নিজস্ব ঘর চেয়েছিল বুজী। তাই আই-ওয়ানকে তার ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্য ঘরে কেরাণীদের মধ্যে জায়গা করে নিতে হয়েছে।

বুজীর পরিবর্তন পদে পদে জানান দিয়ে যায়। ব্যথা পায় আই-ওয়ান্। তামা আর ছোট্ট খোকনই ওর একমাত্র আশ্রয়। তাই যতদিন যায় ততই ও ঘর-মুখো হয়ে উঠছে। অফিসের ছুটি হলেই ও ব্যাকুল হয়ে বাড়ির দিকে ছোটে। সেখানে তামা আছে, খোকনও আছে; আর আছে স্বামী-পুত্র ঘিরে তামার কর্ম-ব্যস্ততা—তামার যত্ন আদর। ঐখানেই ওর শান্তি। আশ্চর্য বাস্তবানুভূতি তামার। ঐ বিষয়ে ও প্রতিভা। ভাবালুতাহীন অথচ গভীর অন্তরঙ্গতায় স্নিগ্ধ ওর ব্যবহার; সময় ও অবস্থা বুঝে কথা বলার আশ্চর্য ক্ষমতা। আই-ওয়ানের সামান্যতম প্রয়োজনেও তামা একেবারে হাতের কাছে প্রস্তুত। শক্তি পায় আই-ওয়ান। পায় ভরসা, পায় আশ্বাস—অনুভব করে ওর মূল দৃঢ় ভূমিতে প্রোথিত। তাই তো প্রতিদিন সকালে উঠে ও কাজে যেতে পারে। মানুষের সাথে জীবনের সাথে যোগ-সূত্র ওর তামাই। তামার যারা স্বজন, তারা ওরই আপন—তামা যে ওর, ওর একান্ত আপনার। যা কিছু তামার, সবই ওর। কাজের শেষে যখন ঘরে ফেরে আই-ওয়ান, দুজনে এক সঙ্গে এসে বসে। সারা দিনের ছোট বড় ঘটনা খুঁটিনাটি উচ্ছ্বসিত হয়ে গল্প করে তামা। ওই গল্পের মধ্যে দিয়েই মানুষের সমাজের সাথে ওর একাত্মতা—নইলে ক'জনকেই বা ও চেনে।

তারপর আছে খোকন। বড় হয়ে উঠছে সে। তারই বা কত কথা। নাম হয়েছে তার জোজীরো। ওরা ডাকে জীরো বলে। নিজের নামটা সে এরই মধ্যে বেশ বোঝে। তামা নালিশ করে—দস্যি ছেলে এরই মধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছেন। এই তো সবে ক'মাস বয়স। অর্থাৎ এক বছর হতে না হতেই তিনি হাঁটবেন। তখন আর বাবুকে সামলাবে কে? সারাদিন লেগে থাক পেছনে। আর বাবাঃ যা রাগ। পান থেকে চুন খসলেই হলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন।

'তা হবে না? চীনে রক্ত যে দেহে। তাই নারে জীরো!' বাপ বলে।

ছেলে সোজা হয়ে মাদুরে বসে কাগজের মণ্ডের কুকুরটার মাথা চিবুয়। এই কুকুর নাকি শিশুর স্বপ্ন রাজ্যের প্রহরী।

'নইলে আর অমন হবে কেন?' রেগে কুকুরটা কেড়ে নেয় তামা। বলে, 'জাপানী ছেলেরা অমন করে কুকুরের মাথা খায় না।' চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে তামার। জীরোও প্রাণপণে চীৎকার করে চলে।

বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, একটুও একা লাগে না আই-ওয়ানের। বাইরেও যে মানুষের ব্যবহার বদলেছে তা নয়। আগের মতই ভদ্র সব। সিগারেট কিনতে বা জীরোর জন্য খেলনা কিনতে দোকানে গেলে এখনও দোকানীর তরফ থেকে তেমনি সাগ্রহ ব্যবহার পায়। কিন্তু তবু ওর কেন মনে হয় এ ভদ্রতার মধ্যেও কি জানি একটা কিসের অভাব আছে। তা ছাড়া ভদ্রতাই কি সব? মানুষে মানুষে সম্পর্কের পরিচয় কি ওই ভদ্রতায়? ও তো শুধু অতিথিদের প্রাপ্য। মিঃ মুরাকীও কেমন যেন দূরে সরে গেছেন। বুঝতে পারে না ঠিক। একদিন তামাকে বলেছিল কথাটা। ও চটেই উঠল, জোর গলায় বলল:

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। যত সব উদ্ভট কল্পনা রাত্তির দিন। বাবা বুড়ো হয়েছেন দেখতে পাও না? বুড়ো হলে অমন হয়েই থাকে মানুষ। আমাকেও তো ভুলে যান কত সময়।'

হবেও বা। মেনে নেয় আই-ওয়ান। কিন্তু যতই দিন যায়—ততই ওর মন বলে——না না—কোথায় যেন কল বিগড়েছে। নিজের মনকে যাচাই করে—চলে সূক্ষ্ম নিরীক্ষা আর সমীক্ষা। বুঞ্জী—বুঞ্জীই মূল। বলবে ওকে খুলে। নইলে এর প্রতীকার নেই। বলতেই হবে। ওর যে বড় দরকার—যারা ওকে ভালোবাসে, এখনও পর্যন্ত যারা ওর বিশ্বস্ত বন্ধু—তারা যে ওর পাশে আছে, এটুকু নিশ্চয় করে যাচাই করতে হবে। আজ ভাবে, মুরাকী-পরিবারের গণ্ডী ছেড়ে ও কেন বেরুল না। যদি দু'দশ জন আরো লোকের সাথে আলাপ-পরিচয় থাকত, ভালো হত। কিন্তু নেই— দু চার জন ছাড়া, এক জনের সাথেও আলাপ নেই। সেও সামান্য আলাপ—চায়ের দোকানে বা থিয়েটারে দেখা হয়ে গেলে সামান্য দু'একটা কথার বিনিময় শুধু। এদের কাছেও এখন পরিচয় মিঃ মুরাকীর জামাই বলে। তারপর উনি মারা গেলে হবে বুঞ্জী মুরাকীর শালা বলে। তাও যদি আগের সেই বুঞ্জী থাকত—। অসহ্য!

দু'হাতে সব মনের এক প্রান্তে সরিয়ে রেখে কাজের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দেয় আই-ওয়ান। দুনিয়ার যা অবস্থা তাতে কোথাও কিছু করা হয় তো সম্ভব হবে না। তবু যা হোক এখানে ঠাঁই মিলেছে, বুঞ্জীর সাথে মানিয়ে চলতেই হবে। চলছেও। চলতে শিখেছে।

মিলিটারীতে যাবার আগে বুঞ্জীর এক পেয়ালা মদ খেলেই মাথা ঘুরত, ঘুম পেত। এখন সে পেয়ালা পেয়ালা দিব্যি খায়। এবং খেতে ভালোবাসে। দুপুরবেলা খাবার পর মুখ লাল করে অফিসে আসা, কর্মচারীদের সাথে চেঁচামেচি করা, চেঁচিয়ে হাসা—এ একাধিক বার ঘটেছে। এবং একদিন এসে ওই অবস্থায় ঢুকল আই-ওয়ানের ঘরে। ঢুকেই চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'হুঁ, এই যে দেখছি—এখানেই আছ। বেশ জবুথবুটি হয়ে, বুড়োর মত

কাজ করছ! তামা করেছে কি তোমায় বল তো? তা একদিন ছিলে ইয়ার বন্ধু আজ হচ্ছ তামার স্বামী—বেড়ে!'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসতে লাগল বুঞ্জী। কেরাণী দুজন তাদের কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যেন কিছুই দেখেওনি, শোনেওনি।

আই-ওয়ান্ ডেস্ক থেকে মাথা তুলে হেসে বলেঃ 'জীরোর বাপও।'

'তা, দুদিন আগে হোক আর পরে হোক, সবাই কারো না কারো বাপ, কিন্তু, আমি বলছি কাজ থামাও আই-ওয়ান!' শ্লেষপূর্ণ জবাব ছুঁড়ে মারে বুঞ্জী।

'তারপর? কি করতে হবে শুনি?'

বুঞ্জী উত্তর দিলঃ 'আমার সঙ্গে কাফেতে যাবে।'

তারপর কেরাণী দুজনের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'তোমরাও ছুটি নিতে পারো।' তারা উঠে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইল। আই-ওয়ান কিছু বলল না। ও জানে বুঞ্জী চলে গেলেই আবার সবাই কাজে বসবে—এবং একেবারে সেই নিয়ম-মাফিক পাঁচটা পর্যন্ত। কিন্তু থাক, যাওয়াই যাক—একটা বোঝা-বুঝির সুযোগ হয় তো আজ পাওয়া যাবে। অতএব উঠে টুপীটা মাথায় পরে নিয়ে কেরাণীদের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে 'আমি আসছি' বলে বেরিয়ে গেল। সবাই বুঝল, মালিকের ছেলের খোসামুদী আর কি!

হেমন্ত কাল। ফিরী-ওয়ালারা রকমারী চন্দ্রমল্লিকার টব নিয়ে ফিরী করছে। হঠাৎ আই-ওয়ান্ দেখতে পেল একজন ফিরীওয়ালার কাছে একটা চন্দ্রমল্লিকা—লালে সোনালীতে পাপড়ি। ভারী ভালোবাসে তামা। লোকটাকে ডেকে বললঃ

'শহরের পশ্চিম দিকে যে পাহাড় আছে তার গা দিয়ে একটা রাস্তা গেছে। চেন?'

বেশ জোরের সাথে সম্মতি-সূচক মাথা নাড়ে ফিরীওয়ালা।

আই-ওয়ান্ বলেঃ 'তা হলে সোজা চলে যাও। কিছুদূর গেলেই দেখবে সবুজ টালির ছাদ-ওলা ছোট্ট একটা বাড়ি। দুদিকে পাইন গাছ। সমুদ্রের দিকে মুখ করা বাড়িটা। গিয়ে গিন্নী-মাকে বলো যে কর্তা পাঠিয়েছেন।'

'তা গিন্নীমা বুঝবেন কি করে যে আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।' লোকটার কথায় ধূর্ততার সুর।

'কেন? আমায় দেখে নাও ভালো করে।' আই-ওয়ান বলে, 'তাই দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবে। তাতেও যদি না হয় বলবে, এক চীনা ভদ্রলোক তোমায় পাঠিয়েছেন।'

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল। 'আপনি চীনা? কিন্তু কই, আমাদের মতই তো দেখতে। চীনা মানুষ আমি আর দেখিনি। কিন্তু ওদের কথা শুনেছি। কেই বা না শুনেছে!'

আই-ওয়ান তাড়াতাড়ি ওকে বিদায় দিয়ে বুঞ্জীর সঙ্গে এগোয়।

'মগা-পনা টনা ছুটে তামারাণী নিশ্চয়ই এখন পুরোদস্তুর পতিব্রতা সাধ্বী রমণী বনে গেছে, না হে আই-ওয়ান্!' আধা-শ্লেষের সুরে বুঞ্জী বলে, 'তা পতিব্রতা জাপানী বউ তোমার ফুল ঠিক কিনবে দেখো।'

'দামে না বনলে মোটেই কিনবে না।' আই-ওয়ান্ বলে ভাবল, বুঞ্জী

নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, হয়তো ওর কথা শুনলই না। কিন্তু বিশ্রী শ্লেষ-বিকৃত স্বরে বুঞ্জী চীৎকার করে উঠল মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতেঃ

'যত সব! তোমাদের এই চীনে জাতটা......পাজীর হদ্দ......'

একটা ছোট্ট কাফে। বাইরে কয়েকটা টেবিল চেয়ার পাতা। থপ করে বসে পড়েই ঠাস্ ঠাস্ করে টেবিল চাপড়াতে শুরু করল বুঞ্জী। ধাতুর টেবিল ঝন্ ঝন্ করে উঠল। একটি রোগা ফ্যাকাশে-মুখ মেয়ে ছুটে এল।

'বীয়ার!' ষাঁড়ের মত গর্জন করে উঠল বুঞ্জীঃ 'তুমি খাও তো বীয়ার?' আই-ওয়ানকে জিজ্ঞাসা করল।

'খাই বৈকি।' জবাব দিল আই-ওয়ান্।

'একটা বীয়ার, আর আমার জন্য হুইস্কী।' মেয়েটিকে হুকুম দিল চীৎকার করে।

'তাহলে—' আস্তে আস্তে মেয়েটি কি যেন জিজ্ঞাসা করতে যায়।

'জলদি লাও।'

চলে যায় মেয়েটি।

'এই ইংরেজগুলোকে দেখতে পারি না দুচোখে। সে-জন্যই ওদের হুইস্কী খাই।' ব্যাখ্যা করে বুঞ্জী।

'তুমি তো আগে এত মদ খেতে না!' আই-ওয়ান জিজ্ঞাসা করে।

'হুঁ!' বুঞ্জীর কথায় ব্যঙ্গ। 'দিব্যি ভালো ছেলেটি ছিলাম, তাই না? এখন আরো ভালো হয়েছি। এখন মদ খেতে শিখেছি, আরো কত কি শিখেছি।'

ঢল্তী সূর্যের আলো-মাখা রাস্তা। ছোট্ট গলি একটা; ওধারে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে স্নান করাতে করাতে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটি মেয়ে।

'তোমার কথা শুনছে, দেখছ? ভেতরে চল।' আই-ওয়ান বলে।

চেঁচিয়ে ওঠে বুঞ্জীঃ 'মেয়েমানুষগুলো আস্ত গবেট।' বোকার মত হাসতে থাকে ও। উঠতে গিয়ে টলে পড়ে। ধরে ফেলে আই-ওয়ান্। ভেতরে গিয়ে একটা কোণ বেছে নিয়ে বসে দুজনে। মেয়েটি বোতল, গেলাস নিয়ে এলে আই-ওয়ান্ দাম চুকিয়ে দেয়; মেয়েটির হাতেও কিছু বকশিশ গুঁজে দেয়।

দেখে বুঞ্জী বলেঃ 'যাও চাঁদ, কষে কলের গান শোনোগে, ফুর্তি ওড়াওগে। ফুরিয়ে গেলে এসো, হাম দে দেগা।'

হট্টগোলে আই-ওয়ানই কেবল শুনল ওর কথা। আস্তে আস্তে বীয়ারে চুমুক দেয় আই-ওয়ান্। বুঞ্জী ঢক্ ঢক্ করে গ্লাসের পর গ্লাস গিলে যায়।

'বিয়ে করছি—'ঘোষণা করে ও।

'তাই নাকি? ঠিক হয়ে গেছে?' অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্ঃ

'হুঁ। বিয়ে। বিয়েই ভালো। বেচারা আকিও।' দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে বুঞ্জীর। মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে চলেঃ 'জানতে পেল না বেচারা, সব মেয়েরা ওই এক ধারা।'

আই-ওয়ান্ জবাব দেয় না। একটা বিষম খেয়ে বুঞ্জী আবার বলেঃ

'মেয়েমানুষদের সম্বন্ধে—।' আই-ওয়ান্ বলে।

'ও জানতে টানতে হয় না।' বুজী বলে, 'আমি বলছি শুনছ না?'

চুপ করে থাকে আই-ওয়ান্। মাতালের সাথে তর্ক করা বৃথা।

'অতএব, আমার বিবাহে তোমার নিমন্ত্রণ, বুঝিলে? কনে? নেহি জানতা হ্যায়। নেহি জাননে মাংতা। বাবাকে বলে দিয়েছি কাল। বিয়ের বয়েস হয়েছে। লাও কনে। বাস্। বলে দিয়েছি। বাবা বললেন: 'কোন কনে?'

আমি বলেছি, 'কনে কনে। কোন টোন নেই। বরাবর হ্যায়।'

গ্লাস ভরে হুইস্কী ঢালতে ঢালতে আই-ওয়ানের দিকে তাকায় বুজী। খানিক খায়, খানিক গড়িয়ে পড়ে। অন্য দিকে তাকিয়ে আছে আই-ওয়ান্। রাস্তায় ঘাটে কত মাতাল দেখছে হামেশা; দিনের শেষে হল্লা করতে করতে বাড়ি ফেরে তারা। দিনের অর্ধেক উপার্জন মদ হয়ে জ্বলতে থাকে শূন্য পাকস্থলীতে আর মগজের মধ্যে। রেস্তরাঁয় কাফেতে, ছেলে বুড়ো, সবার ওই এক দশা। এ দৃশ্য ওর নিজের দেশে বিরল। সেখানে লোকেরা খাবার সাথে একটু আধটু মদ খায়। কিন্তু মাতাল হয় না কখনও। অবশ্যি নেশা যে কেউ না করে তা নয়। এক এক জন খুব টানে হয় তো এদের চাইতেও বেশী। কিন্তু তারা এমন মাতলামী করে না। স্বভাবেই হয় তো চীনেরা শান্ত। এখানে এসে মাতলামী দেখে দেখে এখন ওর অভ্যেস হয়ে গেছে।

অবাক হয়ে তাকায় আই-ওয়ান্। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বুজী সোজা হয়ে বসে। মুখটা কান্নায় বিকৃত হয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে। দুগাল বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে ও:

'সত্যি বলছি ভাই, আমি চাইনি। বলবি তো, কেন করেছি তাহলে?'

করুণ একটা আর্তি ফুটে ওঠে ওর স্বরে। আই-ওয়ান্ হতবাক্, হত-বুদ্ধি। এই এক মুহূর্ত আগে এই লোকটাই মাতলামী করে চ্যাঁচাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করে: 'তার মানে?'

সামনের দিকে ঝুঁকে, হাতে মাথা গুঁজে বুজী বলে: ওরা সবাই করত যে! আমাদের রেজীমেন্টের সব্বাই, বুঝলে না! এক ক্যাপটেন ছাড়া। আমি ছিলুম লেফ্‌টেনান্ট। ব্যাটার ওপর চোখ রেখেছিলাম বুঝলে! বলেছিলাম—' হাতড়ে হাতড়ে গ্লাসটা তুলে আরও খানিকটা মদ ঢেলে দিল গলায়। কাশতে কাশতে অস্থির হয়ে মাথা ঝাঁকাতে আর কাঁপতে লাগল। খুব নীচু গলায় বলল:

'আচ্ছা, আই-ওয়ান্, অনেকটা মদ খেয়ে ফেলেছি?'

'অনেক, বলতে অনেক!' গম্ভীর স্বরে জবাব দেয় আই-ওয়ান্।

'দুয়ো দুয়ো!' জয়ের উচ্ছ্বাসে চীৎকার করে ওঠে ও, 'পাল্লে না। আমার মাপ ঠিক আছে। যখন দেখব টেবিলটা শূন্যে উঠে ঘুরছে—তখন বুঝব, বাস্ হয়েছে। কিন্তু আজ তো সব গ্যাঁট হয়ে যে যার ঠাঁইয়ে দাঁড়িয়ে আছে হে। এখনই থামব কি?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা মদ গিলে হঠাৎ বলে উঠল: 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম না?'

মনে করিয়ে দেয় আই-ওয়ান্ ঃ 'বলছিলে, ক্যাপটেনের ওপর চোখ রাখছ।'

'হু।' ওর মোটা ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে অনবরত। বাঁ চোখটা কেমন কুঁচকে কুঁচকে ওঠে। বলে যায় ঃ

'ও ব্যাটারা কি আমার সমান! আমি পয়সাওলা বাপের ব্যাটা—শুধু পয়সা-ওলা নয়, মুরুব্বী বাপ। আর জেনারেল সেকী হেন লোকের দোস্ত। তার দৌলতেই লেফটেনেন্ট হয়েছি। বল তো, আমি কি একটা হেজী পেঁজী সেপাই ?'

কি যেন বলতে চায় বুজী কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না আই-ওয়ান্। তবু বলে ঃ

'নিশ্চয় !'

'ওই ছোটলোক ব্যাটারা যত সব বদমাইসী করতে লাগল। আমি বললাম —ওরা করছে বলেই আমি করব ? ওরা ছোটলোক—ছোটলোকের চরিত্তির। যদ্দিন কাপ্তেন ব্যাটা কিছু করেনি আমিও ভদ্রলোক হয়ে ছিলাম, বুঝলে ?'

আই-ওয়ান্ অধৈর্য হয়ে বলে ঃ 'আরে কি করোনি তাই খোলসা করে বল না হে, কিছুই তো ঠাহর হচ্ছে না !'

'কি বললাম তাহলে এতক্ষণ ? স্টুপিড্ ! চীনা ভূত তো, আর কত হবে ! চীনে ব্যাটাদের মগজ নয় তো গোবর।'

রক্ত গরম হয়ে ওঠে আই-ওয়ানের, কিন্তু সামলে নেয়। মাতালের কথা।

'শুধু কি বোকা। ভীরু ভীরু, ভীরুর হদ্দ। সাঁ করে খেদিয়ে নিয়ে গেলাম। স্রেফ খেলা। টাকা ছড়ালাম—যাঃ ব্যাটারা, টাকা নিয়ে ভেগে যা। কতক গেল। বাকীদের খেদালাম—সে কি চোঁচা দৌড়, যদি দেখতে !' হোঃ হোঃ করে হাসে বুজী। তখনও চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আর অনবরত মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছে। গ্লাসে হুইস্কী ঢালতে যায়—কোথায় গ্লাস ? হাতড়ায়। আই-ওয়ান্ সাহায্য করে না, চুপ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

'হেঁ হেঁ বাবা, গেলাস নেই, তো মুখটা যাবে কোথায় ?' বলেই উঠে দাঁড়িয়ে গোটা বোতলটা গলায় ঢেলে দিল। তারপর আবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল।

'সব ওই কাপ্তেন ব্যাটার দোষ, বুঝলে ! রাত দিন দেখতাম, কি করত আমাদের সেপাইগুলো—ওঃ। জান আই-ওয়ান—' আই-ওয়ানের দিকে ঝুঁকে আসে ও : কান্নায় দেহটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে চায় ঃ 'ওঃ এই যুদ্ধ। মানুষকে স্রেফ শেষ করে দেয় ভাই—নেশায় বুঁদ করে রাখে। কড়া নেশা— কড়া মদ, এত এত খাবার, গুচ্ছের মেয়েমানুষ সব এই এত এত। কেন জান ? নেশা না হলে মানুষ ভুলবে কি করে যে সে মানুষ ! সমস্তক্ষণ কামান বন্দুকের শব্দ মগজের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে, ভুলতে হবে তো ? তারপর সবার বড় জান। সেই জানের দাম কি ? বলা নেই, কওয়া নেই, নোটিস না দিয়ে হুট করে পটল তুলবে কখন তার ঠিক নেই। বুঝছ তো তাহলে—সময় কোথা মানুষগুলোর ? যে দুটো দিন আছো যত পার দুহাতে কেড়ে ছিনিয়ে লুটে পুটে দুনিয়া থেকে আদায় করে নাও।'

প্রাণের গভীর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসছে ওর। তারই আবেগে শান্ত হয়ে আসে ওর উত্তেজনা।

'তাই মেয়েমানুষ পেলেই হল—স্থান কালের বাছ বিচার নেই; কচি-পাকার ফারাক নেই। প্রথম প্রথম অসহ্য লাগত। আমার বমি আসত। একদিন কাপ্তেন সাহেবকে বললাম—এ সব কি হচ্ছে, দেখছেন? এমনিই চলবে নাকি? বললে কি জান? তা চলবে বৈকি! কাল যদি ওদের লড়তে পাঠাতে চাও, তবে আজ এসব চলতে দিতেই হবে। ওপর-ওলা। কি বলি বল? লোক-গুলোর দিকে তাকাতাম না আর—কিন্তু লক্ষ্য রাখতাম কাপ্তেনের ওপর। বলেছিলাম—যতদিন ও কিছু না করে—'

আবার কাঁপতে থাকে।

'আচ্ছা বলতো আই-ওয়ান্, কেন? ও লোকটাও কেন অমন কাজ করতে গেল? নিজের চোখে দেখেছি হে, নিজের চোখে দেখেছি—লোকজনদের দিয়ে একটা মেয়েমানুষ আনিয়ে নিলে নিজের তাঁবুতে। কাঁদছিল আর হাত পা ছুঁড়ছিল মেয়েটা। কিন্তু তাতে কি। উনি ওঁর কাজ করলেন। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ছুটে বেরিয়ে গেলাম রাস্তায়—প্রথমেই যে-মেয়েটাকে দেখলাম হাতের কাছে—আঃ, ছোট্ট এইটুকু একটা কচি মেয়ে—হয়তো বছর বারো বয়েস হবে—বা তাও হবে না বছর দশ হবে, পনেরও হতে পারে, দেখতেই হয় তো দরকচা মারা। যাই হোকগে, টেনে তো মেয়েটাকে গলির মধ্যে নিয়ে গেলাম—'

বলতে বলতে ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল বুজী, আই-ওয়ানের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ পরে আবার শুরু করল ঃ

'আরে আমি কি আর চেয়েছিলাম করতে! চাইনি—তবু পেছুতে পারলাম না। বুঝলে? সব ওই কাপ্তেন ব্যাটার দোষ। বুঝতে পারছ না আই-ওয়ান্। সব ওর দোষ। মেয়েটারও দোষ আছে। এমনি চ্যাঁচাতে লাগল—চেঁচিয়ে বলে কিনা আমি কুচ্ছিৎ কদাকার—বাঁদরের মত। বললাম এই চোপরাও। তাই কি থামে। গাঁ গাঁ করে চ্যাঁচাতে লাগল আর হাত পা ছুঁড়তে লাগল। আবার বললাম ঃ 'চুপ করলি, নয় খুন করে ফেলব। বললে কি হবে! খুন করব বলেছিলাম শেষটায় সত্যি সত্যি খুন করলাম—' সে কি কান্না বুজীর, অঝোর কান্না। থামতে আর চায় না।'

'বুঝেছ, আই-ওয়ান্! এই হল ব্যাপার। মরে পড়ে রইল—ওর মরা মুখটার দিকে তাকিয়ে আমার হুঁস হল—আমার কথা তো বোঝেনি ও—আমি যে জাপানী ভাষায় কথা বলেছিলাম। বুঝতে পারিনি আগে—খেয়াল হয়নি—কি করে বুঝব, বল? এ দোষ আমারি। সম্পূর্ণ আমার, আই-ওয়ান্।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল বুজী। কয়েকজন এ দৃশ্য দেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। চারদিকের কোলাহলে ওরা শুনতে পায়নি ওর কথা।

আই-ওয়ান্ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ওর যেন বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে। সমস্ত দেহ মন অত্যন্ত ক্লিষ্ট বোধ হতে লাগল। বুজীর বিবৃত কাহিনী ওর চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে জ্বলতে লাগল।

চীনদেশে গিয়ে তাহলে ওরা এই করে এসেছে! কই বাবা তো লেখেননি কিছু! তা কটাই আর পেয়েছে বাবার চিঠি। যাও বা পেয়েছে আষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে জাপানী সেন্সরে ঘায়েল। খবরের কাগজের পাতায় দেখেছে সম্রাটের

সৈন্যেরা ভারী লক্ষ্মী ছেলে হয়েছিল। নিজের ওপর ঘৃণা হল আই-ওয়ানের। চীন-ভূমির ছেলে হয়েও জাপানী ভাঁওতায় বিশ্বাস করতে গেল! অসহ্য যাতনা নিয়ে উঠে পড়ল আই-ওয়ান্।

'চল, বুজী ফেরা যাক।' নীচু হয়ে বুজীর শিথিল দেহটাকে দুই হাতে জড়িয়ে তুলে, ধরে ধরে বাইরে নিয়ে গেল। একটা রিক্স ডেকে ওকে তুলে দিয়ে নিজে সাথে সাথে চলতে লাগল। ঘুমিয়ে পড়েছে বুজী।

মিঃ মুরাকী বাইরেই ছিলেন; বললেনঃ

'ভেতরে নিয়ে যাও, কেউ যেন না দেখে।'

বাড়ির পথ ধরে আই-ওয়ান। ওর ভেতরে ঝড় চলেছে। কি হয়েছে দেশে? কতখানি তার ও জানে, আর কতখানিই বা জানে না? সত্যিকারের অবস্থা কিইবা? নিজের বিয়ে নিয়েই মেতে ছিল, শুনেছে আর অমনি বিশ্বাস করে নিয়েছে যুদ্ধ-টুদ্ধ হয়নি অতএব তামাকে বিয়ে করতে বাধা নেই। কিন্তু ও তো চীন দেশের মানুষ!

জীরোকে কোলে নিয়ে তামা ছুটে আসে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তামাকে, চেহারাটা যেন ঝলমল করছে। সদ্য-আঁচড়ান চুল, এপ্রিকটের ওপরটার মত মোলায়েম চিক্কণ ওর ত্বক।

'এইমাত্র নেয়ে এলাম মায়ে ব্যাটায়, জানো? কেমন নূতন জামা পরেছি দুজনে দেখ। আর, জানো? কি যে চমৎকার চন্দ্রমল্লিকা কিনেছি। লোকটা বল্লে তুমি নাকি পাঠিয়েছ। আমি বল্লাম—প্রমাণ? লোকটা বলে—চীনদেশের মানুষ গো, ভদ্রলোক চীনে। আমি বললাম, 'নাগাসাকীর সব চীনা-ম্যানই আমার বর নাকি?' ও বল্লে কি জানো? বাবু যে বললে আমায় ভালো করে দেখে নাও। তা বাঁ গালে চুলের ধার ঘেঁষে একটা তিল দেখেছি যেন! আমি বল্লাম, বাস্, ঠিক হয়েছে।'

তিনজনেই হেসে উঠল।

"খুব ক্লান্ত হয়েছ আজ না?' তামা বলে।

'সত্যি, ভারী ক্লান্ত লাগছে, তামা,।'

বলবে কি তামাকে? না থাক। নাই জানল তামা। এ-বুজী ওর অজানাই থাক। তা ছাড়া ও নিজেই এখনও ভালো করে বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা।

আই-ওয়ানকে বসিয়ে নিজের হাতে জামা জুতো মোজা খুলে নেয় তামা। মোলায়েম জোরালো হাত দিয়ে বেশ জোরে জোরে ওর পা ঘষে দেয়। প্রত্যেকটি স্পর্শে কি গভীর আরাম। স্নিগ্ধ বিশ্রাম যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

'চল, নাইতে চল এবার। দেখ না সব ঠিক করে দিচ্ছি। এর পর আর কোন কাজ নয়; বিশ্রাম করবে, বুঝলে? জীরো খুব লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে, দেখো।'

মেঝের ওপর বসে জীরো বড় বড় চোখ করে তাকায়।

সব নিজের হাতে করে দিল তামা। স্বামীকে কিছু করতে দিল না। আই-ওয়ানের এখন শুধু ভাবা। বুজীর কথা গুলো মনের মধ্যে তোলপাড় হতে লাগল্। এর আগে কিছুই তো শোনেনি—সৈন্যদের হটিয়ে দেওয়া, বোমা বলাৎকার—কিছুই শোনেনি। কোনও শাস্তি হয়নি এর জন্য! প্রতিশোধও নয়? যাবে, দেশে যাবে ও, নিজের চোখে দেখে আসবে সত্যি অবস্থা। একটা

অদম্য উত্তেজনায় ওর সারা অস্তিত্ব বিক্ষুব্ধ হতে লাগল। এখনি যাবে, দেরী সইছে না আর। মনে পড়ে অতীতের কথা—জাপানীদের ওপর কি ঘৃণায় অভি-ব্যক্তি দেখেছে রাস্তায় ঘাটে, সর্বত্র। জাপানী দেখলেই থুথু ছিটোত ওর দেশের মানুষ—ওদের বলতো বেঁটে-বাঁদর। মনে পড়ে এন্-লান্ কেবলি বলতো-'হোক না বিপ্লব শেষ—জাপানী মেরে তাড়াব।' কিন্তু বিপ্লবের পদধ্বনি দ্বার-প্রান্তে এসেই মিলিয়ে গেল। আর তার সাথে থেমে গেল যত কাজ, যত স্বপ্নের জাল বোনা।

বড় কাঠের গামলাটার গরম জলে স্নান করে যেন বেশ আরাম বোধ হল। মনের উত্তেজনাও অনেকটা হালকা হয়ে এল,। একাই ও কদিনের জন্য বাড়ী যাবে। গিয়ে দেখে আসবে সব নিজের চোখে। যেতেই হবে। শুধু ইচ্ছে নয় যাওয়া ওর কর্তব্য।

খাবার টেবিলে ও বলল; 'ভাবছি দেশ থেকে কদিন ঘুরে আসব।

পরিবেশন করছিল তামা। হাতের বাটিটা নামিয়ে রেখে উল্লসিত হয়ে বলল: 'আমরাও যাব। জীরো আর আমি দুজনে।

মাথা নাড়ে আই-ওয়ান: 'না একা আমিই যাব। তোমাদের যাওয়া নিরাপদ নয়।'

তামা অবাক হয়ে যায়: 'কেন বল তো?'

'এই কমাস আগে সাংহাইতে লড়াই লেগে ছিল, জানতো!' খুব সাবধানে বলে আই-ওয়ান্, 'জানো তো জাপানীদের ওপর ওখানকার লোকের ভাব-সাব কেমন এখন।'

সাগ্রহে জবাব দেয় তামা: 'কেন? চীনের সাথে আমাদের দুশমনী তো নেই! কাগজে তো হামেশা পড়ি—আমাদের সৈন্যরা তোমাদের দেশে খুব আদর অভ্যর্থনা পাচ্ছে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে। সরকারী কর্মচারী আর চীনে সৈন্যরা খুব নাকি অত্যাচার করে ওদের ওপর। তাই নাকি আমাদের সৈন্যদের ওপর ওদের খুব ভরসা। আমি রোজ কাগজ পড়ি, জানো!'

সত্যি; অস্বীকার করার উপায় নেই। নিয়মিত কাগজ পড়ে তামা। অনেক সময় বিকেলে ওর সাথে আলোচনা করতে চায়। কত মিনতি করে: 'নইলে যে মুখ্যু হয়ে ঠিক সেকেলে জাপানী বউ হয়ে থাকব গো।'

আই-ওয়ান্ কঠিন হয়: 'সে যাই হোক, তোমাদের যাওয়া হবে না এখন।'

অমন করে হুকুম তো আই-ওয়ান্ ওকে করে না! টেবিলের ওপর দিয়ে স্বামীর দিকে চায় তামা। তারপর উঠে এসে ছেলেকে ওর কোলে বসিয়ে দিয়ে বলে:

'বল না রে জীরো, বাবাকে বল, তোকে আজ কি বলেছি আমি।'

জীরো লজ্জা পায়, একবার বাবার একবার মার মুখের দিকে তাকায়।

মা বলে: 'বল না, যে মা বলেছে ঠাকুরের কৃপায়—অবশ্যি ভগবান টগবান আমি বিশ্বাসই করিনে—হ্যাঁ বল, ঠাকুরের কৃপায় বসন্তকালে আমার একটি ছোট্ট ভাই হবে।'

'তামা!' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সত্যি নয় তো কি। তাই তো আমাদের ফেলে তোমার এখন যাওয়া হবে না। কি জানি, যদি কিছু হয়। কি যে হয়েছে এবার আমার—

কেবলি অমঙ্গল ডাকছে মনটায়। কুসংস্কার টুসংস্কার আমার নেই। তবু, সমুদ্রের দিকে তাকালেই, কি মনে হয় জানো? ওটা যেন হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে তোমার আমার......না না......কখনও হবে না,......তোমার আমার মাঝখানে সমুদ্রকে আসতে দেব না...দেব না। জানো আই-ওয়ান্, সমুদ্র কেবলি চাইছে তোমার আমার মাঝখানে এসে দাঁড়াতে। আমার মন কেন মানছে না? তুমি গেলে কি জানি ভয় পেয়ে পেটের ছেলেটা নষ্ট হয়ে যায় যদি!'

কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে আই-ওয়ান্ তামার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আবার তামা মিনতি করে বলেঃ 'দাঁড়াও না বাপু, সবাই একসাথেই যাব'খন। একা যাওয়া হবে না তোমার আমাদের না নিয়ে।'

স্বামীর বাহু-সংলগ্ন হয়ে থাকে তামা। জীরো ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে।

'এই জীরো, চুপ।' তামাকে জড়িয়ে ধরে আই-ওয়ান। তাইতো কি-ই বা হবে গিয়ে। সত্য জেনেই বা কি হবে? যা হয়েছে হয়েছে চুকে বুকে গেছে সব।

তামা ওর কাঁধে মুখ রেখে তখনও কাঁদছে।

ধমকে ওঠে আই-ওয়ান্ঃ 'বাস্ বাস্, চুপ কর। দুজনে মিলে কেঁদে ভাসাচ্ছে দেখ!'

দুই হাতে মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে দোল দেয়।

তামার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলেঃ 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা। যাব না। হল তো? ছেলেটাকে যে ভয় পাইয়ে দিলে!'

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে তামার কান্না। জীরোও শান্ত হয়েছে। আই-ওয়ান্ তেমনিভাবে স্ত্রী পুত্রকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে দোল দিচ্ছে। কোথায় যাবে ও, এই তো ওর জগৎ, ওর আপন বাহু-পাশে বাঁধা।

বুজীর কিছুই মনে পড়ল না পরের দিন। খালি ভয় করতে লাগল কি জানি কি বলেছে আই-ওয়ানকে। অফিসে এল দেরী করে, শ্রান্ত, পাণ্ডুর চেহারা নিয়ে। স্বাভাবিক হবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল ও। আই-ওয়ান দেখতে পেল ওর ঘরের পাশ দিয়ে বুজী চলে গেল। কিন্তু ডেকে কথা কইতে ইচ্ছে হল না ওর।

দুপুরবেলা কেরাণীরা খেতে চলে গেলে আস্তে আস্তে এসে ঢুকল বুজী। আধা-সঙ্কোচ, আধা-সারল্যে মিশিয়ে খানিকটা আব্দারের সুরে বললঃ 'কাল বড় মাতলামী করেছি না?'

'করেছ বৈকি!' আই-ওয়ান্ ওর দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়।

'খুব যা তা বলেছি, না? কি বলেছি বলতো?'

আই-ওয়ান্ বুঝল বুজীর মনে নেই। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। একটা বোঝা নামল যেন।

'বলছিলে, বিয়ে করবে।'

'আর কিছু নয় তো? 'হ্যাঁ, বিয়ে করব। সনাতন প্রথায়, বুঝলে? উপযুক্ত পাত্রীদের ছবি আসবে সামনে। দেখব, তারপর একটার ওপর আঙুল রেখে বাবাকে বলব, এইটে। বাস্।'

হাসতে থাকে বুজী। আই-ওয়ান্ কিছু না বলে একটু হাসল শুধু।

'শিগগিরই সেরে ফেলছি বিয়েটা। তোমার ছেলে যে আমার ছেলেকে পেছনে ফেলে লম্বা ঠ্যাংএ এগিয়ে যাবে তা হবে না।'

'ছেলে নয়, ছেলেরা বল।' শুধরে দেয় আই-ওয়ান্।

'সেকি হে? রা—হল কি করে?' চীৎকার করে ওঠে বুজী।

মাথা নাড়ে আই-ওয়ান।

'সাবাস্। পয়মন্ত মেয়ে তামা। আধুনিকারাও তো বেশ কাজের দেখছি। এবারেও ছেলেই তাহলে!'

'তামা তো তাই বলছে। ঠিকই নাকি বুঝেছে ও।'

'হোক দেখি আগে। গুমর ভাঙবে মেয়ের। আমি কিন্তু আরো ঠাণ্ডা বৌ চাই। ওর মত ধিঙ্গি নয়।' বলে বুজী।

'আমার তো ধিঙ্গি বউ নিয়ে বেশ চলে যাচ্ছে।' আই-ওয়ান্ বলে।

মাথা নেড়ে চলে যায় বুজী।

কিন্তু আই-ওয়ান বসে ভাবতে থাকে। বুজীর মনে নেই—ভালোই হয়েছে। এখনও মনে নেই—তখনও হুঁশ ছিল না, নইলে অমন করে মনের কপাট খুলত না বুজী। অজানাই থাক তার সেই খোলা-কপাটের ফাঁক দিয়ে কি দেখেছে আই-ওয়ান। তা না হয় থাকল। কিন্তু ও নিজে তো জেনেছে। এবং যা জেনেছে, তারপর কি আর সব আগের মত থাকতে পারে! অসম্ভব। কাল পর্যন্ত একটি মেয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল আই-ওয়ানের। তামার দৃঢ় বিশ্বাস ছেলে হবে। আজ সকালেই বলছিল সে 'আমি বুঝতে পারছি ছেলে হবে এবার। পুত্রোৎসবের সময় এবার দুটো কাগজের কার্প মাছ ঝোলাব। তাই হোক। ছেলেই যেন হয়। কাল থেকে মেয়ে চাইতে পারছে না ও। ছেলে বংশধর.. পিতৃধারায়ই সে চলবে। কিন্তু মেয়ে যে একেবারে পর হয়ে যাবে!

দুটো বড় বড় ঘটনা একসাথে ঘটল।

আই-ওয়ানের দ্বিতীয় ছেলে গঞ্জীরোর জন্ম আর ভূমিকম্প। চিরকাল মনে থাকবে ওর। সবে বুজীর বিয়ে হয়েছে। অদ্ভুত বিয়ে বুজীর। হুস্ করে হয়ে গেল কোথা দিয়ে। নেহাৎ যেন ঘরোয়া ব্যাপার। জাপানী বিয়ের এই ধরণ আই-ওয়ানের একটুও ভালো লাগে না। চীন জাপানের এই একটা পার্থক্য। ওদের দেশে বিয়ের ঘটা চলে দুদিন ধরে। আর এখানে শুরু হতে না হতেই শেষ। বিয়েটা যেন কিছুই নয়, মনে হয় বুজীকে দেখে। আর ওর কনে সেৎসু হাজিমা—ছোট্ট মেয়েটি কনে-সাজানো মুখের রং-চিত্রের পেছনে নিতান্ত সাধারণ একটি গ্রাম্য জাপানী মেয়ে। বিয়েও শেষ হল, ওর কথা বুজী আর কোন দিন মুখে আনল না। কয়েক দিনের মধ্যে এমনি মিশে গেল সেৎসু মুরাকী পরিবারে যেন আজন্ম ওখানেই ও আছে। তারপর ওর অস্তিত্ব আর কারো মনে রইল না।

হ্যাঁ, সবে বুজীর বিয়ে হয়েছে—মাসখানেকও নয়—গঞ্জীরো হল দুপুর-বেলা, অত্যন্ত সহজ নির্ঝঞ্ঝাটে। আই-ওয়ান জানতেই পারেনি কিছু। সকাল-বেলা রোজকার মত জীরো আর তার মার কাছে বিদায় নিয়ে কাজে বেরুল। এপ্রিলের শেষ—চেরীফুলের শেষ ঝরা পাপড়িরা লুটিয়ে আছে বাগান ছেয়ে।

আচমকা এক ঝলক বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে। রাস্তা ভেজা। সমুদ্র থেকে আকাশে উঠছে নরম নরম শাদা মেঘের উত্তাল ঢেউ—তার ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক দিচ্ছে স্বচ্ছ নীল। আকাশের এ রূপটি বড় ভালো লাগে আই-ওয়ানের। প্রতিটি গাছ পাতায় সবুজ ঢালা; মৃদু কোমল ভিজে হাওয়ায় প্রতিটি মানুষের মুখে পড়েছে সুখ আর পরিতৃপ্তির স্পর্শ। সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনে কি যেন একটা গভীর মাধুরী আছে। অনুভব করে ও, মর্যাদা দেয়। মানুষে মানুষে যে-সহজ প্রীতির বন্ধনটি আছে তারই অভিব্যক্তি সাক্ষাৎ-কালীন নমস্কারে, কুশল প্রশ্নে, অভিবাদন আর অভিনন্দনে। এপ্রিলের সোনালী রোদে পথ চলতে চলতে ওর মনে হল এখানে কোন দিন তো কারো মুখে কালো ছায়া দেখেনি, এমনকি বৃদ্ধদের মুখেও না, মার খেয়েছে বলে কোন শিশুকে রাগ করতে দেখেনি। ভালোবাসে আই-ওয়ান্ এই মানুষগুলিকে—ইচ্ছায় ও বাসে অনিচ্ছায়ও। এদের কত কাছে এসেছে ও, অথচ সহস্র মানুষের মধ্যে ও কত একা।

বিয়ের পরে বুজী আগের চেয়েও বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। আবার দূরেও সরেছে। মদ খাওয়া ছেড়েছে। অবশ্য বিয়ের দিন রীতিমত মাতাল হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর ওকে কেউ মাতলামী করতে দেখেনি। এখন বৌ-এর ওপর বেশ স্বামিত্ব ফলায়। নিতান্ত সরল সাধারণ মেয়ে সেৎসু। ভারী সম্মান করে স্বামীকে। স্বামীর সামনে পারত পক্ষে বসেও না। ইদানীং বুজী বৈদেশিক নীতি নিয়ে বিশেষ করে চীন-জাপান সম্পর্ক নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। ওর দৃঢ় অভিমত, চীন কম্যুনিস্টদের হাতে চলে যাচ্ছে। গত কাল রাতে বুজীর নিজের বাড়িতে তামা আর ওর নিমন্ত্রণ ছিল; সেখানেও ওর লম্বা বক্তৃতা শুনে এসেছে এই সম্বন্ধে।

'কম্যুনিস্টদের মাথা তুলতে দিলে চলবে না—দাবাতেই হবে।' জোর গলায় ফতোয়া দিয়েছিল বুজী।

আই-ওয়ান্ উত্তর দেয়নি। দিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া বুজীর কথা বিশ্বাসই বা করে কে! কম্যুনিস্ট নয়, আই-ওয়ানের ব্যাংকার বাবার মত লোকেরাই চীনকে গ্রাস করে আছে। কম্যুনিস্টদের তারা আর জামাই-আদর দেবে না। চীন-সরকারের কম্যুনিস্ট দমনের সংবাদ বহুবার জাপানী কাগজে পড়েছে ও। বুজীর মাথায়ও কুসংস্কার ঢুকেছে। যাই হোক—এসব কথা মন থেকে দূর করেই ও অফিসে ঢুকল। আশা ছিল নূতন বছরে ওর মাইনে বাড়বে। কিন্তু আশায় ছাই পড়েছে। কর্মচারীদের নূতন বছরের ভোজের সময় শুনিয়ে দিয়েছেন মিঃ মুরাকী—স্থলে জলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করবার জন্য সম্রাটের সেনাবাহিনী মজবুৎ করবার প্রয়োজন! সেজন্য অর্থ চাই। এবং সেজন্য বেতন বৃদ্ধি এ বছর সম্ভব হল না। সম্রাট কথাটা শোনা-মাত্রই কারো বিন্দুমাত্র আপত্তি রইল না। অবশ্য আই-ওয়ান ছাড়া। এদের দেব-কল্প সম্রাটের ওপর ওর কোন ভক্তি নেই। সুস্থ একটা জাতির এই পুজো-বাদ ওর কেমন বিশ্রী লাগে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডেস্কে এসে বসল আই-ওয়ান্। আর একজন বেড়েছে সংসারে। তামাকে খুব হিসেব করে চলতে হবে এবার। বাবা টাকা পাঠান না বহুদিন। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে চাইতে ওর ইচ্ছে করে না। আচ্ছা,

জাপান তো মাঞ্চুরিয়া নিয়েই নিয়েছে তবে সম্রাটের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাড়াবার দরকারটা কি হল? হয়ত সামরিক দলই মাথা তুলছে। চুলোয় যাক। কি হবে জাপানী রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? জাপানী রাজনীতি কেন—কোন রাজনীতি নিয়েই মাথা ঘামায় না আই-ওয়ান।

সেই সকাল থেকে বিক্রীত আর মজুদ মালের হিসেব মেলাচ্ছিল ও বসে বসে। এল ঝি। সেই যে জীরোর খবর নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছিল। আজ এল সে ধীরে আস্তে, চুল আঁচড়ে, পাট-ভাঙা কিমোনো আর সাদা মোজা পরে—যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে।

অবাক হয়ে আই-ওয়ান্ তাকিয়ে রইল।

'কি ব্যাপার?'

'ছেলে হয়েছে, বাবু।'

আই-ওয়ান লাফিয়ে উঠল টুপী হাতে নিয়ে। 'সে কি?'

ঝলমল করে ওঠে মেয়েটির মুখ। বলল: 'হ্যাঁ গো বাবু। ছেলে হয়েছে। কি সুন্দর ছেলে—এই মোটা সোটা!'

অন্য কেরাণীরা দাঁতের মধ্য দিয়ে কি রকম একটা খুশির শব্দ করে উঠল।

হাসতে হাসতে বলল ঝি: 'পুত্রেষ্টির আগেই পুত্র হয়ে গেল।'

তক্ষুণি বেরিয়ে পড়ল আই-ওয়ান। বুজীর দরজায় উঁকি মেরে শুধু বলে গেল: 'বাড়ি যাচ্ছি হে, ছেলে হয়েছে।' স্বরে ওর গর্ব; অথচ উত্তেজনা নেই, যেন প্রতিদিন ওর ছেলে হচ্ছে।

'সে কি হে?' হাঁক দিয়ে উঠল বুজী। মাথাটি শুধু একটু নেড়ে ততক্ষণ খানিক এগিয়ে গেছে আই-ওয়ান।

সেবারের মত তাড়াহুড়ো নেই এবার। ঝির বক্ বক্ শুনতে শুনতে সাধারণভাবেই চলেছে।

'বুঝলেন বাবু, আজ যেমন ঝপ্ করে বৃষ্টি হল আর ঝপ্ করে রোদ উঠল, তেমনি খপ্ করে ছেলে হয়ে গেল। না বলা না কওয়া না কিছু। এই দেখলুম দিব্যি আছে দিদিমণি। ও মা তারপরেই দেখি—বাস্ ছুটলাম দাইএর জন্য। ওমা এসে দেখি খতম। আর কি সুন্দর এই এতখানি ফুট-ফুটে ছেলে গো। দিদিমণি বলে কি জানো, ছেলে হওয়া এই মাত্তর! তাহলে আর কি। হোক না যত খুশি।' প্রভু-পত্নীর গরবে গরবিনী মেয়ে প্রাণ খুলে হাসে।

সত্যি তাই। বাড়ীতেও কোন গোলমাল হৈ চৈ নেই। কিছু যে হয়েছে বোঝাই যায় না। তামা রান্না করতে গিয়েছিল। তার হাতের ব্যঞ্জনের সুগন্ধ ছেয়ে আছে বাতাসে। নাকে যেতেই ক্ষিদে পেয়ে গেল ওর।

ঝি ওর জুতো খুলতে খুলতে বলে: 'যখন খাবেন বলবেন খাবার এনে দেব।'

'আধঘণ্টা খানেক পরে দিও।' আই-ওয়ান্ বলে।

পর্দার ওধারে বিছানায় তামা—গঙ্গীরো আর জীরো কোলে। দৌড়ুতে পারে এখন জীরো। নূতন ছোট্ট মানুষটাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে ও। বুঝতেই পারল না আই-ওয়ান্ এ মেয়ে সদ্য প্রসূতি। মুখখানা একটু

কালোও হয়নি। দুষ্টুমী-ভরা চোখে তাকাচ্ছে—যেন ভারী ঠকিয়ে দিয়েছে স্বামীকে।

'তামা!' চাপা সুরে ডাকে আই-ওয়ান্।

'এই যে গো, আমরা সবাই এখানে। এবারেও ছেলে। কেমন বলিনি!'

কি উত্তর দেবে খুঁজে পায় না আই-ওয়ান্। জীরো দুনিয়ায় এলো শোর গোল তুলে, জাঁক জমক করে। সে একটা দিন গেছে বটে। কিন্তু এ ছেলে এল, চুপ চাপ্ শান্ত পদক্ষেপে। ক'বছরের মধ্যে ঘর ভরে উঠবে ওর।

গর্বিতভাবে তামা বলেঃ 'আমি চেয়েছিলুম পুত্রেষ্টির আগেই চুকে যায় সব।'

'তাই তো হল।' আই-ওয়ান্ বলে।

হাসে তামা। বলে, 'খাওগে যাও, আজ কার্প মাছ রান্না হয়েছে। কার্প যে পাওয়া গেছে এও তো একটা মঙ্গলের চিহ্ন।'

'বিকেলে বাড়ি থাকব তো?' শুধায় আই-ওয়ান্।

'হবেটা কি শুনি থেকে? আমি তো ঘুমিয়ে থাকব। আর জীরো ঝির সাথে বাগানে খেলা করবে। তুমি কি করবে বসে বসে?'

অতএব তামার হাতের উপাদেয় রান্না খেয়ে যথানিয়মে আফিসে যেতে হয়। যেতে যেতে ভাবে—তামা আমার কল্যাণী। আশ্চর্য মেয়ে—ওর সব কিছুতে চমৎকার একটা স্বাস্থ্য; কিছুই যেন কঠিন নেই ওর কাছে। সব নিজে হাতে করে, তথচ সন্ধ্যাবেলা স্বামী বাড়ি এলে কাছে এসে বসবে, ওর সময়ের অভাব হয় না। কি যে ও জানে না—প্রথম প্রথম ভেবে আশ্চর্য হত আই-ওয়ান্। এখন আর হয় না। তামা সব জানে—ওর জানাটা আশ্চর্য নয়। আশ্চর্য নয়-জানা। যাই হোক না, তামাকে বিয়ে করার জন্য কোনদিন অনুতাপ করবে না ও।

আঁতুড়ের অশৌচ তখনও শেষ হয়নি। তাই পুত্রেষ্টির দিন কোথাও গেল না ওরা। তামা উৎসবের আয়োজনে কোমর কসে লেগে গেছে। পুত্রেষ্টির প্রধান মঙ্গল চিহ্ন—দুই ছেলের নামে দুটো কাগজের তৈরী কার্প বাড়ির মাথায় বাঁশের ডগায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। একটার রং সাদায় কালোয়, আর সোনালী চোখ—এটা জীরোর; আর লালটা গঞ্জীরোর নামে।

সৌর বৎসরের পঞ্চম দিন। হাওয়ায় উড়ছে কার্প আর আনন্দে চীৎকার করছে জীরো। সমুদ্র থেকে কেমন যেন অস্বাভাবিক একটা বাতাস দিচ্ছে আজ। জীরোকে কোলে তুলে নেয় তামা। আই-ওয়ান্ বলে, 'ও বড় ভারী, আমার কাছে দাও।'

'একটু তুলে ধর তাহলে, ভালো করে দেখুক কার্পটা।'

দমকা বাতাসে ওদের কাপড় উড়তে লাগল।

'আমাদের ছেলে-ভরা ঘর।' তামার স্বরে গর্ব উপচে পড়ল।

আই-ওয়ান্ উত্তর দিল না। ওর কেবলি মনে হতে লাগল, ওর পরম্পরা পেল না ওর ছেলেরা। আজ যে-উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে তারা বড় হয়ে উঠছে, তা ছিল না তাদের পিতার শৈশবে। পাল-পার্বন তামাও খুব ভালোবাসে; খুব ঘটা-পটা করেই সব করে। তবু আজ কেবলি মনে পড়ে সেই ছোট বেলার কথা। কি আনন্দই ছিল নতুন বছরে, ড্রাগন-পুজো, আর বসন্তোৎ-

সবের সময়। কিন্তু......বুকটা কেমন করে ওঠে......জীরো গঙ্গীরো কোন দিন তার স্বাদ পাবে না।

বড় ছেলেকে বোঝাচ্ছিল তামাঃ 'বুঝলি তো, কার্প দেয় ছেলেদের জন্য! ওরা সর্বদা ঢেউ ভেঙ্গে উজিয়ে উজিয়ে চলে কিনা তাই!'

হঠাৎ চমকে ওঠে আই-ওয়ান্। কার্প-ঝোলান বাঁশটা দুলে উঠল না! সারা দিন দাপাদাপির পর বাতাসও একদম পড়ে গেল হঠাৎ। পাতাটিও নড়ছে না। এক সঙ্গে দুজনের দৃষ্টি ছুটে গেল সমুদ্রের দিকে। এ কি রূপ সমুদ্রের! কোথায় নীলাম্বুধি! শুধু একটা নিকষ কালোর ভীমা স্ফীতি যে চোখের সামনে! একটা চাপা গুমরানী উঠছে। সাগরের বুক থেকে না ধরিত্রীর মর্ম হতে কে জানে!

ভয় পেয়ে ডাকে আই-ওয়ান্, 'তামা!'

'ভূমিকম্প', বলে তামা—অতি শান্ত ছোট্ট একটুখানি কথা। মুখখানা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে।

এখানে মিনিটে মিনিটে ভূমিকম্প—সহজভাবেই নিতে শিখেছে আই-ওয়ান্। কিন্তু তেমন বড় ভূমিকম্পের সাথে পরিচয় ঘটেনি এখনও। মাঝে মাঝেই অবশ্য রাত্রি বেলা আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যায় দুজনের। পিঠের তলা থেকে একটা হিম কম্পন ওঠে শির শির্ করে। ছাদ থেকে মুখে চোখে চুন বালু খসে পড়ে। কাঠের কড়ি বরগা ওঠে মচ্‌মচ্ করে। তামা ওঠে, কাপড় ঠিক ঠাক করে নিস্তব্ধ হয়ে চোখ কান খাড়া করে বসে থাকে। ক্রমে বুঝতে শিখেছে আই-ওয়ান্, ঘরে ঘরেই অমনি কবে তৈবী হয়ে উদগ্র শংকায় বসে থাকে অসহায় মানুষ। কিন্তু প্রতিবারই মা ধরিত্রী শান্ত হয়ে গেছেন। তেমন কিছু একটা ঘটেনি। আজ আবার এই সাংঘাতিক ঝোড়ো হাওয়াই বা কেন?

বাড়ির দিকে ছোটে তামা। কিন্তু ঝি গঙ্গীরোকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে তার আগেই। বাড়িটা হঠাৎ মড়মড় করে উঠল। তাকিয়ে দেখল কার্প ঝোলান খুঁটিটা প্রবলভাবে দুলছে—এ হাওয়ার দোলা নয়—অন্য কিছু।

ঝি কিছু না বলে বাচ্চাটাকে আই-ওয়ানের কোলে ঝুপ্ করে ফেলে দিয়ে দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। তামা বেরিয়ে এল ওদের কাপড় চোপড় ভরা কয়েকটা বাক্স প্যাটরা নিয়ে। পেছন পেছন ঝি, তারও দুহাত ভরা।

হাঁপাতে হাঁপাতে আই-ওয়ান্ বলেঃ 'ছেলেদের কোথা রাখি? তোমাদের সাহায্য করতে হবে তো।'

শান্তভাবে জবাব দেয় তামা—লক্ষ্মীটি, তুমি ওদের নিয়ে থাক।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আই-ওয়ান্ এই দুটি নারীর দিকে। কি আশ্চর্য শান্ত ধীরতা! যেন বহুদিন রিহার্স্যাল দিয়ে রেখেছিল। আজ শুধু তার প্রয়োগ। ভেতরে যাচ্ছে, বাইরে আসছে, আবার যাচ্ছে। বাড়ির সামনের আঙ্গিনা টুকু অল্পক্ষণের মধ্যে ভরে উঠল জিনিষ পত্রে। তেমন বেশী কিছু নয়। দামী জিনিসগুলো তামা শহরের ভূমিকম্প-নিরোধক একটা তোষাখানায় আগেই রেখে দিয়েছিল।

সব হয়ে গেলে তামা এসে দাঁড়িয়ে স্বামীর কোল থেকে ছেলেকে নেবার জন্য হাত বাড়ায়। আই-ওয়ান্ জিজ্ঞাসা করেঃ 'কোথায় যাব আমরা?'

'কোথায় আর যাব? ভূমিকম্প ছাড়া জায়গা কোথায় পাব?'

তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষা। সকলেরই চোখ সমুদ্রের দিকে। জীরোকে শক্ত করে ধরে রেখেছে আই-ওয়ান্। ও-ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ তামার কণ্ঠ হতে একটা ভীত আর্ত চীৎকার বেরিয়ে আসে। দুই হাতে ও মুখ চাপে। সে কি ভয়ংকর দৃশ্য। সমুদ্রের সবখানি জল যেন দিগন্ত রেখার কাছে এসে জড় হয়ে একটা বিরাট ঢেউ এর মত ক্রমশ ফুলে ফুলে উঠছে। ঢেউ নয়, বুঝি বিশ্ব-প্লাবনের ঢল, বুঝি গোটা সমুদ্রের বুক-জোড়া একটা জলেরই তৈরী বাঁধ। তরঙ্গ-শীর্ষে ফেনা নেই, জলোৎক্ষেপ নেই। শুধুই ক্রমোপচীয়মান স্ফীতি—ভয়াল, করাল সীমাহীন কালো স্ফীতি—তার সমস্ত ব্যাপ্তি নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠছে।

'এখান পর্যন্ত আসবে না,' আশ্বাস দেয় তামা।

'শহরের নীচের দিকটা হয়তো শেষ হয়ে যাবে', বলে আই-ওয়ান্। ওর ভেতরের সব কিছু যেন ডেলা পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। একটা অকথ্য যাতনায় বড় পীড়িত বোধ হতে লাগল। কিন্তু তবু চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না। এগিয়ে আসছে ঢেউটা। কিন্তু গতি প্রতীয়মান হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ঢেউটা স্থির হয়ে কেবলি ফুলছে। কেবলি ফেঁপে উঠছে মিতি-হীন বিস্তারে। কিন্তু আসলে তা নয়—দুর্নিবার বেগে কূলের দিকে ধেয়ে আসছে ওই ভয়াবহ জলপিণ্ড। পথে পথে সহস্র হাতে সাগরের জলের সঞ্চয় লুটে নিয়ে, স্ফীতকায় হয়ে বিপুল হতে বিপুলতর, ভয়ালতর হয়ে। নীচের দিকে চোখ পড়ে—ঘর বাড়ি ছেড়ে প্রাণের ভয়ে দিকে বিদিকে মানুষ ছুট্‌ছে—ছুটছে পাহাড়ে পাহাড়ে আশ্রয়ের সন্ধানে।

তামা বলেঃ 'এমনি হুট্ করেই আসে সর্বদা।'

আশ্চর্য তামা! শান্ত, স্থির, ধীর প্রতিমা। তামার এ রূপ ওর অদৃষ্ট, অকল্পিত। ভয় পেয়েছে কিনা, তাও বুঝতে পারা যায় না। ছুটে পালাতে চায় আই-ওয়ান্, বাঁচতে চায় ওই প্রমূর্ত সর্বনাশের হাত থেকে। কিন্তু ধরে রেখেছে তামা।

ফেনহীন, তরঙ্গ-ভঙ্গ-হীন ধাবমান জলস্ফীতি ঘোর গর্জনে সমস্ত দ্বীপ-খানাকে মথিত করে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সহস্রধা হয়ে ফেটে বিপুল ফেনপুঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ল। ঘর বাড়ি গাছ পালা এক ছোবলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

স্তিমিত স্বরে তামা বললঃ 'বাবার বাড়িটাও হয়তো থাকবে না।'

তাকিয়ে আছে ওরা নিশ্চল হয়ে। এবার সমুদ্রের ফিরে যাওয়ার পালা। তার অভিযানের চেয়ে পশ্চাদপসরণ আরো ভয়ানক। নাগালের মধ্যে যা কিছু পেল সব নিশ্চিহ্নে শুষে একেবারে গোটা দ্বীপখানাকে মুছে নিয়ে সে চলে গেল।

কাতর আর্তনাদ করে জীরোর কাঁধে মুখ ঢাকল আই-ওয়ান্। সেই মুহূর্তেই পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গা থেকে পাথর-স্খলনের শব্দ। তামাকে জড়িয়ে ধরল ও। এখনও ও মেয়ে স্থির, কঠিন, অকম্পিত।

অভয় দিয়ে বললঃ 'এখানে কিছু হবে না, ভয় নেই তোমার। আল্গায়

পাথরগুলোই খসে পড়ছে। আমাদের এদিকটায় পাথর নেই—ক্ষেত খামার সব।'

সত্যি তাই। ওদের ওপরের স্তর থেকে পাহাড়ের নীচ পর্যন্ত চলে গেছে এক ঝরনা। তারি উপত্যকার দুধারে ধাপে ধাপে ফসলের ক্ষেত।

পায়ের নীচে প্রবলভাবে মাটি কাঁপছে। মাথা ঘোরে আই-ওয়ানের।

তামা দেখায়ঃ 'ওই দেখ আবার আসছে ঢেউ—কিন্তু এবারে আর অত জোর হবে না।'

আই-ওয়ান্ শুনতে পায়, ক্রুদ্ধ সমুদ্রের হুংকার—আগের মত অত জোর নেই এবার। মুখ তোলে না ও তবু। বাবার মাথা দুহাতে জড়িয়ে ধরে আছে জীরো। কিন্তু কান্না নেই। ছোটটি ঘুমুচ্ছে। জাপানী ঘুমের কথা বলেছিল বটে বুজী।

হঠাৎ একটা মৃদু ঝন্ ঝন্ শব্দ। তারপর কাঠ পড়া আর কাগজ ছেঁড়ার শব্দ। তাকাল আই-ওয়ান্। মাটিতে ছড়িয়ে লুটিয়ে আছে ওদের বিধ্বস্ত বাড়িখানা। কতটুকুই বা শব্দ হল, আর কতটুকুই বা ধুলো উড়ল। আশ্চর্য! ও চীৎকার করে ওঠার আগেই তামা বলে উঠলঃ

' যাক বাঁচা গেল। থেমে গেছে ভূমিকম্প। আমরা বেঁচে তো আছি।'

ভাঙা বাড়ীটার দিকে পেছন ফিরে বসে পড়ে তামা। সমুদ্র শান্ত হয়ে আসছে। কিন্তু হাওয়ার বেগ বাড়ছে। আই-ওয়ানের পা গুলো যেন থর্ থর্ করে কাঁপছে।

তামা বলেঃ 'এ আর কি। এর থেকে কত সাংঘাতিক ভূমিকম্প দেখেছি!'

জামার আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে শিশু পুত্রকে স্তন দেয়। জীরোকে ঝির কাছে দিয়ে, পাশের বাক্সটার ওপর বসে পড়ল আই-ওয়ান্। ঘামে নেয়ে উঠছে ওর সর্বাঙ্গ।

'বাবাঃ, এমন সাংঘাতিক ব্যাপার জীবনে দেখিনি!' বলল।

'এ আর কি সাংঘাতিক? এতো কিছুই না।' তামা জবাব দেয়।

অবাক হয়ে গেল আই-ওয়ান্। ঘর বাড়ি সব সর্বনাশ হয়ে গেল—তবু নির্বিকার। আশ্চর্য মেয়ে! কিছুই যেন হয়নি। ভাঙা ঘরের ভগ্নস্তূপের সামনে বসে—!

খানিকক্ষণ পরে বলল ওঃ 'এখন কি করব?'

'দাঁড়াও না বাপু। একটু হাঁপ ছাড়ো তো। তারপর দেখা যাক বাবার হাল কি।' জবাব দিল তামা।

খাটো নীল কোট-পরা কে যেন উঠে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। দেখা যাচ্ছে বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। তামার বাবারই একজন রিক্সা-ওয়ালা। নমস্কার করে সামনে এসে দাঁড়ায় লোকটি।

'মালিক পাঠিয়েছেন, আপনারা কেমন আছেন দেখতে।'

'বাবা মা?' তামা জিজ্ঞাসা করে।

'সব ঠিক আছে। গেটটা আর রান্নাঘরের খানিকটা শুধু পড়েছে। বাগানের কথা এখনও জানিনে। বাড়ির কিছু হয়নি। বড় বৌমা রান্না ঘরে

ছিলেন, তাঁর পায়ের ওপর একখানা কাঠ পড়েছিল। তা ভালো আছেন এখন তিনি। শুয়ে আছেন। তা ছাড়া কারো কিছু হয়নি।'

'ভাগ্যিস!' উল্লসিত হয়ে ওঠে তামা।

উঠে দাঁড়ায় ওরা। ফিরে তাকায় আই-ওয়ান্ পেছনে—এক লহমা আগে ওদের গৃহ ছিল ঐখানে। ছিল সর্ব-বিশ্ব।

সাথে সাথে তামাও তাকায়।

'আবার তৈরী করব। কি হয়েছে?' সান্ত্বনা দেয় তামা।

'এখানে নয়।' বলে বসে আই-ওয়ান্।

'কেন? এখানে নয় তো কোথায় শুনি? দেখলে তো সমুদ্র এখানে আসতে পারেনি। এখানেই ভালো।' তামা জবাব দেয়।

আই-ওয়ানের তর্ক করার মত অবস্থা নেই। জীরোকে কোলে নিয়ে তামার পেছন পেছন ও নামতে লাগল। পথের চিহ্ন মুছে গেছে। রিক্সা-ওলা পথ দেখিয়ে চলেছে। পেছনে আসছে ঝি। দুই হাতে জিনিষপত্র বোঝাই। প্রথম থেকে এ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি এই মেয়ে।

অবাক হবার পালা শেষ হয়নি। এত বড় প্রলয়ের পরক্ষণেই পেল মুরাকী-গৃহের নিরাপদ, নিশ্চিত আশ্রয়; পেল গৃহের আরাম; পেল রোজকার মত গরম গরম সুপরিবেশিত অন্ন। এবং পেয়ে স্তম্ভিত হল আই-ওয়ান্।

কিন্তু এ তো কিছুই নয়। আরো বিস্মিত হল ও জাতটার আশ্চর্য চাপা-স্বভাব দেখে। কত দামী, দুর্লভ গাছ-পালা দিয়ে মিঃ মুরাকীর অমন সুন্দর সাজানো বাগান ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ান মিঃ মুরাকী; মুখে এক বিন্দু আফ্‌সোস নেই। সেৎসুর পা ভেঙে গেল, বুঞ্জীর মুখে তার উল্লেখ মাত্র নেই। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে সেৎসু, তা নিয়ে তার নালিশ নেই। কত মানুষের ঘর ভেসে গেল, কত প্রিয়-পরিজন গেল—রাস্তায় ঘাটে কোন আক্ষেপ শোনা যায় না। আই-ওয়ানের অফিসের কেরাণীটির এক মাত্র ভাইটি গেছে। তার বুক হয়তো ফাটছে কিন্তু ফুটছে না মুখ। লাভ-ক্ষতি, শোক-দুঃখ নিয়ে কোথাও কোন আলোচনা নেই। অদ্ভুত সংযম, অদ্ভুত প্রকাশ-বিমুখতা জাপানী চরিত্রের।

পরের দিন থেকেই আবার কাজ সুরু হয়ে গেল। ধ্বংস-স্তূপ সরান, ঘর তোলা, বাঁধ মেরামত এ যেন প্রত্যেকের কাজ, এমনি সহজ ভঙ্গি প্রত্যেকটি মানুষের।

তামা বলল: 'বাড়িটা একটু বাড়িয়েই করা যাক এবার।'

'আবার যদি ভূমি-কম্প হয়?' বলে ফেলেই লজ্জিত হয় আই-ওয়ান্।

তামা অবলীলায় জবাব দিল: 'হোক না, আবার গড়ব।'

এর মধ্যে কি আর নিজের জন্য নালিশ চলে? কি বলবে আই-ওয়ান! ভাঙা-চোরার মধ্যেই আবার ফিরে যাচ্ছে সারা শহরের মানুষ। কত মানুষ সমুদ্রে গেছে......কি জানি কেন সমুদ্রের ধারেই বারে বারে আই-ওয়ানের মন টানে।

সে-দিন এক বুড়ো জেলেকে শুধাল: 'আগের জায়গায়ই ঘর তুলবে নাকি আবার?'

গম্ভীর কালো চোখের দৃষ্টি তুলে জেলে জবাব দিল: 'কোথায় আর যাব!

বাপ-ঠাকুর্দোর ভিটে।'

'আবার যদি—।'

'যদি টদি আর কি বাবু, ভূমিকম্প হবেই।' জবাব এল।

এ যেন একটা নূতন আলো। উদ্ঘাটন। এই আলোয় তামাকে আরো ভালো করে দেখতে পায় আই-ওয়ান্। প্রতি মুহূর্তের হাসি, খুশি, লীলা-চাঞ্চল্যের আড়ালে কি অনমনীয় দার্ঢ্য। জাতটাই অমনি। ওরা শিশুর মত প্রাণ খুলে স্ফূর্তি করে কিন্তু অমন জেদী জাত আর নেই। যা ধরবে তা করবেই। সেই জন্যই ওরা দুর্ধর্ষ। প্রয়োজন হলে ওরা সব করতে পারে, সর্বংসহ হতে পারে।

তারপর চলে গেল কয়েকটা বছর। শোনা গেল যুদ্ধ থামবে। মাথা নেড়ে আই-ওয়ান্ বলল—যুদ্ধ থামবে কি! এ দ্বীপের মানুষের কি শত্রুর শেষ আছে। ঝড় তুফান, ভূমি-কম্প, আগুন। মানুষের বাড়া দুশমন, আর এ দুশমনের শেষ নেই। এতগুলো শত্রুর সাথে আজ লড়তে হয় জাপানীদের। এবং লড়ে লড়ে ওদের বুকের পাটা শক্ত হয়। আই-ওয়ানের ছেলেরা জন্মে অবধি কাঁদল না। একদিন ভয়ও পেল না। পিতার বুক গর্বে ভরে ওঠে।

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সংবাদপত্ররা এবারে সত্যি ঘোষণা করল যুদ্ধ টুদ্ধ আদপে নয়। যা ঘটেছে তাকে যুদ্ধ বলা চলে না। সামান্য হাঙ্গামা মাত্র। কিন্তু তার চাইতেও বড় খবর, আই-ওয়ানদের নূতন বাড়িটায় এবার আর একটা ঘর বাড়ানো হয়েছে। পড়বার ঘর। শক্ত কাঠের দেয়াল দিয়ে তৈরী। গত বছর থেকেই পীড়াপীড়ি করছিল তামা। ছেলেদুটো বড় হচ্ছে, দুষ্টু হচ্ছে দিন দিন। সারাদিন ওদের চ্যাঁচামেচি। অতএব আলাদা পড়ার ঘর চাই স্বামীর। প্রথমটা তেমন গা করেনি আই-ওয়ান্। তারপর একদিন দেখা গেল—তামা গেছে স্নান করতে, আর ঝি রান্নাঘরে। এই অবসরে মাঝের ঘরের ওর পড়ার টেবিলটা আঠা-লিপ্ত হয়ে গেল আষ্ঠে-পৃষ্ঠে ললাটে। সেদিনই রাজী হয়ে গেল ও। একেবারে নিজস্ব একখানা ঘর—ভারী ভালো লাগে।

যুদ্ধ নয়—শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। উত্তর-চীনের ছোট্ট একটা শহরে কয়েকজন সৈন্যের মধ্যে সংঘর্ষ। খবরের কাগজরা বেশী হৈ চৈ করল না এ নিয়ে।

বুজী বলল ঃ 'তিন মাসও থাকবে না হে।'

আই-ওয়ান্ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—তিন মাস? অত দিন কেন? তবে কি ব্যাপার আরও গুরুতর? বাবার চিঠির পথ চেয়ে থাকে। তাও আসে কালে ভদ্রে। বাবার কাছে লিখল খবর জানতে চেয়ে, কিন্তু জবাব এল না। আরও ভাবনা হয় ওর। হয়তো কিছুই না, তবু।

সেদিন ওর সহকর্মী কেরাণীটি কাজে ইস্তাফা দিল—ডাক পড়েছে সামরিক কাজে। এই সেদিন ভাইটি মারা গেল ভূমিকম্পে। মায়ের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সম্রাটের কাজ।

আই-ওয়ান্ শুধায় ঃ 'করবে কি তাহলে তোমার মা?'

'এ বিষয়ে মিঃ মুরাকামী অত্যন্ত উদার। যাদের সম্রাটের জন্য যুদ্ধে যেতে হয়, তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে উনি একটা সাপ্তাহিক ভাতা দেন।' বলে মিঃ তানাকা।

তানাকার জায়গায় এল দুটি মেয়ে। মাঝখানে পার্টিশন উঠে ঘর ভাগ হয়ে গেল। ভালোই হল আই-ওয়ানের। আলাদা ঘর হল ওর। এখন মেলা অবসর। কাজ কমেছে। চালানী কাজও তেমন নেই। আরও অবাক লাগে ওর। শুধু যদি সেপাইদের হাঙ্গামাই হবে তবে এমন ধারা কেন? চীনের কারবারীরা জাপানে মাল চালান বন্ধ করল কেন হঠাৎ? ও মাসটায় ঠিকই ছিল সব। কিন্তু তারপরই হঠাৎ সব বন্ধ হয়ে গেল। জাহাজ আসে যায়, কিন্তু ব্যবসা নেই। অনেক জিনিষ মজুদ আছে মুরাকী কোম্পানীর গুদামে —চালান যায় আমেরিকায়, ইউরোপে। ওই নিয়ে ব্যস্ত থাকে আই-ওয়ান্।

সেদিন একটা তার এল বাবার কাছ থেকে। সকাল বেলায় ডেকে পাঠিয়ে বুজী খামটা হাতে দিল। ও খুলে পড়তে লাগল—বুজীর সন্ধানী দৃষ্টি রইল ওর মুখের ওপর। তখন কিছু মনে হয়নি। অনেক দিন পরে ভেবে অবাক হয়েছে ও, বুজীর হাত দিয়ে তারটা কেন এল। বাবা লিখেছেন সতেরো তারিখ 'এস্ এস্ বালমোরাল' জাহাজে আই-কো ইয়াকোহামা পোঁছুচ্ছে, তার সাথে যেন ও দেখা করে জাহাজঘাটায়।

সতেরো তারিখের দু'দিন বাকী তখনও।

'তোমার ভাই আসছে বুঝি?' শুধায় বুজী।

'কি করে জানলে?' অবাক হয়ে যায় আই-ওয়ান্।

কথা ঘুরিয়ে জবাব দেয় বুজীঃ 'বাবা তোমার বাবার কাছে একটা জিনিষ পাঠাতে চান। তা যদি নিয়ে যায় তোমার ভাই।'

'কিন্তু মিঃ মুরাকীই বা জানলেন কি করে?

'বাবার ওখানেই এসেছিল কিনা তারটা!' শান্তভাবে বলে বুজী, 'উনি পড়েছেন খুলে।'

'কেন?'

'তাতে আর কি হয়েছে? খুব জরুরী কিনা দেখতে চেয়েছিলেন।' আই-ওয়ান্ অবাক হয়ে গেল।

কঠিন একটা উত্তর মুখে এসেছিল—ও তার তো ছিল আমার। কিন্তু সামলে নিল। হয়তো বেচারার কোন মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না। বললঃ 'মিঃ মুরাকীকে আমার ধন্যবাদ জানিও।'

ও কি স্বপ্নেও ভেবেছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে নিরীক্ষণ করছে বুজী?

একবার ইচ্ছে হল ভামা আর ছেলেদের নিয়ে যাবে ভাইকে দেখাতে। কিন্তু বুজীর অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে-সংকল্প ছেড়ে দিল। একাই যাবে আই-কোর সাথে দেখা করতে।

মরাল গতিতে এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে জাহাজ ঘাটে লাগল। আই-ওয়ান্ মাথা উঁচিয়ে খুঁজতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সামনে এগিয়ে গেল না। আই-কোকে কেমন যেন বড় লজ্জা করতে লাগল। দুভাইয়ের অন্তরঙ্গতা ছিল না কোন কালেই। বয়সের তফাৎ অনেকটা। তাছাড়া এখনও মনে আছে, কি দারুণ ঘৃণা করত পিওনী ওকে। কিন্তু কেন, মুখ ফুটে কিছুতেই বলেনি। সেই থেকে দাদার ওপর ভারী খারাপ ধারণা হয়ে গিয়েছিল ওর। কোনদিন

তাকে ভালো বাসতে পারেনি আই-ওয়ান্‌। কিন্তু এতদিন পরে ভাইকে দেখবে ভারী আনন্দ হল ওর। আজ ওর মনে হয়—কত কাল ও ঘর ছেড়ে এসেছে জাহাজ ভিড়ছে। রেলিং ধরে কত লোক দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে চেনে না ও।

ঐ তো সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে আই-কো। যে-আই-কো গিয়েছিল একি সেই? সেই অতি-সুছাঁদ, ঋজু তনু-দেহ মানুষটি? আদ্দেরে শিশুর মত ছিল ওর ওষ্ঠ, যা চাই তা না পেলে এখনি যেন ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে বসবে। জার্মানী এতদিন করল কি ওকে নিয়ে? আই-ওয়ান্‌কে দেখে চীৎকার করে উঠল আই-কো। আই-ওয়ান্‌ দেখল—খুব লম্বা মানুষটি, জাপানীদের ভিড় থেকে মাথা অনেক ওপরে উঠে গেছে; কঠিন মুখ, দৃঢ়-নিবন্ধ ওষ্ঠ, উদ্ধত দৃষ্টি, আর চাল-চলন বিদেশের আমদানী। তার পেছনে সবুজ রংএর ঝলমলে সিল্কের পোষাক পরা এক শ্বেতাঙ্গিণী। কাঁধ অবধি বাহু দুটি নিরাবরণ। আই-ওয়ান্‌ চোখ ফিরিয়ে নিল।

হাত বাড়িয়ে দিল আই-কোর সামনে গিয়ে।

'আই-কো!'

'আই-ওয়ান্‌!'

তারপর সঙ্গিনীর হাত হতে ধরে জার্মান ভাষায় পরিচয় করিয়ে দিল আই-কোঃ 'আমার ভাই।'

শোনে আই-ওয়ান্‌। বোঝেও। ঠাকুর্দার সাথে বেড়াতে গিয়ে জার্মানী ভাষা শিখেছিল একটু। এখনও মনে আছে কিছুটা। কিন্তু এ মেয়ে কে? ঘৃণায় মন বিষিয়ে ওঠে। বয়স বেশী নয় মেয়েটির। কিন্তু অতি স্থূল দেহ—গাল দুটো লাল। উগ্র নীল চোখ; সোনালী চুলের রাশ সবুজ টুপীতে ঢাকা। পীত রংএর চামড়ার দস্তানা-ঢাকা হাত দুটি বাড়িয়ে দিল আই-ওয়ান্‌এর দিকে।

'আঃ কি ভালোই যে লাগছে আই-ওয়ান্‌, ভাই, তোমায় দেখে,' উচ্চ স্বরে হেসে ওঠে সেই মেয়ে। জার্মান ধরণে করমর্দনের পরমুহূর্তেই আই-ওয়ান্‌ আঁৎকে ওঠে—মহিলার বিচিত্রিত ওষ্ঠ দুটি ওর গালে চেপে বসেছে।

উদ্ধত স্বরে পরিচয় করিয়ে দেয় আই-কো, 'আমার স্ত্রী।' ওর নাম ফ্রীডা ফন রাইখোসেন। ওর বাবা জার্মানীর একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী।'

'তোমাকে যে চেনাই কঠিন, আই-ওয়ান্‌!' মাতৃ ভাষায় বলে আই-কো। বহুদিন মাতৃভাষায় কথা বলতে পায়নি। আজ সে সুযোগ পেয়ে আনন্দে প্রায় নাচতে থাকে আই-ওয়ান্‌।'

খুশি হবার আরও কারণ ছিল—দাদার বিদেশী বৌ বুঝতে পারবে না ওদের কথা।

আই-কোর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'আমি বড্ড বদলে গেছি, না রে?' বলে ও, 'উন্নতি হয়নি তেমন, তাই না?'

'কেমন যেন বুড়িয়ে গেছ।' বলে আই-ওয়ান্‌।

ঈষৎ হেসে জবাব দেয় আই-কো, 'এখন যে ভারিক্কী হয়েছি রে! তা ভালোই করেছিলেন বাবা। প্রথম প্রথম কি খারাপ লাগত। রীতিমত ঘেন্না

করত জার্মানীকে। কিন্তু ধীরে ধীরে ভালো লেগে গেল। ওঃ কত কথা যে বলবার আছে রে! কোথায় গিয়ে বলা যায়, বলতো! জাহাজ আবার থাকবেও না বেশীক্ষণ। কোথায় চার ঘণ্টা থাকবার কথা, না থাকছে মোটে একটি ঘণ্টা।'

'এটাতে নাই গেলে না হয়। কটা দিন থেকে পরের জাহাজ ধরো!' আই-ওয়ান্ বলে। কিন্তু সত্যি যদি রাজী হয় আই-কো, ওই বিবিকে নিয়ে করবে কি আই-ওয়ান্!

'তা হয় না রে,' আই-কো জানায়, 'তা হয় না। হুকুম। নড়চড় হবার যো নেই। যেতেই হবে। তা এখন চল না কোথাও।'

কেমন একটু অনিশ্চিত সুরে বলে আই-ওয়ান্, 'ওই ছোট রেস্তরাঁটায় চলো না!'

'বেশ বেশ তাই চল্। চল, ফ্রীডা!' বলেই আগে আগে চলতে সুরু করল আই-কো। পেঁৗছে জায়গা করে বসে পরিবেশিকাকে হাঁক দিল।

চারদিকের সব চোখ এদিকে ফিরল। দু'দিকে দুই চীনা ম্যানের মাঝখানে শ্বেতাঙ্গিনী। দেখবার জিনিস বটে। আই-কো গ্রাহ্য করে না।

বিয়ারের ফরমায়েস দিয়েই আই-ওয়ানের দিকে ঝুঁকে বসল আই-কো। তারপর চীনে ভাষায় আরম্ভ করলঃ

'তোর এখানে আর থাকা হবে না। এক্ষুণি দেশে চলে যা।'

'কিন্তু, কিন্তু'...আই-কোর দিকে তাকিয়ে কথা বেধে যায় আই-ওয়ানের মুখে, '—কিন্তু কি করে যাব? বৌ-ছেলে?' আই-কোর মুখ কেমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বলেঃ

'সে কি? কিছুই জানো না?'

একটা অজানা ভয়ে গলা কাঠ হয়ে যায় আই-ওয়ানের, কোনও মতে বলেঃ 'কিসের কথা বলছ?'

'কিছুই শোননি?' উত্তেজিত হয়ে ওঠে আই-কো।

'না কিছুই জানিনে তো।' আই-ওয়ান্ বলে।

'জাপানীরা পিকিং নিল বলে।' ফিস্ ফিস্ করে বলে আই-কো।

'পিকিং?' কেমন যেন বোকার মত শোনায় আই-ওয়ানের গলা।

'কেন এখানে কি এ ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ হয়নি?' উত্তেজিত স্বরে আই-কো জিজ্ঞাসা করে।

চারদিকে ছোট ছোট টেবিল ঘিরে জাপানীরা হাসি গল্পে মেতে উঠেছে। কেউ চা খাচ্ছে, কেউ বা মদ। মাথার ওপরে নির্মেঘ নীল আকাশ। উজ্জ্বল রংএর কিমোনো-পরা মহিলারাও আছেন। একদিকে টেবিলে কয়েকজন আমেরিকানের ছোট্ট একটা দল—জাহাজের একজন অফিসারের সঙ্গে চা খাচ্ছে। আর এদের পাশেই বসে আছেন আই-কোর জার্মান স্ত্রী। বীয়ার শেষ হয়েছে। এখন মাংসল কনুই দুটো টেবিলে ভর দিয়ে বসে একটু একটু কেইক্-এ কামড় দিচ্ছেন।

অন্যদিকে তাকিয়ে আই-ওয়ান্ বলেঃ 'কিছু হয়েছে—শুধু নাকি সৈন্য-চলাচল আর কিছু না।'

ঊর্ধ্ব-শ্বাসে বলে চলে আই-কোঃ 'কয়েক সপ্তাহ আগেই বাবা সব বুঝতে

পেরেছিলেন। তাই আমাকে টেলিগ্রাম করেন। জেনারেলিসিমো নাকি হুকুম করেছেন আমায় দেশে আসতে। বহু সৈন্য চাই তো! আদা-নুন খেয়ে লোক জোটাতে হবে। যুদ্ধ হবেই, বুঝেছ? এবং শেষ পর্যন্ত আমরা লড়ব অদৃষ্টে যাই থাকুক।'

আই-কোর কথা আই-ওয়ানের মগজেই যেন ঢোকে না।

'কিন্তু কই—কেউ তো—কিছু জানে না!' ও কথা কইতে পারে না; সমস্ত নিশ্বাস যেন নিংড়ে বের করে নিয়েছে ওর ফুস্‌ফুস থেকে। 'কাগজেও তো কই তেমন কিছু দেখিনি...' আবার বলে আই-ওয়ান্।

'এই বেটারা—' ঘৃণায় বিকৃত হয়ে ওঠে আই-কোর স্বর; 'তা বড় কত্তারা কি আর কাউকে কিছু জানতে দেন? কিন্তু আমি বলছি, আই-ওয়ান্ শুনে রাখ। যুদ্ধ হবেই; সাংঘাতিক যুদ্ধ; এমন যুদ্ধ আমাদের দেশে কস্মিন কালে হয়নি। চল ভাই, আমার সাথে চল ফিরে দেশে'।

'এক্ষুণি?'

'এক্ষুণি'। টাকা আছে আমার কাছে। জাহাজেই টিকিট পাওয়া যাবে। বাবা বলে দিয়েছেন—'

'কিন্তু আমার ছেলে, বৌ?'

'তোমার ওপর এখন দেশের দাবী ছাড়া আর কারো কোন দাবী নেই। বিশেষ করে এই সঙ্গিন সময়ে। শুধু ঘেন্না—জাপানী ব্যাটাদের শুধু ঘেন্না—। কর্তব্য বলছিস্! ও ব্যাটাদের ওপর ওই কর্তব্য।' আই-কোর মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে। কেমন যেন নাটকীয় ভাব। আই-ওয়ানের মনে পড়ে—ছোটবেলা থেকে ঐ ওর স্বভাব। নাটুকে-পনা ভালোবাসে ও। হুঁশিয়ার হয় আই-ওয়ান।

...তামা...তামা...জাপানী মেয়ে তামা...আই-ওয়ানের বুকের মধ্যে গুঞ্জরণ হতে থাকে...প্রিয়া তামা...দয়িতা তামা। দাদাও বিদেশিনী বিয়ে করে নিয়ে এল। কিন্তু এই তো তার নমুনা। ওই মেয়ের পাশে অনুগতা, প্রেমময়ী, সুশীলা তামাকে অধিক-মনোজ্ঞা মনে হয় আজ।

'কিন্তু লড়াই বাঁধবে কেন, বুঝতে পাচ্ছিনে তো! আমরা তো এদের শত্রু নই!' আই-ওয়ান্ জিজ্ঞাসা করে।

আই-কো উত্তেজিত হয়ে ওঠেঃ 'নই মানে? নইলে এতদিন থেকে আমাদের ওপর হামলা করবার জন্য পাঁয়তাড়া চলছে কেন? কোথায় ছিলি এতদিন! লুকোশিয়াও-এর ব্যাপার শুনেছিস তো!'

'তা শুনেছি' আই-ওয়ান্ বলে, 'কিন্তু খবরের কাগজে তো লিখছে, একটা বন্ধুত্ব-পূর্ণ মীমাংসা হয়ে যাবে তার।'

'মীমাংসাই হবে বটে! পিকিং খুইয়ে, তাই না?' আই-কো যেন প্রশ্নই করে আই-ওয়ানকে। ওর স্বরে উত্তেজনা।

আই-ওয়ান কুণ্ঠিতভাবে জবাব দেয়ঃ 'না, কই? তা তো বলেনি!'

'জাপানী বিয়ে করে তুই একদম জাপানী বনে গেছিস। গোল্লায় গেছিস।' ধমকে ওঠে আই-কো।

'না, না, তা হব কেন,' ওর কথা কেড়ে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে আই-ওয়ান্ বলে,

'তবে বড্ড হঠাৎ হল কি না! তাই কিছুই জানতে পারিনি। আর বাড়ি থেকে চিঠিপত্র তো পাচ্ছি না।'

আই-ওয়ান্ বলতে চাইছিল, তা তুমিও তো জার্মানী বউ বিয়ে করেছ, তুমি কি জার্মান বনে গেছ? বলল না, পাছে আই-কো বলে বসে আমার বউ জার্মান বটে কিন্তু জাপানী নয়।

'চিঠি আসছে না জানলি কি করে,' আই-কো বলে, 'সেন্সর না হয়ে এক-খানা চিঠিও আসে না জেনে রাখিস। বাবা লিখেছেন ঠিকই, তোর হাতে এসে পৌঁছয়নি। আর ওদিকে তোর চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবছেন বাবা। তাই আমায় তার করেছিলেন যেন তোর সাথে দেখা করে জেনে যাই ব্যাপারটা কি।'

আই-ওয়ান্ বলেঃ 'মিঃ মুরাকী এদিকে আমায় বলেছেন বাবা নাকি আরেকটা ব্যাংক খুলবেন কোথায়, তার ব্যবস্থা করতে সেখানে গেছেন। আমি তো নিশ্চিন্ত আছি সে জন্যই বাবার লিখতে দেরী হচ্ছে।'

'কোন ব্যাটা নিপ্পনীকে বিশ্বাস নেই। চল, দেশে চলে আয়, আই-ওয়ান্' আই-কো বলে।

কথা বলতে বলতে সময়ের হুঁশ নেই ওদের। কথা বলে, চুপ করে থাকে ...বহুক্ষণ চলে গেল এমনি করে। সন্ধ্যা হয়ে এল। সমুদ্রের জলে অর্ধলীন বিদায়-রাঙা সূর্য। ফ্রীডা বসে বসে হাই তুলছে। সকলে উঠে পড়ল। ফ্রীডা আগে আগে হাঁটতে লাগল।

আমেরিকানরাও উঠছে এবার। আশেপাশে সকলের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে কথায় মশগুল হয়ে ছিল ওরা। ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। দুজন চলে যাবে অফিসারের সাথে। বাকীরা থাকবে। একটি তরুণী চীৎকার করে উঠলঃ 'সাংহাইয়ে তো যাচ্ছ, দেখো বাবা, সামলে থেকো। ওপর থেকে বোমা পড়তে শুরু করলে টুপীটা খুলে ফেলো যেন। তোমাদের লাল চুলে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যাবে যে তোমরা চীনা-ম্যান্ নও।'

লাল-চুল-ওয়ালা একটি ছোকরা হেসে উঠল।

'চলি তাহলে, মলি! পরে দেখা হবে। তুমি তো আর যাচ্ছ না। তা ওখানে এখন মেয়েদের যাওয়া ঠিকও নয়।'

জাহাজের সিটী শোনা যায়।

'শুনছ?' আই-কো বলে দাবীর সুরে। 'সবাই জানে হে, সবাই জানে। হাঁদা জাপানীগুলো ছাড়া দুনিয়ার সবাই জানে যে বহু মানুষ মারা পড়েছে। অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হবে। জাগাতে হবে আমাদের দেশকে। সারা দেশকে উঠতে হবে। তৈরী হতে হবে লড়াইএর জন্য।'

জাহাজের কাছে এসে আই-কো দাঁড়িয়ে পড়ে বললঃ 'চল্ তাহলে।'

'এক্ষুণি এমনি ভাবে কেমন করে যাব?' আই-ওয়ান্ জবাব দিল।

'কেন? পারবি না, কেন শুনি?'

'এমনি হুট্ করে সবাইকে ফেলে যেতে পারি? মিঃ আর মিসেস্ মুরাকী তো কোনদিন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি।'

'ওঁরা জাপানী, ওই যথেষ্ট।' মনে করিয়ে দেয় আই-কো।

'তা হোক—আমার সাথে কোন শত্রুতা করেনি।'

'তাহলে শোন, বলছি। আমি তোর বড় ভাই, বাবার হয়েই বলছি। এখন যখন গেলিই না। যত শিগ্গির হয় চলে আসিস্ কিন্তু। যত শিগ্গির মানে-সপ্তাহ নয়, মাস নয়, কদিনের মধ্যে। পারিস তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়।'

ডেকের ওপর খালাসীরা কর্ম-ব্যস্ত। সিঁড়ি লেগে গেছে। যাত্রীরা উঠছে।

আই-কো আবার বলেঃ 'ঘন্টা—ঘন্টা—কয়েক ঘন্টার মধ্যে রওনা হবি। শুনছিস? আর যেখানেই থাকো—জাপানে নয়।'

আই-ওয়ানের কাঁধ ধরে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বিদায় নিল আই-কোঃ 'আচ্ছা, চল্লাম। শিগ্গিরই তো দেখা হচ্ছে। দেরী করিসনি, কিন্তু। আমি গিয়েই তোকে সত্যি অবস্থা কি খুলে জানাব।'

জাহাজ ছাড়ল। কূলের আলিঙ্গন ছেড়ে ধীরে ধীরে ভেসে গেল দূরান্তরের পাড়িতে। ডেকে দাঁড়িয়ে আই-কোর বিদেশিনী বৌ হলদে-দস্তানা-পরা হাতখানা নেড়ে বিদায় জানাল। দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জাহাজ। আই-ওয়ান্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কিছুই তো ও শুধালো না আই-কো কে; কোন কথাই হল না ভাইয়ে ভাইয়ে। দূরেই ছিল ওরা, আজ যেন আরো দূরে চলে গেল।

রাতের ট্রেনেই ফিরল আই-ওয়ান্। বাড়িতে পেঁৗছুল ভোরে. তামা তার প্রাণ-ভরা অভ্যর্থনার ডালি সাজিয়ে গেটেই দাঁড়িয়ে ছিল। বাগানের রাস্তা দিয়ে দুই জনে বাড়ীর দিকে চলল। আই-কোর বিদেশী স্ত্রীর কথা মনে করে আই-ওয়ানের মনটা নূতন করে বিষিয়ে উঠল। কিন্তু তারি মধ্যে ওর মন হিসাব করতে বসল জাপানী তামাকে কেমন দেখায়। সেই আগে স্কুলের পোষাকে আর চামড়ার জুতোয় ওকে খুব একটা জাপানী তো মনে হত না, একটি তরুণী—ঐ পর্যন্ত। এর বেশী আর কিছুই মনে হত না আই-ওয়ানের।

হঠাৎ বলে ফেলল আজঃ 'কি যে কেবল কিমনো আর গেটা পর আজকাল সব সময়।'

বিনয়-নম্র কোমল মৃদু হাসি হেসে তামা বলেঃ 'কেন? তোমার ভালো লাগছে না বুঝি? খুব আরাম কিন্তু পরতে।'

কি করে বলবে আই-ওয়ান্, ভালো লাগছে না! এতদিন তো চোখ তুলে ও দিকে তাকায়ও নি। সত্যি কথা বলতে গেলে, বড় নারাঙ্গী রঙের ফুল-ছাপা কিমনোটা তামার ডাগর ডাগর কালো চোখ আর এপ্রিকট-রং এর সাথে ভারী মানিয়েছে। দরজার কাছে এসে মাটিতে বসে পড়ে সেবিকার মত স্বামীর জুতো খুলে দিয়ে হালকা চটি জোড়া পরিয়ে দেয় তামা। আগে বাধা দিয়েছে আই-ওয়ান্। কিন্তু তামা শোনেনি। 'আর তো কারো জন্য করতে যাই না। বরাবর ওই এক জবাব ছিল তামার। আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে ওর। শুধু অভ্যাসই নয়—পায়ের কাছে আনত ওই কৃষ্ণ-কালো মাথাটার সাথে বড় মিঠে একটা অন্তরঙ্গতাও আছে। মনে হয়, আর কোন মেয়ে এমন করে করত!

জীরো ছুটে আসে।

'গঙ্গীরো কোথায় গেল?' ওকে একা দেখে জিজ্ঞাসা করল। দুভাই সর্বদাই এক সাথে থাকে।

'ঘুমুচ্ছে।' জীরো খবর দিল।

বেশে বাসে চেহারায় পাকা জাপানী করে তুলছে জীরোকে ওর মা। চুলটিও ঠিক তেমনি করেই আঁচড়ানো। আই-ওয়ান্ বলে!

'গেটা পরে পরে পা দুটো কেমন বাঁকা হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? ওকে চামড়ার জুতো এনে দাও, তামা।'

'স্কুলে ভর্তি হবার আগেই?' অবাক হয়ে তাকায় তামা, 'বড্ড দাম যে!'

'হলই বা। এনে দাও।'

জবাব দিল না তামা। জুতোর কথা শুনে—জীরো আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু আধপথেই সেই উচ্ছ্বাস দাবিয়ে দেয় তামা। আই-ওয়ান্ লক্ষ্য করে কথাটা তামার পছন্দ হয়নি এমনি সময় ঝি চলে গেল সামনে দিয়ে। ঘুমন্ত গঙ্গীরো তার পিঠে বাঁধা। জানে, তামা অসন্তুষ্ট হবে তবু বলে আই-ওয়ান্ঃ

'দিব্যি তো হাঁটতে পারে খোকা। তবু আবার ওকে পিঠে বাঁধা কেন? বুজীর মত পা দুটো বাঁকা হয়ে উঠছে, খেয়াল করেছ?'

তামা চটে ওঠে।

'আই-ওয়ান্, যা বলার পরে বলো। জীরোর সামনে নয়। ছোট শিশুকে মানুষ কেমন করে করতে হয়, জানো না। ঘুমিয়ে পড়েছে—পিঠে বাঁধা রইল বাস্ কোন ভয় নেই। তাছাড়া কত আরাম। মানুষের দেহের গরমে কচি দেহটা গরমও থাকে, সর্দি-কাশি হওয়ার ভয়ও থাকে না।'

'শুইয়ে দাও বলছি। ও সব চলবে না!' আই-ওয়ান্ বলে।

মনে মনে অপ্রসন্ন হলেও অত্যন্ত কোমল স্বরে স্বামীকে বললঃ 'দিচ্ছি দিচ্ছি। তুমি ভেবো না। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তো! হবে না, সারা রাত্তিরের ট্রেণের ধকল। যা তো জীরো এখান থেকে। না ডাকলে আসবিনে কিন্তু!'

'কে বললে ক্লান্ত হয়েছি!' জবাব ছুঁড়ে মারে আই-ওয়ান্ আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেল। হবেও বা—হয়তো ওর নিজেরই দোষ। তামার সাথে খুব খানিকটা ঝগড়া করতে পারলে যেন ভালো লাগত। আজ এরকম কেন হচ্ছে? আর তো কোনদিন হয়নি। কিন্তু ঝগড়া হবার কোন উপায় নেই। তুমি যতই বল তামা জবাব দেবে না--তারপর তোমাকে একলা থেকে ঠাণ্ডা হবার সুযোগ দিয়ে সামনে থেকেই চলে যাবে। আই-ওয়ানের মনে হয়, তা নয়, আড়ালে যাবার অন্য দরকার আছে তামার। পুরুষদের, বিশেষ করে স্বামী-জাতীয় পুরুষের গরম মেজাজ ঠাণ্ডা কি করে করতে হয় বিয়ের আগে তার তালিম পেয়েছিল, সেই পুরানো পড়াই মনে করতে বসে আড়ালে গিয়ে। কারণ খানিক পরেই আবার একটা ফুল, বা গরম চা, বা একটু খাবার— কিছু একটু হাতে নিয়ে ফিরে আসে। কত যেন বাধ্য, অনুগতা রমণী! এজন্য কখনও সখনও মেজাজ খারাপ হলে লজ্জাই বরং পেয়েছে আই-ওয়ান্। কিন্তু আজ ওর রাগ হয়—বাধ্য না আরো কিছু। যত দেখান ভালোমানুষী, ছল, কৌশল। আসলে কিন্তু তামার নিজের কথাই ষোল আনা। কিছুর মধ্যে এক চুল এদিক ওদিকও করবে না, তুমি যতই বল।

এসব ভেবে মনটা বড় খারাপ হয়ে রইল। একটি কথাও কইল না খাবার সময়। নিজের ওপরই রাগ হতে লাগল, কারণ তামা একটুও রাগ করেনি, ঠিক তেমনি আছে—হাসি-খুশি, সহজ সরল, তাজা প্রাণের সেই মেয়েটি। ছেলেমানুষীতে, গোঁড়ামীতে নূতনে, পুরানোয় মিলিয়ে এক বিচিত্র মানুষ ও! ওর একমাত্র দোষ—যেভাবে যা করতে ও একদা শিখেছিল, পরম নিষ্ঠা সহকারে তাই আঁকড়ে রেখেছে। হঠাৎ ওর মনে হল—এ অপরাধ তো তামার একার নয়—জাপানী মাত্রেরই। যা বলা হয় তাই শুধু করে জাপানীরা। প্রত্যেকেই তাই। কিন্তু বলার মালিক কে? শেষ কথা কার? জনতার আত্মা প্রেরণা পায়—কোথায়? সম্রাট? বহুবার দেখেছে আই-ওয়ান্ সম্রাট্ ও তাঁর মহিষীর ছবি। কিন্তু ওরা কি মানুষ! স্থানু-ভূত দুটো পুতুল রূপী জীব যেন। ইস্কুলে, কলেজে, হাঁসপাতালে সরকারী বেসরকারী প্রত্যেকটি জন-সাধারণের প্রতিষ্ঠানে—সর্বত্র আছে ও ছবি—বেদীর ওপর স্থাপিত—ঠিক যেন পুজোর মন্দিরে ঠাকুরের বিগ্রহ। পুতুলই। শুধুই শিখে শিখে, শেখা পথ ধরে, শেখা কাজ করেই চলেন সম্রাটও। গোটা জাতিটাই ঐ ভাবে তৈরী হয়েছে। এক ছাঁচে ঢালাই প্রত্যেকটি মানুষ! আই-ওয়ানের ছেলেরাও তাই হবে।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল আই-ওয়ান্। আফিসে যেতে হবে। টুপী, নেই তো এখানে। একটু আগেই তামা ঘর থেকে চলে গেছে।

চা নিয়ে এসেছিল ঝি, তাকে হেঁকে বলল: 'আমার টুপীটা?'

গাঞ্জীরো পিঠে বাঁধা নেই এখন। আই-ওয়ানের, হাঁকে চম্‌কে উঠল ঝি। পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে পাগলের মত স্থানে অস্থানে খুঁজতে লাগল। অধীর হয়ে চীৎকার করে উঠল আই-ওয়ান্: 'তামা, আমার টুপী কোথায়?'

ছুটে এল তামা। কোলে গাঞ্জীরো, কাঁদছে।

'সেকি? তোমার টুপী? কোথায় যাবে আবার?'

পেছন পেছন জীরো এল থপ্ থপ্ করে—টুপীটা তার মাথায়।

তামা টুপীটা কেড়ে নিয়ে ধমকাতে লাগল ছেলেকে:

'লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বাবার ভালো টুপীটা নিয়ে তোমার খেলা?'

টুপী মাথায় দিতে দিতে আই-ওয়ান্ বলল:

'ছেড়ে দাও। বেশ করেছে। মানুষ ও। পুতুল নয়। মানুষ স্বাধীন-ভাবে চলবে। তার স্বাধীন ইচ্ছে আছে। ও যে তা একটু দেখাতে পেরেছে আজ, আমার বড় খুশি লাগছে।'

জবাব দিল না তামা। ক্রন্দনপর শিশুকে ঝির কোলে দিয়ে ইসারায় তাকে যেতে বলে দিল। তারপর হাসি মুখে স্বামীর সাথে সাথে গিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আই-ওয়ান্ ভাবে—শিখেছে কিনা! স্বামী বাইরে যাবার সময় হাসি মুখ দেখাতে হয়— শেখা বিদ্যা! নিজের ওপর ঘৃণা হতে লাগল।

অনেকটা সহজভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেল আই-ওয়ান্। যেতে যেতে ভাবতে লাগল কোন অঙ্কের যবনিকা উঠবে এখন ওর গৃহে। গৃহকর্তা নেই হয়তো বিদায় বেলার ওই হাসিটুকু তুলে রাখবে এখন তামা—ও সন্ধ্যায় ফিরলে আবার তা ফুটে উঠবে তার ঠোঁটের কোণে। হয়তো এরই মধ্যে গাঞ্জীরো আবার বাঁধা পড়েছে ঝির পিঠে। এতদিন এসব প্রশ্ন ওর মনে ওঠেনি। আজ চঞ্চল হয়ে উঠল। ওর অনুপস্থিতিতে কি হয় ওখানে কে জানে?

গভীর রাত। তামা ঘুমিয়ে পড়েছে। আই-ওয়ানের চোখে ঘুম নেই। মাথাটা দপ্ দপ্ করছে। ঘন্টাখানেক তামা ওর কোমল হাতের দৃঢ় আঙ্গুল দিয়ে মাথা টিপে দিয়েছিল। কি আল্‌তো স্পর্শ—ত্বকের ওপর দিয়ে ছুঁই না ছুঁই করে চলছে ফিরছে আঙ্গুলগুলো কপালের শিরাগুলিকে কঠিন নিষ্পেষণ করে। কিন্তু একটুও বুঝতে পারছিল না আই-ওয়ান্।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পর আই-ওয়ান্ বলেছিল ঃ

'সবই তো জানো দেখছি!'

'ভালো লাগছে একটু!' তামা জিজ্ঞাসা করেছিল।

'লাগছে।'

একটু পরে আবার ঠিক তেমনি ব্যথা। কিন্তু তামাকে জানতে দিল না আই-ওয়ান্। যথা-সাধ্য তামা করেছে। এ ব্যথা যেখানে সেখানে ওর হাত পেঁছবে না। এ ব্যথা আত্মার গভীরে। আত্মা? আত্মার কথা বহুকাল ভুলেছিল আই-ওয়ান্। তামা ওর দেহটাকে অসীম সুখে রেখেছে। স্ত্রীর এ-দান ও মাথা পেতে গ্রহণ করেছে। আজ ও শুতে যাবার আগে ওর কি লাগবে না লাগবে ভালো করে দেখে তবে শুয়েছে তামা।

চিন্তার লহর চলে। সত্যি কি তামার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নেই? আগে তো ছিল! অতীতের এক পর্বে যে-দৃঢ়তা দেখিয়েছিল তামা, তা কি ওর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা নয়? তাই। তবু মনে হয়—ঠিক তা নয়, অন্য কিছু। কি অন্য কিছু? সংস্কার? তাও নয়—লেখা-পড়া শিখে ওর সংস্কার তো ভেঙে গেছে। তবে? কি জানি। কি জানি একটা—বোধের অগম্য। এদের সবার মধ্যেই আছে। মা, বাবা, বুজী, শিও—সকলের মধ্যে। আকিওরও ছিল। তারই জোরে আকিও মরল; অমন হেলায় মরল সুমীর মত সাধারণ মেয়ে। হয়ত এ দৃঢ়তা জাপানীদের প্রকৃতিরই অঙ্গ! এখানে আসার আগে এ বস্তু ও দেখেনি। নিজেদের বাড়ির কারো মধ্যেই নয়। এমন কি এন-লানের দল-ভুক্ত বিপ্লবীদের মধ্যেও দেখেনি। অবশ্যি তাদের চরিত্রেও প্রচুর দৃঢ়তা ছিল—কিন্তু সে অন্য রকম; বুদ্ধি দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ও বিশ্বাসের ওপরই সে-দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল—জাপানীদের মত সহজাত বা প্রকৃতিগত নয়। আই-ওয়ানের ছেলেরাও কি এই বিশিষ্ট গুণের অধিকারী হয়েছে? জীরোর গোল দৃঢ় মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এখন কিছু বোঝা যায় না। তবে নাই বা হবে কেন? তামার রক্তের ধর্ম তার রক্তের সঙ্গেই তার সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। অক্ষয় হয়ে থাকবে সে-রক্তের বীজ।

অর্থাৎ আই-ওয়ানের সন্তানদের আত্মায় জাপানীত্বই অক্ষয় হয়ে থাকবে, যেহেতু তামা জাপানী। হঠাৎ আই-ওয়ানের কেমন মনে হয়—পাশে শুয়ে-থাকা এই নারী ওর কেউ নয়—একে ও চেনে না—। রোজকার মতই নিঃশব্দে ঘুমুচ্ছে তামা। বুঝি নিশ্বাসের শব্দও হয় না। আই-ওয়ান্ ঘুমের মধ্যে নড়ে চড়ে ওলট পালট হয়। কিন্তু তামার তনু দেহটি একটুও নড়ে না। ভোরবেলা যখন ওঠে, একটি চুলও স্থানচ্যুত হয় না। অর্থাৎ শয়নে জাগরণে আত্ম-শাসনের শিক্ষা পেয়ে এসেছে ওরা; তাই প্রতি মুহূর্ত এমন করে নিয়ন্ত্রিত। এমন করে প্রতিটি মানুষ আত্ম-শাসিত। এক স্থির কেন্দ্রে রয়েছে এই সংযমের উৎস। সেখান থেকেই সমগ্র জাতির সত্তায় তা ছড়িয়ে

গেছে। এ-বাঁধন ওদের কিছুতেই স্খলিত হয় না। ভূমিকম্পের কথা মনে পড়ে। একটি প্রাণীও ভয় পায়নি। এক ফোঁটা নালিশ-ফরিয়াদ করেনি। কিন্তু আই-ওয়ানের চাইতে কম অনুভূতিশীল দৃষ্টিতেও ধরা পড়বে ওদের আভ্যন্তরীণ তীব্র যাতনা।......তবু বাঁধ ভাঙেনি কি বুজীর? তাও ভেঙেছে। একবার বাঁধ ভাঙলেই ওরা পশু। বুজীর মত ভালো ছেলেও—শুধু ভালো নয়, সব থেকে ভালো—সেও তাই হয়েছিল। সত্যি বুজী ভাল, এত ভালো খুব কমই হয়। নিজের কৃতকর্মের জন্য ভয়ে ঘৃণায় ও জর্জরিত হয়ে আছে। নিজের কাছে নিজে লজ্জায় মরে আছে।

আর তামা......তামার যদি রাশ ছেঁড়ে? নৈশ-প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় ঘুমন্ত মুখখানা দেখে। ওপাশে গঙ্গীরো—জাপানী শিশুরা মায়ের কাছেই শোয়। একদিন প্রস্তাব করেছিল আই-ওয়ান্—ঝির কাছেই শুক না ও। চমকে উঠেছিল তামা। ছেলেদের কিছু হলে কি বুঝবে ঝি? সত্যি ওদের কিছু হবার আগেই তামার রক্তের মধ্যে খবর পেঁাছে যায়।

তীব্র আক্ষেপে ওর মাংস-পেশীগুলি পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে। জোর করে শান্তভাবে শুয়ে থাকে আই-ওয়ান্, পাছে তামার ঘুম ভেঙে যায়। এই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্ষীণতম শব্দও কোলাহল হয়ে উঠবে। ধীরে ধীরে অনুভব করে ও—তামার শান্ত নিশ্চল দেহটি থেকে কি যেন বিচ্ছুরিত হয়ে ওর দেহের রোমে রোমে সঞ্চারিত হচ্ছে। ওর চঞ্চলতা শান্ত হয়ে এল। দেহের আক্ষেপ স্তিমিত হয়ে এল। একটা স্নিগ্ধ উষ্ণতার মত সুপ্তি ছেয়ে এল চিত্তের আকাশে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া ঝিমিয়ে এল; শুধু জেগে রইল অন্তর্লোকের চির-জাগ্রত কেন্দ্রগুলি। আর দেহের অতি গভীরে, মন্থর গতিতে বৃত্তে বৃত্তে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল চিন্তার দল। থাক না, আবার কেন তছনছ্ করে দেবে জীবনটা? কত যত্নে কত কষ্টে ও স্থিতি পেয়েছে। নিজের ভিটে মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে এই অচিন্ ভুয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল ওকে ওর ভাগ্য। সেদিন ছিল ও একা। একাই ও খুঁজে পেয়েছে তামাকে। ঘর বেঁধেছে তাকে দোসর করে। ওর আপন ঘর আপন গৃহ। ওর সবখানি, ওর সমস্ত সত্তা জড়িয়ে আছে এই সংসারের সাথে সাথে। যেখানে যাই ঘটুক, এ বাঁধা ঘর ও দুহাতে আগলে রাখবে। আবার এখনি সব খুইয়ে দেউলে হতে পারবে না আই-ওয়ান। সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আবার ওকে ভিখারী করে ছেড়ে দেবে, তা হবে না।

হাত বাড়িয়ে তামার মুখখানা ছোঁয়। কানে কানে ডাকেঃ

'তামা!'

সামান্য শব্দেই জেগে ওঠে তামা। আজও উঠল।

'কি হল?' ব্যস্ত হয়ে শুধায়।

'না, অমনি। একটুখানি কথা কও শুধু।' মিনতি করে আই-ওয়ান্, 'ঘুম হচ্ছে না। সেই থেকে জেগে আছি। কি সব আবোল তাবোল ভাবনা আসছে মাথায়।'

ওর গায়ে হাতখানা রাখে তামা।

'এত ভাবছ কেন? ছিঃ, ভেবো না।' আদরের আদেশের সুর।

'না, আর ভাবব না।'

পরম অন্তরঙ্গতায় নিস্তব্ধ হয়ে এলিয়ে থাকে দুজন। তামার বুকের ঘন-উষ্ণতায় যেন অভয় বাণীর উদ্ঘোষণা—। এই বক্ষই ওর আশ্রয়, এর বাইরে যা খুশি তা হোক।

পরিপূর্ণ শান্তি। কোন অশান্তিই নেই। খুব শীত পড়েছে এবার। যেমন ঠান্ডা তেমনি রোদ। অফিস থেকে ফিরে সবাইকে নিয়ে রোজ সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরোয় আই-ওয়ান্। কোনদিন বাসে করে দূরে, কোনদিন বা রিক্স চড়ে কাছেই যায়। 'সাগর-পারাবারের তীরে' ছেলেরা খেলা করে। কখনও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে গঞ্জীরো। উষ্ণ বালির মধ্যে গর্ত করে শুইয়ে দেয় ওকে ঝির পাহাড়ায়। সন্ধ্যে বেলা, হয় কোন ছোট রেস্তরাঁয়, নয় ফিরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে কিছু খেয়ে বাড়ি ফেরে।

মিঃ মুরাকীর ওখানে খুব ঘন ঘন যাওয়া আসা। যেদিন যায় রাত্তিরের খাওয়া সেরেই ফিরতে হয় গৃহকর্তার নির্বন্ধে। তামা গুমর করে বলেঃ 'বুঝতে পারছ না? জীরো, জীরোর জন্যই। জীরোকে ছাড়তে চান না বাবা। মা বলে কি জানো? শিওর ছেলেদের চাইতে নাকি জীরো বেশী চালাক।'

তা সত্যি, অমন সুন্দর ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। ঐ বয়সের ছেলেদের চাইতে ও অনেক বেশী লম্বা; মাথাটা দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে থাকে সবার ওপর দিয়ে। তামার মত ছোট ছোট হাত পা হয়নি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন আই-ওয়ানের মত সরুটে আর লম্বা ছাঁদ, প্রায় মেয়েদের মতই নরম ওর দেহ। জীরো হাসিখুশি, উচ্ছল, ব্যঙ্গ-প্রিয়। খাওয়ার পর নাতির হাত ধরে একা একা বাগানে বেড়াতে ভালো বাসেন মিঃ মুরাকী। আই-ওয়ানের বড় ভালো লাগে দেখতে—জীবনের দুই বিপরীত ছবি। কোমল ধূসর পরিচ্ছদ ঢাকা ভঙ্গুর জরা-মূর্তি, তার পাশে টগবগিয়ে চলেছে প্রোজ্জ্বল জীবন-প্রভাতের একটি রশ্মি।

ঘরে ফিরেই বৃদ্ধের চঞ্চল চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জীরো সামনে থেকে সরে যেতে বলেই ফেলেছেন কতদিনঃ 'খাসা ছেলে। হাজারে এক মেলে না। কেমন, আই-ওয়ান্, দেখ এখন। বলেছিলাম কি না যে চীন আর জাপান মিলে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় জাতি সৃষ্টি হবে। মিলতেই হবে চীন জাপানকে।' বলে হাসেন পুরানো দিনের সেই শুকনো খট্‌খটে হাসি। সাথে সাথে সবাই হাসে। ছেলের প্রশংসার বিনিময়ে শ্বশুরের সাত খুন মাপ এখন আই-ওয়ানের কাছে। সব দিক দিয়ে সময় ভালোই যাচ্ছে। বুজীর ব্যবহারও প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আগের মত এখন আবার গ্রাম্য হাসি-মস্করাও করে কখনও কখনও। সেদিন বলছিলঃ

মনে আছে রে, আই-ওয়ান্? সেই যে বলতাম, আমি কুচ্ছিৎ মেয়ে বিয়ে করব! তা মন্দ নেই কিন্তু। বেশ আছি। মাথা উঁচু করে কথাটি কইতে পারেন না তিনি। বুঝলে হে! একেবারে খাঁটি জাপানী বউ আমার সেৎসু।'

লজ্জায় লাল হয়ে হাসে সেৎসু। বুজী যা বলে তাই ওর ভালো লাগে। কখনও জবাব ফিরিয়ে দেয় না। সবাই ভালোবাসে বৌকে। লেখা পড়া জানে

না। অতি কষ্টে বানান করে পড়ে একটু আধটু। স্বামী আর শ্বশুর শাশুড়ীর সেবাই ওর একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য। বিয়ের অল্প পরেই গর্ভবতী হয়ে বহু-পুত্রবতী মায়ের ভূমিকায় পদার্পণ করল সেৎসু নিতান্ত ঠান্ডা ভাবেই।

আই-ওয়ান্ ভেবেছিল ওর শান্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে। কিন্তু ক্ষণিকের আঘাতে সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল একদা অতি আচম্বিতে।

সেদিন ছিল মিঃ মুরাকীর জন্মদিন। সত্তর বছর পূর্ণ হল। বিশেষ সমারোহের উৎসব। ইয়াকোহামা থেকে শিও এসেছে সপরিবারে। বিরাট মধ্যাহ্ন-ভোজের আয়োজন হয়েছে এক বড় হোটেলে। শহরের বণিক সম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হয়েছেন। উপহার আপ্যায়নের স্রোত চলছে। অতিথি অভ্যাগতরা আসছেন—বারে বারে উঠে তাঁদের অভিবাদন করতে হচ্ছে। অভিনন্দনের উত্তরে, একটা বক্তৃতাও দিতে হল মিঃ মুরাকীকে। মিঃ মুরাকী বড় একটা বাড়ির বাইরে আসেন না আজকাল। আজ আসতে হয়েছে। বড় ক্লান্ত বোধ হতে লাগল।

বিকেলের জন্য তাই কোন ঝামেলা রাখা হয়নি বাড়িতে। ভয়ানক গরম। যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। চারদিকের সব পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাতালে বসে ছিল সবাই। তিনদিকেই বাগান। পড়ন্ত বেলার কোমল আলোয় ভরে গেছে বাগানখানা। ছেলেরা ঝরনার ধারে খেলছে, বড়রা বসে দেখছে। মিঃ মুরাকী পাইপ টানছেন। শিও কাছে বসে। শ্রীযুক্তা মুরাকী অভ্যাস মতই হাঁটু গেড়ে বসে আছেন চুপচাপ। বুঞ্জী কেবল ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। কখনও বা ধমকাচ্ছে ভৃত্যকে, কখনও বা হাঁক দিচ্ছে বাচ্চাদের।

আই-ওয়ান্ শুধু চুপচাপ বসে আছে তামার পাশে। বেশ লাগছে বিকেলটা। মিঃ মুরাকীর কথা ভাবছে বসে বসে—সারাদিনই ভেবেছে আজ। চমৎকার জীবন ভদ্রলোকের—খাঁটি পথে সগৌরবে একভাবে চলে এল এই দীর্ঘ পথ ধরে। সারা জীবন ধরে যা পেয়েছেন, আজ এই সত্তর বছরের উপান্তে বসে তা নিয়ে তৃপ্ত হননি কি মিঃ মুরাকী? জীবনে যা চেয়েছিলেন সব কি পাওয়া হয়ে গেছে? না এখনও বাকী আছে কিছু! বাকী? এখনও, আরো বাকী? বিশ্বাস হতে চায় না আই-ওয়ানের।

হঠাৎ জলে পড়ে গিয়ে পরিত্রাহি চীৎকার আরম্ভ করল গঞ্জীরো। সেই মুহূর্তেই রাস্তায়ও কিসের গোলমাল উঠল। আই-ওয়ান্ গঞ্জীরোকে তুলতে ছুটে গেল। গঞ্জীরোর কান্না ছাপিয়ে বেড়ে উঠল রাস্তার কোলাহল। কি হয়েছে, কি হয়েছে, বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে গেল বুঞ্জী। শিও চীৎকার করতে লাগল: 'ভূমিকম্প নাকি? ভূমিকম্প? টের পেয়েছ তোমরা?' তামা ছুটে এল বাইরে স্বামী আর ছেলেদের কাছে। এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সত্যি পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে কিনা।

কিন্তু না, ভূমিকম্প নয়। চারদিকে সব তেমনি আছে। তেমনি করেই পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরঝরিয়ে ঝরনার জল ঝরছে, শেওলা রং-এর মাটির বুকে লম্বা লম্বা গাছের ছায়ার আলপনা এঁকে তেমনি রক্ত-রাঙা হয়ে ডুবছে সূর্য। বুড়ো মালি এসে ঢুকল একখানা খবরের কাগজ নিয়ে—ছাপার ভিজে কালি

শুকয়নি তখনও। বুজী ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিল—সবাই চারদিক থেকে ঝুঁকে পড়ল। এক মুহূর্তে রহস্যের উদ্ঘাটন হয়ে গেল।

চীনেরা পিকিং-এর কাছাকাছি একটা ছোট্ট শহরে তিন শ' জাপানীকে—শিশু-নারী-নির্বিশেষে হত্যা করেছে। জাপানী সৈন্যরা নাকি শান্তিপূর্ণ-ভাবে শৃংখলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। তা সত্ত্বেও তাদের ওপর এই অকারণ বর্বর জুলুম। বড় বড় হরফে এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতীকারের দাবী তোলা হয়েছে।

সবাই যেন পাথর হয়ে গেল। কেউ তাকাল না আই-ওয়ানের দিকে। ভূমিকম্পের ভয়ে যে যেখানে ছিল সেখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু একটা অঘটন ঘটেছে বুঝতে পেরে শিশুরা চুপ করে রইল। এই দুঃসহ স্তব্ধতার মধ্যে রাস্তার কোলাহল আরও তীব্র মনে হতে লাগল। টেলিফোনটা বেজে চলেছে ঘরের মধ্যে। পরক্ষণেই পরিচারিকা ছুটে এসে নমস্কার করে সংবাদ দিল—জেনারেল সেকীর টেলিফোন।

নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেল বুজী। সাথে সাথে গেল সেৎসু। কোথা থেকে ভেসে এল নারী কণ্ঠের চাপা কান্না। তামার ঝি।

'কি হয়েছে মিয়া?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুধায় তামা।

ফুঁপিয়ে ওঠে বালিকা: 'আমার ভাই—আমার ভাই বুঝি আর বেঁচে নেই গো। ঐ হোথা যেখানে মানুষগুলোকে মেরেছে সেখানেই তার দোকান ছিল। মাংসের দোকান। হেথা কাজ কর্ম চলছিল না। মেলাই মাংসের দোকান হয়ে গিয়েছিল। তা সরকার যখন বললে—যাও চীন দেশে, দোকান করগে, বড়লোক হয়ে যাবে দুদিনে, আমরা টাকা দেব দোকান বসাতে। বাবা বললেন যাও।'

জোরে জোরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মিয়া। ওকে কাঁদতে দেখে গঞ্জীরো ভয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। আই-ওয়ান্ কোলে তুলে নিল ছেলেকে। কিন্তু ছেলেকে শান্ত করবে কি? নিজেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ব্যাপার কি? বুজীর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ল। সম্পূর্ণ একটা এলাকার শান্তি-পূর্ণ মানুষকে হত্যা করেছে চীনেরা—যাদের শিক্ষা দিয়ে, বেতন দিয়ে জাপানীরা শান্তি রক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছিল।

তামা বলল: 'দাও ওকে আমার কাছে। কান্না থামেনি দেখছি।

আই-ওয়ানের মনে হল তামা যেন ছেলেকে জোর করে ছিনিয়ে নিল।

বুজী ফিরে এল, গম্ভীর হিম মুখে। আই-ওয়ানের দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা বাবার কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে শুধু বলল: 'হুকুম হয়েছে, এক্ষুণি গিয়ে হাজিরা দিতে হবে।'

বলেই ভেতরে চলে গেল ও।

কেউ কথা কয় না। আই-ওয়ান্ চীৎকার করে বলতে চাইল—নিশ্চয়ই কারণ ছিল; বিনা কারণে কাউকে মারিনে আমরা চীনেরা। আমরা চীনেরা! এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত এদের সকলের সাথে এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল আই-ওয়ান্—ও যে এদেরই একজন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই ওর ছিল না। কিন্তু এখন এদের এই উপেক্ষা—।

'চল বাড়ি যাই।' একি কণ্ঠ তামার!

তারপর প্রণাম, নমস্কার, বিদায়ের পালা। শুধু বিদায়—আর কোন কথা নয়। অতএব কি করে আরম্ভ করতো ও 'আমরা চীনেরা—'

প্রদোষের আলো-ছাওয়া পথে তামার পেছন পেছন কোন মতে অবশ দেহ মনকে টেনে নিয়ে চলে আই-ওয়ান্। আবার সব শান্ত হয়ে আসে। সবাই জানে কি হয়েছে। এ সম্বন্ধেই আলোচনা করতে করতে চলে। মুখ তাদের কঠিন—স্বর চাপা। মাঝে মাঝে বাস্ থামার শব্দ, সান্ধ্য-ভ্রমণকারীরা দলে দলে নামে। তারা শোনেনি এখনও।

আই-ওয়ান্ও নীরব। ওর কেবলি মনে হয় ভিড়ের মধ্যে থেকে ওকে আলাদা করে নিয়ে চারদিকে সহস্র চক্ষু তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ও যেন সবার থেকে আলাদা। টলতে টলতে হাঁটে অন্ধের মত। রাগে লজ্জায় ভেতরটা ওর তোলপাড় হতে লাগল। রাগই বেশী। হাঁক দিয়ে শোনাতে চায় সবাইকে—'কেন তোমাদের এ ছল্? নিরপরাধ, অত্যাচারিত বলে মিথ্যের মুখোস পরেছ কেন? শুনে রাখ তোমরা—মানুষ মেরে খেলা করিনে আমরা।'

কিন্তু কি করে বলবে? কেউ তো কিছু বলেনি ওকে। ও তাকালে তারা শুধু মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাহলে কি করে চীৎকার করবে এই রাস্তার মধ্যে।

মর্ম-লোকের মত্ত ঝঞ্ঝার কলরোলে বাহিরের স্তব্ধতা ডুবে যায়। জাপানী-দের সুদীর্ঘকাল ব্যাপী অন্যায়, অবিচার খতিয়ে খতিয়ে হিসাব করতে করতে জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটে আই-ওয়ান্। জাপানীরা কি করেছে না করেছে জানে সব এন্-লান্। ও সব শুনেছে তার কাছে। তখন বিশ্বাস হয়নি। কারণ এন্-লানের মত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না ওর। নিজেদের বাড়িতেও কিছু শুনতে পেত না। এন্-লান থাকত উত্তর-চীনে। জাপানীদের অত্যাচার সেদিকেই তীব্র হয়ে উঠেছিল। এখন মনে পড়ছে, কি আকুলতা নিয়ে বলত এন্-লান্—কোরিয়াকে গ্রাস করেছে ওরা। আমাদেরও করতে চায়। আজ হোক কাল হোক ওদের মেরে তাড়াতে হবে। সেই একুশ দফা-দাবীর কথা উঠলে—আগুন হয়ে উঠত সে। সর্বদাই বলত ও—এই জাপানী ব্যাটারাই আফিং এনেছে এদেশে, আর সস্তায় বিকুচ্ছে গরীব গরবার কাছে। জাপানীদের বিরুদ্ধে যখনই কোন বয়কট বা আন্দোলন হত জান দিয়ে খাটত এন্-লান্। দোকান পাট উজাড় করে জাপানী মাল এনে সাংহাই এর রাস্তায় হত বহ্যুৎসব। কোন কোন ছোট দোকানী জাপানী লেবেল ছিঁড়ে চীনে বলে মাল চালাত। তখন ওর রাগ দেখে কে? কি জানি কোন যাদুতে, হঠাৎ এক দিন সব বয়কট আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। আসন্ন বিপ্লবের—বৃহত্তর পটভূমিকায় সব ফিকে হয়ে গেল।

মনে আছে আই-ওয়ানের, তবু থামেনি এন্-লান্। স্কুলে পাথরের সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে উঠতে, ওর কানে কানে কেবলি বলছিল সে-দিন—বিপ্লবের পর জাপানীদের তাড়াতে হবে।

বড় ইচ্ছে করে তামার কাছে বুকটা খুলে দেয়। বোঝায় ওকে। কিন্তু বড় ব্যস্ত তামা। তার অবকাশ নেই।

'চলে যারে মিয়া তুই। বাড়ি যা। আমি করে নেব'খন সব। কাল আসিস্ না। দু একদিন থাক বাবা মার কাছে।' ঝিকে বলে তামা।

কৃতজ্ঞতার অশ্রু মুছে চলে যায় বালিকা। তামার হাত চলে যন্ত্রের মত। ছেলেদের নাওয়ান, খাওয়ান, জামা কাপড় ছাড়িয়ে ঘুম পাড়ান কত কি। আই-ওয়ান্ সাহায্য করতে এলে মিষ্টি কথায় সরিয়ে দেয় তামা। বলে ঃ

'তুমি যাও বাপু, একটু বিশ্রাম করগে। এ আর কি কাজ। করে নেব'খন আমি।'

পড়ার ঘরে আঁধারে বসে বসে শোনে আই-ওয়ান্—সারা বাড়ি ময় কাজের চাকায় ঘুরছে তামা। শোনে আর মনে মনে হিসেব চলে—ওর দেশের ওপর জাপানীরা কত অত্যাচার করেছে। সব কাজের শেষে ওরা দুটিতে—তামা আর ও—যখন একান্ত হবে শয্যার শুভ্র আরামে—নিশ্চয়ই শুধাবে তামা—'এবার বলতো, আই-ওয়ান্ কি মনে হয় তোমার কেন এমন ব্যাপার ঘটতে পারল!' তখন ও বলবে—

কিন্তু কিছু শুধাল না তামা। একটু পরে এসে দরজার কাছের সুইচ্ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বলল ঃ

'ও কি, অন্ধকারে কেন? খাবার হয়েছে, চল।'

কোমল হাতে ওর হাত ধরে নিয়ে গেল। খবার সময় তেমনি বকে গেল—আসল কথা নয়, এদিক সেদিক, বাবার ছোটবেলার কথা, এখনকার কথা, বড় ভালো বাবা, এখন বুদ্ধিমান মানুষ দেখা যায় না; হেন তেন কত কি!

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আই-ওয়ানের ঃ 'জেনারেল সেকীর সাথে যখন তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখনও তাঁকে ভালো বলতে?' বলেই পচতাল; না বললেই হত।

অত্যন্ত ধীর ভাবে জবাব দিল তামা ঃ 'ভালো বুঝেছিলেন বলেই চেয়েছিলেন।'

দুজনের চোখাচোখি হয়। আই-ওয়ান্ ভাবে, ভুলকে যারা ঠিক বলে জানে, তাদের কথার দাম কি?

কিছু নয়, কিছু নয়। কি দাম কথার! থাক কথা। ও-ও চুপ হয়ে যায়।

ওর প্রতি লোকের মনোভাব কি ঠিক বুঝতে পারে না আই-ওয়ান্। বদলেছে! না ঠিক তেমনি আছে! খুঁজে খুঁজে বেড়ায় ওই বুঝি কে বাঁকা ভাবে চাইল ওর দিকে। ওই কে ওকে অবজ্ঞা করল। এমনি চলে ওর সারাদিন মান আপন মনে ঝগড়া। কারো সাথে নয়, অথচ প্রত্যেকের সাথে। প্রতিপক্ষ ওর গোটা জাপান। বাড়িতে আসে যায়, জানে এ বিষয়ে কিছুই বলবে না তামা, যাই ভাবুক সে—কিন্তু কদিন পরে মনে হয় ভাবছেই না তামা। কিছুই ভাবছে না। বেশ তাই যদি হয়—কেন ভাবছে না ও? সত্যি সত্যি ওর মনে কোন বৈলক্ষণ্য নেই, না ভাববে না বলে পণ করেছে?

বুঁজীর সাথে দেখা হয়নি আর। সে রাতেই সে চলে গেছে। আই-ওয়ান্ ভেবেছিল এবারেও বুঝি বুঁজীর রিক্তস্থানে ওর ডাক পড়বে। কিন্তু শিও বা মিঃ মুরাকী কারো কাছ থেকেই কোনো খবর এল না। ও পদ শূন্যই রয়ে গেল। আই-ওয়ান্ রইল যথাস্থানে। তবে কাজ বেড়ে গেছে। চালানী

কারবার ফেঁপে উঠেছে আবার। তবে বেশীর ভাগই নাগাসাকীতে নামে না সোজা চলে যায় ইয়াকোহামায়, শিওর কাছে। খালি হিসেব আর কাগজ পত্র থেকে মালের খবর পায় আই-ওয়ান্, কারণ ঠিক দেওয়া, নথি-ভুক্ত করা সব কাজ এ অফিসেই হয়। পিকিং থেকে মাল আসে—বার বার নামটা পড়ে ও। পিকিং! নিশ্চয় লুটের মাল। লুটের মালের ব্যবসা করছেন নিশ্চয় মিঃ মুরাকী!

ওর সম্বন্ধে সবাই চুপ। এ ছাড়া আর কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। পার্টিশনের ওধারের মেয়ে কেরাণী দুটি আগের মতই ভদ্র ব্যবহার করে। ডাকা মাত্র তেমনি চট্পট্ সাড়া দেয়। দোকানে গেলেও সবাই ঠিক আগের মতই ব্যবহার করে। সবই ঠিক তেমনিই আছে। কিন্তু তবু যেন তা নেই। সৌজন্য আছে, স্বাচ্ছন্দ্য নেই। সারাদিনের ছোট বড় কথায়, সকাল বেলাকার শুভকামনায় সে প্রাণ নেই। চুপ করে থেকে থেকে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে—যেন অন্ধকারে ডুবে গেছে। হয়তো বা ওরই ভুল, ভিত্তিহীন কল্পনা। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে মানুষ—তামা কোথায় খুঁজে পাবে খুশি? কেমন করে সহজ হবে?

হয়তো তাই। কিন্তু এই থম্থমে আবহাওয়ার মধ্যে একলা বসে জীবনটাকে ওর মিথ্যে ছায়া মনে হয়। মিথ্যে মনে হয় ওর ঘর-বাড়ি, বিবাহ, সন্তান, প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ বাস্তব ভূমিতে ও নিজেকে ঘিরে যা কিছু রচনা করেছে সব—সব—। সব ছাপিয়ে বাস্তব হয়ে ওঠে শুধু জাপানের সাথে ওর অহর্নিশ মানসিক বিরোধ। সেখানে প্রতিপক্ষ তামা নয়, বুঁজী নয়, কোন জাপান-সন্তানই নয়—শুধু জাপান—এক অচেনা অস্পষ্ট জাপান—যার সাথে মিল সম্পর্ক খুঁজে পায় না ও এই সুন্দর শহরে, এই শ্যাম-শোভা পাহাড়ের, শ্যামাঙ্গিনী বনানীর, এই দ্বীপ-তিলকিত নীল সাগরের—যাদের রূপ-মাধুরী ও গণ্ডুষ ভরে পান করেছে দিনের পর দিন।

ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তামা আগের চেয়ে আরও যত্নবতী হয়েছে। আগে ঠিক না করে আজকাল কখনও বেরয় না ওরা। একদিন আই-ওয়ান্ প্রস্তাব নিয়ে এল: 'চল না, ছেলেদের নিয়ে পার্কে যাই।'

মাথা নাড়ল তামা, 'কেন, বেশ তো আছে বাড়িতে। মিছেমিছি ঝামেলার কাজ নেই।'

ওর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে তামা চলে গেল। আই-ওয়ানের হঠাৎ মনে হল—আমাকে বিয়ে করেছে বলে, তামা লজ্জা পায় না তো লোকের কাছে? জিজ্ঞাসা করতেও পারে না। যদি তাই হয়, যদি সত্য হয়...পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে আই-ওয়ানের।

জানালার ওধারে শোনা যায় জীরোর কথা। জিজ্ঞাসা করছে মাকে, 'মিয়া কাঁদে কেন, মা আজকাল? যখনই তুমি দেখ না, ও খালি খালি কাঁদে, জান?'

তামা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, শুনতে পেল আই-ওয়ান্: 'ওর ভাইকে মেরে ফেলেছে।'

'কে মা? কে মেরেছে?' শিশু কণ্ঠ কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল:

'চীনদেশে, চীনে সৈন্যরা মেরেছে।' তামা বলল:

'ওরা ভালো নয়, দুষ্টু।' জীরোর স্বর রাগে কাঁপতে লাগল।

আই-ওয়ানের রাগ তামার ওপর। বললেই তো হত, মরে গেছে লোকটা। জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল—তামা গাছে জল দিচ্ছে, জীরোও তার ছোট্ট ঝরনা নিয়ে পায়ে পায়ে ঘুর্ ঘুর্ করছে।

'তামা,' কঠিন কণ্ঠে ডাকল আই-ওয়ান্, 'অত কথা শিশু বুঝতে পারে ?'

চোখ তুলে তাকাল তামা— কালো চোখের অনুতপ্ত দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে স্বামীর চোখে—। নিমেষে আই-ওয়ানের কাছে বাস্তব হয়ে উঠল তামা। বুঝিয়ে বলতে চাইল; কিন্তু একটা হলদে প্রজাপতির পেছনে ছুটে জীরো। শিশু ভোলা নাথ ভুলে গেছে।

আবার বইয়ে মন বসাতে চেষ্টা করে। আজ রাতে বোঝাবে তামাকে। কিন্তু কি বোঝাবে? তিনশ' নিরপরাধ প্রাণ বলি হয়েছে—জেনেছে তামা। শুধু ঐটুকুই জেনেছে—এবং ভুলবে না। যাই বলুক মুখে, তামার নীরবতায় ওই জানাই উচ্চারিত হয়ে থাকবে। অসহায়ের মত বসে থাকে আই-ওয়ান্। বইটা চোখের সামনে খোলা পড়ে। ওর মনে আছে—সাংহাই-এ বহু জাপানী ছিল। নানা জাতির নানা রকমের লোকের বাস সাংহাইএ। তার মধ্যে জাপানীদের কথাই ওর বেশী মনে আছে—কারণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ছিল জাপানীরা। যেমন এসেছিল বহু বছর বাসের পরও ঠিক তেমনিই রয়ে গেল ওরা। যেখানেই গিয়ে ওরা ডেরা ফেলেছে, জাপানী ধাঁচের বাড়ি, জাপানী ছাঁচের বাগান দিয়ে বিদেশের ভূঁয়েও ছোটখাট জাপান বানিয়ে তুলেছে। অর্থাৎ ভিন্ দেশে, ভিন্ মাটিতে থেকেও ওরা জাপানেই থেকেছে। কিন্তু সে যাই হোক, নিজের দেশের মানুষকেও আই-ওয়ান্ চেনে। ওরা মারার জন্যই কাউকে মারে না। নিশ্চয়ই কিছু করেছিল জাপানীরা; নিশ্চয়ই চীনেদের ক্রোধের কারণ ঘটিয়ে ছিল। এই কথাটাই ও বোঝাবে তামাকে। কি করে বলবে—বসে বসে তার ছক কাটতে লাগল আই-ওয়ান্।

তামার ডাক শুনে বাগানে এল ও। ছেলেরা শুয়েছে, মিয়া বাড়ি চলে গেছে। ওরা দু'জনে একলা এখন। বেরিয়ে গেল বাগানের ধার ঘেঁষে সমুদ্রের দিকে চলে-যাওয়া বালুর রাস্তাটায়। পায়চারী করতে করতে তাকিয়ে রইল কালো রাত্রির কালো সমুদ্রের দিকে। এই তো উপযুক্ত লগ্ন—বোঝা-বুঝির শুভক্ষণ। বয়ে যেতে দেবে না এই শুভ মুহূর্তকে। কিন্তু তামার মৌন ভাঙ্গা চাই আগে—যেমন করে হোক, যা দিয়ে হোক। আরম্ভ করল ঃ

'ছেলেরা জ্বালায়নিতো আজ ?'

শান্তভাবে জবাব দেয় তামা ঃ 'না, একটুও না। খুব লক্ষ্মী হয়ে ছিল সব।'

'জীরোর কথা নিয়ে তখন যা বলেছিলাম—কেন বলেছিলাম, বুঝতে পেরেছ তো ?'

'কেন বুঝব না ?' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে তামা, 'কিন্তু ছেলেদের অতশত কি আর মনে থাকে ?'

কি বলতে চায় তামা ? যা বলেছে ঐটুকুই ? না তার বেশী আরো কিছু ? ওর মুখ দেখতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না।

কালো চুলের নীচে খানিকটা শুভ্রতা শুধু জেগে আছে। না থামবে না আই-ওয়ান্।

'জান তামা? সব না জেনে আমাদের কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। বাবার কাছে লিখেছি। তাঁর চিঠি না আসা পর্যন্ত কিছুই ঠিক করব না আমি।'

'ঠিক? কিসের ঠিক করার কথা বলছ?' তামার সাদা মুখটা ঘুরে যায় স্বামীর দিকে।

'মানে, আমার মতামত বলব না, কি করব না করব ঠিক করব না।'

উত্তর না দিয়ে আবার সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরায় তামা।

'তুমি তো জানো, তামা—।'

তবু নির্বাক তামা। আই-ওয়ান্ চটে উঠল।

'তামা!'

এবারে তামার মৌন ভাঙল:

'তা আমাদের সাথে সম্পর্ক কি তার?'

আসলে স্বামীর প্রশ্নকে এড়াতে চায় ও। আই-ওয়ান্ জানে মনে মনে তামা বুঝতে পারছে। ভাবছে ও। হয়ত স্বামীর প্রতি বিরূপও হয়ে উঠছে। না, ছেড়ে দিলে হবে না। ওর মনের মধ্যে পেঁছুতে হবে।

'আমি জানি, তুমিও ভাবছ যে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল।'

ক্ষিপ্র জবাব আসে: 'তোমার স্ত্রী আমি, সুতরাং কি ভাবছি না ভাবছি, তাতে কি এসে যায়?'

এ তো জাপানী স্ত্রীর স্বাভাবিক জবাব। পলায়ন! পালাতে চায় তামা! আই-ওয়ানের প্রশ্নের জবাব দেবে না ও।

উত্তেজিত হয়ে উঠল ও: 'অত জাপানী-পনা নাই করলে।'

অন্ধকারে তামার স্বর ভেসে এল: 'জাপানী মেয়ে, জাপানী-পনা করব না?'

অতি কোমল কণ্ঠ, মাধুরী-ঢালা; কিন্তু অমোঘ, অনমনীয়, আজের তামসী রাত্রির মতই দুর্ভেদ্য। বুঝতে বাকী থাকে না আই-ওয়ানের।

'অর্থাৎ তোমরাই অভ্রান্ত, তাই না?' অত্যন্ত রূঢ়-কণ্ঠে ও বলে ফেলে। আঘাত করতে হবে তামাকে—আঘাত করে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে হবে।

'বিনা প্রমাণেই তোমরা ধরে নিয়েছ আমাদের দেশের লোকেরা অমনি অমনি অতগুলি লোককে মেরেছে। সত্যি যদি তাই বিশ্বাস করে থাক, তাহলে বলতে হবে, আমাদের চেননি তোমরা; একটুও না। তোমরা জাপানীরা আমাদের মাটি কেড়ে নিয়েছ, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য চুরি করেছ। বছরের পর বছর মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করেছি—' উত্তেজনায় ভুলে গেল আই-ওয়ান্, কত বড় অবিচার ও তামার ওপর করতে বসেছে—জাপানের হয়ে ওই জাপানী মেয়েকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে। কিন্তু কণ্ঠের আগল খুলে যখন গেছে—তখন আর থামবে কে? বলে চলল: 'কি হয়েছে আমি জানি। পিকিং চলে গেল। শত্রুর পতাকা উড়ল তার ওপর। দেখে সহ্য করতে পারেনি আমাদের সৈন্যরা। এতদিন বহু সহ্য করেছি আমরা—।'

তামা রাগে পাগলের মত হয়ে স্বামীর হাত ধরে ঝাঁকানী দিয়ে চীৎকার করতে লাগল ঃ

'১৯২৭ সনের ২৭শে মার্চ নান্‌কিংএ আর ১৯৩২ সনে সাংহাইএ জাপানীদের কারা মেরেছিল, শুনি?'

'ওঃ, এতদিন আমার বিরুদ্ধে তাহলে এসব কথা মনে মনে পুষে রেখেছ?' আই-ওয়ান্ ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

'না—তোমার বিরুদ্ধে নয়, অভিযোগ তোমার দেশ-বাসীর বিরুদ্ধে।' তামা জবাব দিল।

'একই কথা। তোমার কাছে—আমার দেশ-বাসী মানেই আমি।' রাগে উগ্রমূর্তি হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্। পারলে তামাকে ও খুন করে ফেলত এই মুহূর্তে। পর মুহূর্তেই মনে পড়ল, এই একটু আগে তো জাপানের অপরাধে জাপানী তামাকে ও অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল।

'যাদের বিরুদ্ধে মনে তোমার এত আগুন, তোমার কাছে কি আমি শুধু তাদেরই একজন? আর কিছু নই?' তামার বেদনার্ত স্বর আই-ওয়ানের বুকের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

জাপানী মেয়ে আর নেই। দুস্তর জাতি-বৈষম্যের দুই কূলে বসে বোঝা-পড়া করছে দুইটি জাতি। হঠাৎ স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তামা; দুই-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। শেষ পর্যন্ত তামা বিধ্বস্ত হল। কিন্তু জয়ের আনন্দ নেই আই-ওয়ানের। তামা হেরেছে, কিন্তু হার মানেনি।

'চুপ্, চুপ্, লক্ষীটি কাঁদে না, ছেলেরা জেগে উঠবে যে', তামার কানে কানে বলে আই-ওয়ান্।

রাগের উত্তেজনা থেমে গেছে—বড় অবসন্ন বোধ হতে লাগল। আস্তে আস্তে তামার মাথায় হাত বুলাতে লাগল আই-ওয়ান্।

'ঠিকই বলেছ, মণি, যেখানে যা খুশি হোকগে, আমাদের তাতে কি?' বলল।

তামা আই-ওয়ান্ দুই হাতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রইল সংকল্প-শুদ্ধ বিপুল প্রেমে নিকটতর হয়ে, নিবিড়তর হয়ে।

মিলনের লগ্ন কামনার রাগে ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল—কিন্তু শয্যার তটে এসে সেই ঝংকার স্তব্ধ হয়ে গেল। চির-দিনের মত স্তব্ধ হল। একান্ত করে দয়িতাকে চেয়েছিল—তবু ব্যর্থ হয়ে গেল তার সর্ব আমন্ত্রণ। গ্রহণ করতে পারল না আই-ওয়ান্। প্রতীক্ষা-ঘন মুহূর্তগুলি এক এক করে ব্যর্থ হয়ে গেল। তামা শুধাল ঃ

'এ কি?'

কি বলবে? নিজেই জানে না আই-ওয়ান্। শুয়ে রইল নিশ্চল হয়ে। আলিঙ্গনে জড়ান হাত দুখানি আড়ষ্ট হয়ে রইল তামার দেহ ঘিরে। লজ্জায়, অসহায়তায় হতবাক্ হয়ে গেছে আই-ওয়ান্। কিছু বলল না তামা। খানিক পরে আস্তে আস্তে সরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুমিয়েছে কি তামা? কি জানি। ঘুমিয়ে, জেগে অমনি শান্তভাবেই ও শুয়ে থাকে। পাশাপাশি শুয়ে আছে দুজনে। ওর দেহ স্পর্শ করে আছে

তামার দেহ। এত কাছে—এত ঘনিষ্ঠতায়। একটু কাছে সরে আসে তামা—স্বামীর হাতখানা নিয়ে বুকে চেপে ধরে। বাংময় হয়ে উঠল ওই স্পর্শটুকু। বোঝে আই-ওয়ান্, বদলায়নি তামা, বদলেছে ও নিজে। এই মাধুরীময় দেহ-খানির পরম অন্তরঙ্গ পরিচয় বদলে গেছে ওর কাছে। দেহ, দেহী সবই তেমনি আছে। তবু। দরদে উপচে উঠল বুক; কিন্তু কোথায় কামনা? এমনি দরদে ভরে ওর হাতখানা ধরে রেখেছে তামা, কিন্তু জানে আই-ওয়ান্, ওর বুকেও চরম আঘাত বেজেছে। আর সন্তান চায় না ও। অতি সুদূর অতীতের গর্ভ হতে আজ জেগে উঠেছে ওদের পূর্ব-পুরুষের আত্মা। তারই কঠিন হাত ওদের চিরদিনের মত দূরে সরিয়ে দিয়ে গেল।

পরের দিন তামা বলল: 'ছোট খোকার সর্দি হয়েছে, আজ ও-ঘরেই শুইগে।'

...আজ...কিন্তু আই-ওয়ান্ জানে এ আজের অবসান আর হবে না। ওদের কামনা চিরকালের নির্বাপিত হয়ে গেছে। মুখে শুধু বলল: 'জ্বর হয়েছে নাকি?'

'একটু।'

কাঠের বালিশটা, আয়না, ফিতে চিরুণী রাখার বাক্স, সব তুলে নিয়ে ওঘরে চলে গেল তামা।

আই-ওয়ান্ কোন কারণেও আর রাগ করে না। করবেও না কোনদিন। তামার কোমল ব্যবহার আরও কোমল, প্রায় সকরুণ হয়ে উঠল। আই-ওয়ানের বুকটা ব্যথা টন্‌টন্ করে ওঠে। দুজনের মাঝখানে আজ শুধুই সৌজন্যের পারাবার। সেতু বেঁধে এ সাগর পার হয়ে পরস্পরের সত্য রূপ দর্শন আর সম্ভব নয়। যাই ঘটুক, যাই হোক ওরা আর রাগ করবে না, অভিমান করবে না। ব্যবহারে ওদের মধু ঢালা থাকবেই।'

যতদিন যায় বড় একা লাগে আই-ওয়ানের। জীরো আর গঞ্জীরোও যেন দূরে সরে যাচ্ছে। না না, ভুল! ঘা-খাওয়া মনের কল্পনা এ। কিন্তু দিন-গুলো বড় অসহ্য হয়ে ওঠে। বাবার চিঠি নেই, না আই-কোর। আশ্চর্য, আই-কোও লিখল না! খবরের কাগজ পড়তে ইচ্ছে করে না, যত মিছে কথা লেখে ওরা।

সেদিন আফিস যেতেই ডাক পড়ল বুজীর ঘরে। বুজীর জায়গায় এসেছে এক যুবক। দেখেই মনটা রাগে রি রি করে উঠল আই-ওয়ানের।

নিজের পরিচয় দিলেন ভদ্রলোক: 'আমার নাম মিঃ হিদোয়াশী। ইয়াকো-হামার আফিসে উপাধ্যক্ষ ছিলাম, সেখান থেকে এখানে পাঠিয়েছে বড় কর্তা বানিয়ে।'

দাঁত বের করে হাসে লোকটা। বলে: 'চোখ খারাপ কিনা, নইলে কি আর এখানে আসি। দেশের হয়ে লড়তে যেতাম চীনে......বসুন।'

চেয়ার দেখিয়ে দেয়। মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বসে আই-ওয়ান্। সেবারে বুজী চলে গেল, এঘরে ওই বসতো। এবার শিও নূতন লোক পাঠিয়েছে, হয় তো ওর ওপর খবরদারী করার জন্য।

হোঃ হোঃ করে হাসিতে ফেটে পড়ে মিঃ হিদেয়োশী:

"সকালের কাগজ দেখেছেন নাকি?'

'দেখিনি এখনও।' শান্তভাবে জবাব দেয় ও। ঘৃণা পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে।

'এই দেখুন না।' কাগজটা ওর কোলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয় লোকটা; বলে, 'বেশ মজার, না ?'

সামনের পাতা খুলে ধরে আই-ওয়ান্। এই তো—সাংহাইয়ের কথা লেখা আছে! অনেকদিন কাগজ পড়েনি। কিন্তু এখন সাংহাইয়ে কি করছে জাপানীরা ? তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে চলে। একি ? এত হাসি! একটা ভুলের জন্য এত বিদ্রূপ!

'চীনেরা জাপানীদের সাহায্য করিতেছে! চীনা বৈমানিকের দ্বারা সাংহাইতে বোমা বর্ষণ!'

একি প্রহসন ? একজন চীনা বৈমানিক জাপানী লক্ষ্যস্থল মনে করে একটা জনাকীর্ণ রাস্তায় বোমা ফেলেছে। কিন্তু সংবাদপত্রের খবর—'শত শত মানুষ হতাহত হইয়াছে...'

না না, নিশ্চয় কোন জাপানী-কৌশল! দ্রুতবেগে পড়ে চলে—এ যে অবিশ্বাস্য। ঘোরতর লজ্জার ব্যাপার! এই তো বিশদ খবরও রয়েছে—যা লেখা রয়েছে, মিথ্যে হতে পারে না। রাস্তাটাও ও চেনে। কতবার গেছে ওখানে। সারাক্ষণ কি ভিড় লেগে থাকত।......এই তার চেহারা এখন ? সস্তা জাপানী কাগজের ছাপা, তেমন বোঝা যায় না। তবু চেনা যায়। প্রতিটি বাড়ির দেয়াল-চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। লোহার কাঠামোগুলো দুমড়ে মুচড়ে গেছে। কোথাও কোথাও মরা মানুষ আটকে ঝুলে আছে। তবু চেনা যায়।

হিদেয়োশীর উল্লসিত মুখের দিকে তাকায় আই-ওয়ান্।

'খুব মন দিয়ে পড়ছেন দেখছি। পারছেন ? কি সাংঘাতিক! তবু ভারী মজার, না ?' আবার হাসে হিদেয়োশী। 'নিজের দেশের লোকের মাথায় বোমা মারা, ভারী মজা। হাঃ হাঃ হাঃ।'

আই-ওয়ানের দম বন্ধ হয়ে আসে।

'মিথ্যে কথা এসব,' আটকে যায় কথা ওর মুখে, বলে, 'নিশ্চয় ভুল খবর।'

'না হে না। ভুল টুল নয়।' হিদেয়োশী বলে ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে। 'সব কাগজেই এক কথা লিখেছে। সবাই হাসছে। ইংরেজ আর আমেরিকানরা বুঝবে এখন চীনেরা কি বোকা। শুধু তাই নয়, কি উদার প্রাণ ভাই আপনাদের। দুশমনের জন্য কি দরদ! তাই ভাই-বেরাদারকে মেরে দুশমনকে সাহায্য করছেন।'

'তাহলে স্বীকার করছেন যে জাপানীরা চীনেদের হত্যা করছে ?' বলে আই-ওয়ান্।

ঠোঁট বাঁকিয়ে হিদেয়োশী বলেঃ 'কি করব ? চীনেদের হাতে আর অপমান সইতে পারছি না। জানেন তো কত ধৈর্য ধরে মুখটি বুজে সব সয়ে আসছি। কম করেছে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে ? বয়কট করেছে, গুণ্ডারা হামলা করেছে, গাল দিয়েছে, খুন করেছে কিন্তু খুনীর সাজা হয়নি কখনও। বছরের পর বছর চীনেদের হাতে এসব অত্যাচার সয়েছি। কিন্তু আর কত সওয়া যায় ? তাই আমাদের সম্রাট এবার পণ করেছেন, শত্রু-নিপাত করে তবে কথা। যতদিন পর্যন্ত না জাপানী-বিরোধী ভাব সম্পূর্ণভাবে চীন

থেকে চলে যায় আর চীনেরা আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে রাজী হয় ততদিন যুদ্ধ চলবে।'

নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না। তাই আবার জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্ঃ 'তার মানে যতদিন না আপনাদের ভালবাসতে শিখি ততদিন আপনাদের বোমা পড়বে আমাদের মাথায় আর—আর—আমাদের মা বোনের ওপর ব্যভিচার চলবে। এই তো?'

এবারে হাসির পালা আই-ওয়ানের।

'বেড়ে মিঃ হিদেয়োশী! আপনাকে পেয়ার করতে হবে যেহেতু আপনি...'

কেমন ঘাবড়ে যায় মিঃ হিদেয়োশী। বলেঃ 'না না, ব্যক্তিগতভাবে আপনার কথা হচ্ছে না। তা ছাড়া, আপনাকে তো আমরা চীনের মানুষ মনেই করি না। এতদিন এদেশে আছেন, জাপানী মেয়ে বিয়ে করেছেন...'

হঠাৎ হাসি থেমে যায় আই-ওয়ানের। ওর মুখের দিকে চেয়ে শুধায় হিদেয়োশীঃ 'কি হল?'

'কিছু না।' জবাব দেয় আই-ওয়ান্, 'আমার চোখ খুলে গেছে। সব বুঝে নিয়েছি।' কোনো মতে মাথাটা নীচু করে অভিবাদন করে নিজের অফিসে চলে যায়। কাজ করতে বসে কিন্তু পারে না। কেবলি মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাক খায় হিদেয়োশীর কথা, 'আপনাকে আমরা জাপানী বলেই মনে করি!' এন-লান্ জাপানীদের অত্যাচারের একটা ফিরিস্তী তৈরী করেছিল একবার। এক লম্বা ফিরিস্তী—সেই ওর ঠাকুর্দার আমল থেকে আরম্ভ করে আজ অবধি যা কিছু করেছে জাপানীরা। কিছু মনে আছে আই-ওয়ানের। জাপানীরা জোর করে জমি ছিনিয়ে নিয়েছে; ব্যবসা-বাণিজ্য একচেটিয়া করেছে; বড় বড় যুদ্ধবাজ দস্যুদের সরকারের নামে টাকা জুগিয়েছে বড় বড় খনি বন্ধক রেখে; কিয়াওচাও দখল করে নিয়েছে। তার সাথে আরো সেই একুশ দফা দাবী। ছোট্ট ছিল তখন আই-ওয়ান্; ওর নার্স একবার ওকে সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজ দেখতে নিয়ে গিয়েছিল। জাপানী যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের শেখান হচ্ছিল। নিশানগুলো বড় সুন্দর লেগেছিল ওর। কিন্তু এক জায়গায় একটা ছবি ছিল—একটা রাক্ষুসে জাপানী অসহায় চীনেদের ধরে ধরে গিলছে। দেখে ভয়ে ও কালো হয়ে গিয়েছিল। ওর চীৎকারে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এল তাকে নার্স। এর পর ক'দিন পর্যন্ত রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠত আই-ওয়ান্। সেই জাপানী হবে ও? না, তামাও পারেনি—সত্য আই-ওয়ানের গভীরতম গভীরে পৌঁছুতে পারেনি তামা......। তামা কেন প্রত্যেকেই ওর বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে; ভেতরটা কেউ নাগাল পায়নি।

দু'দিন পরে আবার নূতন খবর। হিদেয়োশী ওর দরজায় উঁকি মেরে আকর্ণ দন্ত-বিকশিত করে বললঃ

'দেখেছেন তো আজকের ওসাকা-মাইনিচি কাগজটা! সাংহাইয়ে এবার আমরাই বোমা ফেলছি।'

পাথর হয়ে আই-ওয়ান্ তাকিয়ে রইল হিদেয়োশীর দিকে। ইচ্ছা হতে লাগল শয়তানটাকে পোকার মত টিপে টিপে মেরে ফেলে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল হিদেয়োশী।

এক বিচিত্র মুহূর্তে, কিসের মন্ত্রে আই-ওয়ানের সামনে পথ খুলে গেল অতি সহজ অতি স্পষ্ট হয়ে। যেন কেউ অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিল।

দিন সাতেক পরের কথা। চীন দেশ থেকে জাহাজ এসেছে। মুরাকী কোম্পানীর মাল খালাস করতে এসেছে আই-ওয়ান্।

আশ্চর্য হয়ে গেল মাল নামান দেখতে দেখতে। ওদের মাল ছাড়া আরো যে-সব মাল নামল তা দুষ্প্রাপ্য শিল্প-সম্ভার নয়; সাধারণ গৃহস্থালীর উপকরণ। কারু-কার্য-করা সেকেলে ভারী ভারী নমুনার খাট-পালং, টেবিল, চেয়ার; একেলে নমুনারও আছে—আর আছে বিদেশী মার্কা ষ্টোভ, পিয়ানো, ছবি, রিফ্রিজারেটার, গালিচা, কুশন, মখমলের পর্দা—যাবতীয় নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস। সাংহাইএর ধনী বিলাসীদের সখের জিনিস আছে। ভালো করে বাঁধা-ছাঁদাও নেই, কোনো মতে এনে জাহাজে ফেলা হয়েছে। ওদের নিজেদের বাড়ির জিনিসও তো হতে পারে। লক্ষ্য করে দেখতে লাগল, পরিচিত কিছু চোখে পড়ে কিনা। নেই কিছু। এবং কোনটাই বে-ওয়ারিশ নয়। প্রত্যেকটারই দাবীদার ভাগীদার আছে।

গম্ভীর হয়ে মনে মনে বলে আই-ওয়ান্ঃ 'এইবারে বুঝতে পাচ্ছি, যুদ্ধ, সত্যিকার যুদ্ধ। সব লুটের মাল। নইলে এসব গৃহস্থালীর জিনিস আসবে কোত্থেকে ?'

ভেতরটা ওর রাগে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ থমকে গেল ও। মাল নামার এখনও কিছু বাকী ছিল। সব শেষে নামল নাম-লেখা কতগুলি ছোট ছোট কাঠের বাক্স। এক জন লোক দাঁড়িয়ে নাম ডাকতে লাগল, আর শোকের বেশ-পরা ছোট ছোট এক একটা দল এগিয়ে এসে গ্রহণ করতে লাগল এক-একটা বাক্স। বুঝতে দেরী হল না আই-ওয়ানের যুদ্ধে নিহত জাপানী সৈনিকদের চিতাভস্ম ঐ বাক্সগুলোয়।

ভুল ভাঙল। এতদিন ভেবেছে ওর দেশবাসীরাই শুধু মার খেয়েছে। কিন্তু তা নয়—খেয়েছে, খাচ্ছে এরাও। এরাও দুর্ভাগা কম নয়। নিঃশব্দে একদিকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ও। গভীর আদরে, মহামূল্য ঐশ্বর্যের মত করে প্রিয়জনের অবশেষটুকু নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল বিলাপ-হীন মৌন শোভাযাত্রা। কারু কারু মুখে একটু প্রকম্প হাসি। শিক্ষা পেয়েছে প্রিয়-জন যুদ্ধে মরলে হাসতে হয়। মুখের হাসিকে ভিজিয়ে দিয়ে চোখের জল তবু নামছে বাধা না মেনে।

আই-ওয়ান্ ভুলে গেল ও কে। ধীরে ধীরে এগিয়ে একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। বহু অশ্রুসিক্ত চোখ ওর ওপর পড়ল। ঘৃণা নেই ক্রোধ নেই। শুধু বেদনা। দৃষ্টি থেকে শুধু বেদনা ঝরছে। বিচিত্র! ওরা তো বুঝতে পারছে আই-ওয়ান্ চীনের মানুষ। তবু ঘৃণা করবে না! এত বড় আশ্চর্য! মাথা ওর নত হয়ে গেল। চীনের ভূমিতে শোকের এমন মিতি-সুন্দর রূপ নেই। ওখানকার মানুষ শোক করে বিলাপ করে।

লজ্জায় সরে যেতে গিয়ে ধাক্কা লাগল এক বৃদ্ধের সঙ্গে। একলা এক-ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা বাক্স সন্তান-স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে। চোখে চোখ পড়ে অভিভূত হয়ে গেল আই-ওয়ান্। বুক-ভাঙ্গা বেদনায় রাগ-দ্বেষ-

হীন কি শুভ্র নৈরঞ্জন্য; স্থৈর্যের কি অপরূপতা! বিস্ময়োক্তি বেরিয়ে গেল ওর মুখ থেকে।

অতি ধীরে, কোমল স্বরে জবাব দিলেন বৃদ্ধঃ

'ঘৃণা কিসের ভাই, তোমার কিসের দোষ? তা ছাড়া দেশের জন্য হাসি-মুখে দুঃখ সইব, জীবন ভরে সে-শিক্ষাই তো পেয়ে এলাম।'

বাক্সটাকে আরো নিবিড় করে বুকে চেপে ধরলেন। চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল। আবার বললেন—গলার স্বর কাঁপতে লাগলঃ

'আজ তো আমার আনন্দের দিন—একমাত্র ছেলে আমার—'

এতদিনে অন্ধ আই-ওয়ান্ চক্ষুষ্মান্ হল। ওর বোবা পৃথিবী বাঙ্‌ময়ী হল। জাহাজের ডকের ওপর দাঁড়িয়ে ঘটল ওর আত্ম-দর্শন। মোহ-মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখল ও একদার আই-ওয়ানকে—স্বদেশের স্বপ্নে যার বুক ভরে ছিল; স্বদেশের মন্ত্রে যে নিয়েছিল দীক্ষা—বুকের স্বপ্নকে মাটিতে রূপ দেবার সাধনায় যার জীবন ছিল উৎস্বর্গীকৃত; সেই আই-ওয়ানকে। জাপানীরা কি ভালোই বাসে দেশকে! স্বদেশ-প্রেমই তো শ্রেষ্ঠ প্রেম, সত্য প্রেম। ওই পুত্র-হারা বৃদ্ধের বেদনার্ত চোখে ওই প্রেমেরই শিক্ষা জ্বলছে। আই-ওয়ানও তো চেনে এই প্রেমকে।

আর একবার ঐ বৃহৎ প্রেমে বৈরাগী হবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে আই-ওয়ানের তনু-মন-প্রাণ। আর দেরী নয়। সর্ব সংশয় ফেলে দিয়ে, এক বৃহৎ ত্যাগের মধ্যে সব খোয়াবার নেশায় ও পাগল হয়ে উঠল। এন্-লানের সাথে সে দিনগুলো যে-সুখে কেটেছিল, অত সুখ ও তামার সাহচর্যেও পায়নি।

আই-ওয়ান্ ফিরে তাকাল। বৃদ্ধ চলে গেছেন। তাঁকে আর প্রয়োজনও নেই। তাঁর কাজ তিনি করে দিয়ে গেছেন। তামা ভাগ্য বড় বিশ্বাস করে। সেই ভাগ্যই আজ ঠিক সময়টিতে এই বৃদ্ধের রূপ ধরে সম্মুখে এল ক্ষণিকের জন্য। এবং তার কাজ সেরে চলে গেল। ধীরে ধীরে মাল-গুদামে ফিরে গেল আই-ওয়ান্। কাজ করতে করতে ভাবতে লাগল—কি করে বলবে তামাকে।

বলবে না, না বলেই চলে যাবে। পরে লিখে সব জানাবে। ভাবতে ভাবতে বাড়ি পৌঁছে গেল। প্রতিদিন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে তামা আজ ওর দেরী হয়ে গেছে। ভেতরে এসে জুতো খুলছে আই-ওয়ান্, এমনি সময় ছুটতে ছুটতে এল সে।

'একটা ভালো জিনিস রাঁধছিলাম তোমার জন্য—তাইতে দেরী হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ দেখেছ!'

স্বচ্ছ সরল এই ডাগর চোখ দুটি, গোলাপী মুখখানা—না বলে যেতে পারবে না আই-ওয়ান্। কিছুতেই পারবে না। বলতে হলে এখনি বলা, এই মুহূর্তে......এর পরে আর শক্তি থাকবে না, সাহস থাকবে না। তামার কাঁধ দুটি ধরে বলে উঠল আই-ওয়ানঃ

'দেশে যাবো, তামা।'

খুব ধীরে শান্তভাবে বলল, যেন চমকে না ওঠে তামা। কিন্তু এক

মুহূর্তে ওর মুখখানা ফ্যাকাশে, দেহটা অবশ হয়ে গেল। আজ আর বলল না—আমিও যাব। জানে তামা—একাই যেতে হবে আই-ওয়ানকে। আর ঠেকান যাবে না।

'কি বিশ্রী লেগেছে এ কয় দিন!' বলে চলে আই-ওয়ান্‌, 'কি যে করব বুঝতে পারছিলাম না।'

'জানতাম,' তামা বলে। অতি ক্ষীণ, স্তিমিত স্বর—প্রায় শোনাই গেল না।

'বলোনি তো! আমি তো ভেবেছিলাম কিছুই জানো না তুমি।'

'চাইনি, বলতে চাইনি,' তামার স্বর ফুটছে না, ঠোঁট কাঁপছে, 'কি জানি, যদি সত্যি চলে যেতে চাও—বড় ভয় করত।' আই-ওয়ানের বুক ভেঙে যায়। তামার মাথাটাকে বুকে চেপে তার ওপর নিজের গাল চেপে নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও।

'যাবার কথা আগে তো মনে হয়নি। আজই বিকেলে হল।' আই-ওয়ান্‌ বলেঃ 'এক বৃদ্ধ আমার চোখ খুলে দিলেন। জহাজ-ঘাটায় এসেছিলেন ছেলের চিতাভস্ম নেবার জন্য। দেশের জন্য মরা যে কত বড়, কত সুখের, দেখিয়ে দিলে সেই।'

ওর মুখে এ ভাষা আর শোনেনি তামা। বহু দিন আগে শিখেছিল আই-ওয়ান্‌। মিস্‌ মাইৎল্যান্ড মুখস্থ করিয়ে ছিলেন কথাগুলো। সেদিন তর্ক করেছিল এন-লান্‌—দেশ যদি অন্যায় করে তবু তার জন্য মরতে হবে? ' কক্‌খনও নয়। মরতে হয় আদর্শের জন্য মরব।'

শিক্ষয়িত্রী চটে গেলেন। শোনালেন এক ইংরেজ তরুণের উক্তি—ইংলন্ডের ধূলির সাথে ধুলো হয়ে অনন্তকাল মিশে থাকবে তার দেহ এই ছিল তার মনের আশা। এন্‌-লান জবাব দেয়নি, শুধু একটু হেসেছিল।

তামাকে বুকে চেপে ধরল আই-ওয়ান্‌। ঠিকই বলেছিলেন মিস্‌ মাইৎল্যান্ড। ভুল এন্‌-লানের। দেশ দেশই। ভুল করলেও দেশ। চ্যাং-কাই-শেকের অধীনে গিয়ে কাজ করবার কথা এতদিন ভাবতে পারেনি ও। কিন্তু আজ আর আপত্তি নেই।

জামার আস্তিনে চোখ মুছে সহজভাবে বলল তামাঃ

'যাবে বৈকি; সত্যি দেশের কাজে দরকার হলে নিশ্চয় যাবে। আবার চোখ মোছে তামা। বলেঃ

'আমি জাপানী মেয়ে, বুঝি।'

ওর কথায় চাঞ্চল্য নেই, উত্তেজনা নেই। কিন্তু আই-ওয়ানের বুকের ওপর ওর হৃৎপিন্ডটা ধপ্‌ ধপ্‌ করে আছড়ে চলেছে।

আই-ওয়ান বলেঃ 'কিন্তু তোমার কাছে আমি সেই আছি তামা।'

সরে যায় তামা। বলে, 'জানি আমি। আমাদের সম্পর্ক ঠিকই থাকবে। চল এখন, ভেবেচিন্তে সব ব্যবস্থা করতে হবে।'

ব্যবহারিক বুদ্ধি জেগে উঠেছে তামার। হঠাৎ রান্নাঘরের দরজায় ব্যস্ত-ভাবে মিয়া দেখা দিলঃ 'দিদিমণি, ওটা ফুটে উঠেছে। এখন কি করবে?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, যাচ্ছি। পরে কথা হবে, আই-ওয়ান্‌।' বলে ছুটে চলে গেল তামা রান্নাঘরে।

অনেক রাত পর্যন্ত কথা চলল। ঘরের সব পর্দা খোলা—সামনে বাগান, তার ওধারে সমুদ্র। সমুদ্রের দিকেই চেয়ে রইল তামা। আকাশে চাঁদ নেই; ঘরের বাতি নিবিয়ে দিল। অন্ধকার চোখে সয়ে এলে বাগানের প্রতিটি বস্তুর পরিলেখ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তামার মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু বোঝা যাচ্ছে ওর মুখ ফেরান। মাদুরের ওপর বসে আছে ওরা। আই-ওয়ানের হাতের মধ্যে তামার উষ্ণ, বলিষ্ঠ হাতখানা। তামা চোখের জল ফেলল না, এতটুকু প্রতিবাদ জানাল না। এখন বুঝতে পারে আই-ওয়ান, অনেক দিন থেকেই এ কথা জানে তামা। সে প্রস্তুত হয়েই আছে। জিজ্ঞাসা করল ও, এখন কি করবে ও ছেলেদের নিয়ে। তৈরী আছে সে ব্যবস্থাও।

'বাবার কাছেও চলে যেতে পারি। নাতিদের পেলে তো বর্তে যান বাবা।' বলল তামা।

এ ব্যবস্থা ভাবেনি ও। ও ভেবেছিল এখানেই থাকবে ওরা যতদিন না—যতদিন না—কি? কে জানে কবে লড়াই শেষ হবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হয় আই-ওয়ানকেঃ 'তাই ভালো।' জীরো গঞ্জীরো মানুষ হবে তাদের দাদামশায়ের ওখানে। এ ঘর ওদেরই জন্য নিজের হাতে বেঁধেছিল আই-ওয়ান। এ গৃহের ধূলির পরে ওদের চীনদেশীয় পিতার কোলে এতদিন বড় হয়েছে ওরা। তখন এ ঘর ওরা ভুলে যাবে।

আই-ওয়ান্ বলেঃ 'ওদের বাবাকে ভুলতে দেবে না তো?'

তামা ওর হাত চেপে ধরে। জবাব দেয়ঃ

'কপাল পুড়ল বলে কি স্ত্রীর ধর্ম ভুলব?' তারপর আবেগের উচ্ছ্বাসে বলে যায়ঃ 'তোমার দোষ কি? তুমি তো আর অমনি অমনি ইচ্ছে করে ছেড়ে যাচ্ছ না। ওদের বলব আমি—ওরে, তোদের বাবা বীর, মহাবীর, প্রণাম কর তাকে। নিজের দেশের জন্য লড়াই করতে গেছে সে। আই-ওয়ান, তোমার একটা বড় ছবি করিয়ে নিই কেমন? অবশ্যি একটু টাকা খরচ হবে। তা হোক। এখন যেমন আছ ঠিক এমনি একটা ছবি করিয়ে নিতে চাই তুমি যাবার আগেই। এমনি জায়গায় ওটাকে টাঙিয়ে রাখব, চলতে ফিরতে সব সময়ে ছেলেরা দেখতে পাবে। রোজ ছবির সামনে ফুল দেব।' গলা ধরে গেল—একটু কেশে থেমে গেল তামা।

'কাল করব, কেমন?' কথা দেয় আই-ওয়ান্।

আই-ওয়ানের মনে হয়, তামা কাঁপছে। একটু পরেই সামলে নিয়ে বললঃ 'একটা নতুন ব্যাগ লাগবে, না যেটা আছে তাতেই হবে?' অতি শান্ত স্থির কণ্ঠ তামার।

'বেশী জিনিস নেব না। গিয়েই তো উর্দি চড়াতে হবে।' আই-ওয়ান্ বলে।

সত্যি কাঁপছে তামা। একটু কিছু বললেই হয়ত ভেঙে পড়বে ও। কিন্তু জানে আই-ওয়ান্, এ প্রসঙ্গ না উঠলেই খুশী হবে তামা। তাই নিঃশব্দে ওর হাতে হাত বুলাতে লাগল আই-ওয়ান্। আর টুকরো টুকরো এক-আধটা এদিক ওদিক কথা হতে লাগল মাঝে মাঝে।

'পরের জাহাজটায়ই যাই। দিন চারেক পরে আছে একটা। একটু সময় পাওয়া যাবে। তোমার বাবাকেও বলতে হবে তো!'

দম বন্ধ হয়ে আসে তামার। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল: 'না না থাক। নাই বললাম কাউকে। এই চারটে দিন এমনিই থাক। তারপর তুমি চলে গেলে বলবখন বাবাকে।'

খানিক ভেবে আই-ওয়ান্ বলল: 'তা কি ভালো হবে? কি ভাববেন? অত করেছেন আমার জন্য।'

'না, আমিই বলব। বাবা অবুঝ নন। বুঝবেন তিনি।'

'বড় ভালো লোক—' আই-ওয়ান্ বলে।

বাধা দেয় তামা: 'ভালো লোক বলে কথা নয়, জাপানী মাত্রেই বোঝে এ কথা।'

যাবার ঘণ্টাখানেক আগে শুধু ব্যাগটা গুছিয়ে নিল আই-ওয়ান্। কোথা দিয়ে যে চারটে দিন চলে গেল টেরই পাওয়া গেল না। কোন প্রশ্ন না করে তামার ইচ্ছা মতই চলল ও একদিন। যাবার আগের দিন পর্যন্ত নিয়মিত কাজে গেল। খাতাপত্র এমনভাবে গুছিয়ে ফেলল যেন এর পরে যে আসবে তার কোন অসুবিধা না হয়। এ কাজ কোনদিনই ওর ভালো লাগেনি, তাই ছাড়তেও কষ্ট হল না। ভালো লাগুক আর না লাগুক এ কাজই ওকে স্থিতি দিয়েছিল, দিয়েছিল নিরাপত্তা। ইচ্ছে করলে, নিশ্চিন্ত মনে চিরকাল ও এখানেই থেকে যেতে পারত। কিন্তু পারল কই! নিজের মনই তো মানল না।

তামার ইচ্ছে জেনেই শেষের দিন ও ওর সাথে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এল। এর আগেও গেছে কবার, কিন্তু মন্দিরে ঢোকেনি। আপত্তি করেছে: 'বিশ্বাস না থাকলে পুজো করা যায় না, বিশ্বাসই নেই আমার!'

ছেলেদের নিয়ে তাই একাই যেত তামা। ছেলেদের এসবের মধ্যে টানাটা ভালো লাগত না আই-ওয়ানের। কিন্তু কিছু বলেনি। ও নিজেও তো ছোটবেলা মার সাথে মন্দিরে গেছে। বাবা ঠাকুর দেবতা কিন্তু মানতেন না। বড় হয়ে তাঁর পথই গ্রহণ করেছিল ও। বিপ্লবের সময় দেবতা, পুরুত আর মন্দিরের বিরুদ্ধেই বিশেষ করে লড়তে হয়েছিল এন্-লানকে। তখন বুঝত না ও, এত তুচ্ছ ব্যাপারে কেন অত রাগ ছিল এন্-লানের।

এন্-লান বলত—ধর্মেই মানুষের আসল দাসত্ব।

তামার সাথে মন্দিরে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ওই কথাই ও ভাবত। এবং অবাক হয়ে দেখত মন্দিরে স্ত্রীলোক, গরীব-গরবা আর খেটে-খাওয়া মানুষই শুধু আসে না। দামী পোষাক-পরা গম্ভীর চেহারার হোমরা-চোমরারাও আসে। অলি গলির ছোট খাট মন্দিরের সামনে মোটর-চারীরাও মোটর থামিয়ে নেমে পুজো দিয়ে যায়। এত দেখেও ওর দেবতায় বিশ্বাস হল না।

তামাকে খুশী করবার জন্যই ও শেষ দিন সবাইকে নিয়ে গেল মন্দিরে। ভেতরেও ঢুকল। তামা পুজো দিল, ও দাঁড়িয়ে রইল পাশে। গঞ্জীরোও পুজো করা শিখেছে। আশ্চর্য হয়ে যায় আই-ওয়ান্। মায়ের ঠাকুরকেই পুজো করবে ওর ছেলেরা? কিন্তু এখন আর বাধা দেবার উপায় কোথায়? তারপর ভাবে—মার মত ভালো যদি হয় ওই করে, তবে করুক।

জীরোর হাতখানা ওর হাতের মধ্যে, গঞ্জীরো দুই হাতে ওর পা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহামূল্যবান এই স্পর্শটুকুর অনুভূতি ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই আই-ওয়ানের এই মুহূর্তে।

শেষের দিনটাও শেষ হয়ে গেল। তারপর এল বিদায়ের ক্ষণ। ব্যাগের মধ্যে খান-কয়েক জামা কাপড়, রাত্রি-বাস, আর কাজের পোষাকটা ভরে নিল। তামা নীলে সাদায় সিল্কের কি যেন একটা নিয়ে এল। আই-ওয়ান বুঝতে পারেনি ওটা কি। খুলে দেখাল তামা—ওর চীনে পোষাকটা—বহুদিন আগে একবারই পরেছিল আই-ওয়ান্।

'প্রথম যেদিন তোমায় দেখেছিলাম, এটাই পরে ছিলে।' মৃদু হেসে বলে তামা। কি সে হাসি! ও তো হাসি নয়, অথৈ কান্না। আই-ওয়ানের বুক ভেঙে যায়।

'কত দিন পরিনি এটা।' বলে আই-ওয়ান্।

'দরকার তো হতে পারে, নিয়ে যাও।' তামা বলে।

অতি যত্নে ভাঁজ করে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল।

রোমে রোমে ওর শুধু তামা—তামা। এমনি করেই ও এ কয়দিন তামাময় হয়ে আছে। হৃদয় দিয়ে অনুক্ষণ বুঝেছে তামার হৃদয়কে—প্রতি মুহূর্তে কান্নায় যেন ভেঙে পড়ছে তামা, কিন্তু স্বামীকে ওর চোখের জল দেখতে দেবে না। আই-ওয়ান্ চোখের আড়াল হলে তবে ওর অক্রন্দনের ব্রত ভাঙবে। নইলে লজ্জায় মরে যাবে তামা। স্বামীর জন্যই ওর নিজকে বাঁধতে হবে এখন। না পারলে ওর কষ্টের অবধি থাকবে না। শেষের কটা ঘণ্টা একেবারে কাছে কাছে রইল দুজনে। শুধু একটুখানি হাত ধরা—তাতেই যেন ভরে উঠল মিলনের পাত্র।

বন্দরে জাহাজের ইঞ্জিনে আগুন পড়ল। চোং দিয়ে উঠল ধোঁয়া। দুপুরে বেলা জাহাজ ছাড়বে।

'এবার আসি, তামা।' শান্ত কণ্ঠ আই-ওয়ানের।

তিন দিন আগেই ঠিক করেছে ওরা—জাহাজ ঘাটে একাই যাবে আই-ওয়ান্, ছেলেরা যাতে জানতে না পারে। হাতে হাতে ধরে ওরা বাগানে এল। ছেলেরা খেলা করছে। একটা নালায় বাঁধ বাঁধছে পাথর দিয়ে। শুনতে পাচ্ছে আই-ওয়ান্—জীরো কি হুকুম করছে আর গঞ্জীরো তার জবাব দিচ্ছে পাল্টা প্রশ্ন করে।

মুহূর্তে সব প্রতিজ্ঞা ভেসে যেতে চায় আই-ওয়ানের। না যেতে পারবে না ও। তামাকে আশ্বাস দেয়, খুব শিগিগির তোমাদের নিয়ে যাব, বুঝলে?'

কিন্তু মাথা নাড়ে তামা। কে জানে কবে।

চমকে ওঠে আই-ওয়ান্। তামার কথা, স্বর, তার শান্ত সমাহিত মর্মান্তিক চোখ দুটি এই মুহূর্তখানি থেকে ওকে উপড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মহা-কালের দিগ্‌বালে—যেখানে হারিয়ে গেল ওদের যৌথ জীবন, তার সুখ আর দুঃখ।

তাড়াতাড়ি বিদায় নেয় আই-ওয়ান্ঃ 'চলি তাহলে।'

আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট হতে লাগল তামা। তার গালে গাল রেখে স্তব্ধ

হয়ে রইল আই-ওয়ান্। একবার চোখ তুলে চাইল ওর চোখের দিকে—দেখল তামার মুখে অনন্ত বিচ্ছেদের অনুক্ত ঘোষণা।

আই-ওয়ান্ জাহাজের পাটাতনে পা রাখতে না রাখতেই সিঁড়ি উঠতে লাগল।

'আর একটু হলে ব্যাটা পড়েই থাকত।' একটা কর্কশ মার্কিনী গলা শোনা গেল। জবাব দিল না আই-ওয়ান্। নিজের ক্যাবিনটা খুঁজে নিয়ে ঢুকে দেখে ঘর খালি, কিন্তু নীচের বার্থে আর একজনের জিনিস-পত্র রয়েছে। ও ওপরের বার্থে নিজের জিনিস ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এল। দুদিকে সারি দেওয়া ক্যাবিনগুলির দরজা খোলা। চারদিক থেকে অপরিচিত চীনা কণ্ঠ ভেসে এল।

সিঁড়ি বেয়ে আবার ডেকে উঠে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে জাহাজ সরে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বন্দর ছেড়ে যাবে। সমুদ্রের সব চেয়ে কাছের পাহাড়টার দিকে ছুটে যায় ওর সন্ধানী দৃষ্টি। ঐ তো—ঐ যে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে ওর ছোট্ট বাড়িখানা—ঐ তো বাগান—অমন কোমল সবুজ আশে পাশে কোথাও নাই। আর ঐ যে একটা রং-এর ছোপ। তামা! তামা! মুখ দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার আকুল দৃষ্টি ওকেই খুঁজে ফিরছে। আর একটি ছোট্ট কমলা রং-এর বিন্দু সবুজের মধ্য দিয়ে ছুটে এসে দাঁড়াল ওর পাশে। জীরো—ওর ছেলে জীরো।

পাগল হয়ে ওঠে আই-ওয়ান। ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে—ফিরে যাবে যেখানে ওর আপন হাতের রচা নীড়ে আছে ওর প্রিয়া, আছে আত্মজেরা। কেন ছেড়ে এল ও তামাকে? কোথায় চলেছে ও? একবার তো দেশ মনে করে ছুটেছিল মরীচিকার পেছনে। এবারেও যে তাই হবে না কে বলতে পারে। হয় তো কাঁদছে বসে তামা। চোখের জলে গলা ওর বন্ধ হয়ে এল।

'হ্যাল্লো!' এক মার্কিনী স্বর। চমকে চায় আই-ওয়ান্—পেছনে চৌক অতি কুৎসিত হাসি-খুশি একখানা মুখ। আমেরিকান নয়। ওরই স্বদেশী। সাদা ডোরা-কাটা গভীর নীল রং-এর আমেরিকান সুট পরা; গায়ে ঢলঢলে হয়ে আছে। গলায় বেমানান রকম বড় নীলচে সাদা সেলুলয়েডের কলার।

মুখ ভরে মার্কিনী হাসি হেসে বলে লোকটা:

'আমি আপনি এক কেবিনেই। আমার বাড়ি ক্যান্টনে, জন্মেছি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। নাম জ্যাকী লিম্। তিন পুরুষ আছি আমেরিকায়। বুড়ো হয়ে আমার ঠাকুরদা গিয়েছিলেন একবার ক্যান্টনে—তখন তাঁর বয়স ষাট। আমার মাতৃভাষা আমি জানিনে। কিন্তু লড়তে জানি। দেশে ফিরছি জাপানী শালাদের সাথে লড়তে।'

'আমিও তাই।' ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে আই-ওয়ান্ বলে।

হাত বাড়িয়ে দেয় লোকটা।

আর একবার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখে—কিছু দেখা যায় না আর। জাহাজ ঘুরে বড় সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড

দেশের মাটিতে পা দিয়েই বুঝতে পারল আই-ওয়ান্ ক' বছর আগে যে দেশ ছেড়ে গিয়েছিল এ সে দেশ নয়; এন্-লান আর ও যে-দেশের স্বপ্ন দেখেছিল এ তাও নয়।

জাহাজ-ঘাট লোকে লোকারণ্য। দিশেহারা মানুষ উদ্ভ্রান্তের মত ডক আর জাহাজের দিকে ছুটছে। পাহাড়-প্রমাণ সস্তা আসবাব আর বিছানাপত্রে ঠাসা রিক্সগুলো টেনে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে ঘর্মাক্ত কলেবর রিক্সওয়ালারা। তাদের পেছনে ক্রন্দনরত শিশুদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চীৎকার করতে করতে ছুটছে নারী পুরুষের দল। দামী দামী ট্রাংক, গালার কাজ-করা তৈজস, সূক্ষ্ম কারুকার্য-করা আসবাব আর সাটিন-পরা মানুষ নিয়ে মটরগাড়িগুলি হন্যে হয়ে ছুটছে; মানুষগুলি মূর্তির মত বসে আছে ভেতরে। মুখ কাগজের মত শাদা। দূরে, অনেক দূরে, শহরের উত্তর প্রান্তে কি যেন একটা কালো মেঘের মত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মেঘ নয়।

সেদিকে দেখিয়ে আই-কোকে জিজ্ঞাসা করে ওঃ 'আগুন লেগেছে নাকি হে?'

জাহাজ থেকেই বেতার যোগে খবর দিয়েছিল আই-ওয়ান্, তাই আই-কো এসেছে ওকে নিতে। জার্মান-দুহিতা সঙ্গে নেই, আই-কো একাই এসেছে দেখে ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। গায় নীল রং-এর ইউনিফর্মে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল আই-কোকে। বাবার মস্তবড় আমেরিকান গাড়িটা থেকে নেমে রুশ-দেশীয় শোফারকে কি নির্দেশ দিয়ে তারপর ফিরে এল আই-কো। 'ঘণ্টায় ঘণ্টায় আগুন লাগছে। দুদিনে তোর সয়ে যাবে।'

আই-ওয়ানের ক্যাবিনের সাথী কেমন যেন মিইয়ে গিয়ে ডকের এক দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। ও-ও হংকং পর্যন্ত যাচ্ছে। খুব হাসি-খুশি ভাবে আই-

ওয়ানকে বিদায় দিতে নেমে এসেছিল। এই মার্কিন মুলুকের স্বদেশী মানুষটিকে বড় ভালো লেগেছিল আই-ওয়ানের। কিন্তু জ্যাকি লিম আই-কোর হোমরা চোমরা চেহারা দেখে ভড়কে গেল। ও যেন আরো বেশী করে ওর ঢলঢলে পোষাকের মধ্যে চুপসে গেল।

আই-ওয়ান্ পরিচয় করিয়ে দেয় ভাই-এর সাথে। লিম্ চট্ করে হাত-খানা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আই-কো না দেখার ভান করে মাথাটি নামমাত্র নাড়ে। বেচারা লিম্ হাত পকেটে পুরে খিলখিল করে হাসে। ওর খাঁদা নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে।

ভাই-এর দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে আই-ওয়ান্ লিমকে বলেঃ 'গিয়ে চিঠি লিখবে কিন্তু। তোমার ঠাকুর্দা কেমন আছেন, কোন রেজিমেন্টে ঢুকছ সব লিখে জানাবে।'

লিম তেমনি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে জবাব দেয়ঃ

'লিখব বৈকি। লেখা টেখা আমার আসে না অবশ্য তেমন, তবে চিঠি লিখতে পারব।'

করমর্দন করে জ্যাকি জাহাজে গিয়ে ওঠে। গাড়িতে বসে আই-ওয়ান্ আই-কোকে বলেঃ 'বেশ ভালো লোকটি। এই প্রথম দেশে ফিরছে। ঠাকুর্দাকে দেখতে ক্যান্টনে যাচ্ছে। গিয়ে সৈন্য দলে ভর্তি হয়ে যাবে। দেশের জন্য লড়াই করার কি আগ্রহ ওর।'

আই-ওয়ানের ইচ্ছে, লোকটার মহৎ উদ্দেশ্য দাদা বুঝুক। কিন্তু দাদা বিরক্ত স্বরে বলেঃ 'হুঃ, আগ্রহ আর না থাকবে কেন, ষোল আনাই আছে। মূর্খের দল! হাজার হাজার আছে ওর মত, ও কি এক আধ জন? মগজে কিচ্ছু নেই ব্যাটাদের। আমাদের সর্বনাশ করল ওরাই। ওরাই তো এখানে চীনেদের ওপর বোমা ফেলেছে সেদিন—কাল ফেলেছে একটা মার্কিন জাহাজের ওপর। অবশ্য দৈবাৎ হয়ে গেছে। জাপানী জাহাজ বলে ভুল করেছিল। কিন্তু সে কে শোনে। এখন মর আমেরিকার কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে আর হাজার হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে। আমাদের যেন খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই। বাড়ি এসে ভাবছি চীনদেশে জন্মালাম কেন! লজ্জায় মরে যাই।'

আই-কো হিম ঔদাস্যের দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। আই-ওয়ান্ ভাবে আই-কোর এ লজ্জা কোত্থেকে এল। জার্মান বৌ-এর প্রভাব? আই-কো শোফারের পেছনের কাঁচের শার্সি বন্ধ করে দিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করেঃ

'আসল কথা আই-ওয়ান, আমরা জাপানীদের কাছে সর্বত্র মার খেয়েছি। বিমান শক্তিতে আমরা ওদের কাছে কিচ্ছু না। আমাদের বিমান-বাহিনী একদম রদ্দি। হবেই বা না কেন? একটা জাতীয় বিমান-বাহিনী—তার কর্তা কিনা মেয়েমানুষ। শুনেছিস্, আছে কোথাও? চ্যাং-কাই-শেকের বউ বলেই সে সবজান্তা হবে!'

আই-ওয়ানের মনে হয় অনেক কিছু ব্যাপারই ও জানে না। জিজ্ঞাসা করেঃ 'তুমি কি ক্যান্টনে যাচ্ছ?'

'সবাই, এক বাবা ছাড়া। ফ্রিডা তো তিন সপ্তাহ আগেই চলে গেছে। এখানে ওর কিছুতেই মন বসল না।' বিদেশী মেয়েদের, নির্বিকার ভাবে বলে

যায় আই-কো, 'একটুতেই মনে লাগে।' আই-ওয়ানের হাসি পায় ওর কথা শুনে। খুশী হয় মহিলার সঙ্গে ওর দেখা হবে না। আই-কো বলে যায়ঃ 'আর আমি—চ্যাং-এর হুকুম হয়েছে জেনারেল পাই-এর অধীনে আমায় ক্যান্টনে থাকতে হবে। বুড়ো টুড়োদের এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তাই সবাইকে আমার সাথেই নিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য আলাদাই থাকবে তারা। ফ্রিডা ওদের সাথে থাকতে পারবে না। তা আমিও ফ্রীডার সাথে একমত।'

রাস্তা রিকশতে জাম। গাড়ি থাকে এক জায়গায়।

আই-ওয়ান্ বলল: 'এরা সব পালাচ্ছে তাহলে!' তারপর ভাবতে লাগল আই-কো তার বৌ-এর পক্ষ নিয়েছে, ঠিক বাড়িতে গোলমাল বেধে গেছে। কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

আই-কো বলল: 'না পালালে তো দুদিক থেকেই বোমা খেয়ে মরতে হবে।'

ভিড় কেটে অতি কষ্টে গাড়ি চলে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আই-ওয়ান্ চুপ করে বসে আছে। যা ভেবেছিল অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ। রাস্তার দুই পাশে ছাদ-হীন অর্ধ-দগ্ধ সব বাড়ি।

জিজ্ঞেস করে: 'ব্যাপার কি, ঠিক করে বল তো আমায়?'

কাঁধের পটি দুটো একটু ঝাঁকাল আই-কো। আই-ওয়ান্ লক্ষ্য করে, সাধারণ সৈনিকের উর্দি তো নয় এ। তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে আই-কো: 'মানুষ দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছে তো দেখছই। আমরা খতম। তৈরী নেই—সব হ-য-ব-র-ল হয়ে আছে। জালের মাঝখানটিতে মাকড়সার মত চ্যাং রাজধানী নানকিং-এ জাঁকিয়ে বসে আছেন।' নিজের রসিকতায় নিজেই বিশ্রীভাবে হেসে ওঠে আই-কো।

'নিশ্চয়ই কিছু একটা প্ল্যান করছেন বসে।' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্।

'এখনও তো কিছু দেখলাম না। জার্মানী ছেড়ে আসার সময় ভেবেছিলাম বেশ ভালো সংগঠিত সৈন্যদল আছে আমাদের। কিন্তু আছে অষ্ট রম্ভা। কতগুলি অশিক্ষিত গাঁওয়াড়ের দঙ্গল—ছোট ছোট এইটুকু এক একটা দল—দলে দলে আলাদা এক একজন সর্দার। নিজের দলের সর্দার ছাড়া কেউ কাউকে মানবে না। সত্যি কথা বলতে গেলে—তাও মানে না—মানা-মানির ব্যাপারই নেই। কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, কোথাও কিছুর হদিস নেই—হুট করে এক দল গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাপানীদের ওপর—আর কি চোখ বুঝতে সাফ। অনর্থক কতগুলি মানুষের জান আর গোলাবারুদের শ্রাদ্ধ। মরে সব শহীদ হলেন। ঘটা করে পুজো পেলেন। হয়ে গেল।'

আই-কোর ফ্যাকাশে মুখটা হঠাৎ গোলাপী হয়ে ওঠে।

আই-ওয়ান টিপ্পনী কাটে: 'সে কি হে? তোমার মুখে শৃংখলার কথা?'

'শৃংখলার মূল্য যে কি তা বুঝেছি।' জবাব দেয় আই-কো, শৃংখলার জন্যই জাপানী বাহিনী এত চমৎকার। ওদের শিক্ষাও জার্মানদের কাছেই।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলে: 'আমরা যে শুধু জিততে পারব না তা নয়—হারব, হেরে বসে আছি।'

হঠাৎ মাথার ওপর তিনটে প্লেন দেখা গেল। আই-কো চীৎকার করে

বলতেই শোফার গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। গর্জন করতে করতে নিচে নেমে এল প্লেনগুলি। দীর্ঘ একটা রুপোলী রেখা সূর্যের আলোয় জ্বলতে জ্বলতে নীচের দিকে নেমে এল কোন শহরের ওপর। দেখতে ভয় করার মত কিছু নয়। তারপর দেখা গেল না। সেকেণ্ড খানেক সব স্তব্ধ—তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ উঠল দূরের আকাশে—আর প্লেনগুলো ওপরে উঠে পশ্চিমের দিকে উড়ে চলে গেল।

আই-কো শোফারকে হুকুম দিলঃ 'চল এবার।'

গাড়ী চলতে আরম্ভ করে। দুজনেই নীরব। কত লোক মরল কে জানে এই একটা মুহূর্তের মধ্যে। ভাবনা দানা বাঁধতে না বাঁধতেই অতি-পরিচিত একটা গেটের সামনে গাড়ী এসে থামল। পৌঁছে গেছে ওরা। আই-কোর পাশে পাশে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আই-ওয়ানের কি রকম লাগে যেন।

আই-কো ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বলেঃ 'সব ছত্রখান হয়ে আছে। ঠাকুরমা বুড়ী তো একরকম মরেই আছে। রাস্তায়ই হয়তো টেঁশে যাবে।'

দরজা খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই নাকে এসে লাগে ঠাকুমার আফিং-এর সেই মাতাল-করা, মিঠে-মিঠে গন্ধ। গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল পুরানো দিনের স্মৃতি। ছোট্ট রুপোর চামচ দিয়ে চণ্ডু ঘুঁটতে ঘুঁটতেই ঝি এসে দরজায় দাঁড়াল। আই-ওয়ানের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। উঁচু চোয়ালের হাড় গ্রাম্য চেহারা মেয়েটির। পিওনীর জায়গায় কাজ করছে—দেখতে পিওনীর ধার পাশ দিয়েও নয়। পিওনী? বাড়ি আসবার সময়ও তো ওর কথা মনে হয়নি। এখন মনে হতে লাগল। ও যেন এখানেই আছে। আই-কোকে জিজ্ঞাসা করল আই-ওয়ানঃ

'কোন খোঁজ খবর পেলে পিওনীর?'

জামা খুলতে খুলতে শ্লেষের সুরে জবাব দেয় আই-কোঃ

'না, পাইনি। এই তো দেখ! এতদিন মেয়ের মত আদর করে খাইয়ে পরিয়ে—এই তো নিমকের মান!'

পুরানো কথা মনে পড়ে যায় আই-ওয়ানের; বলে ফেলেঃ 'মুফত খাওয়াওনি।' তারপরেই ঠাকুমার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে ঃ 'আচ্ছা গিয়ে ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

আই-কো প্রায় অর্ধেক উঠে গেছে। যেতে যেতে বললঃ

'চিনলে তো তোকে।'

তাই। এখন আর জ্ঞান নেই। কাউকেই চিনতে পারেন না। বিছানার ওপর পড়ে আছে শুকনো, দড়িপাকান কটা রং-এর চামড়ায় ঢাকা এতটুকু একটা কংকাল—একটা শিশুর কংকালের মতই প্রায়। চোখে ছানি পড়ে একেবারে সাদা। সম্পূর্ণ অন্ধ। আই-ওয়ান্ চীৎকার করে ডাকলঃ

'ঠাকুমা, এই দেখ তোমার আই-ওয়ান্ এসেছে।'

বৃদ্ধার কানে পৌঁছুল না। হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিল আই-ওয়ান্, পাখীর থাবার মত শুকনো, ঠাণ্ডা হিম। ছোঁয়া পেয়ে নীল ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে একটা বীভৎস গোঙানী বেরিয়ে এল। ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিল ও। এমনি অনাবশ্যক জঞ্জালে পরিণত হয় মানুষ। এই তার পরিণতি। পায়ের শব্দ শুনে পেছনে তাকায় আই-ওয়ান। বাবা ওকে খুঁজতে এসেছেন।

অনেকখানি মোটা হয়েছেন বাবা—মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে—মুখের ভাব আগের চেয়ে খানিকটা শান্ত হয়েছে। তাছাড়া প্রায় এক রকমই আছেন।

'বাবা।'

'আয় বাবা, আয়।' বলে ছেলের হাত ধরেন এসে মিঃ উ; বলেনঃ 'খুব ভাল হয়েছে এসে গেছিস। কিন্তু একটাও চিঠির জবাব দিসনি কেন রে ক'মাসের মধ্যে?'

'চিঠি? কোথায় চিঠি? পাইনি তো? আর আমি তো লিখেছি তোমায়।'

বাবা বড় বড় করে তাকিয়ে মাথা নাড়েনঃ 'আজকাল আর বুঝতে পারিনে মুরাকিকে। যাক গে এসেই তো গেছিস, ঝামেলা মিটে গেছে।'

বাবাকে কি বলবে, কথা খুঁজে পায় না আই-ওয়ান্। অথচ মনের মধ্যে কথার পাহাড় জমা হয়ে আছে।

তোর ঠাকুরদা তোর জন্য বসে আছেন রে!' বাবা বলেন।

'ঠাকুরমা তো চিনতেই পারলেন না আমায়!' জবাব দেয় ও। ভাবে কি জানি ঠাকুর্দাও যদি—

'নারে, প্রায় সে-রকমই আছেন।' বাবা বলেন, 'একটু দুর্বল হয়ে গেছেন এই যা। কিন্তু দেখগে সবচেয়ে ভালো পোষাকটি পরে, সব কটা মেডেল ঝুলিয়ে ফিট্‌ফাট তৈরী—যাবেন তো ঘণ্টা ছ'এক পরে। আর এই জাপানীদের ব্যাপার নিয়ে ও'র মগজে রাজ্যের প্ল্যান গিস্ গিস্ করছে।' একটু হাসেন শ্রীযুক্ত উ। তারপর আবার বলেনঃ সে বার চ্যাং-কাই শেকের সাথে দেখা করার জন্য যখন নানকিং এ যাই—এই লম্বা এক প্ল্যান পাঠালেন আমার হাতে—তিন মাসের মধ্যে নাকি শুধু জাপানী নয়, যত বিদেশী সব ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেওয়া যায় চীন থেকে।'

হাসেন শ্রীযুক্ত উ। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফেরেন। বৃদ্ধ আবার গুঙিয়ে ওঠে। শ্রীযুক্ত উ সন্ত্রস্ত হয়ে পরিচারিকাকে বলেনঃ 'শিগ্গির দে বাবা, চণ্ডুর নল ঘুমিয়ে পড়ুক।'

মেয়েটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে।

ওপরে উঠতে উঠতে বাবা বলেনঃ 'কিছু করবার নেই এদের নিয়ে এ ছাড়া—।'

উত্তর দেয় না আই-ওয়ান্। বাবা একটু বদলেছেন—একটু শান্ত হয়েছেন, তবে আরো যেন শক্ত।

'মা কেমন আছেন?' জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্।

'উঠেছেন হয়তো এতক্ষণ। কাল রাতে বোমার জন্য ঘুম হয়নি। একটু দেরী হয়েছে উঠতে। উঃ বোমা শুরু হলে কি ভয়টাই যে পান!' ঠাকুরদার ঘরের সামনে এগিয়ে একটু থেমে বলেন শ্রী উঃ 'দেখ, তোর মা যদি তোকে তাদের সঙ্গে ক্যাণ্টনে যেতে বলে—রাজী হবিনে কিন্তু। চ্যাং-কাই-শেক তোকে ডেকেছেন।'

চ্যাং-কাই-শেক? সেই লোকটা? যার হাত থেকে পালিয়ে ও বেঁচে-ছিল? এই লোকটাই হয়তো এন্-লানকে খুন করেছে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আই-ওয়ান্ ভাবে। যাক্‌গে—সবই তো বদলে গেছে। লোকসান কি?

গম্ভীরভাবে 'আচ্ছা' বলে এগিয়ে চলে ও।

জানালার কাছে বসে আছেন বৃদ্ধ জেনারেল। বুকের ওপর রোদ পড়ে ঝক্‌মক্‌ করছে মেডেলগুলো।

'আরে! আরে! এসে গেছিস!' নাতিকে স্বাগত করেন বৃদ্ধ—যেন মাত্র কালই কোথায় গিয়েছিল আই-ওয়ান্‌।

হেসে জবাব দেয় আই-ওয়ান্‌ঃ 'এসে গেছি, ঠাকুর্দা।'

বার্দ্ধক্যে একটু কাঁপে শরীরটা। তাছাড়া ঠিক তেমনি রাশভারী আছেন।

'বোস্‌, বোস্‌ সব।'

দুজনে বসে। বৃদ্ধ টেবিলের কাছে গিয়ে মোড়ান একতাড়া কাগজ নিয়ে এসে খুলে বলেনঃ 'ক্যান্টনে পেঁাছেই, নিজে গিয়ে দিয়ে আসব পাইকে। মোদ্দা কথা কি জানিস্‌? আসুক না জাপানীরা—আসুক। দে আসতে। কিছুটি বলার দরকার নেই। শুনেছি সাংহাইএ নাকি আমাদের দশ হাজার লোক মারা গেছে। আমাদের কি আর লোকের অভাব? দশ হাজার গেছে আরও লাখ লাখ বাকী আছে। কত মারবে ওরা। মেরে মেরে যখন কাবু হয়ে আসবে বাছাধনরা তখন আমরা গিয়ে বলব—যাওতো এবার গুড়িগুড়ি নিজের দেশে ফিরে যাও, যাদুরা। অবশ্যি সব একবারে নয়। এই একটা ঠিক করে দেওয়া হবে—বছরে এত জন করে। নইলে বুঝেছো তো—মুখ থাকে না আমাদের। শত্রু হলেই বা কি—একটা ভদ্রতা আছে তো? অন্যান্য যে সব বিদেশীরা আছে, তাদেরও বলতে হবে। না যদি যায় ভালো কথায়—তখন মেরে ভাগাব! আগে যুদ্ধ করিনি বলে আমাদের তো আর কিছু খরচ হবে না! অস্ত্র শস্ত্র সৈন্য সব পুরোপুরি থাকবে।'

গর্বিতভাবে তাকান বৃদ্ধ। আই-ওয়ান্‌ বাবার দিকে তাকায়। স্নিগ্ধ প্রশ্রয়-ভরা দৃষ্টিতে জেনারেলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন শ্রী উ।

বৃদ্ধ আই-ওয়ান্‌কে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'কিরে তোর কি মত?' সন্তর্পণে জবাব দেয় আই-ওয়ান্‌ঃ 'তা, এত লোক মরবে—একটু—ইয়ে—হবে না?'

'ধুত্তোর তোর ইয়ে।' ধমকে ওঠেন ঠাকুর্দা, 'দুর্ভিক্ষে, লড়াইয়ে কম মরছে? সে অবশ্য ব্যাটাদের গা-সওয়া। তবে হ্যাঁ এতে একটু মরবে বেশী। তাতেই বা কি! এত বড় পেল্লায় দেশ—জাপানী ব্যাটারা সব ঝেঁটিয়েও যদি এখানে চলে আসে, শুধু একটা মাছির ঝাঁক বইতো নয় আমাদের কাছে। ঐ টুকুনি পুঁচকে দেশের আর চীনকে জিততে হয় না। জিতলেই বা কি—আমাদের দেশের লোকেরা সব সইতে পারে।'

মুহূর্তে অন্যদিকে চলে যায় বৃদ্ধের চিন্তা।

'একটা মেডেল্‌ হারিয়ে গেছে আমার।' ছেলেকে বলেন। স্বর সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আব্দেরে ছেলের মত।

শ্রী উ জিজ্ঞাসা করেনঃ 'কোনটা?' মেডেল রাখার মখমলের কেসটা খুলে দেখেন।

'সেই যে ইটালির রাজদূতেরটা দেখে তৈরী করিয়েছিলাম। মনে নেই তোমার? বছর দশেকও তো হয়নি। এটাই সব চেয়ে নূতন ছিল। নিশ্চয়ই কোন ব্যাটা চাকর সরিয়েছে। ব্যাটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও।'

খুঁজতে খুঁজতে বাক্সের মখমলের ভাঁজের মধ্যে পাওয়া গেল মেডেলটা।

বৃদ্ধের হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় বাপ ছেলে। দরজার কাছেই দেখা হয় আই-ওয়ানের মায়ের সঙ্গে। অপ্রত্যাশিতভাবে ছেলেকে দেখে প্রায় চীৎকার করে ওঠেন তিনি। অনেকখানি মোটা হয়েছেন মা। নাক চোখ প্রায় ডুবেই গেছে মাংসের মধ্যে। কিন্তু ঠিক ছোটবেলায় যেমন করতেন তেমনি করেই আই-ওয়ানের হাতখানা নিয়ে শোঁকেন মা। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায় ওর—বড় ভালো লাগত মাকে ওর তখন। ভারী সুন্দর ছিলেন, বুদ্ধিমতী শক্তিমতী ছিলেন। কিছু হলেই ছুটে গিয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকুত ও। কিন্তু এখন মাকে দেখলে মনটা বিগড়ে যায়। মায়ের চেয়ে ও যেন অনেক বড় হয়ে গেছে তাই মায়ের কাছে আর না মেলে আশ্রয়; না খুঁজে পায় তাঁর বুদ্ধি। মনটা বিষণ্ণ হয়ে আসে। আচ্ছা! ওকে দেখে জীরোরও কি একদিন অমনি মনে হবে?...মায়ের স্বরটা কিন্তু বদলায়নি...ঠিক তেমনি মিঠে আছে।

ছেলেকে বলেন: 'জিনিষ পত্র আর খোলাখুলি করবি কি কত্তে? আজ রাতেই তো সব ক্যান্টন যাচ্ছি। যা সাংঘাতিক অবস্থা এখানে! রোজ রাত্তিরে বোমা। কিন্তু তোর বাবা নড়বেন না। কান্নাকাটি পর্যন্ত করেছি। কিন্তু আমার কোন কথাটাই বা কবে শুনল। তোকে আমি ছাড়ছিনে। আই-কো? তার কথা ছাড়। ও ছেলে পর হয়ে গেছে। কি মেয়েই ঘরে আনল। তা আমার কাছে একজন তো থাকবে! নয়ত দুটো বুড়ো হাবড়াকে একলা সামলাবো কি করে?'

মিঃ উ মনে করিয়ে দেন: 'কেন? সব কজন চাকর তো নিয়ে যাচ্ছ। মাত্র দুটোইতো রেখে গেলে এখানে।'

শ্রীমতী উ জবাব দেন: 'তোমার চাকরদের খিদমৎ করতেও লোক লাগবে আবার।'

ভূমিকা না করে আই-ওয়ান্ সোজা বলে ফেলে:

'আমার যাওয়া হবে না, মা। দেশে আসাই আমার যুদ্ধ করব বলে।'

মায়ের মুখ কালো হয়ে যায়।

ছোট মেয়ের মত কচি লাল টুকটুকে নীচের ওষ্ঠখানা কাঁপতে থাকে।

বলেন: 'তুইও তোর বাবার মতই পাথর হলি!'

চোখ ফেটে জল আসে। ঠিক এই সময় কতগুলি ফার্ হাতে নিয়ে ঝি এসে দাঁড়াল। সামলে নিলেন মা।

'এগুলি নিয়ে যাবেন, না এখানে থাকবে, মা?'

'নিয়ে যা।' শ্রীযুক্ত উ বলেন।

কান্নার সুরে বলেন শ্রীমতী উ: 'বাবা, অত বাক্স নেই আমার।'

'কিনে নিলেই হয়!' উ বলেন।

'যত ঝামেলা!' পাগলের মত হয়ে বলেন শ্রীমতী উ। তারপর সব কিছু ভুলে গিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান।

বাবার দিকে চেয়ে আই-ওয়ান্ বলে: 'একটু বিশ্রাম করিগে, বাবা।' হঠাৎ একলা থাকার জন্য যেন পাগল হয়ে ওঠে ও। আজন্মের পরিচিত ঘরখানার দরজা খোলে গিয়ে।

সারা বাড়িতে পিওনীকে না দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল ও। কেমন যেন

নিশ্চিন্ত ছিল এ ঘরে নিশ্চয়ই আছে সে। কিন্তু না পেয়ে আরো অবাক হল। তাই, কোথাও নেই মেয়েটা, ওর স্পর্শটুকুও নেই। শূন্য জানালাগুলো শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। ফুল রাখেনি কেউ। টেবিলে রাখা সেই গরম চায়ের কেৎলী। সবই অবশ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—শুধু ধুলোর একটা হাল্কা আস্তরণ জমেছে ওপরে। পিওনী থাকলে ও আসছে শুনতে পেলেই, এটুকুও মার্জিত হয়ে যেত। বিছানা, বই পত্র, চেয়ারের কুশানগুলো দেখলেই বোঝা যায় বহু-কাল কেউ ব্যবহার করেনি। সেই কবে এ ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল—এতদিন পরে আবার এখানেই নীড় বাঁধবে? কি করে বাঁধবে? একদিন ভেবেছিল বিপ্লবের আঘাতেই এ ঘর ভাঙবে। কিন্তু তা হয়নি। আজও বিরাট ইমারৎ গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে মাটির বুকে। হয়তো শেষ পর্যন্ত জাপানী বোমার মার খাবে বলে। কে জানে—কোন গতি লেখা আছে!

আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। এন্-লানের সেই চিঠিখানা। দেরা-জের একেবারে পেছনে ইস্কুলের খাতা পত্রের মধ্যে গুঁজে রেখেছিল। মনে হতেই দেরাজ খুলে খুঁজে দেখল, নেই। ধুলোয় একাকার হয়ে আছে দেরা-জের ভেতরটা। কেউ হাত দিয়েছে বলে মনে হয় না। তবে? শুধু ওই জিনিষটাই মাঝখান থেকে কোথায় উড়ে চলে গেল? কেউ নিশ্চয় নিয়েছে। তা হলে...ওই চিঠিটা থেকেই কি দলের খবর পেয়েছে পুলিশ? কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। কে নিতে পারে? বাবা? বাবা তো কখনও এ ঘরে আসেন না! পিওনীই শুধু আসত। ওই সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত। ও মেয়ে নয়তো? হতেই পারে না। পিওনী অমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে! বিশ্বাস করেই না সব বলেছিল ওকে আই-ওয়ান্! ভয়টা ভাবনা হয়ে সারা মন জুড়ে বসল ওর। অর্ধেক রাত ঘুম এলো না। ছট্‌ফট্ করল বিছানায় পড়ে পড়ে।

সন্ধ্যার দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। জাহাজ-ঘাটে যাবার পথে বারবার মা বলতে লাগলেন: 'বৃষ্টিটুকুর জন্য ঠাকুরকে কম ডাকিনি!'

বাবা চুপ করে থাকেন। আগের দিন হলে এসব কথা শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতেন। সত্যি বদলে গেছে মানুষটা। জাহাজে উঠে আই-কোর হাতে টিকিট আর টাকা দিয়ে দিলেন।

ওরা যখন ফিরল সারা বাড়িটা নিঝঝুম খাঁ খাঁ করছে। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে শ্রী উকে। 'মেঘ করেছে রে! চাঁদ ঢেকে গেছে।' বলেন ছেলেকে: 'আজ আর বোমা পড়বে না। চল, খানিকটা ঘুমিয়ে নি।'

যে যার ঘরে চলে যায়।

শয্যার আরামে দেহ এলিয়ে পিওনীর কথাই ভাবে আই-ওয়ান্। একটা কথাই শুধু মনে তোলপাড় করে—কি হল ওর। সত্যি পিওনী বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে! তাহলে তো আই-ওয়ানই এন্-লানের মৃত্যুর জন্য দায়ী। ও যদি না বলত পিওনীকে তাহলে তো এমন হত না। কিন্তু কিছুতেই পিওনীকে অবিশ্বাস করতে পারে না। কেউ ও বেচারীকে চিনতে পারেনি। আই-ওয়ান্ নিজেও নয়। তামাকে পেয়ে ও সুখেই ছিল। সুখেই ঘর করেছে। তার মধ্যে একদিনও পিওনীর কথা মনে হয়নি। কিন্তু তবু পিওনীর স্মৃতি মলিন হয়নি। ওর বুকের মধ্যেই আছে পিওনী। সেই ওর বিয়ের

রাতে—অনেকক্ষণ ধরে ভেবেছিল পিওনীর কথা; ভেবে বড় খুশী হয়েছিল যে ও তাকে ভালোবাসেনি, তার ভালোবাসা স্বীকার করেনি। কিন্তু তামাকে ওর কথা বলতে পারেনি। তামার কাছে পিওনীর নাম অনুক্তই থেকে গেছে। আই-ওয়ানের কে এই মেয়ে? একটা কিছু—কি, তা ও নিজেই জানে না—হয়তো বা কোন হারিয়ে-যাওয়া সুগন্ধের স্মৃতিটুকুন। তার বেশী নয়। তবু মন মানে না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে পিওনী দোষী। না, না, ও জানে, জানে, বিশ্বাস-ঘাতকতা পিওনী করেনি; করতে পারে না।

সকালে খাবার টেবিলে, যেন কিছুই নয় এমনিভাবে কথা পাড়ল আই-ওয়ান্‌ঃ

'আচ্ছা, বাবা! সেই তখন আমাদের দলের সকলের নাম তোমরা কি করে জেনেছিলে, বল না! অনেক দিন তো হয়ে গেছে, এখন বললে কি হবে!'

শ্রী উ জবাব দেনঃ 'চ্যাং-কাই-শেক এর কাছ থেকে।'

'চ্যাং-কাই-শেক!' বিস্ময়ে হত-বাক হয়ে গেল আই-ওয়ান্‌। 'সে কি? সে কি করে জানলে?'

'তার অজানা কিছু নেই!' শুষ্কভাবে জবাব দেন শ্রী উ, 'ঐ সময় অনেক কথা হয়েছে তাতে আমাতে। মেলা টাকার দরকার ছিল চ্যাং-এর। আমি ঋণ দিতে স্বীকার হই এই শর্তে যে গোলমাল বন্ধ করে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা হবে এবং কম্যুনিস্টদের তাড়ান হবে। তারপর একদিন দেখি জরুরী তলব। গিয়ে দেখা করলাম। একটা লিষ্টি দেখালেন, মৃত্যু-দন্ড-পাওয়া কম্যুনিস্ট-দের নামের লিষ্টি। তার মধ্যে তোমার নাম। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। জোর দিয়েই বললাম, ভুল আছে। এ হতেই পারে না। ডেকে পাঠা-লেন একজন ছেলেকে। তোমাদের সাথেই পড়ত। টাকা দিয়ে হাত করে তোমাদের মধ্যে ঢোকান হয় ওকে। ফাঁদে পড়লে তোমরা। তার কাছ থেকেই সব পাওয়া যায়।'

'আচ্ছা, ছেলেটার নাম কি পেং-লিউ?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্‌।

'অতশত জানিনে।' বিরক্ত হয়ে জবাব দেন শ্রী উ। পুরনো কথা মনে হয়ে তিক্ততায় মুখের শিরাগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তারপর একটু ভেবে বলেনঃ '...হ্যাঁ, কি রকম যেন ভীতু ভীতু ধরনের ছেলেটা; হল্‌দে সীঁটিয়ে যাওয়া মুখ; বোধ হয় বলেছিল ওর বাবা দোকান করত, কোথায় নাকি একটা ছোট দোকান ছিল—।'

আই-ওয়ান্‌ উত্তেজিত হয়ে ওঠেঃ 'পেং-লিউ, পেং-লিউ! না হয়ে যায় না। তাই বল। ও কোথায় এখন বলতে পার?'

পিওনী নয় তাহলে! হাঁফ ছেড়ে বাঁচে আই-ওয়ান্‌। তাহলে ওর দোষে এন্‌-লান্‌ মরেনি! অবশ্যি মরেছেই যে তা কে বলতে পারে।

'মরে গেছে।' নির্বিকারভাবে বাবা বলেন। পাওনা টাকা হাতে দিয়ে তার পর খতম করে দেওয়া হয়েছে।'

'সেকি? কেন?' আই-ওয়ান্‌ জিজ্ঞাসা করে।

'চ্যাং-এর কাছে বিশ্বাস-ঘাতকদের ঠাঁই নেই।' শ্রী উ জবাব দেন।

'বাঃ, ঘুষও দেবেন, আবার ঘুষ নিলে গর্দান নেবেন, এ কেমন কথা?' রেগে ওঠে আই-ওয়ান্‌।

'করতে হয় কখনও কখনও। যতই নিষ্ঠুর মনে হোক চ্যাংকে কিন্তু একেবারে সাচ্চা মানুষ। কাজে লাগায় সবাইকেই, শুধু অবিশ্বাসীদের ঝেঁটিয়ে ফেলে।'

'সুবিধাবাদী...!' ব্যঙ্গ করে আই-ওয়ান্।

'বুদ্ধিমান মাত্রই সুবিধাবাদী', শ্রী উ বলেন, 'বোকারাই মৌকা সম্‌ঝে চলতে জানে না। কিন্তু বাইরে যত ভোলই বদলাক, ভেতরে কিন্তু মানুষটা চ্যাং সেই এক।'

শ্রী উ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে লম্বা লম্বা নখ দিয়ে টেবিল ঠুকতে থাকেন।

'শুনে রাখ, আই-ওয়ান্। জাপানীদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে এক মাত্র এ লোকটাই। এবং করবেও, দেখে নিস্ তোরা। সিয়ান্ থেকে এসে অবধি—ঐ ওর ধ্যান জ্ঞান হয়েছে। জাপানীদের তাড়াবে। তাড়াবেই দেখিস্। দেখেছিস্ তো কম্যুনিষ্টদের কি হাল করল। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কোন-ঠাসা হয়ে আছেন বাছাধনেরা এখন। যেমনি এগুচ্ছে একটু, অমনি তাড়া। ফি বছর তাড়া খাচ্ছে। চ্যাং ঠিক করেছে গোটা দেশে 'এক-তান্ত্রিক' শাসন-ব্যবস্থা হবে।'

'এক-তান্ত্রিক মানেই স্বেচ্ছা-তান্ত্রিক!' ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ স্বরে বলে আই-ওয়ান্। 'তাও ভাল, তিক্ত স্বরে জবাব দেন শ্রী উঃ 'নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরে শত্রুর সুবিধা করে দেওয়ার চাইতে একের শাসন ঢের ভালো। কবে তো ফতে হয়ে যেতাম সব, যা শুরু হয়েছিল!'

'তার মানে বলতে চাও আজের ভবিষ্যৎটা দশ বছর আগেই দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন ভদ্রলোক। তাই বুঝি তখন থেকেই সারা দেশের ওপর তাঁর একচ্ছত্র শাসন চালালেন! আজের জন্য তখন থেকেই সারা দেশকে 'একত্র' করছেন না?' আই-ওয়ান্ বলে।

পিওনীর কথা আর মনে নেই আই-ওয়ানের। এখন ভাবছে শুধু এই লোকটির কথা, একদিন যার বিরুদ্ধে তীব্র তিক্ত ঘৃণায় ও আকুল হয়ে কেঁদেছিল! বিপ্লবের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল বলে যাকে বিশ্বাস-ঘাতক আখ্যা দিয়েছিল। হয়তো ওরাই ভুল করেছিল। ঠিক বুঝেছিলেন চ্যাংই। হয়তো সত্যি তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল।

শ্রী উ একটু একটু মাথা নাড়ছিলেন বসে বসে। বললেনঃ

'আমার মনে হয় লোকটা সর্বদর্শী, সর্ব-শক্তিমান। সত্যি মানুষের মত মানুষ একটা।'

কিন্তু বাবার কথা এত সহজে গ্রহণ করতে পারে না আই-ওয়ান্। জাপানী খবরের কাগজের কোন কোন সংবাদ ওর মনে পড়ে। বলেঃ

'সুবিধা-বাদী বলেই বারে বারে পথে না গিয়ে বিপথে যান ভদ্রলোক।'

বাবা জবাব ছুঁড়ে মারেনঃ 'সে যখন ছিল, তখন ছিল। নিজের ভুল বুঝতে পারা, এবং তদনুযায়ী নিজকে শোধরানই মহত্বের নিরীখ।'

আই-ওয়ান্ ফেটে পড়েঃ 'যে-ভাবে গায়ের জোরে মুস্কিল-আসান করেন, তাতে মনে হয় ওর দেহে জঙ্গী-সর্দারের রক্ত। অন্য সময় হলে লোকে ওকে স্রেফ জঙ্গী-সর্দার বলতো।'

'গায়ের জোরে হোক আর যে-ভাবে হোক মুস্কিলের আসান তো করে।' জবাব দেন শ্রী উ।

আই-ওয়ান্ আবার আরম্ভ করেঃ 'তারপর ভদ্রলোকের অতগুলো বৌ...'। খাওয়ার বাটি থেকে চোখ তুলে দেখে বাবার কঠিন দৃষ্টি ওকে বিঁধে আছে।

অত্যন্ত গম্ভীর, ভারিক্কীভাবে ছেলেকে বলেন শ্রী উঃ

'এ বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি আলোচনা করব না। বিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমার ভাই যখন ফ্রীডাকে নিয়ে ঘরে এল—তোমার মা, কেঁদে কেটে এমনি হুলস্থুল বাঁধালেন যে শেষ অবধি ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে হল। কেন বিদেশে যাবার আগে জোর করে আই-কোর বিয়ে দিইনি, এই হল তাঁর কথা। আমি বোঝালাম অনেক করে—বিয়ে না দিয়ে আমরা ঠিকই করেছি। আমাদের ছেলেই মূর্খ, তা আর কি করা যাবে।'

ভ্রূকুটি করে থেমে যান শ্রী উ। আই-ওয়ান্ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝে সেই বিদেশিনীকে সংসারে মানিয়ে নিতে কি বিষম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হচ্ছে। ছেলের সাথে চোখাচোখি হয়ে যায় শ্রী উর।

অত্যন্ত নরম সুরে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'তারপর! তোর জাপানী বৌ কেমন? কিছু তো জিজ্ঞাসা করলাম না। জাপানী মেয়েরা খুব ভালো স্ত্রী হয়। তাই তোর জাপানী মেয়ে বিয়ে করাতে আপত্তি করিনি আমি। এই যুদ্ধের সাথে এর কিছুই সম্পর্ক নেই। মানব-নীতি আর রাজ-নীতি মিশিয়ে ফেলে বোকারা।'

বাবার এই স্নেহের অভিব্যক্তিতে কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে আই-ওয়ান্। ইচ্ছে করে বাবাকে তামার কথা সব বলে।

'খুব ভালো, বাবা! এমন চমৎকার মেয়ে হয় না। ওকে আমার জাপানী বলে মনেই হয় না। তামা তামাই। আমার ছেলেদের মা। এ ছাড়া আর কোন কথাই মনে হয় না আমার।' বলে ফেলে আই-ওয়ান্।

'বটে—বটে!' চিন্তিতভাবে বলেন শ্রী উঃ 'তা তোরা চিঠি পত্র লিখবি কি করে! জাপান থেকে চিঠি পত্র পাস জানাজানি হলে আর রক্ষে থাকবে না। তা আমার নামে আফিসের ঠিকানায় লিখতে বলিস। ওখানে কারো নজরে পড়বে না। আর তোর চিঠিও আমার হাতে দিস্, পাঠিয়ে দেব। দিন কাল তো ভাল না। টের পেলে হয়তো তোকে মেরেই ফেলবে।'

আই-ওয়ানের মনে হয়েছিল একবার। বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেঃ 'কিন্তু বাবা, তোমার ওপরেও তো বিপদের ঝুঁকি কম আসবে না।'

শ্রী উ বলেনঃ 'আমায় সবাই চেনে, সে ভাবনা তোর নেই। তা ছাড়া আমায় মারবে এত বড় বুকের পাটা কারো নেই। চ্যাং-কাই-শেক রক্ষে রাখবে না তা হলে। তাকে সবাই যমের মত ভয় করে।' নিঃশব্দে হাসতে হাসতে চাটুকু নিঃশেষ করে ভেতরের পকেট থেকে একটা চিঠি টেনে বের করেন। 'দাঁড়া তো দেখি—হ্যাঁ, চ্যাং-কাই-শেকের হুকুম—তোকে গিয়ে দেখা করতে হবে। দুটো দিন আছে মাঝে।'

'হুকুম' কথাটা এমন একটা খুশির সুরে জোর দিয়ে বললেন শ্রী উ, আই-ওয়ানের ভেতরটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। একটু গরম হয়ে জবাব দিলঃ 'কেমন

জ্ঞানি হয়ে গেছ, বাবা। বিশ্বাস করছ কি করে লোকটাকে! লোকটা খৃষ্টান, খাঁটি খৃষ্টান। ওদের দেবতা ভজে।'

'চ্যাং সব সময়েই খাঁটি।' শ্রী উর চতুষ্কোণ মুখখানির ওপর একখানি মন্থর হাসি খেলে গেল। আবার বললেন: 'তা সবাইকেই তো সে কাজে লাগায় সুবিধা মত। তা খৃষ্টানদের দেবতাকেও একটু লাগাচ্ছে, এই আর কি!'

শ্রী উর মুখে এই প্রথম বিদ্রূপ শুনল আই-ওয়ান্।

যে-মানুষ একদা ওর জীবনকে ছিন্ন-মূল করে নিষ্ঠুর হাতে আর এক দুনিয়ায় ছুঁড়ে ফেলেছিল, তারি সামনে আজ প্রথম এসে দাঁড়াল আই-ওয়ান্। যে তাড়িয়েছিল, সেই আবার ডাক দিয়েছে।

এত বড় ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হওয়া এই প্রথম। এন্-লানের সামনেও এমনি করে দাঁড়াতে পারেনি। এন্-লান্ বেঁচে থাকলে এমনি ব্যক্তিত্ব-বান্, এমনি বলিষ্ঠ, সংযত-শ্রী, এমনি সংহত-শক্তির অধিকারী হত। আই-ওয়ানের স্মৃতিতে একদার এক আবেগোদ্দীপ্ত, ভাব-পাগল এন্-লানের ছবিই জেগে আছে।

বসতে আদেশ করলেন চ্যাং-কাই-শেক।

খাড়া-পিঠ ওয়ালা তিনখানি চেয়ার ছিল। তারি একটায় বসে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল আই-ওয়ান্। চীনের ভাষা ছাড়া কোন ভাষায় কথা বলেন না চ্যাং, সাবধান করে দিয়েছিল সেই রূপবতী—আসতেই দুয়ারে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন যিনি। বলেছিলেন: 'খবরদার ইংরাজী টিংরীজী বলো না, একটি শব্দও নয়। ভীষণ চটে যাবেন।' বলে একটু হেসেছিলেন মহিলা। মহিলার চেহারায় কেমন বিদেশী বিদেশী ভাব।

বসে বসে ভাবতে লাগল, স্ত্রীর প্রতি এই লোকটার মনোভাব কেমন? মহিলার পরনে চৈনিক বেশ; কালো চুলের গোছা পেছনে টেনে এ' দেশেরই সাবেকী ধরণে বেঁধেছেন। কিন্তু তবু মুহূর্তের সামান্য দু-চারটি কথার মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল আই-ওয়ান্ বেশে-বাসে যাই হোক অন্য বহু দিক দিয়েই চীন-কন্যা নন ইনি। উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি হতে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কোমলতায় গলান, প্রাণ-ঢেলে-দেওয়া কণ্ঠ; চলা-ফেরার সুন্দর ভঙ্গি, সুসংযত অথচ স্বচ্ছন্দ। এ নারী অশংকিনী, স্বাতন্ত্র্যাণী। এ-নারী জাতীয় বিমান-বাহিনীর অধিনায়িকা বলে হেসেছিল আই-কো। শুধু বিমান-বাহিনী কেন—যে-কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের পূর্ণ-ক্ষমতা রাখেন।

এই পুরুষটিই কেবল হয় তো তাঁর নাগালের বাইরে।

আই-ওয়ান্ নত মস্তকে অভিবাদন জানাল। সম্মুখের পূর্ণ দৃষ্টির সাথে ওর দৃষ্টি মিলে গেল। শুনতে পেল: 'তোমার বাবা আমার বন্ধু। এই চিঠিখানা নাও...।' স্থির দৃষ্টিতে কোন বীচি-ভঙ্গ নেই। বলে যান চ্যাং-কাই-শেক অতি শান্ত, কিছুটা বা নিরুৎসুক স্বরে, 'অত্যন্ত জরুরী চিঠি। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে কম্যুনিস্ট সেনা-বাহিনী আছে তার একজন অফিসারের হাতে এ চিঠি দেবে। সেখান থেকে ঐ বাহিনীরই ভার প্রাপ্ত সেনাপতি দুজনের হাতে পৌঁছে দেবে সে।'

'আজ্ঞে, বুঝতে পেরেছি।' বলে আই-ওয়ান্। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। সব রহস্য মনে হয়। মনে হয়, যে-কম্যুনিস্টদের দেশ ছাড়া, মাটি-ছাড়া করে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কোন ঠাসা করে রেখেছেন, তাদেরই কাছে আবার চিঠি! কোন কাজে? আশ্চর্য! কিন্তু আশ্চর্য হবার সময় নেই। এক কথা দুবার বলে না এ ব্যক্তি, বোঝায় না, ব্যাখ্যা করে না, একটা অক্ষর বেশী বলে না। সুতরাং প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনতে হবে। বেখেয়ালে একটিও খোয়ালে চলবে না।

'এ কাজের জন্য তোমায় ডেকেছি, তার কারণ তুমি বিশ্বাস-যোগ্য বলে তোমার বাবা বলেছেন। বিশ্বাস না যদি রাখতে পারো, অন্যান্য বিশ্বাস-ঘাতকদের যা হয় তোমারও তাই হবে। এ কথা বেশ ভালো করে জানেন তিনি, তোমায়ও বুঝে নিতে হবে। এক্ষুণি রওনা হতে হবে। প্লেন তৈরী।'

'আজ্ঞে, আর একটা কথা। জবাব আনতে হবে?' বলে আই-ওয়ান্।

'প্লেন অপেক্ষা করবে, তোমায় নিয়ে ফিরবে।' বলেই ডেস্কের ওপরকার ঘণ্টা বাজালেন। দরজা খুলে গেল।

আই-ওয়ান্ উঠে দাঁড়াল; এবং যেন সহজ-বুদ্ধি-চালিত হয়েই একটা কড়া সামরিক স্যালুট্ দিয়ে ফেলল। জার্মান শিক্ষকটির কাছে একদা শিখেছিল।

তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন চ্যাংঃ 'সামরিক শিক্ষা নিয়েছ বুঝি? আমি ভেবেছিলাম তোমার ভাইই গিয়েছিল বাইরে।'

'আমি জাপানে গিয়েছি শুধু।' আই-ওয়ান্ উত্তর দিল।

'সেখানেই ট্রেণিং নিয়েছ?' আবার প্রশ্ন করেন চ্যাং।

'আজ্ঞে না। আগেই।' আই-ওয়ান্ জবাব দিল।

হাতের তালু দিয়ে ঘণ্টাটা আবার বাজালেন চ্যাং। সংগে সংগে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আই-ওয়ান্ সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন চ্যাংঃ 'শুনছি, জাপান নাকি একেবারে অন্তিম দশায়। সত্যি?'

'না, সত্যি নয়।' আই-ওয়ান্ বলে।

'ব্যবসার অবস্থা ভালো?'

'আজ্ঞে।' জাপানের জন-বহুল, কর্ম-ব্যস্ত রাস্তাগুলির কথা স্মরণ করে জবাব দিল আই-ওয়ান্।

ভাস্বর চোখ দুটির সন্ধানী দৃষ্টি আই-ওয়ানের ওপর ফেলে আবার জিজ্ঞাসা করলেন চ্যাংঃ 'এও শুনেছি, জাপানের সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না। একথা সত্য?'

ধীরভাবে জবাব দেয় আই-ওয়ান্ঃ 'তাদের যা চাওয়ান হয়, তাই চায়।'

'সরকারের প্রতি অনুগত জনসাধারণ?'

'অত্যন্ত।'

'সম্রাটকে এখনও পুজো করে?'

'আজ্ঞে।'

একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসলেন চ্যাং। আই-ওয়ানের ওপর থেকে এই প্রথম তাঁর দৃষ্টি সরল। জেডের তৈরী সীল-মোহরটা তুলে নিয়ে

সেই দিকে তাকিয়ে বললেন : 'আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে আমার লোকেরা। যা দেখছি যুদ্ধ চলবে।'

আই-ওয়ান্ জবাব দিল : 'আজ্ঞে, তাই। যুদ্ধ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হবে।' হিদেয়োশীর কথা মনে পড়ে গেল। আবার বলল : 'প্রথম থেকে ঐ কথাটি বুঝে এবং প্ল্যান করে চলতে পারলে আমরাই জিতব। শত্রুপক্ষ—' মানে হিদেয়োশী—তামা এবং ওর ছেলে দুটি নয়—তারা ওর, একান্ত আপনার— 'শত্রু-পক্ষ ভেবে রেখেছে যুদ্ধ দু'চার দিনেই থেমে যাবে।'

চ্যাং এর দৃষ্টি আবার ছুটে যায় ওর দিকে।

'তাই ভাবে নাকি? কত দিন—ওদের ধারণায়?'

'প্রথম বলেছিল, মাস তিনেক—এখন বলে এক বছর। কিন্তু আমার মনে হয়, বহুদিন থাকবে।'

বাইরে একটা প্লেনের গুঞ্জন শোনা গেল। কিন্তু চ্যাং এর কথা এখনও শেষ হয়নি—

'তার মানে ওদের লড়াই শেষ হলে তবে আমাদের লড়াই-এর প্ল্যান...' আই-ওয়ান্ উত্তর দিল না। '...তার মানে ওরা নিঃশেষ হোক, ততক্ষণ আমরা শক্তি-সঞ্চয় করব। তার মানে—জাতীয় জীবনের পক্ষে আবশ্যকীয় সব রক্ষা করতে হবে—শহর নগর নয়, মানুষ নয়। ওসব বহু আছে।'

'শহর-নগর নয়, মানুষ নয়—' কথাগুলো কানে গেল আই-ওয়ানের। এগুলো রক্ষা করার প্রয়োজন নেই! এর মধ্যে অন্য কথা আছে। তাহলে এও কি রণ কৌশল—হারার ছল দেখিয়ে জয়ের কৌশল?

দরজা খুলে গেল। মাদাম চ্যাং-কেই-শেক এসে বললেন :

'প্লেন তৈরী। এখন রওনা হলে হত না? নইলে নামতে নামতে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'তাই যাও।' আদেশ দেন চ্যাং। হয় তো আর কিছু বলার ছিল। না-বলা থেকে গেল।

জাপান—মুঠো খানেক দ্বীপ নিয়ে যার অঙ্গ—তার ওপর দিয়ে ওড়া, আর এই ওড়া। আকাশ পাতাল তফাৎ। আই-ওয়ানের বুক গর্বে ফুলে উঠল। এই দেশ জয় করবে সাধ্য কার! ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়ে চলল ওরা মহা-চীনের প্রধান ভূ-ভাগের নিরবচ্ছেদ বিশালতার ওপর দিয়ে—। আশ্চর্য দেশ! কোথাও শ্যাম-ভূমি, কোথাও পাংশুল মরু-ভূমির বুকের ওপর দিয়ে বইছে বিশালাঙ্গী পীত-নদী; তারি গতি-পথ ধরে কখনও বা হাজার মাইল উড়ে চলল অত্যন্ত নীচু দিয়ে। কখনও বা তুষার-মৌলি পাহাড় ডিঙ্গিয়ে উড়ল আকাশের নীল ছুঁয়ে। কি দুর্গম দেশ! একবার একটা জাপানী সংবাদপত্র লিখল—চীন দেশ অত্যন্ত অনগ্রসর দেশ। সমুদ্রের উপকূলবর্তী স্থানগুলো ছাড়া আর কোথাও ভালো রাস্তা-ঘাট নেই। দেশবাসী চীনের উন্নতি-সাধনের কোন চেষ্টাই করে না। পড়ে লজ্জা পেয়েছিল তখন ও। শত্রুদের আসার জন্য শান-বাঁধান পথ নেই। অনগ্রসর তো সত্যি! খোলা আছে শুধু আকাশটাই। কিন্তু কত বোমা ফেলে এত বড় দেশটাকে ঘায়েল করা যায়?

একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। নান-কিংএ আসার দিন দুই আগে—সাংহাইয়ের কি অবস্থা হয়েছে দেখতে বেরিয়েছিল বাবার সঙ্গে। শহর

ধূলিসাৎ। যতদূর গেল—শুধু ধ্বংস। কিন্তু শহরের উপান্তে এক ক্ষেতের মধ্যে উবু হয়ে বসে বাঁধা-কপির চারা বসাচ্ছিল এক কৃষক। প্রশান্ত মুখ, নিবিষ্ট মন। বাড়িখানার যে কি হয়েছে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে কখানা চাটাই দিয়ে কোন মতে খাড়া করা চালাটা। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। কিছু না বলে অমনি দাঁড়িয়ে থাকতে ভারী বিশ্রী দেখায়। তাই ওর বাবা বললেনঃ

'ছিঃ ছিঃ তোমারও বাড়ি গেছে, ভাই!'

কৃষকটি তাকিয়ে কাঁধের নীল গামছাটা দিয়ে মুখ মুছে এক গাল হেসে থুতনীর ইসারায় দূরে দেখাল—বেড়ার ধারে একটা প্রকাণ্ড গর্ত, জলে ভরে আছে। তারপর অত্যন্ত খুশী মুখে বললঃ

'ওখানেই বাড়িটা ছিল—বাপ-দাদার আমলের বাড়ি। তা গেছে। কপাল ভাল আমাদের। কারো কিছু হয়নি; সব ক্ষেতে মাঠে ছিলাম কি না—কাজের সময়। গর্তটায় জল দেখে গিন্নীকে বললাম—ভালোই হল গো, নাও। সেই কদ্দিন থেকে না একটা পুকুর পুকুর করছিলাম!'

বলে হোঃ হোঃ করে সে কি হাসি। ওরাও হেসেছিল সঙ্গে। এতক্ষণকার মনের ভাব খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল। অর্থ-হীন হয়ে গেল ধ্বংসের তাণ্ডব। সেই কথাই বারংবার ওর মনে হতে লাগল আজ।

দিন-মান প্লেনখানা ফুঁসে ফুঁসে গর্জে গর্জে আকাশ পাড়ি দিল। চালক এক তরুণ ইয়াংকী। এখনও তেমন আলাপ হয়নি। ঠিক ছাড়বার মুখে মাদাম চ্যাং তাড়াতাড়ি পরিচয়টুকু সেরে দিয়েছিলেনঃ মিঃ উ—ডেনী ম্যাকগার্ক।'

'ভারী খুশি হলাম,' বলেই ম্যাকগার্ক ঝপ্ করে গিয়ে তার আসনে বসে পড়ল। দুজনের হাতে একটা একটা ছোট ব্যাগ তুলে দিলেন মাদাম চ্যাং। দুপুরের খাবার।

এক হাতে চালাতে চালাতে ডেনী ম্যাকগার্ককে আর এক হাতে খেতে দেখে খেয়াল হল আই-ওয়ানের, দুপুর হয়েছে। নিজের ব্যাগটা খুলে নিল ও। বিদেশী পাঁউরুটির দুটো টুকরোর মধ্যে মাংস দেওয়া; বাদামী রংএর এক রকম মিষ্টি। একটা আপেল। এ ধরণের খাবার কখনও খায়নি ও। কিন্তু এত ওপরে ঠাণ্ডার মধ্যে মন্দ লাগছিল না। ম্যাক্‌গার্ক মাথা ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন বলল। বাতাসে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফালি ফালি হয়ে উড়ে গেল সে-কথা। তবু যেন শুনেছে এমনিভাবে মাথা নাড়ল আই-ওয়ান্। ওর ভারী অবাক লেগেছে চীন সেনাপতির বিমানে ইয়াংকী চালক কেন। মুরাকীদের ব্যবসায়ে অনেক সময় আলাপ আলোচনা শুনেছে—ইয়াংকীদের বোঝা যায় না।

সন্ধ্যার সময় একটা উপত্যকার মধ্যে গ্রামের বাইরে মাঠে নামল প্লেন। চোখের নিমেষে একদল সৈন্য এবং ফ্যাল ফ্যাল করে-তাকিয়ে থাকা এক দঙ্গল ছোট ছোট ছেলে এসে ওদের ঘিরে ধরল। ম্যাকগার্ক ও তার পেছনে পেছনে আই-ওয়ান্ নেমে এল।

ম্যাকগার্ক বললঃ 'ওহে, এই কাঁঠের সেপাইদের একটু সমঝে দিন তো আজ আমরা এখানে থাকব। কাল সকালে যাব। এ প্লেন কার তাও বলে দাও—ছুঁয়েছে কি গেছে। এই ছোঁড়াগুলোকে যেন ঠেকিয়ে রাখে।'

দরজা বন্ধ করে প্লেনে চাবী টাবী লাগিয়ে দিল ম্যাক্‌গার্ক। আই-ওয়ান্

সৈন্যদের 'ম্যাক্গার্ক' এর কথা অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিল—যে সরকারী কাজে যাচ্ছে জেনারেল চ্যাং-কাই-শেক এর প্লেন। অতএব এর নিরাপত্তার ভার তাদের।

'এই শালা কচ্ছপের বাচ্চারা—আঙ্গুলের ডগা দিয়েও ছুঁয়েছিস কি গেছিস্।' শুনল ম্যাক্গার্ক যেতে যেতে, ভয়-পাওয়া বাচ্চাগুলোকে শাসাচ্ছে সেপাইরা।

দুজনে কথা বলতে বলতে চলে। পায়ের আঘাতে ধুলো উড়ে ওদের নাকে মুখে ঢোকে। ম্যাক্গার্ক জিজ্ঞাসা করে;

'গেছেন নাকি কখনও আমেরিকায় ?'

কেমন একটু মিইয়ে গিয়ে আই-ওয়ান্ জবাব দেয়ঃ 'না, যাওয়া হয়নি, খুব সুন্দর দেশ না ?'

'স্বর্গ হে স্বর্গ। স্রেফ স্বর্গ! কিন্তু,' এক গাল হেসে বলে ম্যাক্গার্ক, 'কি জানি, আমার ধাতে সয় না। বাড়ি গেলেই পালাই পালাই করি।'

গ্রামের প্রাচীর সংলগ্ন গেট পেরিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। পেছন পেছন মস্ত ভিড়। ম্যাক্গার্ককে দেখে মনে হল ও অভ্যস্ত এতে। ওদের দেখতে পেয়েই হোটেল-ওয়ালা ছুটে বেরিয়ে এসে সোল্লাসে ওদের হাত ঝাঁকিয়ে দিল।

ম্যাক্গার্ক আই-ওয়ানকে বললঃ 'ওর কিচ্মিচ্ আমি একটা অক্ষরও বুঝিনে। সাহেবদের মত হাত-ঝাঁকাতে শিখিয়ে দিয়েছি, মাঝে মাঝে এসে রাত কাটাতে হয়, এক রকম ওইতেই চলে যায়।'

অনেকবার আর অনেকখানি মাথা ঝুঁকিয়ে আই-ওয়ানকে নমস্কার করে অভ্যর্থনা করে হোটেল-ওয়ালাঃ

'আসুন হুজুর, হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে একটু চা খান।'

ম্যাক্গার্ক পাশের ঘরে। আই-ওয়ানের চা নিয়ে এল হোটেল-ওয়ালা। 'সাহেবটি—' বলে নিজের জুলুর ওপর আঙুল ঠুকে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলল। তারপর আবার বললঃ 'তা আমি খুব তোয়াজ করি।'

আই-ওয়ান্ হাসি চেপে বললঃ 'বেশ ভালো লোক।'

'তা বলতে, তা বলতে! চমৎকার লোক!' সায় দেয় হোটেল-ওয়ালা। তারপর আই-ওয়ানের দেওয়া মুল্যের পরিমাণটি দেখেই সোৎসাহে বাইরে ছুটে এসে কৌতুহলী জনতাকে তাড়া করলঃ

'ভাগ্ শালারা, ভাগ্। হাঁ করে দেখছিস্ কি, বলি ? বাপের জন্মে মানুষ দেখিস্নি শালারা ?

ধীরে ধীরে ভিড় চলে যায় ভয় পেয়ে। এবড়ো-খেবড়ো কাঠের দরজাটা ধড়াম্ করে বন্ধ করে ভেতরে এল বৃদ্ধ।

'কিছু মনে করবেন না, হুজুর! ওরা সাহেব দেখতে আসে। আপনার দেশ কোথায় স্যার ?'

অবাক হয়ে আই-ওয়ান্ জবাব দেয়ঃ 'আমি তো এদেশেরই!'

'তাই নাকি স্যার, আপনার পোষাক—চিনতে পারিনি।'

'চীনারা অনেকেই তো সাহেবী পোষাক পরে আজকাল।' একটু আহত হয় আই-ওয়ান্।

'আপনার কথাও তো—'

'চীন ভাষায়ই কথা বললাম—।' আই-ওয়ান যেন কৈফিয়ৎ চায়।

'তাই তো, স্যর। কিন্তু স্যর, কিছু ভুল টুল—' থেমে যায় ভয় পেয়ে। এমন মালদার খদ্দের যদি চটে যায়! '—যাক্ গে স্যর, মাংস খান তো! নিরামিষও আছে খুব ভালো।'

একটু রাগ হল আই-ওয়ানের। রেগেই জবাব দিল: 'মাংস খাই।'

রেগেই রইল। খাবার সময় পরিবেশন করতে করতে হোটেল-ওয়ালা বক্-বক করতে লাগল: 'আমরা চীনীরা, স্যর, সাহেবদের মত অত খুঁৎখুঁৎ করি না। এই সাহেব—' ম্যাক্গার্কের লাল মাথাটার পেছনে দাঁড়িয়ে নিজের মাথায় টোকা মেরে বলে, 'দেখুন না, মাংস একটু শক্ত রইল, তো চেঁচিয়ে একশা। তাই তেনার জন্য মিহি করে মাংস কাটো, বিছানায় বাড়তি লেপ-কম্বল দাও—একটা আধটা ছারপোকা থাকলে—ওরে বাবা! আমাদের চীনীদের তো ছারপোকা ছাড়া বিছানাই নাই। আচ্ছা বলুন তো স্যর ছারপোকারও তো জান আছে। ওদের বাঁচতে হবে না, না? কিন্তু বোঝাবে কে বলুন—একটা কথাও বোঝে না আমার।'

তা, মাংস সত্যিই কাঁচা; দুই ঢিবি মাটির ওপর রাখা কাঠের তক্তার বিছানাটাও মোটেই কোমল নয়। রাত্তির বেলা আই-ওয়ানের মনে হল চামড়ার ওপর কি যেন গুড়ি মেরে বেড়াচ্ছে। লাফিয়ে উঠল গা ঝাড়া দিয়ে। চ্যাঁচাতে যাচ্ছিল। কিন্তু না চেঁচিয়ে ছোট্ট প্রদীপটা জেলে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

হোটেল-ওয়ালা বলেছিল, 'আমরা চীনীরা—'

অবশেষে রাত্রি ভোর হল। আবার আকাশ পাড়ি। ম্যাক্গার্কের উদ্ভিন্ন শমশ্রু-সংকুল মুখের প্রোফাইল উত্তর-পশ্চিম অভিমুখী হয়ে স্থির হয়ে রইল। দূর বিসারী ধূসর রং-এর পর্বত-শ্রেণীর ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে বিমান। মাটির বুকে গভীর হয়ে কেটে বসেছে পথের চিহ্ন। বহু দূরে সাথে সাথে চলেছে মরীচিকার ছলনা। মরীচিকা বলে প্রথম আই-ওয়ান্ বুঝতেই পারেনি। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল, না দেখা গেল গাছ-পালা, না জল, তখন বুঝল দূরে এতক্ষণ যার আভাস দেখে এসেছে তা শুধু মরীচিকা। দুপুরের আহার আজ ম্যাদাম চ্যাংএর দেওয়া পরিষ্কার সাদা কাগজে মোড়া পাঁউরুটি নয়; দিশী সরাই-খানার কেনা কড়া রসুনের পুর দেওয়া মোটা মোটা ছাই রং এর সেদ্ধ চাপাটি। খেলে অনেকক্ষণ খিদের মুখ চাপা থাকে।

বিকেলের দিকে হঠাৎ ম্যাক্গার্ক ইঞ্জিন বন্ধ করে বলল চীৎকার করে: 'এসে গেছি হে'। ধীরে ধীরে তীর্যকভাবে ভেসে ভেসে বিমান নামতে লাগল।

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখন আই-ওয়ান্ প্রাচীর ঘেরা একখানি গ্রাম—মাটির বুকে বসান এক খানি নক্সার মত। বাইরে ক্ষেত মাঠ।; বাড়ীর হাতায় খাটো খাটো গাছের ঘন ঝোপ। বিমান নামতেই কোদাল ফেলে নীল কাপড়ের জামা-পায়জামা পরা মানুষ ক্ষেত থেকে ছুটে এল দেখতে।

'এক দম লাল এলাকায় এসে গেছেন।' ম্যাক্গার্ক চীৎকার করে বলে দন্তপাটি বিকশিত করে হাসল। আবার বলল, তা ওরা আমাদেরই মত হাত-পা-ওলা মানুষ। আমার তো বেশ লাগে। যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন—

জাঁদরেল মানুষ। মাদাম আপনাকে সোজা তার কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন আমায়'।

বিমান থেকে নেমে ম্যাক্‌গার্ককে অনুসরণ করল আই-ওয়ান্‌।

আই-ওয়ান্‌ ধরেই নিয়েছিল এন-লান্‌ বেঁচে নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ যা দেখল—নিজের চোখকে ও বিশ্বাস করতে পরল না।

গ্রামের ঘেরা পাচিলের গেট দিয়ে ঢুকে একটা রাস্তা ধরে একটা আঙিনায় এসে পড়ল ওরা। আঙিনা পেরিয়ে একটা মেটে ঘর। একটা পালিশ-হীন টেবিলের সামনে বসে একটি মানুষ। এন্‌-লান্‌। সংশয় ভরা চোখে দুজনের দিকে দুজনে তাকিয়ে রইল। দশ বছরের ব্যবধান—আর কত কি ঘটে গেছে এর মধ্যে। কত ওলট্‌ পালট্‌ হয়ে গেছে। কিন্তু আই-ওয়ানের চিনতে দেরী হল না।

ম্যাক্‌গার্ক বলছিল: 'উ একটা চিঠি নিয়ে এসেছে আমার মালিকের কাছ থেকে। তারপর উ, আমি এতক্ষণ বলিনি, এখন বলছি—' বলেই পকেট থেকে দুটো পিস্তল বের করল, 'হুকুম আছে আমাদের কেউ বিরক্ত করলেই গুলি চালাব।'

ওর কথা আই-ওয়ান্‌, এন্‌-লান্‌ কারু কানে পৌঁছুল না। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। খানিক পরে ধীরে ধীরে এন্‌-লান্‌ বলল:

'সত্যি, আই-ওয়ান্‌ তুমি?'

'আমি, সত্যি আমি, কিন্তু তুমি! এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে।' জবাব দিল আই-ওয়ান।

দূরত্ব ক্ষীণ হয়ে আসে। স্পর্শ লাগে কাঁধে কাঁধে, বাহুতে বাহুতে। হাতের বাঁধনে ধরা পড়ে হাত। এন্‌-লানের হাত—আগের চেয়ে খানিকটা বড় হয়েছে, কড়া আর শক্ত হয়েছে।

'কি হয়েছিল তোমার বল তো?' এন্‌-লান্‌ জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় গিয়েছিল? একটা খবরও তো পেলাম না। পিওনী ছুটতে ছুটতে আমাদের আড্ডায় এল। শেষ পর্যন্ত তোমার আশায় পথ চেয়ে বসে রইলাম।'

ম্যাক্‌গার্ক বলে উঠল: 'জানা শোনা আছে দেখছি! আচ্ছা তাহলে আমি যাই। প্লেনটার কলকব্জা একটু ঠিক ঠাক করতে হবে কাল যদি যেতে হয়।'

ওর কথাও কেউ শুনল না, ওর দিকে তাকিয়েও কেউ দেখল না।

'পিওনী?' আই-ওয়ান্‌ স্তম্ভিত হয়ে গেল, 'সে তোমাদের ওখানে গিয়েছিল তাহলে!

'আছে এখানে। আরে বসো বসো। কত কথা জমে আছে।'

এন্‌-লান্‌ বলে।

হাততালি দিতে খাকী উর্দি পরা একটি ছেলে এসে দরজায় দাঁড়াল। এন্‌-লান্‌ বলল: 'ভেতরে গিয়ে বলে আয়।'

'পিওনী—মানে—তোমাদের—' আমতা আমতা করে আই-ওয়ান্‌।

'বিয়ে?' জিজ্ঞাসা করে এন্‌-লান্‌, 'সে তো দশ বছর হল।'

'দশ বছর এক সাথে আছ? আমায় লেখ টেখনি কেন?'

'আলবৎ লিখেছি, ছদ্ম নামে। ভেবেছিলাম বুঝতে পারবে।'

'কিন্তু একটা চিঠিও পাইনি।' আই-ওয়ান্‌ উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে।

'তোমার বাড়ির ঠিকানায়ই তো দিয়েছিলাম।'

'তা হলে বাবাই দেননি।' একটু চিন্তা করে দেখল আই-ওয়ান্, তাই হবে, বাবা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন।

'আচ্ছা, তুমিই বা কেন লেখনি?' এন্-লান্ জিজ্ঞাসা করে।

'আরে, আমি তো জানি তুমি নেই। পিওনী যে এখানে তাই বা কি করে জানব?'

আবার পরস্পরের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রইল ওরা। দেখতে লাগল পরীক্ষা করে, নিরীক্ষা করে; পেছনের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল জীবনের হারানো অধ্যায়কে, আই-ওয়ান্ ভাবতে লাগল—এ ব্যক্তিকে তামার কথা বলা যায়?

এন্-লান্ জিজ্ঞাসা করেঃ 'তারপর, তোমার খবর? বিয়ে থাওয়া করেছ তো? ছেলে পুলে হয়েছে?'

'হুঁ।' আই-ওয়ান বলে। ইচ্ছে হয় বলে জীরোর কথা গঞ্জীরোর কথা। তামার কথা এখন থাক, না বলাই ভালো। কি জানি কি হবে। শুধু বললঃ 'দুটি ছেলে।'

হঠাৎ চম্‌কে উঠল আই-ওয়ান্। দ্রুত পায়ের শব্দ। চেনা চেনা মনে হচ্ছে। পিওনী এসে ঢুকল ছুটতে ছুটতে। কিন্তু এই পিওনী? তনুদেহ ঘিরে পুরুষালি বেশ, মাথায় সৈনিকের টুপী। খাটো করে কাটা চুল। ঠোঁটে রং নেই, মুখে পাউডার নেই, চামেলীর সেণ্ট নেই। ওর হাতখানা নিজের হাতে ধরে আছে—এমন কড়া, শক্ত হাত কোথায় পেল পিওনী? কোথায় গেল সেই ভয়-পাওয়া পাখীর মত ধুক্ পুক করে কাঁপা কাঁপা হাত! এ হাত পিওনীর নয়।

'আই-ওয়ান্—আই-ওয়ান্—আই-ওয়ান্—' উচ্ছ্বসিত হয়ে ডাকছে পিওনী। টুপীটাকে মাথা থেকে ফেলে দিল। তাই তো এতো পিওনীই! কিন্তু সেই লাবণ্যময়ী, বিষাদময়ী, আবদেরে মেয়েটি কোথায়, যাকে জানত আই-ওয়ান্! এ মেয়ে সে নয়। এ এন্-লানের স্ত্রী। আই-ওয়ান্ বসে পড়ল।

'আমার পা কাঁপছে, মাথা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।' বলে আই-ওয়ান্।

ওর মনে হয়, এতদিন ও ঘুমিয়ে ছিল। দশ বছর. .ঘর বেঁধে তামার সঙ্গে সুখে দুঃখে ও কাটিয়ে দিল—আর যে-জীবন ও ভেবেছিল নির্মূল হয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়েছে—এই দশটি বছর ধরে ওরই অগোচরে তা এমনিভাবে সঞ্জীবিত হয়ে আছে!

'কি করে হল?' শুধায় আই-ওয়ান্, 'তুমি তাহলে মিথ্যা কথা বলেছিলে। বলতে না বিপ্লবীদের ঘেন্না কর!'

সুন্দর থুতনীটি বাড়িয়ে এন্-লানের দিকে দেখিয়ে বলল পিওনীঃ 'ওকে তো করতাম না!'

ওর ডাগর ডাগর এপ্রিকট-নয়ন ব্রীড়া-বিজড়িত হয়ে উঠল। দেখতে পেল আই-ওয়ান্, চোখ দুটি ওর বদলায়নি। ঠিক তেমনি আছে।

'তুমি তো চিনতে না ওকে। একবার তো শুধু দেখেছিলে।' আই-ওয়ান্ বলল।

হঠাৎ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল এন্-লান্। পিওনীর মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল: 'দেখার আগে অল্প অল্প জানতাম।'

'থামলে কেন?' এন্-লান্ বলে, 'শুনিয়ে দাও একবার পেটে পেটে তোমার কত বিদ্যে।'

ধীরে ধীরে পিওনী বলে চলে: 'তোমার টেবিলের দেরাজ পরিষ্কার করছিলাম একদিন—'

'হুঁ, তাই তো সেদিন একটা জিনিষ খুঁজে পেলাম না...' বলে হেসে ওঠে আই-ওয়ান্।

এন্-লান্ চেঁচিয়ে বলে উঠল: 'সেই যে তোমায় একটা চিঠি লিখেছিলাম মনে আছে হে? শ্রীমতী সেটা চুরি করে পড়লেন—তারপর আর কি—তক্ষুনি ধনুর্ভাঙ্গা পণ—'

পিওনী একটা চেয়ারের ধারে বসল। লাল টুকটুকে অধর কামড়াতে লাগল বসে বসে।

'তোমার দেরাজ গোছান তো আমারি কাজ ছিল, তাই না? বল।' পিওনীর চোখে মুখে চাপা হাসি।

'তা বটে, বটে।' সায় দেয় আই-ওয়ান্।

তিন জনে এক সঙ্গে হেসে উঠল। আই-ওয়ানের মনে হল এমন প্রাণ খুলে আনন্দের হাসি আর বুঝি হাসেনি। হঠাৎ আসার কারণটা মনে হয়ে গেল। এন্-লান্কে বলে উঠল: 'চ্যাং আমাদের আলাদা করেছিল। আবার তার দৌলতেই দেখা হল। এই ধর তার চিঠি।'

বলে পকেট থেকে সীল মোহর করা চিঠি বের করে এন্-লানের হাতে দিল।

'আমি চিঠিটার জন্য বসেই ছিলাম; কিন্তু এর সাথে তোমায় যে পেয়ে যাব ভাবিনি,' এন্-লান্ বলল, 'সব বসে আছে এটার জন্য, দিয়ে আসি, আর দেরী করব না। তুমি এখানেই বস, আমি আসছি।'

চিঠিটা নিয়ে এন্-লান্ চলে গেল।

আই-ওয়ান্ এবার পিওনীর দিকে চাইল। চোখাচোখি হল দুজনে। পিওনী এক এক করে সকলের খবর নিল। আই-ওয়ান্ও বিনা দ্বিধায় বলে গেল। শুধু বলল না, আই-কোর জার্মান বিয়ে করার কথা, আর বলল না তামার কথা। ভেতর থেকেই যেন নিষেধ উঠল।

নিবিষ্ট চিত্তে পিওনী বসে বসে শোনে। আই-ওয়ান্ ভালো করে ওর মুখ দেখে—দশ বছর আগেকার মুখখানাই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বদলায়নি পিওনী। শুধু দশটা বছরের নির্মম পদক্ষেপে পড়েছে ওর ওপর। এন্-লানের ওপর কালের স্পর্শ এমন করে পড়েনি।

একটু পরেই এন্-লান্ ফিরে এল। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর কিন্তু প্রাণবন্ত। গম্ভীরভাবে পিওনীকে বলল:

'যা ভেবেছিল্যুম, তাই হয়েছে। চ্যাং আমাদের সাথে যুক্ত হতে চায়!'

একটা উল্লাসের অভিব্যক্তি বেরিয়ে এল পিওনীর মুখ থেকে। আই-ওয়ান্ অনুভব করে, এদের মধ্যে শুধু প্রেমই নেই—তদূর্ধ্বেও আরো কিছু আছে।

'বলেছিলাম কি না, পিওনী, চ্যাং যে-সে লোক নয়। ঠিকই করেছে চ্যাং।' এন্-লান্ বলে, 'কিন্তু আমাদের সৈন্যদের বোঝাতে হবে এ কথা। তারা যে সহজে রাজী হবে মনে হয় না। নিজের নিজের ডিভিশনকে আমাদের প্রত্যেকের বোঝাতে হবে। একটা সভা ডাকা দরকার। আমি বুঝিয়ে ছাড়ব।'

পিওনীর সম্মতির অপেক্ষায়ই যেন এন্-লান্ ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। মাথা নেড়ে সম্মতি দিল পিওনী। জিজ্ঞাসা করল:

'সভার জন্য ঘণ্টা দিয়ে দেব ?'

'হাঁ, ওদের বলো,' এন্-লান্ বলে, '—দাঁড়াও, বলো আধঘণ্টা খানেক পরে। একটু হাত মুখ ধুয়ে নেব। আর খানিকক্ষণ আমায় একা বসতেও হবে সভায় যাবার আগে।'

'এখনও সেই অভ্যাস, বলতে হলেই, লিখতে বসে।' পিওনী বলে।

কুচ্-কাওয়াজের ময়দানে জমায়েৎ বসেছে। মাটির ওপর বসেছে এন্-লান্, পাশে পিওনী, চারদিক ঘিরে এলোমেলো ছড়িয়ে বসেছে আর সব ছেলেরা আর মেয়েরা, সকলেরই বয়স কম। রোদে-পোড়া মেটে রংএর মুখ-গুলোতে উত্তর দেশের কড়া রোদ ঝলসাচ্ছে। কে যে ছেলে আর কে যে মেয়ে, বোঝা কঠিন। মুখ তুলে সাগ্রহে এন্-লানের কথা শুনছে প্রত্যেকটি মানুষ। এন্-লান্ যেন সেই আগের দিনে ফিরে গেছে। কিন্তু তখন বক্তৃতা দিত দশ বিশজনের সামনে—আজ ওর সামনে শয়ে শয়ে মানুষ। এ অসম্ভব সম্ভব কি করে হল। যে করেই হোক হয়েছে। আই-ওয়ান্ ভেবে বসেছিল এন্-লান্ মরে গেছে। আর সেই ফাঁকে কি না আরো বেশী করে বেঁচে থেকেছে ও—, আর এত বড় সংগঠন তৈরী করেছে বসে বসে। গোটা এলাকাটাকেই নতুন করে রচনা করেছে। দুর্দান্ত সংগ্রাম করেও ঘায়েল হয়নি; আজও দাঁড়িয়ে আছে—শুধু প্রাণে বেঁচে নয়, প্রাণবন্ত হয়ে, শক্তিমান হয়ে। আর ওর পাশে আছে এতগুলি জ্বলন্ত অগ্নি-শিখা। এন্-লানের অতি স্পষ্ট, উদাত্ত স্বর নিস্তব্ধ বায়ু-মণ্ডলে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল:

'আমরা কি করেছি সবাই জান তোমরা। ছ'বছর আগে জাপানের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম। সে-দিন শত্রু-পক্ষ আমাদের বিদ্রূপ করে-ছিল। তার তিন বছর পর সুরু হয় আমাদের সুদীর্ঘ অভিযান। আমাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হল, অনাহারে প্রাণ গেল কত প্রিয় সাথীর। সেদিনও জনতাম আমরা আমাদের প্রকৃত শত্রু কে। চ্যাং-কাই-শেকের তাড়া খেয়ে হাজার হাজার মাইল আমরা পিছু হঠেছি। কিন্তু জানতাম—তাঁর চাইতেও বড় শত্রু আমা-দের আছে।' স্বরগ্রাম উচ্চে তুলে ঘোষণা করল এন্-লান্: 'সেই শত্রু আমাদের জাপান। তখনও জাপানের হাতের মার খাচ্ছিল আমাদের দেশের মানুষ।'

থামল এন্-লান্। সভার মধ্যে এক অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। পুরানো দিনের এক অতি পরিচিত ভঙ্গিতে হাত তুলল ও—আই-ওয়ানের ভেতরটা নেচে উঠল।

'সবাই জান তোমরা, এই ক'মাস আগেই সিয়ান্ থেকে চ্যাংকে আমরা হরণ করি একবার। তখন সে ছিল সম্পূর্ণ আমাদের মুঠোর মধ্যে।'

বলে কর্কশ হাতখানা বাড়িয়ে ধরে এন্-লান্। মুঠোটাকে বন্ধ করে বলে যায়ঃ 'এই এমনি করে মুঠোটা একবার বন্ধ করলেই—বাস্ শেষ হয়ে যেত চ্যাং।'

মুঠোটা খুলে, সে-দিকে তাকিয়ে রইল। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। নিশ্বাস বন্ধ করে এন্-লানের দিকে তাকিয়ে আছে সমবেত জনতা। খোলা মুঠোটার ওপর দিয়ে সভার দিকে তাকিয়ে বলে চলে এন্-লান্ঃ 'সে-দিন তোমাদের অনেকেই, মেরে ফেল মেরে ফেল বলে চীৎকার করেছিল। সে-কথা তোমাদের নেতারা শুনলে, [হাতের বুড়ো আঙ্গুল নীচের দিকে করে] তক্ষুণি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যেত মানুষটা। আমরা তা করিনি বলে তোমাদের গাল শুনেছি। কেন তাকে নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে দিয়েছি—সেজন্য আমাদের তোমরা নিন্দা করেছ। সে বেঁচে আছে বলে, আজও তোমাদের অনেকেরই রাগ রয়েছে।'

হাত দুটো ঝুলে পড়ল আলতোভাবে আঙ্গুলে আঙ্গুলে জড়িয়ে। এন্-লান্ স্থির নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঐখানেই ওর যাদু। ওর শক্তি দেহ-ভঙ্গি নয়, অস্ফালন নয়—শুধু কণ্ঠ দিয়ে মানুষের মন কাড়ে, মাথা নুইয়ে আনে। আই-ওয়ান্ মর্মে মর্মে অনুভব করে অজও। ঠিক এমনি ছিল দশ বছর আগেও। এখন ওর শক্তি আরও পরিণত হয়েছে, গভীরতর হয়েছে।

'কিন্তু আসল শত্রুকে আমরা ভুলিনি। সে চ্যাং-কাই-শেক নয়। জাপান। বলেছিলাম তখন—বছরের পর বছর এমন সাংঘাতিকভাবে যে আমাদের তাড়া করে ফিরছে, এত বড় যার শক্তি, সেই পারবে আমাদের শত্রুকে প্রতিহত করতে। তাই সোজা প্রস্তাব রাখলাম—জাপানকে রুখবে? জবাব এল—আলবৎ! যতক্ষণ জান আছে। তাই তাকে মুক্ত করে দিলাম।'

কারো বুঝতে বাকী রইল না—এ কিসের আভাস। দুঃখ সহনের ডাক এল। সামনে দাঁড়ান মানুষটার হৃদয়-শোণিত আবার সব ডালি দেবার ডাক নিয়ে এসেছে। এন্-লানের চোখে অগ্নি-শিখা জ্বলে উঠল। গম্ গম্ করে উঠল তার কম্বু-কণ্ঠ; ঋজু দেহের ওপর উন্নত মস্তক যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। সমবেত জনের অভিভূত দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল তাদের নেতার ওপর।

'আজ সংগ্রামে আমাদের পরিচালন করতে পারে সেই একটি মানুষ। দ্বিতীয় মানুষ নেই।'

উন্মথিত জনতা হতে আরাব উঠল আকাশ বিদীর্ণ করেঃ

'আছে—তুমি—তুমি।'

এন্-লান্ যেন হাতের মুঠোয় করে সে দাবী বিক্ষিপ্ত করে দিলঃ

'না আমি নই। আমি সাম্য-বাদী। জাতি সাম্যবাদীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে না। আজ আমরা যদি তার পতাকাতলে সমবেত হই তাহলে শত্রুর কিছু বলার থাকবে না। দুনিয়া দেখবে শত্রুর বিরুদ্ধে অবিভক্ত গণ-শক্তির সংগ্রাম। কিন্তু আমাদের নেতৃত্বে বিপরীত ফল হবে।'

সভা নীরব। মিথ্যা বলেনি তাদের নেতা। আর কি বলবে সে এর পর?

আই-ওয়ান্ অপলকে তাকিয়ে ছিল এন্-লানের দিকে। ওর অন্তরে যেন কান্না গুমরে উঠছে। মানব নয়, মহামানব এন্-লান্। এতগুলো মানুষের কাছে, আর কিছু নয়, দাবী করে বসল আত্ম-বিলুপ্তি, আত্ম-বিসর্জন! যে একদা হন্তারক ছিল—তারই কাছে! এত বড় দাবী কে আর করতে পারত এ মানুষ ছাড়া!

'ভুলে যাও, আপনাকে ভোল,' আদেশের নির্ঘোষ ওঠে, 'শুধু মনে রাখো তোমরা মহা-চীনের সন্তান।'

কথা নয়, গুঞ্জন নয়। জমাট-বাঁধা স্তব্ধতা থম্ থম্ করে উঠল।

পিওনী বসে বসে মাটির বুকে আঙ্গুল দিয়ে লিখছিল দুটি অক্ষর—চীন।

'যারা পারবে, তারা হাত তোল।'। আবার আদেশ এল।

শত শত দক্ষিণ হাত উঠে এল মাথার ওপরে।

'যার অমত আছে—',

একটি হাতও উঠল না। মাথা নীচু করে ধীর মন্থর গতিতে ফিরে চলল এন্-লান্। স্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠল জনতা। কেউ চলে গেল, কেউ দাঁড়িয়ে কথা কইতে লাগল।

সব শেষ হয়ে গেছে। এন্-লানের শক্তি জয়ী হয়েছে। তাকিয়ে দেখল আই-ওয়ান্ এন্-লান্ চলে গেল তার ঘরে। পিওনীও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে ওর কানে কানে বলল :

'এরকম ব্যাপারের পর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ওর থেকে কি যেন ক্ষয় হয়ে যায়।' বলে ঘরের দিকে চলে গেল।

এর কিছুক্ষণ পর আই-ওয়ান্ বেরিয়ে এল যেখানে প্লেনটা ছিল। ম্যাক্-গার্ক কলকব্জায় তেল দিচ্ছিল। একটু আগেই যা হয়ে গেল—এখনও তার একটা মিঠে স্বপ্নের আমেজ ওর মনে লেগে আছে। ভাবল, ফিরে গিয়ে বলবে চ্যাংকে : 'আমি ফিরে যাব সেখানে।' আসবেই, না এসে পারবে না ও।

ম্যাক্‌গার্ককে জিজ্ঞাসা করল, কখন যাওয়া হবে।

'ভোর চারটায়।' জানিয়ে দিল ম্যাক্‌গার্ক। তারপর ঘর-ফেরা জনতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাজ হল ?'

'হল।'

'অদ্ভুত মানুষ। প্রায় আমাদের সর্দারের কাছাকাছি। অবশ্যি এখনও পুরো নাগাল পায়নি। আমি বাবু সব থেকে বড় গাছটার তলায়ই থাকি।'

ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে আই-ওয়ান্ শুধু বলল : 'ঠিক চারটের সময় আমি আসব।'

ফিরে গিয়ে চ্যাংকে বলবে আই-ওয়ান্, 'আমায় ছেড়ে দিন। ওখানে থেকেই আপনার সব থেকে বেশী সেবা করতে পারব।' দেরী করবে না ও। চ্যাং যদি ছেড়ে দেন তবে দিন পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে আসবে।

পেছনে ফেলে-আসা জীবনের সুদীর্ঘ অধ্যায়কে আই-ওয়ানের অলীক মনে হয়। বর্তমান জীবনই ওর কাছে একমাত্র সত্য, একমাত্র বাস্তব। মনে হয় এতগুলো বছর যেন ও ঘুমিয়ে ছিল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, তামার কথা, ছেলেদের কথা একবারও মনে পড়ে না। মনে হয় আজীবন এন্-লান্ আর ও এমনি করেই এক সাথে কর্মরত রয়েছে একই মস্তিষ্ক পরিচালিত দুইটি হাতের মত। প্রতিদিন একই কথা, একই আলাপ—শুধু যুদ্ধের পরিকল্পনা। সৈন্যদল তো নয় যেন ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন এক যন্ত্র, যে-কাজে লাগাও, সে কাজেই লাগবে। দিন রাত তো চলছে—চালাচ্ছে গুটি কয়েক মানুষের ছোট একটি মন্ত্রণা-গোষ্ঠি। এন্-লান্ আর আরো দু'জন কারা যেন আছে। তাদের সম্বন্ধে ভালো করে সব জানে না এখনও আই-ওয়ান। কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের পরিচয় ততখানিই জানে, যতখানি জানে নিজের মস্তিষ্ককে।

এত বড় সংগ্রাম, অথচ সম্বল নেই। চ্যাং-কাই-শেক বলে, তারও নেই। যখন টাকা হাতে হবে, দেবে। তার নিজের সৈন্যদেরই প্রয়োজনীয় হাতিয়ার জোটাতে পারেনি। তা ছাড়া সামন্ত-সর্দার আর তাদের সৈন্যদের হাত করার জন্য প্রচুর টাকা চাই।

আই-ওয়ান্‌কে বিনা দ্বিধায় বলেছেন চ্যাং: 'জাপানীরা যা দেয় ওদের তা থেকে আমাদের বেশী দিতে হবে।' শুনে ভেতরে ভেতরে রাগে ফুলেছে ও। রেগে বলেও ফেলেছে: 'চীন দেশে এমন মানুষ আছে, যাকে এখনও ঘুষ দিয়ে কাজ করাতে হবে!'

জবাব দিয়েছেন চ্যাং-কাই-শেক: 'আছে। আমি তাদের চিনি। উপায় নেই। স্বভাব বদলানো যাবে না, সুতরাং সেভাবেই কাজ চালাতে হবে।'

হয় তো ঠিকই বলেছিল ম্যাক্‌গার্ক, আই-ওয়ান্ ভাবে, এন্-লান্ হয় তো এখনও চ্যাং-এর মত অত বড় হতে পারেনি। হোক, না হোক, ও এন্-লানেরই। অভিন্ন ওরা, তাই ও ফিরে এসেছে এখানে।

এন্-লান্ বলেছিল: 'টাকা আমাদের চাইনে।' বলে তক্ষুনি শুধরে নিল: 'মানে চাই ঠিকই, তবে না হলেই চলবে না এমন কথাও নেই। এত দিন টাকা ছাড়াই তো এত যুদ্ধ করলাম। এখনও তেমনিভাবেই চলে যাবে।'

তাই যাচ্ছেও চলে। গেরিলা যুদ্ধই চলছে বেশী। এন্-লানের দলের প্রত্যেকেই গেরিলা যুদ্ধের রীতিতে শিক্ষিত। হাতের কাছে যা মেলে তাই নিয়েই তারা লড়তে পারে। বিশটা মেশিন-গান এদের কাছে একশটার সমান। থাকলেও ক্ষতি নেই—আদ্যিকালের বর্শা, বল্লম, ছোরা-ছুরি, বা পাওয়া যায় তাতেই চলে। কিছু না থাকলে লুকিয়ে থেকে পাথর ছোঁড়া। সুযোগ পেলে চোখের নিমেষে তাদের এক একজন একশ জনের ভব-লীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে। বড় বড় রেজিমেন্টের মত জাঁক-জমক করে মার্চ করে যায় না; একজন দুজন বা ছোট ছোট দলে নানা জায়গায় লুকিয়ে থাকে; হাতে কাস্তে আর নীল কুর্তার তলায় ছোরা পিস্তল লুকিয়ে নিয়ে চাষীর বেশে চাষীর দলে মিশে যায়।

প্রথমেই এন-লান্ আদেশ দিল, নিজেদের গ্রাম ছেড়ে যতটা সম্ভব শত্রুর

সীমানার কাছাকাছি এগিয়ে যেতে হবে। এক দিনে, এক জোটে নয়; আজ এক জন কাল দুজন করে চাষীর বেশে। শত্রুরা যে-সব ক্ষেত-খামার ধ্বংস করে ফেলেছিল তাতেই যেন চাষীরা ফিরে যাচ্ছে আবার।

ঘরে বসে আলোচনা করতে করতে মানচিত্রের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে এন্-লান্ বললে সে-দিন: 'এই-সব জমি—আমার ভালো করে চেনা। মনে আছে আমাদের গাঁয়ের কথা বলেছিলাম তোমায়!'

'মনে আছে।' আই-ওয়ান্ জবাব দিল।

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে থেকে এন-লান্ বলল: 'এই দেখ, নামটা এখনও আছে। কিন্তু গ্রামটা নেই। একটি প্রাণীও বেঁচে নেই। একটি বাড়িরও দেয়াল নেই। রাস্তা-ঘাট সব পোড়া-মাটি। বোধহয় আমার একটি ভাই জীবিত আছে। ঠিক জানি না। তুংচাও-এর পর প্রতিহিংসা নেবার জন্য জাপানী সৈন্যেরা জায়গাটা ধ্বংস করে দেয়।'

নীরব হয়ে গেল এন-লান্। আই-ওয়ানও কিছু বলতে পারল না। কি বলবে? কি বলার আছে?

কয়েক মিনিট পরে ধীরে ধীরে বলল এন-লান্: 'একদিন ভারী ইচ্ছে ছিল গ্রামেই ফিরে আসব, এসে একটা ইস্কুল করব।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে আরম্ভ করল:

'যতদিন তারা বেঁচে ছিল, তাদের ঋণ আমি শোধ করিনি। আজ তারা নেই—আজ আমার ঋণ-শোধের দিন এসেছে।'

পিওনী কাছেই একটা বেঞ্চিতে বসে এন-লানের একটা ছেঁড়া উর্দি সেলাই করছিল। সেটা রেখে দিয়ে উঠে এসে মানচিত্রটা স্বামীর হাত থেকে নিয়ে বলল:

'রাত হয়েছে, শুতে যাও তো এখন। ভোর হতে না হতেই তো তোমার ঘুম ছুটে যায়।'

এক মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গেল এন-লান্। হাসতে হাসতে বলল: 'আমি চির-কেলে চাষা। মোরগ ডাকলেই ঘুম ভাঙে।'

কি গভীর প্রেম! দেখে আই-ওয়ানেরও হৃদয় মর্মরিত হয়ে ওঠে। কি এক আকুলতা কুহেলীর মত ব্যাপ্ত হয়ে যায় ওর সমস্ত অন্তরলোক। অথচ সপ্তাহের পর সপ্তাহ তামাকে ও স্মরণ করেনি। আজ হঠাৎ যেন তামার কণ্ঠে ওর নাম বেজে উঠল। তামাময় হয়ে উঠল আই-ওয়ান্। কতবার এমনি তামাময়তার ক্ষণে এন-লান্ আর পিওনীকে তামার কথা বলবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বলতে পারেনি। কি জানি যদি ওরা ভুল বোঝে। এন-লান্ আগের মত জেদী এখনও। সরল—কিন্তু ওর সারল্যও নির্মম। হয় তো অবাক হবে সে, কি করে কেউ কোন জাপানীকে ভালোবাসতে পারে। কিন্তু তবু আই-ওয়ান্ ভালোবাসে তামাকে, এবং বাসবে—যতকাল ওর নিশ্বাস আছে, ততকাল বাসবে। তামা কোন দেশের নয়—তামা শুধু ওর—আই-ওয়ানের।

এক বার ঠিক করল শুধু পিওনীকেই বলবে। সেদিনই তামার একটা চিঠি পেয়েছিল—বাবা তাঁর নিজের শীলমোহরে পাঠিয়েছিলেন বরাবরের মত। মস্ত

বড় চিঠি—ছেলেদের কথা লিখেছিল তামা। জীরো ইস্কুলে যায়—ওকে বই খাতা রাখবার জন্য একটা খাকী কাপড়ের ব্যাগ আর ইস্কুলের পোষাক কিনে দিয়েছে। 'বাড়িতেও আমি একটু একটু পড়াই,' লিখেছে তামা, 'প্রত্যেক দিন তোমার ছবির সামনে ফুল সাজাই আর ওকে শেখাই তুমি কত বড় বীর—চীন কত সুন্দর দেশ। শেখাই আমরাও চীনের মানুষ। আমি শুধু তোমারি—আর ওরা আমাদের, তাই না?'

তাই। ও চলে এসেছে, তাই তামা আজ লিখেছে—আমরা চীনের মানুষ—

চিঠিখানা পেয়ে স্ত্রী-পুত্রের জন্য বুকটা ওর হু-হু করে উঠল। পৃথিবী যেন শূন্য হয়ে গেল। দিনটাও ছিল অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ। যেখানে পরবর্তী আক্রমণ করা স্থির হয়েছিল, শত্রুরা সেখান থেকে অবস্থান পরিবর্তন করছে—তাই এন-লানের হুকুমে কাজ-কর্ম বন্ধ ছিল। পিওনী রোজকার মত রোদে পিঠ দিয়ে বসে সেলাই করছিল। হঠাৎ তামার নামটা ওর মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে এল। কিন্তু যথা-সময়ে সাবধান হয়ে অন্য কথা পাড়ল: 'তোমার ছেলেপুলে হয়নি, পিওনী?'

সেলাইয়ের ওপর চোখ নামিয়ে উত্তর দিল পিওনী:

'দুটি হয়েছিল। ছোটটি হবার সময়, খুব অসুখ হয়েছিল আমার। তারপর থেকে, কই আর কিছু হয়নি।'

সেলাই-এর হাত চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে আরম্ভ করল: 'তুমি আমার ভাই, তোমায় বলতে বাধা নেই। বড়টিকে হারালাম—আমাশয়ে ভুগে গেল। আমাদের এ জীবন শিশুর সইবে কেন? তখন আমরা তাড়া খেয়ে কেবল এখান থেকে সেখানে ছুটছি। অত বারে বারে জল-হাওয়া খাবার বদল কি সয়? কত করে পাঁচটা বছর টিকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা দিনের মধ্যে চলে গেল। কিয়াংসিতে একটা পাহাড়তলীতে কবর দিলাম। এখান থেকে বহুদূরে—সেই দক্ষিণে। কখনও যে গিয়ে দেখব, সে আশা নেই।'

মাথাটা ওর কাঁপতে লাগল—কিন্তু চোখ দিয়ে জল পড়ল না। আবার বলতে আরম্ভ করল: 'ছোটটি মেয়ে। অনেক দিন পরে হল। এত দেরীতে—আমি ভাবিনি আর হবে। জান তো, এন-লান্ ভগবান টগবানে বিশ্বাস করে না। ছেলে হওয়ার জন্য যে পুজোটা আসটা দেব—কাকে আর দেব! সেই বড় লড়াইয়ের বার রাস্তায়ই মেয়েটা পেটে এল।'

একটু থেমে, দাঁত দিয়ে সুতো কেটে বলতে লাগল:

'ভেবেছিলাম, বাচ্চাটা হবার আগেই আমাদের মার্চ শেষ হবে। কিন্তু কৈ তাই হল! সেকি রাস্তা—চড়াই, উৎরাই, মরুভূমি—। তাতে আমার শরীর খারাপ হয়নি। কিন্তু সারাক্ষণ হয় পা চালাও, নয় ঘোড়ায় চড়। এ আরো খারাপ। শুধু কি খারাপ রাস্তা! এক এক জায়গায় রাস্তাই নেই। আমার পা না বেঁধে তোমার বাবা কি ভালোই করেছিলেন যে। যাই হোক, মেয়েটা তো হল—এই এতটুকুন, রোগা জির্‌জিরে। রাস্তায় এক চাষী-বৌর হাতে তুলে দিলাম ওকে, আর কিছু টাকা। বললাম ফিরে আসব, এসে নিয়ে যাব।

কিন্তু জায়গাটাও মনে নেই, মহিলার চেহারাও মনে নেই। খালি নামটা মনে আছে—ওয়াং। তিন বছর আগের কথা তো।'

আই-ওয়ান্ বলে উঠল: 'এন-লান্ ছিল!'

পিওনী চোখ তুলে তাকিয়ে শুধু বলল: 'তুমি তো জান ওকে।'

জানে আই-ওয়ান্, চেনে মানুষটাকে! কি বলবে ও। শুধু মেয়েটাকে নিয়েই এন-লানের নেয়া শেষ হবে তা নয়; পিওনীর কাছে দাবী করবে তার সর্বস্ব। কেন জানি আই-ওয়ানের মনে হয়—পিওনীও হয় তো ঘর চেয়েছিল—একখানি ঘর। তামার মত—পাহাড়ের গায়ে, বাগান-ঘেরা ছোট্ট একটুখানি ঘর।

জিজ্ঞাসা করল আই-ওয়ান্: 'ওকে বিয়ে করেছ বলে সেদিন পস্তাওনি?'

মাথা নাড়ল পিওনী। উল্টে শুধাল:

'ওকে ছাড়া আমি তো কিছুই নই!' তারপর সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলল: 'ওঃ বড্ড দেরী হয়ে গেছে।' সূঁচটাকে একটা ছোট কাপড়ের ফালিতে বিঁধিয়ে রেখে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলল: 'ভারী দাম সূঁচের এখন। যত সূঁচ হারিয়েছি, সব যদি এখন পেতাম!' হাসতে হাসতে উঠে পড়ে: 'যাই এবার, খাবার টাবার ঠিক করিগে।'

ওর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে রইল আই-ওয়ান্। গতি-ভঙ্গিতে এখনও সুষমা আছে। কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছে। বেশী দিন বাঁচবে না আর। থাক তামার কথা ওকে বলা হবে না। এন-লানকে বলে দেবে পিওনী। এন্-লান্ই ওর ধ্যান জ্ঞান। তামার ব্যাপারে ওকে বিশ্বাস করা চলে না।

দেশের সর্বত্র আছে বিদেশী অফিসারের হাতে শিক্ষিত, উর্দি-পরা, হাতিয়ার-বন্দ রীতিমত সংগঠিত সেনা-বাহিনী। কিন্তু এখানে সব বিপরীত। হয় তো ঐ ধরনের সার-বন্দি জীবন এদের বরদাস্ত হত না। তবু প্রত্যেকেই প্রাণপণে লড়ছে। শত্রুর ঘাঁটির এত কাছে এসে পড়ল ওরা যে হেসে খেলে হেঁটে এক দিনেই বেহাত-এলাকায় পৌঁছুতে পারা যায়। ছড়িয়ে আছে সব এখানে ওখানে; কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন আছে বলে মনে হয় না, দল হয় তো আছে, নেই দলপতি, এন্-লান্ নিজে আছে একটা গ্রামে—নিরীহ গৃহস্থের মত। চারদিকে গৃহস্ত, চাষী-মজুর, দোকানী-পসারী, আর সাধারণ খুঁটে-খাওয়া ছা-পোষা মানুষের বাস, যাদের লড়াই-এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অথচ কোত্থেকে যে এসে কালো কালো ভয়ানক চেহারার ডাকাতের দল রাতারাতি শত্রুর ঘাঁটিতে চড়াও হয়ে, ছাউনীকে ছাউনী উজাড় করে দিয়ে কোথায় উবে যায়। সকালবেলা আগুন হয়ে ছুটে আসে জাপানী খবর-দারী দল—গ্রামকে গ্রাম জাল-ছাঁকা করে। কিন্তু কোথায় কি। নিরীহ গোবেচারী গ্রামের মানুষ কেউ ঘুণাক্ষরে কিচ্ছু জানে না, চর্মচক্ষে কিচ্ছু দেখেনি। ছোট শিশুর মত সরল চোখে ড্যাব ড্যাব করে শত্রুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু হাসে।

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে: 'আমরা কেন শুধুশুধি কাউকে মারতে

গেলাম। কেবা রাজা আর কেবা কি—আমরা আদার ব্যাপারী—ওসব জাহাজের খবরে আমাদের দরকারটা কি! দুঃখু ধান্দা করে মাটি কুপিয়ে দুটো কোন মতে মুখে দিই। অত সাত সতেরয় আমরা নেই। আর বাপু আমাদের সরকারের কথা বলছ! খাজনা, ট্যাক্সর চোটে হাড়ে মাসে ভাজা ভাজা হলাম। তাদের জন্য আবার হেতের ধরব! ওরে আমার পীরিত রে! তা তোমরা এলে যদি দুঃখু-ধান্দা ঘোচে, এসো বাপু, পুজো করে রাখব।'

জাপানীরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে, তারপর মাথা নেড়ে চলে যায়; এবং ওপর-ওয়ালার কাছে লম্বা রিপোর্ট পাঠায় —গ্রামবাসীরা জাপানী শাসন চায় এবং তজ্জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল। তামার চিঠিতেও জেনেছে আই-ওয়ান্, জাপানী সংবাদপত্রে অনুরূপ সংবাদ বের হচ্ছে। তামা খুশী, কারণ তাহলে যুদ্ধ অবিলম্বে শেষ হবে, এবং শেষ হবে তার প্রোষিত ভর্তৃকার জীবন।

কি করে সত্যি কথা বলবে তামাকে আই-ওয়ান্ যে, এই নিরীহ দেখতে গ্রাম-বাসীরা, সত্যি নিরীহ গোবেচারী নয়—ওরাই এন্-লানের যোদ্ধৃ-বাহিনী। ওদের অনেককেই আই-ওয়ান্ নিজে শিখিয়েছে, আবার নিজেও শিক্ষা-লাভ করেছে তাদের কাছে। এখানে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। যে যা জানে, অন্যকে তা শিখিয়ে দেয়, একই খাবার সবাই প্রয়োজন মত ভাগ করে খায়, এক পোষাক পরে, টাকা পায় সবাই সমান। এ ভাবে আই-ওয়ানের বাবা কখনও থাকতে পারবেন না। নাই পারুন। এ দোষ-গুণের কথা নয়। সবাই সব পারে না। স্বাতন্ত্র্যের জন্য অনেকে দারিদ্র্য বরণ করে থাকেন। অনেকের কাছে দারিদ্র্যের মূল্যে ক্রীত স্বাতন্ত্র্য ঘৃণার বস্তু। ওর বাবার কাছেও।

এন্-লানের পথকেই একমাত্র পথ বলে আই-ওয়ান্ মনে করে না। যদিও এন্-লান্ আ-মৃত্যু তার বিশ্বাসকেই আঁকড়ে থাকবে। ও কখনও গৃহবাসী হবে না, আপনার বলে কিছু রাখবে না, সন্তানের জন্য রেখে যাবে না কোন ঐহিক উত্তরাধিকার। ও লড়তে এসেছে, চির জীবন লড়ে চলে যাবে। লড়াই না থাকলেও খুঁজে পেতে বের করে নেবে কোন অন্যায়, অবিচার এবং তার সংস্কারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। শৈশবে পিতৃগৃহের প্রাচুর্যের মধ্যে বসে এমনি বন্ধনহীন জীবনের স্বপ্ন একদা দেখেছে আই-ওয়ান্। প্রলুব্ধ হয়েছে তার কল্পিত বর্ণাঢ্যতায়। কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শে ওর চোখ খুলেছে—স্পষ্ট বুঝতে পারছে আজ একটা সমগ্র জাতি-গঠনের পক্ষে এ বিধি যথেষ্ট নয়। আজ সংগ্রামের জন্য এদের তৈরী করা হয়েছে, এরা সংগ্রাম করছে। কিন্তু যুদ্ধান্তে কি করবে এরা! আজ শত্রুকে এরা যতখানি ঘৃণা করছে, যে-কোন শাসন-পদ্ধতিকে এরা ঠিক ততখানি ঘৃণাই করবে।

এন্-লানের সাথে এ নিয়ে ওর বহু তর্ক হয়েছে।

এন্-লান্ জবাব দিয়েছেঃ 'কেন? এখন যেমন আছে তেমনি থাকবে। এত সরল এত সাহসী এরা। আমি ওদের শাসন করতে চাইনে, বরঞ্চ ওরাই আমার শাসক হোক, আমার আইন-কানুন তৈরী করুক।'

আই-ওয়ান্ প্রতিবাদ করেঃ 'বেশ, বেশ! ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমিও তো ওদের একজন।'

এন্-লান্ বাধা দেয়ঃ 'আর তুমি নও ?'

'আলবৎ, আমিও বৈকি,' অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্, (কখনও কখনও এন্-লান্ যেন একটু একটু বুঝতে পারে) বলেঃ 'কিন্তু শুধু তোমাকে আর আমাকে নিয়েই তো আর জাতি নয়। আমাদের মত সরল মানুষদের নিয়ে সহজ-সরল ছোট এতটুকু সমাজ আর নেই। সমাজ এখন মস্ত বড় একটা যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রটাকে সকলের মঙ্গলার্থে ঠিক মত চালাবার জন্য মানুষকে বহু কিছু জানতে হয় এখন।'

এন্-লান্ উদ্দীপ্ত হয়ে বলেঃ 'তাতো ভালো করেই জানি আমরা। জানি না! আমাদের অশন-বসন জুটছে, ন্যায় ব্যবহার জুটছে। পায়ে শেকলও নেই। মানুষ আর কি চায় বল! এই তো চায়!'

'বটে, কিন্তু ওটুকুই সব নয়—বলতে যাচ্ছিল আই-ওয়ান্, কিন্তু বলল না। বুঝবে না এন্-লান্—বুঝবার মত মনই নয় ওর। ওর নিজস্ব বিশ্বাসের বাইরে ওর দৃষ্টি অচল। যৌবনে কোন একদিন স্বপ্ন দেখেছিল এন্-লান্। সেই স্বপ্ন বিশ্বাস হয়ে ওর বুকে বাসা বেঁধেছিল সে-দিন। আজও তা অক্ষয় হয়ে আছে। স্বপ্নকে সত্যরূপে মাটির বুকে প্রতিষ্ঠা করবার ব্রত নিয়ে সারাটা জীবন ছুটল তারি পিছনে। ছুটবে যতদিন বেঁচে আছে। নিজের বিশ্বাস মত মনে মনে ও জাতি গড়েছে, দেশ সমাজ গড়েছে, তারি মধ্যে ওর স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য আমৃত্যু ও সংগ্রাম করে যাবে।

কিন্তু আই-ওয়ানের সে-দিনকার সে-স্বপ্ন আর নেই। দিনে দিনে তার রূপান্তর ঘটেছে। এখানকার এই জন-জীবনের সংস্পর্শে, এন্-লানের সংস্পর্শে যতই এসেছে ততই বুঝেছে ওর দৃষ্টি বদলেছে। বুঝেছে, অত্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝেছে যে ওদের দ্বারা রাষ্ট্র-পরিচালন সম্ভব নয়। এরা অত্যন্ত সৎ, অত্যন্ত সরল, তবু নয়। সারল্যই যথেষ্ট নয়। সততা এবং সারল্য শাসকের একমাত্র যোগ্যতা নয়। তা যদিই বা হয় তবে এদের সততার পরিসর আরো প্রসারিত হবার অপেক্ষা রাখে।

যুদ্ধ একদা শেষ হবে, কে তখন দেশের সমাজের হাল ধরবে, কি আইন-কানুন তৈরী হবে, কেমন করেই বা হবে ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে ওঠে আই-ওয়ান্। এন্-লানের প্রশ্ন অবান্তর, যেহেতু ও যা নিজে জানে না, বোঝে না তার কর্ণধার ও হবে কেমন করে? কোনো দিন ও বুঝবে না জ্ঞান আর কৃষ্টি, শৃঙ্খলা আর সৌষ্ঠব ছাড়া জীবন অচল। একথা বুঝল না, বুঝবে না এন্-লান্। আই-ওয়ানের মনে হয় তামাই পরশ-পাথর ছুঁইয়ে দিয়েছে ওর অন্তরে। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি কাজে পরিমিতি, শীল ও সৌষ্ঠবকে সমাদর করতে শিখিয়েছে সেই-ই। তামার সাহচর্যের দশটা বছর ওর সত্তার সাথে মিশে আছে। ভাবতে খারাপ লাগে, কিন্তু ওর দশ বছরের জাপানী-জীবনও যেন ওর রক্তে মিশে গেছে। মনে মনে স্বীকার না করে পারেনি, চীনের চাইতে জাপানী মানুষ অধিক নিরাপত্তায় বাস করে, যেহেতু তাদের জীবন ও সমাজ সু-নিয়ন্ত্রিত। এন্-লানের কাছে এ-কথা উচ্চারণ করার সাহস নেই ওর। শত্রুর দেশের কোন প্রশংসা করা যাবে না; দেশকে যে ভালো-বাসে সে যে শত্রুর ভালো কি করে দেখতে পারে সে ভেবেই পায় না।

এক দিন ছিল যখন আই-ওয়ান্ অন্ধভাবে এন্-লানের অনুসরণ করতে পারত। কিন্তু এখন আর কিছুতে পারবে না। যুদ্ধান্তে এক নূতন পৃথিবী জন্ম নেবে; কিন্তু কি হবে তার রূপ আজও তা জানে না ও; আর ভাবতে পারে না। স্তব্ধ হয়ে যায় চিন্তার গতি। কেবল মনে হয় কবে সে-দিন আসবে, যে-দিন স্ত্রী-পুত্রকে এনে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

সুদীর্ঘ হিমের কাল হিমান্তের পথ চেয়ে বসে থাকে, কখন ভুট্টা আর চীনের ক্ষেত মাথা তুলে দাঁড়াবে; কখন তার আড়ালে দিনের বেলায় গা-ঢাকা দিয়ে গেরিলা সৈন্যের দল আবার যুদ্ধে নামবে—আই-ওয়ান্ বসে বসে স্বপ্ন দেখে, যুদ্ধ শেষ হলে তামাকে আর ছেলেদের সমুদ্র পেরিয়ে ঘরে এনে তুলবে। ঘর? কোথায় হবে সে-ঘর? বিরাট চীন-ভূমির কোন অংশে? উত্তরে? সেখানকার সূর্যের আলো, স্নিগ্ধ গ্রীষ্ম ঋতু, আর শীত-ঋতুর বর্ণোজ্জ্বল তীক্ষ্ণতায় স্বাস্থ্যের সম্পদ আছে বটে; কিন্তু মধ্য-চীনের সৃষ্টিময় রূপের ঢালা ঐশ্বর্য আর দক্ষিণের ফুল-ফল প্রাচুর্য......নির্বাচন বড় কঠিন। তামা ফুল ভালোবাসে বটে; কিন্তু ছেলেদের পক্ষে কোথায় উপযোগী হবে সেই হলো সমস্যা। কোথায় থাকা যায়—হ্যাংচাও, সুচাও, নানকিং, হ্যাংকো প্রভৃতি বড় বড় শহরের কথা মনে মনে আলোচনা করে।

কিন্তু কোথায় সে শহর। একে একে সব শত্রুর কবলিত। সাংহাই আগেই গিয়েছিল—সেই হেমন্তের শেষের দিকে। বাবার চিঠিতে জানতে পারে মরীয়া হয়ে লড়ছে সব; যদিও মিছামিছি। এত হতাহত হচ্ছে যে তাদের আর কোন ব্যবস্থা করে ওঠা যাচ্ছে না। শীতের আরম্ভেই গেল সুচাও; গেল হ্যাংচাও—সেই অমরাপুরীর মত হ্যাংচাও। ছোটবেলায় মা বাবার সাথে কতবার গেছে শরতে আর বসন্তে আনন্দ-ভ্রমণে।

শত্রু ক্রমাগতই ভেতরের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারেনি আই-ওয়ান্ যে নানকিংও হাতছাড়া হবে। স্বয়ং চ্যাং-কাই-শেক আছেন নানকিংএ। চ্যাং-কাই-শেক সম্বন্ধে কত উচ্চ ধারণা ওর—হাসি পায় নিজেরই। বাবার মতই ও। দেব-দ্বিজে আস্থা নেই বাবার; আছে শুধু ওই মানবটির ওপর। দেবতার মতই ভক্তি। কিন্তু একদা প্রভাতে শোনা গেল পতন হয়েছে নানকিংএরও। একটা গোটা দিন স্তম্ভিত হয়ে রইল সব; শোক-বিহ্বল হয়ে রইল। কোন কাজে হাত উঠল না। বসে বসে ভাবতে লাগল পিছু হঠবে কিনা। সভায় ডেকে, ভোজের আয়োজন করে বক্তৃতা শুনিয়ে বহু কষ্টে এন্-লান্ ওদের হিমায়িত প্রাণে একটু আগুন জ্বালতে পারল।

পেট পুরে খেয়ে দেয়ে সবাই ধাতস্থ হলে এন্-লান্ বলতে আরম্ভ করল উদাত্ত স্বরেঃ 'নানকিং হাতছাড়া হয়েছে তো কি হয়েছে? নানকিং থেকে কিছুই পাইনি আমরা; সুতরাং ও গেলেও আমাদের লাভ লোকসান নেই। এখন যদি আমরা হটে যাই আর সেই সুযোগে শত্রুরা জয়লাভ করে, পরে আমাদের একাই ওদের সাথে লড়তে হবে। নয় কি? কিন্তু আমরা না হটে যদি লড়ি—এবং জিততে পারি—জিতব নিশ্চয়ই তবে এ দেশ আমাদেরই হবে।'

সেই চিরকালের যাদু—ওর প্রদীপ্ত দুই চোখের যাদু, ওর কম্বু-কণ্ঠের

যাদ্ু; যাদ্ু ওর অতি সহজ অতি সরল বাচন-ভঙ্গিমার যা সবাই বোঝে এবং অনায়াসে বোঝে। যাদ্ুর প্রভাবে আবার মরা-গাঙে ঢেউ জাগল—ফেলে-দেওয়া হাতিয়ার আবার উঠল সকলের হাতে। আই-ওয়ানকে স্বীকার করতে হয় সত্যি যাদ্ু জানে এন্-লান্। কিন্তু এও জানে এ যাদ্ুর জোর ততদিন যত-দিন আছে লড়াইয়ের ডাক। লড়াই যে-দিন সাঙ্গ হবে সে-দিন আসবে ভাঙা ফেলে গড়ার ডাক। এক নূতন মহাজাতি গঠনের কাজ। দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আসবে তারি আহ্বান। সে-দিন ও যাদ্ু আর টিকবে না। সে-দিন হয়তো এন্-লান্ও এখানে থাকবে না। অধৈর্য হয়ে, নূতন কাজে বিরক্ত হয়ে সে হয়তো আর কোথাও চলে গিয়ে আর একটা বিপ্লবের মহড়া দেবে। সে যাই হোক আজ এন্-লান্কে প্রয়োজন আছে।

যখনই কোন শহরের এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূভাগের পতনের খবর আসে এন্-লানের বাহিনী আরো মরীয়া হয়ে ওঠে। কোথাও কোন বড় সংঘর্ষ নাই, দৃশ্যমান কোন হার-জিৎ নাই; অথচ গোপন ক্ষত-স্থান হতে রক্ত ক্ষরণের মত শত্রু-বাহিনীতে নিরন্তর ক্ষয় হয়ে চলেছে। কারো মুখে একটি কথা উচ্চারিত হল না, কেউ জানল না, সংবাদপত্রে একটি অক্ষর উঠল না—অথচ অকস্মাৎ আজ রাতে অমুক গ্রামের অমুক ঘাঁটিতে প্রহরা-রত শতাধিক সৈন্য বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল; কাল অমুক নদীর ওপরকার পুল ভেঙে আধখানা রেজীমেণ্ট নদীর তলায় তলিয়ে গেল; কোথাও ট্রেন ঘায়েল হল; কোথাও বা রাস্তায় পেতে-রাখা মাইন ফেটে শত্রু-সৈন্য বোঝাই ট্রাকখানা উড়ে গেল; হয় তো বা শত্রু-শিবিরে আগুন লাগল রহস্যজনকভাবে; পথে আসতে আসতে অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই জাহাজখানা বেহাত হয়ে গেল; গোলন্দাজ-বাহিনীকে মেরে কামানখানা ঘাঁটি থেকে লোপাট হয়ে গেল; হঠাৎ বাঁধ ভেঙে বান এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল শত্রুর অবস্থান......এমনি আরও কত কি।

এমনি যুদ্ধই চলছিল। এই রীতিতেই এন্-লানের অনুচরেরা সিদ্ধ-হস্ত। এবং আই-ওয়ানও মানে এই ছিল তৎকালীন অবস্থায় প্রকৃষ্ট রীতি। কেন না বাবার চিঠিতে হরদম সংবাদ আসছিল দক্ষিণ চীনে অগুন্তি চীনা-সৈন্য মারা গেছে। পড়তে পড়তে ওর গা কাঁটা দেয়। শত্রুর হাতে দলকে দল কচুকাটা হয়েছে সামনা-সামনি লড়তে গিয়ে। ভাবতে ভাবতে ওর অসহ্য লাগে—কেন চ্যাং বিদেশীদের মত সামনা-সামনি লড়তে যায়; এন্-লানের মত পুরানো রীতিতে লড়ে না কেন!

সে-দিন বাবার চিঠি এল। এক নূতন সুর আজ। যেন পরিণাম চিন্তা করে ভীত হয়েছেন তিনি। লিখেছেন:

'আমাদের সৈন্যদের শুধু সাহসই আছে, আর কিছু নেই। প্রায় খালি হাতেই তারা লড়ছে—ছোট্ট এতটুকু ছর্‌রা-বন্দুকের মত বন্দুক—ওই নিয়েই ও-পক্ষের মেশিন-গানের মুখে ছোটে। ভালো ভালো জোয়ান ছেলেরা প্রায় সব গেছে।'

চিঠিখানা এন্-লান্কে দেখিয়ে বলল:

'যাও না একবার চ্যাং-এর কাছে। দেখো না গেরিলা-যুদ্ধে যদি রাজী করাতে পার।'

অনেকক্ষণ কথা হল। প্রথমটায় যেতে রাজী হয়নি এন্-লান্; ওর সন্দেহ ও গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না। আগে যারা ওকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে চেয়েছিল, তারা যে ওত পেতে নেই কে বলবে। আই-ওয়ানকে বলল:

'আমার বদলে তুমি যাও না! তুমি যাঁর ছেলে, জানের ভয় তো আর নেই তোমার।'

বাবার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের খোঁচাটা হজম করে নিয়ে শান্তভাবে জবাব দেয় আই-ওয়ান্: 'আমার কথা সে শুনবে কেন? তোমার কথা ফেলতে পারবে না। কি সাংঘাতিক মানুষ তুমি জানতে তো আর বাকী নেই তাঁর!

এন্-লান হাসে। আই-ওয়ানের যুক্তি অকাট্য, মানতেই হয়। বাবাকে টেলিগ্রাম করে দিল আই-ওয়ান্। এন্-লানকে নিয়ে যাবার জন্য প্লেন এল। দুজনে হেসে ওঠে এক সঙ্গে। পরক্ষণেই এন্-লানের হাসি উবে যায়। কোন-দিন কিছুকে ভয় করেনি যে-মানুষ সে এরোপ্লেনে চড়তে ভয়ে হিম হয়ে গেল। কিন্তু আই-ওয়ানের বিদ্রূপের ধাক্কায় গিয়ে চড়ে বসল। আকাশে উধাও হয়ে মিলিয়ে গেল প্লেন।

শিগ্গিরই ফিরে এল এন্-লান্। কাজ হয়ে যাবার পর এক মুহূর্ত দেরী করেনি ও। চীৎকার করতে করতে নামল—ওরে বাসরে, এখানে মানুষ থাকে! আর একটি ঘণ্টা থাকতে হলে নাকি মরেই যেত। ঠিকই বলেছিল আই-ওয়ান্। চ্যাং-এর ঘোষণা সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে—মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে লড়ার বিলিতী ধরণ আর নয়। এবারে নিজের দেশের সাবেকী ধরণ—যা দেশের লোকের রপ্ত আছে। ওপক্ষ পিছুবে তো এপক্ষ এগুবে। তারা এগুবে তো এরা হটবে। আর মৌকা বুঝে ধাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে দুশমনের ওপর। কিন্তু মুখোমুখি লড়াই আর নয়।

শুনে জল এল দেশের লোকের প্রাণে। এবারে জিতবার আশা আছে। আই-ওয়ান্ খুশী—অযথা প্রাণী-হত্যা কমবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনটা কঠিন হয়ে ওঠে, এমনি করে চলবে না। জলে স্থলে আকাশে সামরিক শক্তিতে সবার সমান হয়ে দাঁড়াতে হবে। পিছিয়ে থাকলে চলবে না। আজ অবশ্য যেন-তেন প্রকারেণ আত্মরক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এন্-লান্ আর আই-ওয়ানের মধ্যে মাঝে মাঝে শান্তি-ভঙ্গ হয়। যতই দিন যায়, ভুট্টা গাছ বড় হয়, গা-ঢাকা দেওয়ার বাধা কাটে, লড়াই সুরু হয়, শত্রু-পক্ষের মানুষ এ পক্ষের হাতে মরে, ধরা পড়ে বন্দী হয়, ততই তাদের মধ্যে অশান্তি বাড়ে। ধরা-পড়া বিপক্ষ-সৈন্যদের নিয়েই যত গোলমাল। অর্থাৎ তাদের হত্যার পদ্ধতি নিয়ে। নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গি অনুসারে আই-ওয়ানের মন এন্-লানের চেয়ে অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের মার-খাওয়ার শৈশবের সে-পরিধিকে যেন আজও অতিক্রম করতে পারেনি এন্-লান্। পারেনি ভুলতে দুর্গতির যে মর্মান্তিক ছবি সে, সে-দিন দেখেছিল চারধারে। এসব দুঃখ-দুর্দশার জন্য ওর বিচারে দায়ী মানুষই। যদিও মানুষকে, অর্থাৎ স্বজন-পরিজনকে ও ভালোবাসে নিষ্ঠা দিয়ে। কিন্তু ওর মত যারা নয়, ওর স্বজন বলে গণ্য তারা নয়। যে দরিদ্র নয় সে ওর ক্ষমার পাত্র

নয়, প্রাণদণ্ডের যোগ্য। এস্থলে জাপানীদের তো কথাই নেই, তারা ওর কাছে মানুষই নয়।

কিন্তু আই-ওয়ানের শৈশবের ইতিহাস বিপরীত। অবস্থার মার সে খায়নি। লালিত এবং পালিত হয়েছে কোমল হাতের কোমল স্পর্শে। কোন তিক্ততার স্মৃতি তার পশ্চাতের ইতিহাসে নেই।

হয়ত দেখার ভঙ্গি তাই ওর ভিন্ন। মতের অমিল ইদানীং কখনও প্রকাশ্য সংঘর্ষে দাঁড়ায়। পিওনী এসে মাঝে পড়ে দুজনকেই ধমকে সরিয়ে দেয়।

আই-ওয়ান্ এখানে এসেই দেখেছিল এন্-লানের লোকেরা যাদের ধরে সাধারণতঃ তখনই তাদের মেরে ফেলে। খুব অদ্ভুত দেখতে, অথবা গোলমেলে অথবা বিশিষ্ট অপরাধীদের একবারে মেরে ফেলার মত লঘু-দণ্ড দিয়ে যাদের অব্যাহতি দিতে চায় না এমন দুচারজনকেই রাখে এবং ঘরে নিয়ে আসে। তারপর তাদের নিয়ে চলে নিষ্ঠুর খেলা, ওদের অবসর-বিনোদন। খাঁচায় বন্ধ করে, অথবা গাছের সঙ্গে বাঁধে হতভাগ্যকে; যারা আসে গায়ে থুথু ছিটোয়, লোহার শলা দিয়ে খোঁচায়, মশাল জেবলে হাত-পায়ের আঙুলের ডগা ঝলসে দেয়—বর্বর উল্লাসে অসীম যাতনা দিয়ে ধীরে ধীরে একটু একটু করে মারে মানুষগুলোকে।

সইতে না পেরে সে-দিন আই-ওয়ান্ ছুটে এল এন্-লানের কাছে রাগে কাঁপতে কাঁপতে। বলল্ঃ

'তুমি বরদাস্ত করছ এসব?'

ঘরে বসে সেদিন রাতের আক্রমণের স্থানটা ম্যাপে দেখছিল এন্-লান্। জবাব দিলঃ 'কিসের কথা বলছ?'

চীৎকার করে উঠল আই-ওয়ান্ঃ 'বাইরে তাকিয়ে দেখ একবার।'

এন্-লান্ উঠে দরজার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ 'কি হে?'

কঠিন স্বরে বলল আই-ওয়ান্ঃ 'কিছুই দেখতে পাচ্ছ না?'

চিন্তান্বিতভাবে এন্-লান্ জবাব দিলঃ 'না তো? ঐ যে ওরা ওখানে খেলা-ধুলো করছে তার কথা বলছ?'

এবার গর্জে উঠল আই-ওয়ান্ঃ 'একে বলছ খেলা?'

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ভাঁড় ভিড়ের মধ্য থেকে হাসতে হাসতে ছুটে এসে একজন বন্দীর চোখের মধ্যে বুড়ো আঙুলটা ঠুসে দিল। চোখ দুটো ফুটে গলে গিয়ে গাল বেয়ে পড়তে লাগল। হতভাগ্য লোকটা একবার চীৎকার করে উঠে দাঁত চেপে ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল। সমস্ত মুখ মাথা ওর ঘামে নেয়ে উঠল।

এন্-লান্ দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর নির্বিকার চিত্তে বললঃ

'সব কিছু থেকেই তো বেচারীদের বঞ্চিত করে রাখা যায় না। একবার ভেবে দেখ তো কি পায় ওরা? যুদ্ধে জিতলে সৈন্যরা কত লুট-তরাজ করে। টাকায়-পয়সায়, খাবারে, মদে কত বাড়তি জিনিস পায়। আর এরা? প্রতিদিন মুঠো মুঠো করে জীবনগুলো ডালি দিচ্ছে। দিচ্ছি কি ওদের? একই কদন্ন দিনের পর দিন, পকেটে একটা পয়সা দিতে পারিনে কখনও, আর লুট-

ভরাজের তো বালাই-ই নেই। নেহাৎ সরল বেচারারা, কিছু তো ওদের চাই!'

'তাই বলে এই অমানুষিক খেলা? এতো জংলী বর্বরের ব্যসন।' জবাব ছুঁড়ে মারে আই-ওয়ান।

সংযত কণ্ঠে জবাব দেয় এন্-লান্: 'বেশ, তাহলে জংলী বর্বরই ওরা।'

আই-ওয়ানের দিকে তাকিয়ে ওর প্রদীপ্ত চোখ দুটো কঠিন হয়ে ওঠে। বলে: 'এখনও স্বপ্নই দেখছ, আই-ওয়ান্! এখনও বিশ্বাস করে বসে আছ এরা বড় লোকদের চেয়ে ভালো? বড়লোকদের ঘৃণা করি বটে আমি, কিন্তু এরাও কিছু আর দেবতা নয়। তবে এরা এখনও শিশু। যা করে খোলা-খুলিই করে।'

কাতর গুমরানী ঠেলে বেরিয়ে আসে আই-ওয়ানের বুকের ভেতর থেকে। দেয়ালের ওপর হাত রেখে তার মধ্যে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে। কেমন যেন পীড়িত বোধ হয়।

কয়েক মিনিট পরে কণ্ঠকে কিছুটা কোমল করে বলে এন্-লান্: 'ভারী দুর্বল মন তোমার। আমার মত শক্ত হওয়া উচিত ছিল। এতটুকু বয়সে শুয়র মেরেছি নিজে হাতে। সেবার আকালের বছর, যখন একরত্তি খাবার ঘরে ছিল না, পালা বলদটাকে বাবা মারলেন, আর আমি করলুম তাঁর সাকরেদী। আমার একটা বোন হয়েছিল সে সময়, মা নিজের হাতে সেটার টুঁটি টিপে দিলেন। নিজের চোখে দেখেছি সব। আর আমি? বড় হয়েছি ডাকাতের পালের মধ্যে—আকছার দেখেছি নিরীহ মানুষদের কারো যাচ্ছে নাক কাটা, কারো চোখ দিলে গেলে, কারো কান গেল, কারো পিঠের চামড়া তুলে নিলে চড়্ চড়্ করে। জাপানীদের ওপর মায়া করব কেন বলতো?'

আই-ওয়ান্ মুখ মুছে এসে বসল। তারপর বলল: 'জাপানীরাও মানুষ। কিন্তু শুধু সে জন্য বলছিনে আমি। আমার দেশের মানুষ এমন কাজ করছে ভাবতেও লজ্জায় মাথা কাটা যায়।'

রেগে ওঠে এন্-লান্। জিজ্ঞাসা করে: 'জাপানীরা নান্কিংএ কি করেছিল ভুলে গেছ? ওরা যা করেছে, আমরা যতদূরই যাই তার কাছাকাছিও যেতে পারব না।'

'জানি। তাদের অপরাধ আমি ছোট করিনে,' জোরের সঙ্গে আই-ওয়ান্ বলে, 'কিন্তু জাপানীরা যা করেছে আমাদেরও তাই করতে হবে তার মানে নেই। আমার লোকেরা যদি করে তবে আমার কর্তব্য হচ্ছে......'

'ওরে আমার দেশ-প্রেমিকরে!' বলে উঠল এন্-লান্। 'তুমি মুর্খ, আই-ওয়ান্। তোমার মুখের ওপর বলছি, তুমি আকাট মুর্খ। যে কষ্ট আমি ভোগ করেছি, তুমি যদি—'

'তবু এসব কোন কালে আমি সমর্থন করতে পারব না।' আই-ওয়ান্ উত্তেজিত স্বরে বলল।

'তাহলে বরঞ্চ এখান থেকে সরে পড়। দেখ কোথায় এসব দেখতে হবে না। দিল-দরিয়া জাপানীদের সঙ্গেই ভিড়ে যাও না। একটা গভর্ণর টবর্ণর—'

কথা শেষ হতে পেল না এন্-লানের। জ্বলে উঠল আই-ওয়ান্। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। এন্-লান্ প্রস্তুত ছিল না এর জন্য; গড়িয়ে পড়ল

মাটিতে। ছেলেমানুষের মত দুজনে ধ্বস্তাধস্তি। পিওনী অন্য ঘরে ছিল। ওদের চীৎকার শুনে ছুটে এল। তারপর দু'জনকে গাল দিয়ে টানাটানি করে ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। কিছুতেই কিছু হয় না দেখে দুজনের হাতে কসে কামড়ে দিল। ব্যথায় অস্থির হয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল দুই বন্ধু। এন্-লান্ বলল পিওনীকে ঃ

'দেখছ, রক্ত পড়ছে।'

'ঠিক হয়েছে।' শুনিয়ে দিল পিওনী।

আই-ওয়ান্ কিছু না বলে চুপচাপ রুমাল বের করে রক্ত মুছে দাঁড়িয়ে রইল।

পিওনী হাঁক দিল ঃ 'তোমাদের ঝগড়াটা কিসের শুনি!'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল এন্-লান্।

'আমি ওকে দেশ-প্রেমিক বলেছিলাম, তাই।'

ধমকে উঠল পিওনী ঃ 'দেখ্ এন্-লান্, আই-ওয়ান্‌কে যতটা বোকা ভাব, তা নয়।'

হঠাৎ বলে উঠল আই-ওয়ান্ ঃ না না ওসব নয়। বন্দীদের ব্যাপার নিয়ে।'

'কোন বন্দী?' জিজ্ঞাসা করে পিওনী।

বাইরের দিকে তাকায় সবাই। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'মরে গেছে লোকটা।' বলে উঠল এন্-লান্।

আদরের সুরে পিওনী বলল ঃ 'তা হলে তা নিয়ে আর ঝগড়া কেন?'

'কালই তো আবার হবে।' আই-ওয়ান্ বলে।

এন্-লান্ বলে ঃ 'আই-ওয়ান্ চায় অত কষ্ট দিয়ে যেন লোকগুলোকে মারা না হয়। আমি বলছিলাম আমাদের লোকগুলোর একটু আধটু ফুর্তিও তো চাই।'

আই-ওয়ান্ ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয় ঃ 'আর আমি কি চাই জান? চাই, ওদের এমনি শিক্ষা দেওয়া হোক যাতে ওরা রুচি বদলাতে পারে।'

পিওনীর দিকে চেয়ে আবার বলে ঃ 'এন্-লান্ বলে, আমাব মন নরম। কিন্তু তুমি তো ছোটবেলায় আমাদের বাড়ি ছিলে, বলতো ঠিক বলছি কি না!'

এন্-লান্ তীক্ষ্ন কণ্ঠে জবাব দেয় ঃ 'কিন্তু পিওনী তো ছিল ক্রীতদাসী। বড়লোকের বাড়ির ক্রীত-দাসীদের দুর্দশা—'

'তা বটে, কিন্তু ঠিক কথাই বলছে আই-ওয়ান্', ধীরে ধীরে বলে পিওনী। 'আমাদের লোকজনদের পক্ষে সত্যি এসব ভালো নয়, এন্-লান্। আমি জানি কি বলতে চায় আই-ওয়ান্। ওর ঠাকুরমা মাঝে মাঝে তাঁর পাইপ দিয়ে ছ্যাঁকা দিতেন আমায়—' আই-ওয়ানের দিকে একবার তাকায়; লাল হয়ে ওঠে ওর মুখ। আবার ধীরে ধীরে শান্তভাবে বলতে আরম্ভ করে, '—আমার মনে আছে, মনে মনে আমি বলতাম—তুমি আমায় ছ্যাঁকা দিলে, তুমি নিষ্ঠুর, তুমি খারাপ। আমি তো নই। আমার না হয় হাতের চামড়াটাই পুড়ে গেছে, কিন্তু তুমি তো মন্দ হয়ে গেলে।'

স্তিমিত স্বরে শুধায় আই-ওয়ান্ ঃ 'সত্যি' ছ্যাঁকা দিত ?

আস্তিন গুটিয়ে দেখায় পিওনী, বাহুর কোমল ত্বকে গোল গোল অজস্র পোড়া দাগের মালা।

তেমনি স্তিমিত কণ্ঠে বলে আই-ওয়ান্ ঃ 'আমায় বলনি তো কখনও।'

বেদনার্ত হয়ে ওঠে পিওনীর স্বর ঃ 'পারিনি বলতে—কাউকে না। জানিনে কেন। আমার মনে হত সত্যি সত্যি যেন ওগুলো আমার দাসত্বের ছাপ। তাই লুকিয়ে রাখতাম।'

ক্রোধে চোখে জল এসে যায় আই-ওয়ানের। বলেঃ 'বলা উচিত ছিল। যার ওপরে যে কারণেই হোক অত্যাচার আমি ঘৃণা করি।'

'আমিও।' সহজভাবে বলে পিওনী। হাতের আস্তিনটা নামিয়ে দিয়ে এন্-লান্‌কে বলে ঃ 'দেখ, ঠিক কথাই বলছে আই-ওয়ান্।'

সায় দেয় এন্-লান্ ঃ 'হবে।'

ওর মুখ দেখে বোঝা যায় না স্বীকৃতিটা অন্তরের না শুধু বাইরের।

কিন্তু সে-দিন থেকে অন্ততঃ আই-ওয়ান্ আর কোন পীড়ন সংঘটিত হতে দেখেনি।

বহু দিন থেকে একটা পরিকল্পনা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিল আই-ওয়ান্। মাস কয় আগে হঠাৎ একদিন ওর মনে হল যদি কোনদিন বুজীর ওপরই হামলা করে বসে; অথবা ওর লোকজনরা ওকে মেরে ফেলে বা ধরে! পরিকল্পনাটার সূত্র-পাত সে-দিন থেকেই, যদিও বুজীর এদিকে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই জেনে উঠ্‌তি চিন্তাটাকে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল আই-ওয়ান্।

কিন্তু তবু সেদিন থেকে আই-ওয়ান্ অতর্কিত আক্রমণের সময়ও মুখ না দেখে কোন জাপানীকে কিছু করেনি বা পেছন দিক থেকে কাউকে মারেনি। কেবলি মনে হয়েছে, কি জানি যদিই বা বুজী হয়। এমন কি হয়তো কেউ ওর সামনে থেকে পালিয়ে গেলেও মুখ দেখতে না পেলে আটকায়নি। বুজী যে কোথায় আছে কিছুই জানে না ও; তামা জানলেও ওকে কিছু লেখেনি। শুধু লিখেছে—বুজী বেঁচে আছে এবং ভালো আছে। তার ছেলে এখন হাঁটে একটু একটু। সেংসু আর একটি ছেলের জন্য ভারী ব্যগ্র। কে জানে কবে সেংসুর আশা মিটবে। যুদ্ধের যেন আর শেষ নেই। শেষ হয় হয় করেও হয় না।

বুজী বেঁচে আছে বলেই তো যত ভয়। কখনও যদি বুজী ধরা পড়ে এখানে—আই-ওয়ানের কর্তব্য ঠিক হয়েই আছে। ও তাকে পালাতে সাহায্য করবে অবশ্যই। কিন্তু প্রথমে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করবে, জাপানীরা অনর্থক চীনের ওপর এই যে লড়াই বাঁধিয়েছে, কত অনিষ্ট, কত ক্ষয়-ক্ষতি তাতে হচ্ছে। বহু বন্দীর সাথে কথা বলেছে আই-ওয়ান্। দেখেছে, অনেকেরই জানা নেই ভিটে-মাটি স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে এদেশে কেন পাঠান হয়েছে ওদের এমন করে শুধু মরতে। ওদের মন বুঝবার জন্য অনেক সময় মৃত জাপানীদের পকেট থেকে,

চিঠি পত্র, ডায়েরী খুলে নিয়ে পড়েছে। সর্বত্র একই কথা—এই যুদ্ধ—ন্যায়ের যুদ্ধ এবং অপরিহার্য। তাদের দেশ, ঘর-বাড়ি রক্ষা করার জন্যই এই ধর্ম-যুদ্ধ ওরা প্রাণ দিয়ে লড়ছে। আই-ওয়ানের বলতে ইচ্ছে হয়েছেঃ 'আমরা তো তোমাদের দেশ ছিনিয়ে নিতে যাইনি! তবে আমাদের কাছ থেকে কি রক্ষা করবে তোমরা? কিসের জন্য এমন করে প্রাণ ডালি দিলে!' কিন্তু প্রাণ-হীন মৃত দেহের কাছে কি বলবে?

এন্-লানের সাথে হাতাহাতির পর থেকেই পরিকল্পনাটা নিয়ে উঠে পড়ে লাগল। সে-দিন গেল বন্ধুর কাছে। একটু সন্দিগ্ধ চিত্তেই গেল—কি জানি কি ভাবে গ্রহণ করবে এন্-লান্। যদিই বা আবার ওর মন নরম বলে গাল দিয়ে বসে! কিন্তু হল বিপরীত। এন্-লান্ শুনেই লাফিয়ে উঠল খুশী হয়ে।

'ঠিক বলেছ হে,' উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল সেঃ 'ঠিক বলেছ, ভেতরের বিশ্বাস ছাড়া জোর করে কাজ করাতে গেলে কাজ হয় না। সত্যি সত্যি যদি ওদের মনে সন্দেহ আর নেতাদের ওপরে অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারা যায় বাস্। চমৎকার ফন্দী।'

আই-ওয়ানের হাত চাপড়ে দরাজ হাসি হেসে বললঃ

'মাথার খুলিটার মধ্যে পদার্থ একটু আধটু আছে দেখছি।'

মত মিলল, তবু, আই-ওয়ান্ জানে, ওদের দুজনের ভাব-ধারায় কোথায় যেন পার্থক্য আছে। মতৈক্য হলেও কেমন যেন একটা অসঙ্গতি থাকে। যাই হোক গে। ও আর মাথা ঘামাবে না ওসব নিয়ে। কাজ হাসিল হলেই হল। এন্-লান্ যখন তার দলের কাছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল, তারাও দেখলে শত্রুকে ঘায়েল করার তোফা কায়দা। বেজায় খুশী তারা। অতএব আর চাই কি। এবং এর পর থেকে ধৃত বিপক্ষ-সৈন্যদের খুব করে খাইয়ে দাইয়ে, জামাই আদরে কয়েক সপ্তাহ রেখে, এন্-লানের ভাষায় 'শিক্ষা' দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতে লাগল। বেচারারা সব দেখে শুনে এবং এ ভাবে ছাড়া পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে কি যে করবে ভেবে পায় না।

কিন্তু বেচারা বুজীর কোন কাজেই এল না আই-ওয়ানের এই পরিকল্পনা। কিছুদিন পরে তামার চিঠি এল বুজী তাইয়েরচোয়াং-এর যুদ্ধে মারা গেছে। আই-ওয়ানের মনে পড়ে—যেদিন প্রথম দেখেছিল বুজীকে। কি দিল-খোলা, হাসি-খুশী মানুষ ছিল। লড়াই না হলে সুখের সংসার হত বুজীর। যুদ্ধই সর্বনাশ করল ওর। সরল সহজ প্রাণ রণাঙ্গনের পাশবিকতা সইতে পারল না। ভেঙ্গে গেল ও...। বুজীকে নিয়ে অত আশংকা আই-ওয়ানের, মিছে হল। মিছে হল সেৎসুর আর এক সন্তানের পথ চেয়ে থাকা। সে সন্তান আর আসবে না।

চ্যাং-এর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেল আই-ওয়ান্। ডাক এসেছে। পরের দিনই প্লেন আসছে ওকে নিতে। আই-ওয়ান্ খবর দিতে গেল এন্-লান্‌কে। দুজনে অনেকক্ষণ মাথা ঘামাল এই তলবের হেতু কি। কিন্তু কিছুই ঠাহর

হল না। তবে এটা তারা ধরে নিল, রাষ্ট্র সংক্রান্ত কিছু নয়। নইলে একা আই-ওয়ানেরই ডাক আসত না।

চ্যাং কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলেও মনে হল না, কেন না কিছু-দিন আগেই এখানকার সকলের শীতের কাপড় কিনে দেবার জন্য মোটা অংকের টাকা পাঠিয়েছেন। হয়তো বা ওর নিজেরই কোন ব্যাপার, ভাবে আই-ওয়ান্। তামা সম্বন্ধে ওকে যাচাই করে দেখতে চান। আচ্ছা যদি ত্যাগ করতে বলেন তামাকে ?

অসম্ভব। তা ও পারবে না। কিন্তু কি করবে ? কি বলবে ? আসুক, সময় আসুক, যা হয় করা যাবে। ও ফিরে এসেছে নিজের দেশের হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়ছে, এই কি ওর বিশ্বস্ততার যথেষ্ট প্রমাণ নয় ? তামার সাথে ওর সম্পর্ক—সে অতীত ও ভবিষ্যতের মণি-ভাণ্ডারের ধন। ওর বর্তমান উৎসর্গ করেছে দেশ-মাতৃকার দেউলে। ভবিষ্যতে কি করবে না করবে সে সম্বন্ধে কোন অঙ্গীকার ও কারো কাছে করবে না। ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত। কেই বা জানে কি ঘটবে অনাগত কালে।

বুকে সাহস সঞ্চয় করে, কাপড়ের পুটলিটা হাতে নিয়ে আই-ওয়ান্ এসে দাঁড়াল মাঠে যেখানে প্লেন নামে। এমনি সময় পেঁাছে গেল ম্যাক্‌গার্ক তার প্লেন নিয়ে। ভেতর থেকেই চীৎকার করে বলল :

'তৈরী ?'

'একদম।' জবাব দিল আই-ওয়ান্।

'বেশ বেশ,' প্লেন থেকে লাফিয়ে নামতে নামতে জবাব দিল ম্যাক্ : 'দাঁড়াও, এক পেয়ালা চা খেয়ে, আর একটান সিগারেট্ টেনে—এই মিনিট বিশেক আর কি! উঃ, বেদম নাকাল হ্যাংকো থেকে এখানে আসতে। গোটা আকাশটা যেন গর্তে ভরা। একটু এগোও আর ধপাস্ ধপাস্ করে পড়। বাপ্‌স্!'

গাঁয়ের ছোট্ট দোকানটায় চা খেয়ে নিয়ে দুজনে ফিরে এল প্লেনে। নিজের দেশকে আজ যেন আরো ভালো করে দেখতে পেল আই-ওয়ান্। তরঙ্গায়িত পর্বত-শ্রেণী নীচে; ঊর্ধ্বাকাশে মেঘ-মালা। পাহাড়ের চূড়ায় আর মেঘের দলে চলছে লুকচুরি খেলা। কিন্তু আজ এই সৌন্দর্য উপভোগ করবার মত মন নেই ওর। ওর সমস্ত চিন্তা জুড়ে আছে এক প্রশ্ন—কেন ওকে ডেকে পাঠাল চ্যাং।

হ্যাংকোতে আই-ওয়ান্ এল এই প্রথম। যদিও এর আশে পাশে বহু জমিদারী আছে ওদের। শহরের রাস্তা দিয়ে চ্যাং-কাই-শেকের আস্তানার দিকে যেতে যেতে আশপাশের মানুষকে নিরীক্ষণ করে দেখে, তাদের কথা শোনে। ভাষা বুঝতে কষ্ট হয় না, কিন্তু টান কেমন যেন এন্-লানের সাথেও মেলে না. আর ওর সাংহাই অঞ্চলের টানের সাথে তো নয়ই। কিন্তু তবু একই দেশের মানুষ সব; আই-ওয়ান্ এদেরই একজন। ওর স্বদেশীয়দের মধ্যেকার এই সব পার্থক্যের কথা অনেক সময় ও গভীরভাবে ভেবেছে। প্রতিটি চিন্তায় কর্মে তামার দেশের প্রতিটি মানুষ এক সূত্রে বাঁধা। কিন্তু চীনের মানুষ ?

যুদ্ধ আজ চীনের মানুষকে একীভূত করেছে। চীনের ইতিহাসে এই প্রথম। কিন্তু যখন শেষ হবে যুদ্ধ, তখন? তখন কোথায় খুঁজে পাবে মিলনের রাখী? বহুবার নিজকে এই প্রশ্ন করেছে আই-ওয়ান্ বিশেষ করে নিজের আর এন্-লানের কথা মনে করে। যুদ্ধের দৌলতেই ওরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে আজও। কিন্তু তারপর? না—চাই—চাই—আর একটা কিছু চাই—অন্য কোন বন্ধন-সূত্র চাই—যুদ্ধের মতই প্রবল, শত্রুকে প্রতিরোধের দায়ের মতই অপরিহার্য—।

ভবিষ্যতের চিন্তায় ডুবে গেছে আই-ওয়ান্। হঠাৎ মোটরখানা থেমে গেল ঝাঁকানী দিয়ে সাধারণ একটা পাকা বাড়ির সামনে। চালক বুড়ো আঙ্গুলের ইসারায় দেখিয়ে দিল ওরা যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। নেমে দরজার ঘণ্টা বাজাল ও। সাদা উর্দি পরা ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল। ভৃত্য যেন ওরই প্রতীক্ষা করছিল। অভিবাদন করে সে ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে বলল।

সাধারণ একখানা ঘর; সাদা মাটা আসবাব। মনকে আকর্ষণ করবার মত কিছুই নেই। আবার নিজের ভাবনায় গা ভাসাবে, এমনি সময় দরজা খুলে গেল। ওর বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল আই-ওয়ান্।

'বস।' বাবা বললেন।

বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে বাবাকে। গতবার যা দেখেছিল তার চেয়ে অনেকখানি যেন রোগা হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা করল:

'তোমার শরীর বুঝি ভালো নেই, বাবা?' বাবার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মন ওর উদ্বেগে আশংকায় উদ্বেল হয়ে উঠল। এমনতর তো কখনও দেখেনি এ মানুষকে! কোথায় গেল সে তেজ, সে দীপ্তি। এমন করে বসে আছেন যেন সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। উঠে দাঁড়ানও যেন একটা বিপুল পরিশ্রমের ব্যাপার।

'না রে, ভালোই আছি।' জবাব দিলেন শ্রী উ। তারপর আবার বললেন: 'একদিক না একদিক দিয়ে আমাদের সবাইকেই মেরে রেখে গেল এই যুদ্ধ। নান্‌কিং থেকে চিঠি পেলাম।' একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'শহরটাকে নূতন করে গড়তে আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। বহু ঋণ করেছিলাম। সে আমার গর্ব ছিল। কিন্তু গেছে, সে নানকিংও গেছে।'

'মানে—একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে?' নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্। ওর মনে পড়ে সেবারে যখন চ্যাং এর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল, বাবা কত আগ্রহে নূতন নান্‌কিংএর নূতন ইমারত, রাস্তা-ঘাট, এটা-সেটা দেখিয়েছিলেন। সত্যি বড় সুন্দর ছিল প্রত্যেকটি জিনিষ। গর্ব করার মতই।

'যতটুকু বেঁচেছে তাও শত্রুর কবলে।' জানালেন শ্রী উ। তারপর একটু সামনে ঝুঁকে হাঁটুর ওপর হাত চেপে কানে কানে বললেন:

'আজ বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। ভয়ে আমার দেহ হিম। কেন জানিস্? শহর গেছে বলে নয়, মানুষ মরেছে বলে নয়...। নান্‌কিংএর রাস্তায় রাস্তায় আবার

আফিং বিকুচ্ছে—একেবারে খোলাখুলি। যারা মরেছে গেছে। যারা বেঁচে আছে, তাদের ওই আফিংএর বিষ দিয়ে মারবে ওরা।'

বাবার দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে ধারাসারে। মুছবার চেষ্টাও নেই। ঝরেই চলেছে অশ্রু। ভয় পেয়ে গেল আই-ওয়ান্। ওর বুক ভেঙ্গে যেতে লাগল। কি বলবে ভেবে না পেয়ে মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইল। আই-ওয়ান্ শুনেছে আফিং-এর কথা। শত্রুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা শহর-গুলির রাস্তায় রাস্তায় এমনি করেই আফিং বিকোয়। দেখে এন্-লান্ কি সাংঘাতিক চটে যেত তাও দেখেছে আই-ওয়ান্।

তারপর আস্তিনে চোখ মুছে ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললেন, আকুল মিনতির সুরেঃ

'দিবি, বাবা, কটা দিন আমায়? যাবি আমার সাথে—বহু জমি আছে আমাদের; একদিন এ সবই তোর আর তোর ছেলেদের হবে।'

তখন খেয়াল হয়নি, কিন্তু পরে ভেবেছে, কই বাবা আই-কোর কথা তো একবারও বললেন না! শুধু বললেন—সব তোর আর তোর ছেলেদের হবে।

'যাব, বাবা।' জবাব দিল আই-ওয়ান্।

'কে জানে', বাবা বলে চলেন; 'চীনের একেবারে ভেতরকার এই সব জায়গা-গুলোই অবশিষ্ট থাকবে হয়তো শেষ পর্যন্ত। যা হচ্ছে, হয় তো ভালোই হবে আমাদের—আমরা যারা সমুদ্রের ধারের জায়গাগুলো থেকে এখানে পালিয়ে এসেছি—স্কুলগুলোও উঠে এসেছে এখানে। এই তো, গত সপ্তাহের কথা—হ্যাংকো থেকে একটা লোহার কারখানা এখানে তুলে আনবার জন্য টাকার দরকার। বহু হাজার ডলারের এক ঋণ পত্রে সই দিয়ে এলাম।

'চ্যাং হ্যাং-কো রক্ষার ব্যবস্থা করবে না?' আই-ওয়ান্ জিজ্ঞাসা করে।

মাথা নাড়েন শ্রী উ।

'কালই ক্যান্টন থেকে হটে আসা হয়েছে। দু'চার দিনের মধ্যে হ্যাংকোও যাবে। বোধ হয়, ঠিকই করছে চ্যাং—' দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে চলেন, 'আর যদি ভুল করে থাকে, তবে বাস্ আমরা গেছি।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন শ্রী উ। আই-ওয়ান্ অবাক হয়ে ভাবে চ্যাং-এর ওপর বাবার সেই অকুণ্ঠ বিশ্বাস! খোয়ালেন কি তা? ক্যান্টন গেছে... তারপর হ্যাংকো...? এমনি সময় দরজা খুলে গেল; শ্রীমতী চ্যাং এসে জানালেন জেনারেলিসিমো প্রস্তুত। এবং আর একটা কক্ষের মধ্য দিয়ে চ্যাং-এর কক্ষে ওদের নিয়ে গেলেন।

বসে ছিলেন চ্যাং। ওরা যেতেই উঠে দাঁড়ালেন। এর আগে কখনও ও'কে উঠে দাঁড়াতে দেখেনি আই-ওয়ান্। ঋজু, কৃশায়িত দেহটা আগের চেয়ে দীর্ঘতর মনে হল। নিঃশব্দে সকলে আসন গ্রহণ করলে শ্রীমতী চা পরিবেশন করলেন অপূর্ব সুকুমার ভঙ্গিতে। তারপর স্বামীর দিকে তাকালেন, এবং তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে দরজা বন্ধ করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

স্বাগত-সম্ভাষণ নেই, ভূমিকা নেই, আরম্ভ করলেন চ্যাংঃ

'আমি তোমায় দু কারণে ডেকেছি। প্রথম, তোমার ভাইএর মৃত্যু-সংবাদ দিতে।'

অত্যধিক জোর দিয়ে কথাটা বললেন এবং বলে একটু থামলেন যাতে খবরটা আই-ওয়ানের হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না ও। আই-কো নেই! মাথাটা ওর যেন শূন্য হয়ে গেল, সমস্ত রক্ত যেন মাথা হতে বেরিয়ে গেল। আবার পরক্ষণেই টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে ফুটতে যেন মাথার দিকে বেয়ে এল রক্ত-প্রবাহ। বাবার দিকে তাকাল। স্তব্ধ প্রতিমার মত বসে আছেন—মাথাটা নুয়ে ঝুঁকে পড়েছে।

ধরা গলায় শুধায় আই-ওয়ান্‌ঃ 'তুমি জানতে, বাবা?'

মাথা নেড়ে জবাব দেন শ্রী উ নিবন্ত স্বরেঃ 'কাল।'

হঠাৎ বলে ওঠেন চ্যাংঃ 'হয়ত জানতে চাও, কেমন করে মারা গেল তোমার ভাই—' বলে দেরাজ থেকে একখানা চিঠি বের করে আই-ওয়ানের হাতে দিলেন। যেমন তেমন করে লেখা ময়লা একটা চিরকুট। ভাষাটা ইংরেজী। লেখকের নাম নেই। কিন্তু সমাচারটি দ্ব্যর্থ-বিহীন। পাঁচটা নাম আছে। বিপক্ষের কারো সাথে গোপনে যোগাযোগ করতে দেখা গেছে এদের। আই-কোর নাম তালিকায় তৃতীয় স্থানে।

আই-ওয়ান্‌ আবার চ্যাংএর দিকে তাকায় চোখ তুলে।

'কিন্তু দাদা, দাদা কেন—' এর বেশী আর বলতে পারে না।

রুক্ষ স্বরে জবাব দেন চ্যাং। এটা ওর স্বাভাবিক রুক্ষতা কিন্তু এখন বড় বেশী তীব্র শোনাল।

'একটা ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। তোমার দাদার সাথে ব্যবস্থা হয়েছিল ও পক্ষ যদি এখানে তাদের সরকার কায়েম করতে পারে তবে তাকে উঁচু পদ দেবে সরকারে।' তারপর টেবিলের ওপরে রাখা চিঠিটার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'ওটা লোক মারফৎ আমার হাতে আসে চৌদ্দ দিন আগে। অনেক কষ্টে সে বেচারা আমার কাছে এসে পেঁছায়। এই প্রথম খবর নয়। এর আগে আরো পেয়েছি। যে লিখেছে—এটার মধ্যে সে নাম দেয়নি, কিন্তু যার হাতে এটা পাঠিয়েছে, তার কাছে মুখে বলে দিয়েছিল। তারপর আমি লোকটাকে এখানে আনাই। বলল তার নাম লিম্‌—তোমাদের দুভাইকে চেনে। তোমার দাদাকে একটুও পছন্দ করত না যে কারণেই হোক।' একটু থেমে আবার বলল চ্যাংঃ মানুষের রাগ বিরাগকে আমি সুবিধামত কাজে লাগাই। এক্ষেত্রেও তাই করলাম। লিম্‌-এর রাগকে আমার কাজে লাগালাম।' আবার একটু থেমে আরম্ভ করলঃ 'আর এই হচ্ছে প্রমাণ যে তোমার দাদা বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণ-দণ্ডের হুকুম দিয়ে পাঠাই।'

একটি একটি করে প্রতিটি অক্ষর শুনল আই-ওয়ান্‌। শুনতে শুনতে আগেই বুঝেছিল উপসংহার কি এর। ভয়ে ও কাঁটা হয়ে ছিল। কিন্তু চ্যাং-এর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে ও বসে রইল।

'কিন্তু কি করে...কি করে...ঐ লোকটা...' গলা ধরে যায় আই-ওয়ানের; আড়ষ্ট জিহ্বায় কথা বেঁধে যায়। জ্যাকি লিম্‌...দাদার ওপরে গোয়েন্দাগিরি করল কি না জ্যাকি লিম্‌! অত ভালো ব্যবহারের এই প্রতিদান আই-ওয়ান্‌কে দিল জ্যাকি লিম্‌!

চ্যাং জবাব দিল ব্যস্তভাবেঃ 'ও লোকটার কোন দোষ নেই। অতি সাচ্চা

সরল মানুষ। সৈন্যদের মধ্যে সর্বত্র ঐ নিয়ে কানাঘুষা চলছিল। কোন কোন অফিসার নাকি ঘুষ খাচ্ছে। শুনে খেপে গেল লিম্। এবং সরল মানুষ বলেই খোঁজ খবর করতে শুরু করে দিল। তারপর সাহস করে খবরটা পোঁছে দিল আমার কাছে সোজা। আমেরিকায় বাস ছিল ওর। বল্লে ওদেশের মানুষ শাসককে ভয় করে না।'

আই-ওয়ান্ দাবীর ঝাঁজ ঢেলে শুধাল: 'কোথায় আছে লোকটা এখন?'

চ্যাং জানান: 'নিজের কাজেই সে ফিরে গেছে। তারপর আর জানি না।'

আর বলার নেই কিছু। পাথর হয়ে বসে আছেন শ্রী উ। আই-ওয়ান্ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসল। মনের পর্দায় ভিড় করে আসতে লাগল আই-কোর হাজারো ছবি—সেই ছোটবেলার আই-কো, খেলা করছে দু'ভায়ে বাগানে; কি সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা ছিল—আব্দেরে আই-কো—যা চাইবে দিতেই হবে, নইলে মাটিতে লুটিয়ে হাত পা ছুঁড়ে সে কি কান্না... তার পর সে বড় হল। সেই সু-কান্তি তরুণ আই-কো—কন্দর্পের মত চেহারা ...কেমন করে মৃত্যুকে বরণ করল আই-কো? বীরের মত নিঃশব্দে? না শেষ পর্যন্ত ঠোঁট-ফোলান আব্দেরে ছেলেই রয়ে গেল সে? চেষ্টা করলেও জানা যাবে না, অসম্ভব। থাক, জানতে চায় না ও। জানবে না।

ধীরে ধীরে শ্রী উ বলেন: 'সব ওই বিদেশী মেয়েটার কীর্তি। দেব পাঠিয়ে ওর নিজের দেশে। ওই খেপিয়ে খেপিয়ে নিজের দেশের মানুষের ওপর চটিয়ে দিয়েছিল আই-কোকে। এসে অবধি আমাদের কিছুই তার ভালো লাগলো না। আমাদের সৈন্যদের ঠাট্টা করত। আর হামেসা ছেলেটার কানে জপত জাপানীরা নাকি অনেক ভাল। শুনতে শুনতে মন বিগড়ে গেল বেচারার। সত্যি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে বসল, জাপানীদের ঠেকান যাবে না। যখন গেল তখন—', বিশীর্ণ কাতর মূর্তিতে দৃষ্টি তুলে বললেন: 'না, আমি তার হয়ে সুপারিশ করছি না।'

চ্যাং-এর চোখে মুখে কেমন একটা হিম-কঠিন করুণা ফুটে ওঠে। শ্রী উর কথা শেষ হলে বলেন: 'আমাদের বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। দুজনে বুঝেছি দুজনকে।'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানান শ্রী উ। পিতার প্রতি এক অপূর্ব ভালবাসায় ওর হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

'আপনি একটু বাইরে যান,' চ্যাং অনুরোধ জানান শ্রী উকে, 'আপনার ছেলের সঙ্গে আমার কথা আছে।'

অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন শ্রী উ।

হঠাৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন চ্যাং। মুখের সমস্ত কোমলতা মিলিয়ে গেল। আই-ওয়ানের দিকে ওর কালো চোখের কঠোর দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল। বললেন: 'তোমায় দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছি এতদিন। আরো করবার মতলব ছিল।' একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন:' কিন্তু তুমি জাপানী মেয়ে বিবাহ করেছ।' তীক্ষ্ন হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর।

আই-ওয়ান্ চমকে উঠল। সব জানে এ লোকটা। স্বীকার করে আই-ওয়ান:

'আজ্ঞে।'

'একদিকে বাপকা বেটা, আর একদিকে বিশ্বাস-ঘাতকের ভাই—' বলে চ্যাং। স্বর অতি কঠোর, মুখখানা অতি নিষ্করুণ। '—তাহলে বুঝব কি করে তুমি কেমন মানুষ?'

আই-ওয়ান্ জবাব দেয়ঃ 'আমার বলার কিছু নেই।' ভয় পায় লোকটাকে আই-ওয়ান্। কিন্তু না, করবে না ভয়।

'স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারবে?' শুধান চ্যাং। প্রশ্নে দাবীর সুর।

'তাই আদেশ করছেন?' জিজ্ঞাসা করে আই-ওয়ান্।

চ্যাং নিরুত্তর। ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে আই-ওয়ানের মুখের ওপর।

শান্তভাবে জবাব দেয় আই-ওয়ান্ঃ 'না, পারব না।' কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটে। তারপর আবার বলেঃ 'স্ত্রী পুত্র ফেলে এখানে এসেছি, দেশের হয়ে লড়ব বলে। এবং লড়ছি। লড়াই শেষ হলে, দেশে শান্তি স্থাপিত হলে ওদের নিয়ে আসব এখানে। আমার ছেলেরা এ দেশের মানুষ। আর .ওদের মা...আমার একান্ত অনুগতা সে...'

'শান্তি! সে তো বহু দিনের কথা।' জবাব দেন চ্যাং।

'জানি।' আই-ওয়ান্ বলে।

ততদিনে এই শহর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।' চ্যাং বলেন। ওর দুই চোখের দৃষ্টি ঘুরে ফেরে কক্ষের চারদিকে। তারপর চলে যায় খোলা জানালার পথে বাহির পানে যেখানে জনাকীর্ণ শহরের বুকে অট্টালিকাগুলি দাঁড়িয়ে আছে ঘেঁষাঘেঁষি ঠেকাঠেকি করে। বলে চলেনঃ

'...শুধু এই শহরই নয়, সব যাবে শান্তি আসতে আসতে, একটি শহরও থাকবে না।'

'মাটি তো থাকবে...' জবাব দেয় আই-ওয়ান্; বুঝল এখন ও কেন বাবা বলেছিলেন—জমি সব তোর আর তোর ছেলেদের।

ওই কথাই প্রতিধ্বনিত হয় চ্যাং-এর মুখেঃ 'তাই.. মাটি থাকবে বটে।'

পরক্ষণেই আবার বদলে যায় লোকটা। আই-ওয়ান্ অবাক হয় না। অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

'কেমন মানুষ তোমার স্ত্রী?' জিজ্ঞাসা করেন চ্যাং।

জবাব না দিয়ে তামার শেষের চিঠি দুখানা পকেট থেকে বের করে দেয় আই-ওয়ান্। এ দুখানা নষ্ট করেনি। পেয়েছিল এখানে আসবার ঠিক আগেই। ভালো করে পড়া হয়নি। আবার পড়বে বলে রেখে দিয়েছিল।

সাধারণ চিঠি, তামার সু-ছাঁদ হাতে লেখা। লিখেছে—বাবার ওখানে যায়নি সে। যেতে পারবে না আই-ওয়ানের ভরা-স্মৃতি ফেলে। তারপর নানা খবর —বাগানে অমুক গাছ হয়েছে, দুজনে যে চন্দ্রমল্লিকা লাগিয়েছিল তাতে ফুল ধরেছে; সেদিন প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেল, কাগজের পর্দা সব লণ্ডভণ্ড। জীরোকে নিয়ে ও সব মেরামত করে নিয়েছে আবার; খুব বড় হয়েছে ছেলেরা; ও রোজ শোনায়-ওদের বাবা কেমন বীরের মত লড়ছেন তাঁর আর ওদের দেশের জন্য। আরও লিখেছে পথ চেয়ে আছে ওরা সবাই, কবে আবার সবাই একসঙ্গে হবে

—সে কথা যেন ভুলে না যায় আই-ওয়ান্। এমনি ধারা নানা কথা। প্রেমময়ী স্ত্রী লিখছেন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে স্বামীর কাছে।

পড়ে চ্যাং। আই-ওয়ান্ নিরীক্ষণ করে তার মুখের ভাব। কিন্তু বোঝা গেল না কিছুই। পড়া শেষ হলে ধীরে ধীরে ভাঁজ করে খামের মধ্যে পুরে আই-ওয়ানের দিকে বাড়িয়ে ধরে। কি যেন গভীর চিন্তায় ডুবে আছে চ্যাং।

'আর কিছু চাও ?' জিজ্ঞাসা করে।

'বাবার কাছে থাকতে চাই কটা দিন,' বলে আই-ওয়ান্, 'পৈত্রিক জমি জমা কোনদিন দেখিনি। বাবার সঙ্গে একবার দেখতে যাব।'

'তারপর ?'

'তারপর কাজে ফিরে যাব।'

'বেশ,' সাগ্রহে বলে ওঠেন চ্যাং। তারপর মুখ ঘুরিয়ে টেবিলের ওপরকার ঘণ্টা বাজান। দরজা খুলে যায়, শ্রীমতী চ্যাং দেখা দেন। আই-ওয়ান্ বোঝে এবার বিদায়। উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে। কিন্তু চ্যাংএর চোখ অন্য দিকে।

'বর্মা পর্যন্ত যে নূতন রাস্তাটা হয়েছে তার ম্যাপটা কোথায় ?' স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন চ্যাং এমনভাবে যেন এতক্ষণ এখানেই ছিল মহিলা, 'একটু আগেই তো হাতে নিয়েছিলাম।'

'এই যে,' মৃদু হেসে ম্যাপটা দেখিয়ে দেন শ্রীমতী, 'তোমারই হাতের তলায়।'

...বর্মা পর্যন্ত নূতন রাস্তা...কথাগুলি কানে বাজতে থাকে আই-ওয়ানের। বাইরে আসে ও। নূতন রাস্তা...শেষ হয়েছে কি রাস্তাটা ? তৈরী হচ্ছে শুনেছিল। হাজার হাজার নারী পুরুষ হাত মিলিয়ে রাস্তা বাঁধছে। অতি বিচিত্র এই যুদ্ধের লীলা। শত্রুর বোমার ঘায়ে পূব দিক ভাঙ্গছে...সাথে সাথে গড়ে উঠছে পশ্চিম দিক। এমনিই ওর দেশের ধরণ। কোন চীনকে জানবে ওর ছেলেরা ? উপকূল থেকে দূরান্তরিত এই নূতন চীনই যদি হয় ক্ষতি কি ? নাই বা রইল সমুদ্র-মেখলা চীন। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ভারতের দিকে অভিযাত্রী নূতন চীনের নূতন-মেলা চোখ। হোক না সেই চীনই। কিন্তু কে জানে ? কে জানে ভাবীকালের লেখন ?

বাবাকে খুঁজতে চলে যায় আই-ওয়ান্।

